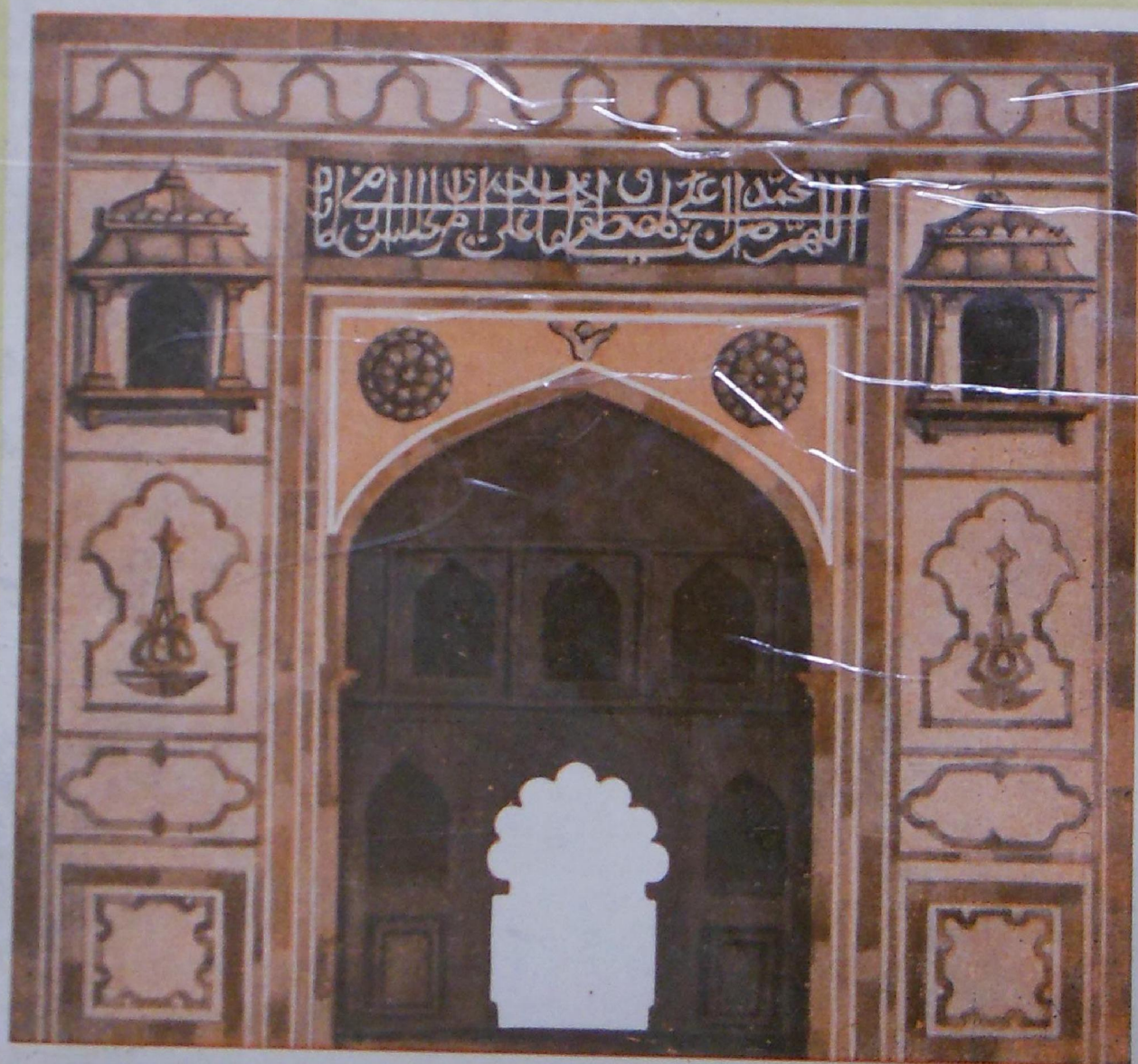
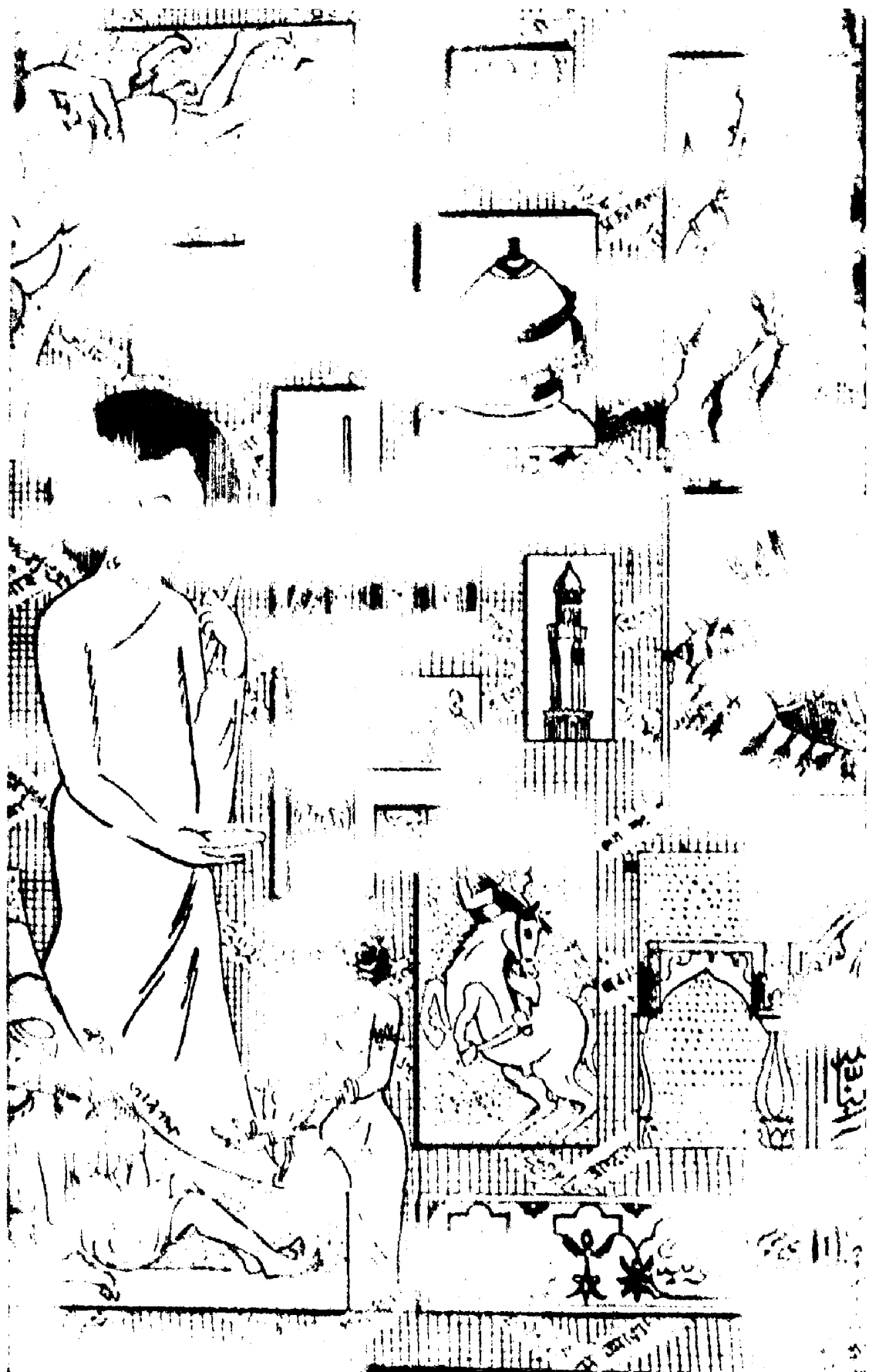
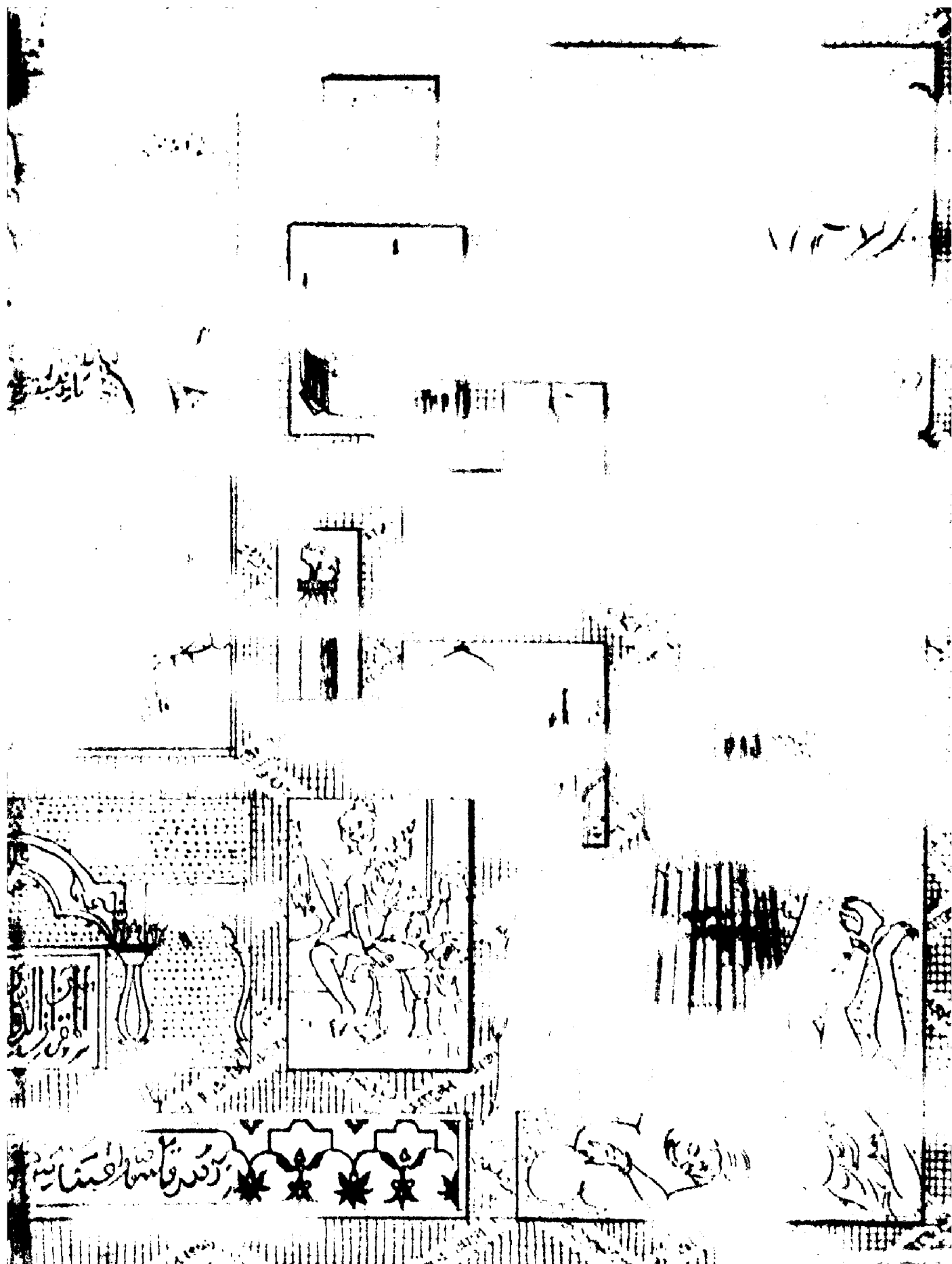


କା-ଓଓଓ ଓଓଓ ଅପରୁପା ବାସୀ

ନାରାୟଣ ସାମଲ





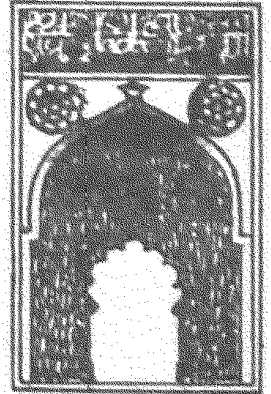


କା-ଅପାର ପୂଜା

নারায়ণ সাহাল

- অপকৃপা আশ্রা

pathaggar.net



ভারতী বুক স্টল

৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রকাশক : শ্রীঅশোককুমার বারিক
৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

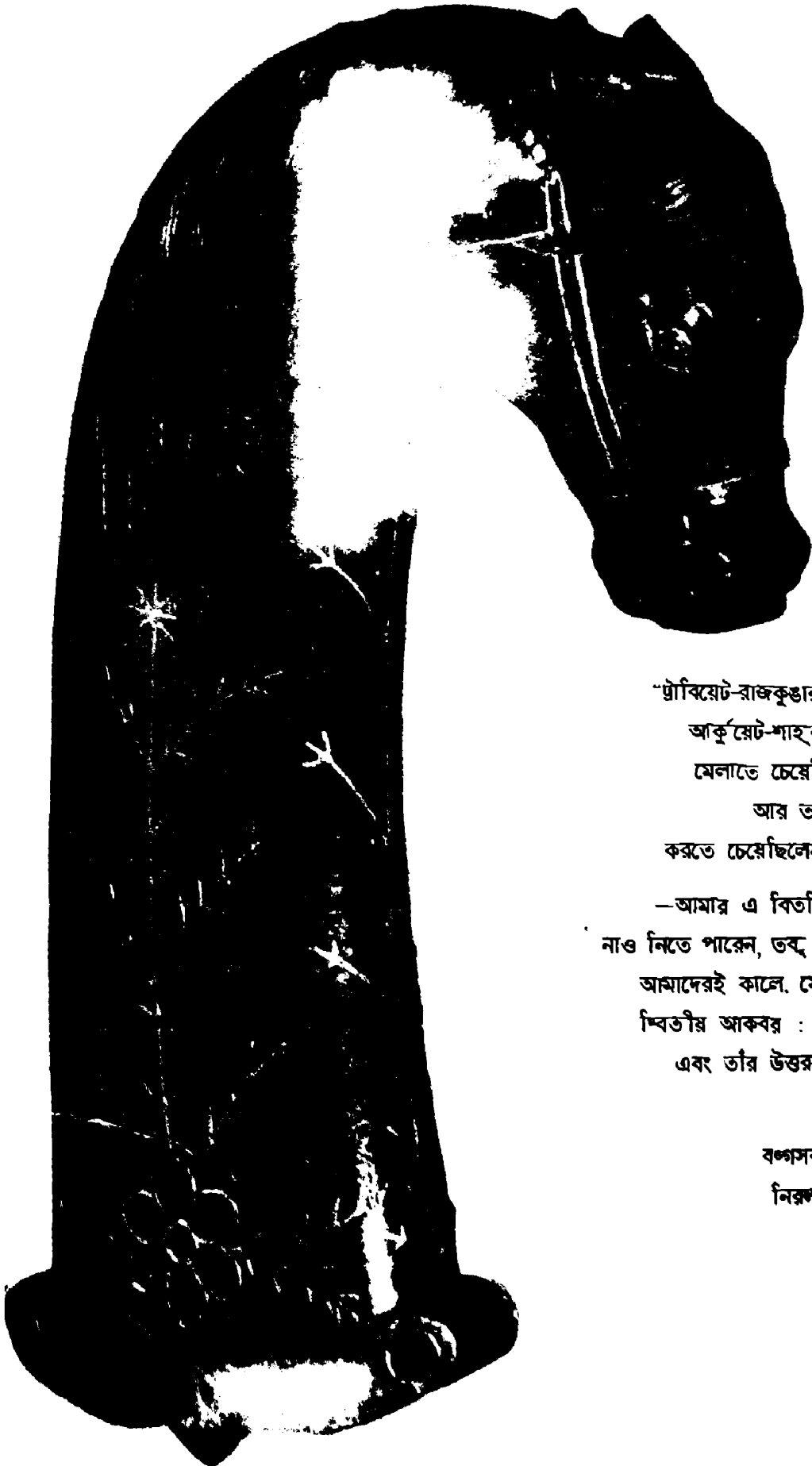
প্রথম প্রকাশ : প্রাবণ, ১৩৪৯
: আগস্ট, ১৯৮২

দ্বিতীয় সংস্করণ : প্রাবণ, ১৩৯২
: আগস্ট, ১৯৮৫

© শ্রীতীর্থবৈষ্ণব সান্যাল

প্রচ্ছদ শিল্পী : বাসেন্দ্র চৌধুরী

মুদ্রক : শ্রীতপসকুমার বারিক
অক্ষয় প্রিন্টার্স
৭বি, সীতেশ্বর মৌর্য স্ট্রীট
কলিকাতা-৯



“ট্রাবিয়েট-রাজকুণ্ডারীর মেহদীরঞ্জিত হাতে
আকুয়েট-শাহজাদার সমশেরবন্দ হাত
মেলাতে চেয়েছিলেন জালালউদ্দীন ;
আর তাঁর আরক্ত কাজ সুসম্পন্ন
করতে চেয়েছিলেন উস্তাদ ইশা আফান্দি”

—আমার এ বিতর্কিত ‘অসিস’ যদি মেনে
নাও নিতে পারেন, তবে নিশ্চয় স্বীকার করবেন—
আমাদেরই কালে, সে কাজে ব্রতী হয়েছিলেন
দ্বিতীয় আকবর : কাজী নজরুল ইসলাম ;
এবং তাঁর উত্তরসূরী, দ্বিতীয় আফান্দি :
সৈয়দ মুজ্জতবা আলী।

বঙ্গসরস্বতীর সেই দুই প্রবাহ
নিরলস সেবকের যশস্বর্ষাভিতে
এ-গ্রন্থ অর্থা হিসাবে
উৎসর্গ করে
ঘন্য হলোয়।
খুদা হাকিম।

নজরুল ইসলাম

কৈফিয়ৎ

বইটা লেখার পর, বিশ্বাস করুন, বেশ বাগিয়ে অকুণ্ঠভাবে একটা 'বৈকুণ্ঠয়ান' নামকরণ করেছিলুম :

“ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যের আদিম উৎপত্তি ও ইতিহাস এবং লা-জবাব দেহলী, ফতেপুর-সিক্রি, সেকেন্দ্রা তথা অপরাধ-আগ্রা-বিধৃত সীমিত ভূখণ্ড ভারতবর্ষের রাজধানীতে তাহার জন্ম, বিকাশ ও বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত সরল প্রকরণ।”

পড়ে, পাণ্ডুলিপি প্রথম পাঠিকা বললেন, নামটা দিবা হয়েছে, তবে ‘ওর-নাম-কি বইয়ের নাম কিছু ছাঁটকাট করেই রাখতে হয়।’ প্রকাশক মশাই ছিলেন পাশেই, লাফিয়ে ওঠেন তিনি : ঠিক ঐ কথাই বলতে যাচ্ছিলুম, কিছুটা সংক্ষেপ করা দরকার। অতঃপর লেখককে কিছুল বরবাদ করে শূভানুধ্যায়ীরা সেনশর বোর্ড-এর ভূগিকায় নামলেন কাঁচি হাতে। শূদ্র হল বস্ত্র-হরণ পর্ব ! ছাঁটতে ছাঁটতে অবশিষ্ট রইল শূদ্র, চোলাই আর ঘাগরা। উপায় কী ? ‘বাজারমে গুজরা হু, খরিদ্দার নেহী হু !’ নাংগা না-করা পর্যন্ত পণ্য হিসাবে আমার দিল-কা-কলিজাকে ওরা বাজারে ঠাই দেবে না। সুতরাং : ‘ওয়া ! দিল-ই-মিন ! ব-খুদা সপদ-মিং !’ হে আমার হৃদয়-রানী, তোমাকে খুদার আমানতে সোপদ করলুম। এখন কৌরবসভায় তোমার বস্ত্র জোগানোর দায় লজ্জাহারী মধুসূদনের !

নামকরণের কৈফিয়ৎ তো দাখিল করা গেল, এবার কৃতজ্ঞতা স্বীকারের প্রসঙ্গ আসি। এ-গ্রন্থ রচনার জন্য আমি সবচেয়ে বেশি ঋণী সেইসব অচেনা, অজানা পণ্যলেখকদের কাছে বাঁরা অজ্ঞতা দেখে বা না-দেখে আমাকে প্রকাশকের মারফত অহৈতুকী ধন্যবাদ জানিয়েছেন। শূদ্রের আনন্দ পেয়েছি, আমার সে-গ্রন্থখানি তাঁদের রসোপলব্ধিতে কিঞ্চিৎ সাহায্য করেছে। মনে হল, প্রতি বছর যতজন ভ্রমণ-পাগল বাঙালী অজ্ঞতা দেখতে যান, তার দশ-বিশগুণ যান দিল্লী-আগ্রা দেখতে। অবশ্য গাইড-বই যথেষ্ট আছে, পি-এইচ-ডি ডিগ্রির প্রত্যাশায় লেখা ঢাউস ঢাউস বইও আছে ইংরাজী ভাষায় : ফাগুসন, হ্যাভেল, পার্সি ব্রাউনের গ্রন্থও আছে—কিন্তু বাঙলায় কই ? বাঙলায় ভ্রমণ-কাহিনী যা আছে তার অধিকাংশই কল্পিত নায়ক-নায়িকার রোমান্স স্থাপত্যশিল্পের রসোপলব্ধির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। একমাত্র মজ্জতবা আলী-সাহেবের একটি অতিক্ষুদ্র প্রবন্ধ (‘দিল্লী-স্থাপত্য’—চতুর্গুণ) প্রকৃত জ্ঞানাজনশলাকার ভূমিকা নিতে পারে। এ-গ্রন্থে কল্পিত রোমান্স নেই, কিছু আঁক-জোক আছে, হিসাবের কচ-কাঁচি আছে। ফলে এ-গ্রন্থ স্থানে স্থানে দৃষ্টপাঠ্য মনে হতে পারে। ‘বড়াভাই’ সৈয়দ মজ্জতবা আলী-সাহেবের ভাষাতেই ‘ডিটো’ দিয়ে যাই : “লেখাটিতে কিঞ্চিৎ মাস্টারি-মাস্টারি ভাব থেকে যাবে বলে গণিজ্ঞানকে অগ্রণে থেকেই হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, তাঁরা যেন এটি না পড়েন।” এবং অগ্রজ সাহিত্যিক বন-ফুলের পরামর্শমতো বলি, “যাঁরা দলবেঁধে ফুটকো খেতে অভ্যস্ত” তাঁদের রসনাতৃপ্তির দায় আমার নেই।

“কোনো-কালে যে বাস্তব গান শোনেনি সে যদি হঠাৎ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শুনেন উম্মাহ হুয়ে নৃত্য না করে তা হলে চট করে তাকে বেরিসক বলা অনায়াস। বাঙলাদেশে এখানে-ওখানে ছিটে-ফোঁটা স্থাপত্য আছে বটে, কিন্তু একই জায়গায় যথেষ্ট পরিমাণে নেই বলে স্থাপত্যের যে ক্রম-বিকাশ এবং সামগ্রিক রূপ তার ক্রম বরাতে সাহায্য করে, তার সম্পূর্ণ অভাব। বিজ্ঞানভাবের যে বিশেষ একটি মন্দির, মসজিদ বা সমাধি রসসঞ্চিত করতে পারে না, তা নয়। তাই তুলনা দিয়ে বসতে পারি, জগতের কোনো সাহিত্যের সঙ্গে যদি আপনার কিছুমাত্র পরিচয় না থাকে, তবে সাধারণতঃ ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, উটকো একখানা ফরাসী উপন্যাসের রস আপনি গ্রহণ করতে পারবেন না। রসবোধের জন্য ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ-জ্ঞান অপরিহার্য কি না এ প্রশ্ন করতে পারবেন না। রসবোধের জন্য ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ-জ্ঞান অপরিহার্য কি না এ প্রশ্ন নন্দনশাস্ত্রের অনাত্ম কঠিন প্রশ্ন। সে গোলকধাঁধার ভিতর একবার ঢুকলে আর দিল্লী বাবার পথ পাবেন না,—আর ‘দিল্লী দূর অস্ত’ তো বটেই।” (মজ্জতবা আলী, দিল্লী-স্থাপত্য)

আলী-সাহেবের ঐ স্বেচ্ছায় সাথে আরও যোগ করি, শব্দ লা-জবাব দেহলী নয়, এ-বিচারে ‘অপরূপা-আগ্রা’ও ‘হনুজ দূর অস্ত’।

বিশেষ কারণে—গুণীজন সহজেই বুঝবেন—নামকরণ থেকে শুরু করে গ্রন্থের সর্বত্র আমি সংস্কৃত তৎত্ব শব্দের সঙ্গে সজ্ঞানে আরবী-ফারসী-উর্দু শব্দের মিশেল দিয়েছি। নজরুল ও আলী-সাহেবের প্রয়াণের পর ঐ জাতের শব্দের ব্যবহার বাঙলাভাষায় কমে এসেছে। ফলে পাঠকের সুবিধা হবে মনে করে এ-গ্রন্থে ব্যবহৃত ঐ জাতের কিছু অপ্রচলিত শব্দের বঙ্গার্থ দাখিল করেছি। আমি আরবী-ফারসী-উর্দুর কোনটাই জানি না, ফলে ভুলত্রুটি হতেই পারে। গুণীজন মার্জনা করে এদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে পরবর্তী সংস্করণে আমি নিজেও কিছু মার্জনা করতে পারি। ‘মার্জনা’-র অপর অর্থ।

এ-গ্রন্থের সাত-নব্বয় পৃষ্ঠায় একটা মারাত্মক ভ্রান্তি রয়ে গেছে। শেরশাহ শুর ও অন্যান্য আফগান-পাঠান সুলতানের রাজত্বকাল বোলো বছর, 1540-1556 (1554 নয়) এবং জালালউদ্দীন আকবরের শাসনকাল ঊনপঞ্চাশ বছর, 1556 (1554 নয়) থেকে 1605। এটি মদ্রাকর-প্রমাদ নয় : আমি পাণ্ডুলিপি মিলিয়ে দেখেছি। ভুলটা একান্ত আমারই। দয়া করে সংশোধন করে নবেন। এ-ভাষায় কৈফিয়ৎ দেবার একটি বিশেষ হেতু আছে। শেরশাহ শুরের মতো আলিওয়াল খানের মক্কারা বানিয়ে দেবার ক্ষমতা আমার নেই ; কিন্তু, প্রেসের প্রভাত যশ, স্বপন দে, ভাসেন সুবাস মৈত্রী এবং শূভানুধ্যায়ী তপন বারিক, সুবীর সরকার, শীতল ঘোষ ও অরুণ রায় প্রভৃতি যোভাবে যত্ন নিয়ে প্রুফ দেখেছে, তারপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্তে কৃতঘ্নের মতো এদিকে ‘মদ্রাকর-প্রমাদ’ বলায় আমার আপত্তি [বর্তমান সংস্করণে সংশোধন করা হয়েছে]।

ইতিহাসের নিরিখে এ-গ্রন্থ শেষ হওয়া উচিত ছিল 1857 খ্রীষ্টাব্দে। কেন তাজমহলে ছেদ টেনেছি তার কৈফিয়ৎ গ্রন্থেই দিয়েছি। ঔরঙ্গজীব ও তাঁর উত্তরসূরীদের কীর্তিকাহিনী নিয়ে গ্রন্থের কলেবর তথা মূল্য বৃদ্ধি করলে ইংরাজী অলঙ্কারশাস্ত্রে যাবে ‘bathos’ বলে সেই ভ্রূষণে রচনাত্মিক ভ্রান্তি করা ষেত—তার চেয়ে নাগা থাকাই বাঞ্ছনীয়। অবশ্য শেষ মঙ্গলসম্মত কবি দ্বিতীয় বাহাদুরশাহ জাফর, যিনি বলতে পেরেছিলেন—

“উমরদরাজ মাংগকে লায়ে থে চারদিন,

দো আরজুমে কট গ্যয়ে, দো ইন্তেজারমে ॥”

(খুদার কাছে মাত্র চারদিনের মেয়াদ নিয়ে দুনিয়াদারী করতে এসেছিলুম, তার দুটো দিন কেটে গেল আকাঙ্ক্ষায়, বাকি দুটো অপেক্ষায় ॥)

—তাকে নিয়েও এ-গ্রন্থের বর্ণনাকাপাত করা চলত। দঃখ এই—শেষ ভারতীয় ভারতসম্রাটের মৃত্যু হয়েছিল কর্মমল্লকে, বন্দীদশায়। স্বাধীন ভারত তাঁর কোন স্মৃতিচিহ্ন বানাবার প্রয়োজন বোধ করেনি লা-জবাব দেহলীতে ; দেখাবো কী ? কৈফিয়তে তাই বরণ উপহার দিয়ে বাই সন্তুষ্টি-কবির একটি আর্থেরি-শের :

“ইৎনা হায় বদনসীব জফর দফন কা লিয়ে

দো-পজ জব্বানি তি না মিলি কুয়ে-ইয়ারমে।”

(জাফরের চেয়ে হতভাগ্য আর কে আছে : মরবার পর স্বদেশের দঃগজ জমিও মিলবে না তঁর কবরের জন্য।)

‘তাজমহল’-প্রসঙ্গে একটি কৈফিয়ৎ দেবার আছে।

‘চীন-জরত’ লেজার্চ গ্রন্থ (রচনা : 1977) চীনের মহাকবি লি, সুন-এর একটি কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন : ‘আমাদের বিশ্ববিশ্বমত মহান প্রাচীর’।

"এজানিয়ারদের ঐ মহান কীর্তি মানচিত্রে পর্যন্ত দাগ ফেলেছে।
 সারা পৃথিবীতে এমন মানদ্য নেই যে কিছুমাত্র লেখাপড়া শিখেছে,
 অথচ চীনের প্রাচীরের নাম শোনেন।
 সত্যি কথা বলতে অবশ্য ওটা অসংখ্য দাস ও বন্দীর মৃত্যুর হেতু—
 আর হৃদয়ের ওটা কোনকালেই ঠেকাতে পারেন।
 এখন ওটা পুরাতত্ত্বের নিদর্শন ছাড়া আর কিছু নয়।
 হয়তো ধূলোয় মিশিয়ে যেতে ওর কিছুটা দেরী হবে,
 কারণ ওটাকে জিইয়ে রাখতে আমরা বন্ধপরিষ্কর।
 আমার সবসময় মনে হয় ওটা আমাকে ঘিরে রেখেছে।
 মহান প্রাচীরটা।
 পুরানো-ইটের মাঝে মাঝে মেরামতির কেরামতি।
 ঐ মহান প্রাচীরকে টিকিয়ে রাখার জন্য নতুন নতুন ইটের জোড়াতালি
 দেবার এ-ব্যবস্থা বন্ধ হবে কবে?
 হে চীনের মহিমময় বিশাল প্রাচীর!
 তোমার মৃত্যু হলে যে বাঁচি!"

উদ্ধৃতিটা শুনিয়ে আমি লিখেছিলাম : "সারা ভারতবর্ষ বুঝতে পারে এমন ভাষায়
 কোনও ভারতীয় দিকপাল কবি লেখেননি :

"সত্যি কথা বলতে কি ওটা অসংখ্য বন্দী
 আর মেহনতী বান্দার বণ্টনার সাক্ষী!
 আর সম্রাটের বিস্মৃতিকে ওটা কোনকালেই ঠেকাতে পারেন।
 এখন ওটা পুরাতত্ত্বের নিদর্শন ছাড়া আর কিছু নয়।
 হয়তো ধূলোয় মিশিয়ে যেতে ওর কিছুটা দেরী হবে,
 কারণ ওটাকে জিইয়ে রাখতে আমরা বন্ধপরিষ্কর।
 আমার সবসময় মনে হয়—ঐ পরিণামভার আমার বুকে চেপে বসে আছে।
 ওটা দেখলেই আমার মনে পড়ে—গদিতে চড়ে বসেই
 আলমগীর কেমন করে জুলে গেল শাহজাহাঁকে—যে তাকে
 জন্ম দিয়েছে, পালন করেছে, ময়ূর-সিংহাসন বানিয়ে দিয়েছে।
 ঐ মহান ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার এই জোড়াতালি-ব্যবস্থা বন্ধ হবে কবে?
 হে ভারতের মহিমময় তাজমহল!
 তোমার মৃত্যু হলে যে বাঁচি!"

তখন জানতুম না, এখন জেনেছি, এই ভারত-ভূখণ্ডেও এমন কবি জন্মগ্রহণ করেছেন
 যিনি ভিন্ন চোখে তাজকে দেখেছেন—অনেকটা লুপ্ত-এর মতো। গ্রন্থ রচনাকালে শাহীর
 লুপ্তিমানভীর এই শায়েরীটি আমার নজরে পড়েনি। তাই কৈফিয়তে সেটা আখেরী-দখিল
 করি :

"মেরে মেহবুব কাহি" ঔর মিলা কর্ মদুসে
 বজ্রমে শাহীমে গরীবোঁ কা গুজর কা মানে?
 সব্ যিস্ রাহ পো হয় সংবতে শাহী কে নিশা
 উস্পে উল্ফৎ-ভরী রুহোঁকা সফর কা মানে?
 মেরে মেহবুব, ইন্খোভ তো মদুস্বৎ হোগী
 জিন্ ক সন্মাই নে বজ্রী হয় ইয়ে শক্ লেকজমাল
 ইনকে প্যারোঁকে মকাবির রহে ও-নামে নমুদ
 আজুক্ উনপে জুলাই না কিসিনে কন্দীল।
 ইয়ে চামনদার, ইয়ে যম্ না-কা-কিনারা, ইয়ে মহল্
 ইয়ে মুনজাশ, দর-এ-দিওয়ার, ইয়ে মেহরাব, ইয়ে তাক্
 এক শাহেনশাহ্-নে দৌলৎকা সাহারা লেকর
 হাম্ গরীবোঁকা মদুস্বৎকা উড়ারা হয় মজাক্।
 মেরে মেহবুব, কাহি" ঔর মিলাকর মদুসে ॥"

“হে প্রেমসী আমার, তাজমহল নয়, আর কোথাও আমার সঙ্গে দেখা কর। ঐশ্বৰ্যের এই পরিবেশ আমাদের মতো গরীবের দেখা করার কী মানে? যে স্থান বাদশাহের চরণচিহ্ননা, সেখানে দুই সামান্য প্রেমিকের সাক্ষাতের কোন অর্থ হয়? বন্ধু, ভেবে দেখ যে হতভাগ্য মজদুরেরা এই স্মৃতিসৌধ গেঁথে তুলেছে, তারাও তো ভালবাসতো? যারা নিখুঁত কারু-কার্যে সম্রাটের প্রেমকে দিয়েছে ঐশ্বৰ্যের মর্যাদা, তাদেরও তো স্ত্রী ছিল, প্রেমিকা ছিল—তাদের কবরগুলি কোথায়? কেউ জানে না! সেখানে দিনান্তে আজ কেউ চিরাগ জ্বালে না। কিস্মতির অতলে তলিয়ে গেছে তাদের প্রেমের চিহ্ন। সম্পদ তাদের ছিল না, মানছি, তাই পাথর দিয়ে তারা কোনও শাস্বত প্রমাণ রেখে যেতে পারেনি—কিন্তু প্রেমে তারা তো বাদশাহের চেয়ে এক তিল কম ছিল না? আমার তো মনে হয়—এই যে বিশাল বাগিচা, যমুনার তীর, আকাশচুম্বী মহল, এই কারুকৃতি, গম্বুজ, মর্মরের বাতায়ন, দৌলতের দার্টা দিয়ে এসব তৈরী করে শাহেনশাহ শূন্য আমাদের ব্যঙ্গই করে গেছেন, উপহাস করে গেছেন! অপমানিত হয়েছে তোমার-আমার মতো সাধারণ মানুষের প্রেম। তাই বলি, হে আমার প্রেমসী, তাজমহলে নয়, অন্য কোথাও আমার সঙ্গে মিলিত হয়ো।”

বাবুজান

৩০/৪/৮২

দ্বিতীয় সংস্করণের কৈফিয়ৎ

প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থে কিছু কিছু সংস্কার করা সম্ভব হল পাঠকদের সহযোগিতায়, তার মধ্যে কয়েক জনের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। প্রথমত পরমপ্রমোদ গ্রীউমপ্রসাদ মুনোপাধ্যায়। ভ্রমণ সাহিত্যের অপ্রতিম্বন্দ্বী লেখক হিসাবে যাকে আমরা জানি, তিনি শিল্প-সংস্কৃতির একজন বিদগ্ধ পণ্ডিতও। দ্বিতীয়ত হাওড়া জিলার জুজারসাহা গ্রামের জনাব ব্রাহ্মুল আজাদ পুরকারেং ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির সম্বন্ধে আমার কয়েকটি ভ্রান্তি অপনোদন করেছেন। এছাড়া নোনা চন্দনপুকুর থেকে প্রীতনীগোপাল রায় একটি পয়ে প্রথম প্রকাশের কয়েকটি হিন্দি শব্দের বিশুদ্ধরূপ কী হওয়া উচিত তা আমাকে জানিয়েছিলেন। ‘পেটকাটা ব’-এর ব্যবহার ছাড়া তাঁর প্রায় সবগুলি পরামর্শই আমি মেনে নিয়েছি। কলকাতা-৮ থেকে প্রীতপূর্ব দত্ত তিনটি মদ্রাকর প্রমাদের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তবু এ-গ্রন্থে একটি বর্ণশুদ্ধি আমার নজরে পড়ল এই কৈফিয়ৎ লিখবার সময় : ৭৪ পৃষ্ঠার প্রথম কলামের মাঝামাঝি ‘মলীকু’টা হবে ‘মসীকু’। এ-জাতীয় গ্রন্থের শেষে একটি ‘নির্ঘণ্ট’ থাকা উচিত—এমন কথা কোন কোন বিদগ্ধ পণ্ডিত বলেছিলেন। এবার সে জন্য গ্রন্থশেষে একটি নির্ঘণ্টও যুক্ত করা গেল।

বাবুজান

১/৩/৮৫

বিষয়-সূচী

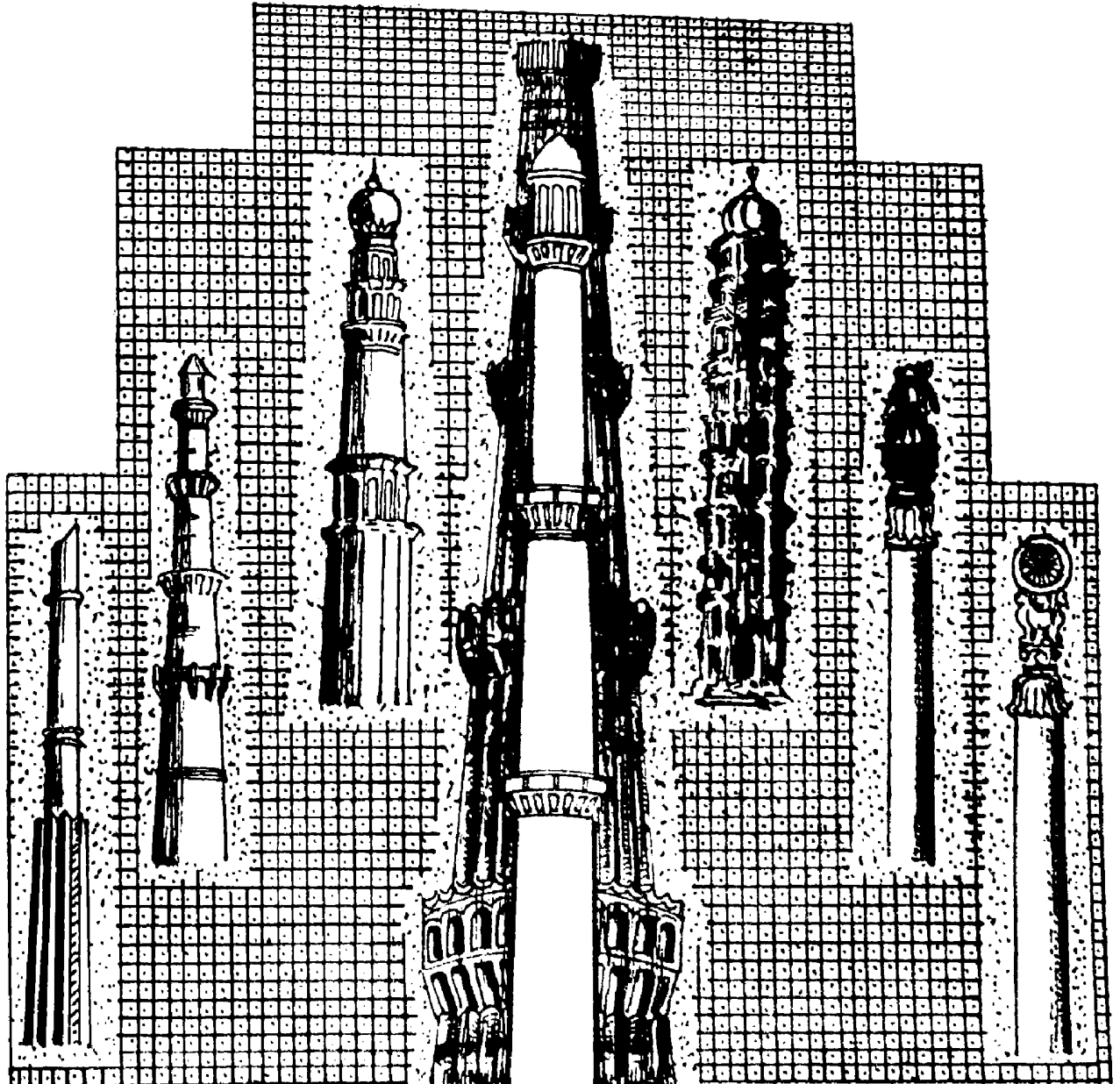
প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্য	১-৭	নবম পরিচ্ছেদ ॥ জালাল-উদ্দীন আকবর ১৬-১৪৫	
ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যের পরিচয়	৪	হুমায়ুন-মক্‌বরা	১০৮
ঐ কালের ব্যাপ্তি	৬	আগ্রা-কিল্লা	১১০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ বহির্ভারেতে ইসলামী		দিল্লী গেট	১১০
স্থাপত্যের বিবর্তন	১০-১৮	আকবরী ও জাহাঙ্গীরী মহল	১১৪
ইসলামের জন্ম	১০	ফতেপুর-সিক্রি	১১৫
আদি-খালিফাদের যুগ	১১	দেওয়ান-খানা-ই-আম	১১৯
ওমায়্যদ যুগ	১২	ইবাদখানা	১১৯
আব্বাসীদ বংশ	১৪	বাদশাহী হামাম, অনূপ-তালো, খোয়াবগাহ	১২২
সেলজুক ও অটোমান তুর্কী	১৬	আবদারখানা, পাঁচশী কোর্ট	১২২
সুলতানী জমানা		দেওয়ান-ই-খাশ্	১২০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥ দাস-বংশ	২২-৪২	হারাম সারাহ, পাঁচমহল	১২৪
কুওওতুল-ইসলাম মসজিদ	২৮	সুনহারা-মকান	১২৪
লৌহস্তম্ভ (কুংব-চত্বর)	৩১	তুর্কী-সুলতানা	১২৫
কুংব মিনার	৩২	যোধবাস্তি-প্রাসাদ, বীরবল-প্রাসাদ	১২৫
ইলদুতুমিসের সমাধি	৩৯	জাম-ই-মসজিদ, ফতেপুর-সিক্রি	১৩০
মেহেরোলীর বাওলী	৪০	শেখ সেলিম চিস্তির কবর	১৩১
সুলতান ঘারী	৪০	বুলন্দ-দরওয়াজা	১৩০
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥ খিলজী-বংশ	৪০-৪১	খিরুপ-মিনার	১৩৬
কুওওতুল মসজিদের সম্প্রসারণ	৪৬	দশম পরিচ্ছেদ ॥ জাহাঙ্গীর	১৪৬-১৫৬
আলাই মিনার ও আলাউদ্দীনের সমাধি	৪৬	আকবরের সমাধি, সেকেন্দ্রা	১৪৭
আলাই দরওয়াজা	৪৭	ইতমদ-উদ্দৌলা	১৫১
জামায়েখানা মসজিদ	৪৮	জাহাঙ্গীর ও নূরজাহাঁর সমাধি, লাহোর	১৫৪
পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥ তুগলক-বংশ	৫০-৬৪	একাদশ পরিচ্ছেদ ॥ শাহ-জাহাঁ	১৫৭-২০০
তুগলকাবাদ ও গিয়াস-এর সমাধি	৫৩	আগ্রা-কিল্লা, খাশমহল	১৬৫
মুহম্মদ তুগলক	৫৫	ঐ, শীশমহল, মুসম্মান বর্জ	১৬৫
আদিলাবাদ, জহান-পনাহ	৫৬	দেওয়ান-ই-খাশ্	১৬৫
ফিরোজশাহ তুগলক	৫৭	দেওয়ান-ই-আম	১৬৬
ফিরোজশাহর সমাধি	৬১	নাগিনা ও মতি মসজিদ	১৬৬
খান-ই-জাহান তিলাঙ্গানীর মক্‌বরা	৬২	লাল-কিল্লা	১৬৭-১৭০
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥ সৈয়দ ও লোদীযুগ	৬৫-৭০	তাজমহল	১৭০-২০০
অষ্টভূজাকৃতি মক্‌বরা	৬৫	আজমুদ্-বানুর বিবাহিত জীবন	১৭৪
সংক্রামণ-ধর্মী মক্‌বরা	৬৯	তাজ-পরিকল্পনাকার কে?	১৭৮
চতুষ্কোণ মক্‌বরা	৬৯	তাজমহলের প্ল্যান	১৮২
মুগল-এ-আজম		তাজের গম্বুজ	১৮৪
সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥ বাবর ও হুমায়ুন	৭৩-৮১	মিনারিকা চতুষ্টয়	১৮৬
জাহিরউদ্দীন বাবর	৭৪	সম্মুখদৃশ্যের গাণিতিক সূত্র ও কম্পিউটারিক	১৮৮
হুমায়ুন	৭৯	তাজমহলের নান্দনিক ছন্দ	১৯১
অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥ শেরশাহ, শূর	৮২-১৫	তাজে হিন্দু শিল্পশাস্ত্রের প্রভাব	১৯২
		তাজের বিন্যাস, ও মধ্যের রিফাইনারি	১৯৬
		আনুষ্ঠানিক	১৯৮
		নির্মাণ-ব্যয় ও ব্যাখ্যা	১৯৮
		তাজের সামগ্রিক ভূমি-নকশা	২০০

চিত্রসূচী

চিত্র-সংখ্যা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
2.1	ভারত প্রবেশের পূর্বে ইসলাম-সাম্রাজ্য	৮
2.2	মক্কাস্থিত কাবা	৯
2.3	ডোম অব দ্য রক, জেরুসালেম	১২
2.4	দামাস্কাসের মসজিদ	১০
2.5	কায়রোর মসজিদ	১৪
3.1	কুৎব মিনার ও আলাই দরওয়াজা ...	১৯
3.2	বৃহত্তর দিল্লীর ভূমি-নকশা ও দৃষ্টব্য	২০
3.3	কুওওতুল মসজিদ ও কুৎব মিনার ...	২৭
3.4	কুওওতুল মসজিদের সেকশন ...	২৮
3.5	হিন্দু-কবেলিঙ পদ্ধতি ...	২৯
3.6	প্রকৃত-খিলান (Real)	২৯
3.7	আইবক-কৃত খিলান ...	২৯
3.8	লৌহসজ্জ কুৎব-চত্বর	৩১
3.9	গজনি মিনার ...	৩০
3.10	কুৎব কি হেলানো মিনার?	৩৫
3.11A	নগর-স্থাপত্যে কোণের সাধারণ ছন্দ	৩৭
3.11B	তৃতীয় রামেসিস-এর ঢালিকায় নকশা	৩৭
3.11C	গজনি মিনারের প্ল্যানিং-ছন্দ ...	৩৭
3.11D	কুৎব মিনারের প্ল্যানিং-ছন্দ ...	৩৮
3.11E	বেশর স্থাপত্যে প্ল্যানিং-ছন্দ ...	৩৮
3.11F	গজরাটের মহেশ্বর মন্দিরে ঐ ...	৩৯
3.12	স্কুইঞ্চ পদ্ধতির জ্যামিতিক ছন্দ ...	৩৯
3.13	ইল্-তুংমিসের সমাধি, কুৎব-চত্বর ...	৪০
3.14	কুৎবের স্ট্যালেক্‌টাইট ও কুরাণ-আলী	৪১
3.15	সুলতান হারী, দিল্লী ...	৪২
5.1	তুগলকাবাদ দর্গা-ও গিয়াসের কবর	৫৪
5.2	গিয়াস-উদ্দীনের মক্‌বারা ...	৫৫
5.3	ফিরোজশাহ কোটলার প্ল্যানিং ...	৫৭
5.4	ফিরোজশাহ কোটলা, বর্তমান অবস্থা	৫৮
5.5A	ফিরোজশাহ প্রাসাদের প্ল্যান ...	৬০
5.5B	ফিরোজশাহ প্রাসাদের সেকশন ...	৬০
5.6	খিড়কি মসজিদ, দিল্লী	৬১
6.1	মুবারকশাহ সৈয়দ-এর মক্‌বারা ...	৬৭
6.2	ঐ গয়দাখলোকনে ...	৬৭
6.3	সিকান্দার লোদী মক্‌বারা ...	৬৭

চিত্র-সংখ্যা	বিষয়	পৃষ্ঠা	চিত্র-সংখ্যা	বিষয়	পৃষ্ঠা
6.4	ঈশা খাঁর মক্‌বারা	৬৮	9.21	বুলাদ্‌ দরওয়াজা, সম্মুখ দৃশ্য (বীররস)	১৩৪
6.5	আযম খাঁর মক্‌বারা	৬৮	9.22	ঐ —ভয়ানক রস	১৩৫
6.6	সংক্রামণধর্মী মক্‌বারা	৬৯	9.23	ঐ —ভিতর থেকে—শান্ত রস	১৩৬
	গ্র্যান্ড-মুগল'-এর তিন পুরুষ	৭১	9.24	হিরণ-মিনার কি মক্‌বারা ?	১৩৯
	মুগল-এ-আজম	৭২	9.25	আবদুর রহিম খান-ই-খানান-এর মক্‌বারা, বাস্তু-নক্‌শা ও সম্মুখদৃশ্য	১৪০
7.1	বাবুরের আত্মজীবনীর একটি পৃষ্ঠা	৭৭	9.26	আবদুল ফজল সম্রাটকে 'আকবরনামা'-র দ্বিতীয় খণ্ড উৎসর্গ করছেন	১৪১
7.2	মুগল-শৈলীতে ভীষ্মের শরশয্যা ...	৮০			
8.1	হাসানশাহ্ শুরের মক্‌বারা, সাসারাম	৮৯			
8.2	শেরশাহ্ শুরের মক্‌বারা, ঐ	৯০	10.1	আকবরের সমাধি, সেকেন্দ্রা (স্কেচ)	১৪৮
8.3	পুরানা কিল্লার ভূমি-নক্‌শা ...	৯১	10.2	ঐ প্রধান প্রবেশতোরণ, সম্মুখ দৃশ্য	১৫০
8.4	কিল্লা-ই-খুন্‌হা মসজিদে নক্‌শা	৯২	10.3	ঐ বাস্তু-নক্‌শা, সেকশান ও সম্মুখ দৃশ্য	১৫১
8.5	শেরশাহ্ শুরের সম্ভাব্য আলেক্সা ...	৯৫	10.4	ইতমদ্‌উদ্‌দৌলা, আগ্রা (আলোকচিত্র)	১৫২
9.1	শিশু আকবর ও জননীর পুনর্মিলন	৯৮	10.5	ঐ বাস্তু-নক্‌শা	১৫৩
9.2	আংকার হত্যা ও আখমের শাস্তি	১০৫	10.6	ঐ সম্মুখ দৃশ্য	১৫৪
9.3	হুমায়ূন-মক্‌বারা, নববস্তুর ছন্দ	১০৬	10.7	ঐ সিলিঙে জ্যামিতিক নক্‌শা	১৫৫
9.4	ঐ বাস্তু-নক্‌শার জ্যামিতি ...	১০৬			
9.5	ঐ গরুড়াবলোকনে ...	১০৭	11.1	সম্রাট জাহাঙ্গীর পত্র খুররমকে সোনা দিয়ে ওজন করচ্ছেন ...	১৫৯
9.6	ঐ সেকশানাল এলিভেশান ...	১০৮	11.2	হিন্দু স্থাপত্যে ইমারতের লিঙ্গভেদ, রেখ-পীড় মিথুনের ঘটাহুতি ...	১৬৪
9.7	আগ্রা-কিল্লা, ভূমি-নক্‌শা ...	১০৯	11.3	আগ্রা-কিল্লার অলিন্দ থেকে তাজ	১৬৬
9.8	আকবরী দিল্লী-গেট, আগ্রা-কিল্লা	১১১	11.4	লাল-কিল্লার ভূমি-নক্‌শা, বর্তমান অবস্থা	১৬৭
9.9	শাহ্‌জাহানী দিল্লী-গেট, লাল-কিল্লা	১১২	11.5	ঐ , ঐ , শাহ্‌জাহানী জমাদান	১৬৮
9.10	জাহাঙ্গীরী-মহল, আগ্রা-কিল্লা	১১৩	11.6	ঐ , ঐ , গরুড়াবলোকনে	১৬৯
9.11	ফতেপুর-সিক্রি, সামূহিক ভূমি-নক্‌শা	১১৬	11.7	ঐ প্ল্যানিং-এ ব্যবহারিক বিন্যাস	১৭০
9.12	ঐ প্রধান দর্শনীয় অংশের ঐ	১১৭	11.8	দেওয়ান-ই-খাশা, লাল-কিল্লা	১৭১
9.13	ঐ রাজপ্রাসাদের ভূমি-নক্‌শা	১১৮	11.9	তাজমহলের বাস্তু-নক্‌শায় পঞ্চবৃত্তিক জ্যামিতির মৌলসূত্র	১৮৩
9.14	খাম্বাহল (?) অথবা দৌলতখানা (?)	১২০	11.10	তাজমহলের বাস্তু-নক্‌শা	১৮৩
9.15	খাম্বাহলের কেন্দ্রীয় স্তম্ভ	১২০	11.11	চন্ডীসেবা পঞ্চরত্ন দেউল, যবম্বীপ	১৮৩
9.16	পাটমহল বা বাদগীর, ফতেপুর-সিক্রি	১২৪	11.12	গম্বুজের ক্রমবিবর্তন	১৮৫
9.17	সনহারা মকান, ফতেপুর-সিক্রি	১২৫	11.13	মিনার/মিনারিকার ক্রমবিবর্তন	১৮৭
9.18	বীরকল প্রাসাদ, বাস্তু-নক্‌শা ও এলিভেশান	১২৭	11.14	তাজে trompe l'oeil পদ্ধতি	১৮৯
9.18A	ঐ দ্বিত্যয়ের বাস্তু-নক্‌শা	১২৭	11.15	তাজমহলের এলিভেশান	১৯০
9.18B	ঐ পরিপ্রেক্ষিতে সম্মুখদৃশ্য	১২৭	11.16	পরিপ্রেক্ষিতে তাজমহল, দৃষ্টিকোণ ৫.৪৭ মি	১৯১
9.19	জাম-ই-মসজিদে হিন্দু-শৈলীতে কবেলিঙ	১৩১	11.17	ঐ , দৃষ্টিকোণ প্রবেশ তোরণের দ্বিভূজ	১৯২
9.20	ঐ ভারবহনের ব্যবস্থাপনা	১৩২			

চিত্র-সংখ্যা	বিষয়	পৃষ্ঠা	চিত্র-সংখ্যা	বিষয়	পৃষ্ঠা
11.18	"আকাশজোড়া ইবানের আহবান", মোকাম-কুর্সি থেকে তাজ-ইবান	১১৪	11.21	পরিদৃশ্যমান তাজের ভূমি-নকশা	১১৯
11.19	তাজমহলের সন্দোখ-কক্ষ	১১৫	11.22	তাজের মৌলিক ভূমি-নকশা	২০১
11.20	তাজ-সিঁলিঙে বর্ণিকাভাঙ্গা	১১৭	11.23	ঈশা আফান্দর (?) ধ্যানে তাজমহলের সামুহিক ছন্দ	২০২



॥ অপ্রচলিত আরবী-ফার্সী-উর্দু শব্দ ॥

[বাঙলাভাষায় সচরাচর অপ্রচলিত কিছু আরবী-ফার্সী ও উর্দু শব্দ
এ-গ্রন্থে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তার তালিকা]

আব্-ওরা-আজদাদ্	পিতৃপুরুষ, পূর্বসূরী
আকদ্ রুতব	কুস ভল্ট, সমকোণে-অবস্থিত খিলান-সম্মিলিত অলিঙ্গ
অজ্-ই-মুবাররার ...	মুখ্য তথ্য-অধিকারিক
আলা-ই-মুহলিখ ...	মারাম্বক অস্ত্র
ইফতারী ...	রোজা ভাঙার পর এক পাশ্রে আহার
ইব্-তিজাল ...	নীচ চক্রান্তপ্রসূত
ইবান ...	(উচ্চারণ iwan, ইওয়ান) মস্জিদে খিলান-সম্মিলিত একটি অঙ্গ
কিব্জা ...	মিহ্রাবে অঙ্কিত মকার দিক-চিহ্ন
কুর্সি ...	Plinth, ভিত বা পোতা
কুজর ...	Battlement, প্যারাপেট
খান্কা ...	মুসল্লীম দরবেশের সাধনস্থল বা আশ্রম
খিলান ...	বিশ্বাসঘাতকতা, ন্যস্ত দায়িত্বের অবহেলা করা অর্থে
খিলান ...	উপহার, বিবাহের মাজসজ্জা
চমন্ ...	ফুলের বাগান
জাসুসী ...	গুপ্তচর
জাহান ...	জগত (জাহান-আরা=জাহানারা=জগতের আলো)
জিল্-জা	প্রতিচ্ছায়া
জিয়াদা ...	মস্জিদ-সংলগ্ন অলিঙ্গ
তবীর-ই-হাজিক ...	বিচক্ষণ চিকিৎসক
তওয়া ...	অনুশোচনা
তালির-ই-মলী ...	জ্ঞানপিপাসু
দিদাবর ...	সম্বন্ধদার, Connoisseur
দীন ...	ধর্ম
নহর-ই-বিহিস্ত ...	স্বর্গীয় স্রোতঃস্বনী
নারিস ...	নারিসাস্ ফুল
মক্-বরা ...	সমাধিসৌধ
মখ্-সুর ...	মারাম্বকভাবে আহত
মিহ্-বর ...	মস্জিদে প্রার্থনাস্থলে রক্ষিত উচ্চবেদী, যেখান থেকে ইমাম খুদ্-বা পাঠ করেন ও নামাজ পরিচালনা করেন।
মিহ্-বর ...	মস্জিদ-ইবানে কুলুঙ্গী-আকারে নির্মিত একটি আবশ্যিক অঙ্গ।
মোহ ...	আশীর্বাদ, স্নেহের দান
মোহা ...	মৃত্যু
মোহা ...	সকল
মোহা ...	অসুর্ষস্পশ্যা কুমারী, virgin
মোহা ...	বিদ্রোহী, বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন
মোহা ...	কসন্তকাল
মোহা ...	অনিন্দ্য-সৌন্দর্য
মোহা ...	পবিত্র
মোহা ...	শূন্যগর্ত কবর-প্রাতিম স্থাপত্য-অঙ্গ, cenotaph
মোহা ...	প্রধান, প্রেক্ষ
মোহা ...	ন্যায় বিচার
মোহা ...	গুপ্তঘাতক, যা-থেকে assassin শব্দের উৎপত্তি বিরহ

ইন্দো-ইসলামী স্বাঘ্রু

অজ্ঞতা দেখা বা দেখানোর তুলনায় দিল্লী-আগ্রা ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্য থেকে রস আহরণ করা কঠিন-তর। প্রথমতঃ অজ্ঞতার চিত্রসম্ভার দ্বি-মাত্রিক, স্থাপত্য-ভাস্কর্য ত্রি-মাত্রিক। প্রাচীর চিত্রের আপেক্ষিকে দর্শকের অবস্থানের প্রশ্নটা অবান্তর ; অথচ স্থাপত্য-ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে সেটি সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ত্রি-মাত্রিক শিল্পসম্পদ ঘুরে-ফিরে দেখার। দর্শকের অবস্থানের উপর তার আবেদন নির্ভরশীল। দক্ষিণ তোরণদ্বারের ফোকরের ভিতর দিয়ে দেখা তাজমহল, আগ্রা-কিল্লার ঝরোকার মাস্কিকোষের ছিদ্রপথে দেখা মমতাজমহল, বিমানগবাক্ষ থেকে নিচু-দিকে মুখ-করে-দেখা তাজ, আর ঐ মর্মর সৌধের কুর্সির উপর দাঁড়িয়ে উর্দু-মুখে-দেখা তাজমহলের আবেদনে আশ্চর্য-জমিন ফারাক। দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে স্থাপত্যের রসোপলব্ধি সম্পৃক্ত।

সঙ্গীত, কবিতা, নাটক, চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের মৌল উদ্দেশ্য একটাই—শিল্পস্রষ্টার অন্তরে সজাত একটি অনিবচনীয় ‘আনন্দ’ চিন্ময় অথবা মৃন্ময় রূপে পরিবেশন করে শিল্পসমরদ্বারের মর্মমূলে অনুরূপ আনন্দের অনুরণন সৃজন। সেই ‘আনন্দ’-কেই ইংরাজিতে বলে ‘ইস্টেটিক ইউনাইট’। এই আনন্দ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য—যদিও ক্ষেত্রবিশেষে তা ইন্দ্রিয়-তীত ভূমানন্দের দিশারী, যা উপলব্ধি করে প্রকৃত অধিকারী ‘ন বিভোতি কদাচন, ন বিভোতি কুতশ্চন’। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, উপরের ঐ তালিকায় আমরা প্রবণেন্দ্রিয় থেকে নয়নেন্দ্রিয়ের দিকে বৃদ্ধিচ্ছি। মার্গ-সঙ্গীত শব্দমাত্র সূক্ষ্মবস্ত্র ধ্বনিবিন্যাস, কবিতা অর্থবহ শব্দসমষ্টি, নাটক ধ্বনিময় দর্শনযোগ্য শিল্প। শেযোক্ত তিনটি ধ্বনিহীন, শব্দমাত্র দৃষ্টিগ্রাহ্য। তবু প্রতিটি ক্ষেত্রেই দর্শনেন্দ্রিয়ের একটি আবশ্যিক ভূমিকা আছে, কোথাও সেটা প্রকট বাস্তব দৃশ্যমান ; কোথাও

প্রচ্ছন্ন—মনশ্চক্ষে। কবি যখন বলেন, ‘হে রুদ্র বৈশাখ, ধূলার ধূসর রুদ্ধ উষ্ঠান পিঙ্গল জটাজাল/তপঃক্লুষ্ট তপ্ত তনু—’ তখন যদি খরতাপদগ্ধ গৌরবকসনা বীরভূমের খোয়াই-এর রূপ—যা দেখে কবির অন্তর স্পন্দিত হয়েছিল—সেই রূপটি কাব্যপাঠরতের মনশ্চক্ষে ফুটে না ওঠে তবে তা সার্থক নয় ; তেমন মার্গ-সঙ্গীতের ‘সারেগামা’র ছন্দ-বিন্যাস যদি মল্লারে শ্বেদ-মন্দির গান্ধীর্ষ্য, বসন্ত-বাহারে হিন্দোলার নয়নগ্রাহ্য চিত্রটি ফুটিয়ে না তোলে তবে তাও অসার্থক। সঙ্গীত বা কাব্যের ঐ চিন্ময়রূপ যখন চিত্র-ভাস্কর্য-স্থাপত্যের মৃন্ময়রূপে মূর্ত হয়, তখন রসাস্বাদন অনেকটা সহজ হয়ে পড়ে। আপামর জনসাধারণ শেযোক্ত শিল্পরূপ থেকে অপেক্ষাকৃত অনায়াসে আনন্দরস আহরণে সক্ষম।

তবু ললিতকলার প্রতিটি ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়কে শিক্ষিত করে তোলার প্রয়োজন অনস্বীকার্য, না হলে পূর্ব-রসাস্বাদন অসম্ভব। উপরের ঐ তালিকায়—সঙ্গীত-কবিতা-নাটক-চিত্রকলা-ভাস্কর্য-স্থাপত্যের ক্ষেত্রে সেই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাটো ‘বৌদ্ধ-থেকে-কম’ এবং ‘কম-থেকে-বৌদ্ধ’র বিন্যাসে সাজিত। এখানে অবশ্য তথ্য-কথিত ‘আধুনিক কবিতা’ অথবা ‘আধুনিক চিত্রকলা’র প্রসঙ্গ খাদ দিয়ে বলা হচ্ছে। রসাস্বাদনের প্রয়োজনে ঐ ব্যাকরণ সম্বন্ধে জ্ঞান মার্গ-সঙ্গীত ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বৌদ্ধ, কবিতা ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম, নাটক ও চিত্রকলার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা তল্প। অক্ষর-পরিচয়হীন নিতান্ত গ্রাম্য মানুষ্যের পক্ষেও নাটক এবং চিত্রকলার ক্ষেত্রে আনন্দলাভ সম্ভব। মার্গ-সঙ্গীত ও ধ্রুপদী স্থাপত্যের ক্ষেত্রে ‘পূর্ণ’ রসাস্বাদন তখনই সম্ভব যখন ঐ ব্যাকরণটি আয়ত্তাধীন।

তা ‘পূর্ণ’ রসাস্বাদন নাই হ’ল সেটা বিশেষজ্ঞের

জানাই না-হয় মূলভূমী থাক, চোখ-কান কিছুটা তৈরী হলেই আমরা কিন্তু তা-থেকে বেশ কিছুটা আনন্দ আহরণ করতে পারি। মার্গসঙ্গীতের আসরে উপস্থিত সব শ্রোতাই কিছু সারেগামা রপ্ত করে আসে না, কিন্তু তারা সেক্ষণ্য আসর ছেড়ে উঠেও যায় না, দিক্‌টি সমের মাথায় মাথা ঝাঁকায়। ভৈরো আর দরবারী কান্নড়ার কারাকটা হয়তো তারা ধরতে পারে না, কিন্তু অনুভূতির নিরিখে বলে দিতে পারে—প্রথমটা ভোর-কোলায় গাইবার উপযুক্ত, দ্বিতীয়টা মধ্যরাত্রে। স্থাপত্যের ক্ষেত্রেই বা সেটা না হবে কেন? হয়! একটু ধরিয়ে দিলেই আপনি-আমি সে ধরতাইটা ধরতে পারি। তারপর চোখ ক্রমশঃ তৈরী হবে। আর্কিটেক্-চারের ক্রাস না করেও আমরা বুঝে নিতে পারব, হুবহু অনুকরণের চেষ্টা সত্ত্বেও ঔরঙ্গজীবের তৈরী বিবি-কা-বক্‌বরা তাজমহলের ধারে-কাছেও যেতে পারেনি; সফদরজন্ডের সুবৃহৎ সমাধিসৌধ হুমায়ূন-মক্‌বারার তুলনায় প্রহসনমাত্র। ‘কেন’ তা হয় তো এখনই বুঝিয়ে বলতে পারছি না, তবে এটুকু বলতে পারি : ছন্দপতন বেছেছে কখন, ভাল কেটেছে গানে।

সঙ্গীত, কবিতা, নাটকের প্রসঙ্গ থাক, শৃঙ্খলায় ললিতকলার নয়নগ্রাহ্য অপর তিনটি বিভাগের মধ্যেই তুলনামূলক আলোচনাটা সীমিত করা যাক, অর্থাৎ চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য।

আগেই বলেছি, চিত্রকলা দ্বি-মাত্রিক, তাতে আছে শব্দ, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ; ভাস্কর্য-স্থাপত্য ত্রি-মাত্রিক, তাতে ‘কোণ বা গভীরতা’ বৃত্ত হয়েছে। চিত্র শব্দ সামনের দিক থেকে দেখতে হয়, ভাস্কর্য-স্থাপত্য ঘুরে-ফিরে। ভাস্কর্য ঐ প্রবীর তালিকায় আছে মধ্যবর্তী স্থানে, সঙ্কল্পের অবস্থানে—বাক্য বলে ‘ট্রান্সিজশন ফেস’-এ। তাই তা দু’জাতের। কখনও দ্বি-মাত্রিক, কখনও বা ত্রি-মাত্রিক। প্রায় দ্বি-মাত্রিক হলে তাকে বলি—‘বাস-রিলিফ’ বা অর্ধাংকীর্ণ ভাস্কর্য। স্মারকপুস্তকের প্রস্তাৱীঘাটে মহাশয়জীবীর স্মৃতিসৌধের চরণমূলে উৎকীর্ণ খ্রিস্টাব্দীয় পালের ‘বাস-রিলিফ’ একটি সুন্দর উদাহরণ। রূপসত্ত্বের পত্রের ধাপে—ত্রি-মাত্রিক হবার পথে আর একপল অগ্রসর হলে পাই অন্য একজাতের মূর্তি, বা তিন দিক থেকে দেখার উপযুক্ত। সচী-কুম্বেশ্বর-খজুরাহো-কোনকের প্রায় যাবতীয় মূর্তি এই পর্যায়ের। তা মন্দিরমাত্র, তোরণমাত্র, অথবা কুলাঙ্গিতে অর্ধাঙ্গিত। সম্পূর্ণ ত্রি-মাত্রিক—ইংরাজিতে বাক্য বলে ‘ফ্রি-স্ট্যান্ডিং’, তা পরিভ্রম্য করে ঘুরে-ফিরে দেখতে হয়। শহর কলকাতায় একজাতের মূর্তির সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণটি দেখতে পাবেন ভিক্টোরিয়া

মেমোরিয়ালের প্রাঙ্গণে, ভাস্কর J. H. Foley-কৃত আউটারামের অম্বারুঢ় মূর্তিটিতে। পটনা শহরে দেবীপ্রসাদের গড়া সপ্ত শহীদেব রূপায়ণে।

প্রসঙ্গত বলি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রায় দ্বি-মাত্রিক বা তিন দিক থেকে দেখার উপযুক্ত মূর্তি ‘ফ্রি-স্ট্যান্ডিং’ রূপে উপস্থাপিত করায় রসভাস ঘটে, দেখতে পাই। যেমন ধরা যেতে পারে, কার্জন পার্কে সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত লোকমাতা রানী রাসমাণির উপবিষ্ট মূর্তিটি। পিছন থেকে এ মূর্তি দেখার উপযুক্ত নয়, কিন্তু উপস্থাপনের হুটিতে এই রসভাস ঘটেছে। যারা এ ধরনের মূর্তির স্থান নির্বাচন করেন তাঁদের যথেষ্ট শিল্পবোধ থাকলে এ-জাতীয় মূর্তি এমনভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় যাতে দর্শকের পক্ষে পীড়াদায়ক অনুভূতিটা এড়ানো সম্ভব। যেমন ধরুন, মিকেলাঞ্জেলোর ‘পীতা’—সেটি রোমের সেন্ট পিতার গীর্জায় এমনভাবে রাখা আছে যে, দর্শক তার পিছন দিকে যেতে পারে না। আরও একটি সহজলভ্য উদাহরণ কলেজ-স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর মশায়ের উপবিষ্ট অবস্থায় মূর্তিটি। জলে না নামলে স্বল্পলোকই তার পিছন দিকটা দেখতে পায়।

স্থাপত্য কিন্তু আবশ্যিকভাবে ত্রি-মাত্রিক। তা চারিদিক থেকেই দেখতে হয়। ফলে এর গঠন-চাতুর্য একটু অন্য প্রকারের। শিল্পীকে খেয়াল রাখতে হয়, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তা কেমন দেখাবে।

চিত্র-ভাস্কর্যের মতো স্থাপত্যেরও দু-দুটি মূল আবেদন : সূক্ষ্ম কারিগরী ও সামগ্রিক প্রতিবেদন। ইংরাজিতে যাকে বলতে পারি—‘ডিটেইল্‌স্’ এবং ‘ওভার-অল্‌ এফেক্ট’। চিত্রের ক্ষেত্রে কোথাও ‘ডিটেইল্‌স্’ বা সূক্ষ্ম কারিগরী প্রাধান্য পায়; যেমন মিনিয়চার পেণ্টিং, কিম্বা হীরাকাঁদ দুগার-এর অধিকাংশ জল-রঙের কাজে। কোথাও বা সামগ্রিক আবেদনটাই বড় কথা। ক্ষেত্র-বিশেষে এই দুই গুণ যখন মিতালী পাতায়, তখন তা হয় সোনায়ে সোহাগা। যেমন, অজন্তা সপ্তদশ বিহারে সারিপুস্তুর পরীক্ষা অথবা সিংহল-অবদান, কিম্বা মিকেলাঞ্জেলোর ‘সিস্টিন-চ্যাপেল’ ম্যুরাল, অথবা হাটের কাছে এই কলকাতা শহরেই বি. বা. দী-বগে শিপিং কর্পোরেশন বিল্ডিংস্-এর একতলায় গ্রীসারদিন্দু সেনরায়ের অঁকা প্রকাণ্ড জলরঙের ম্যুরালে। স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও তাই—কোথাও সূক্ষ্ম কারিগরীর প্রাধান্য, যেমন সেলিম চিহ্নিত কবর, ইংমদ-উদ্-দৌলার সমাধিমন্দির। কোথাও বা সামগ্রিক আবেদনটাই মূখ্য, যথা দিল্লীতে হুমায়ূনের সমাধি, অথবা সাসার স্রে শেরশাহ্‌র। কোটিটকে গুটিক হয়

সোনায়ে সোহাগা—এই দুই গুণের অপূর্ব সামঞ্জস্য—
নিঃসন্দেহে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ : আগ্রার তাজ-
মহল।

স্থাপত্যের ক্ষেত্রে ঐ দ্বিতীয় গুণটি কিন্তু আব-
শ্যিক। সামগ্রিক আবেদনটাই মূল্য। বিভিন্ন অঙ্গ-
প্রত্যঙ্গের মাপজোখ এবং পারস্পরিক সম্পর্ক—কলা-
শিল্পের ভাষায় যাকে বলে ‘রূপভেদ’ ও ‘প্রমাণ’ তা
নিখুঁত হওয়া চাই। সুক্ষ্ম কারিগরী একেবারে না
থাকলেও তা সার্থক স্থাপত্য নিদর্শন হতে পারে।
আকারে যে সুবৃহৎ হতেই হবে এমন কোনো সর্ত
নেই। যেমন, দিল্লীতে গিয়াসউদ্দীন তুগলকের
সমাধি। সেটি আকারে ছোট, অলঙ্করণ বর্জিত—
কিন্তু সার্থক স্থাপত্যকীর্তি। অথচ কম্পোজিশনে
ত্রুটি থাকলে, ইমারতের বিস্তার ও উচ্চতা, তার বিভিন্ন
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—গম্বুজ, মিনারিকা, ছত্রী, গুলদস্তা,
খিলান, কুর্সি প্রভৃতির বিন্যাস নিখুঁত না হলে,
ভারসাম্যচ্যুত হলে, তা কোনোক্রমেই সার্থক স্থাপত্য-
নিদর্শন হতে পারে না। এই প্রসঙ্গে মৃদুতবা আলী-
সাহেব লিখেছেন, “এই সামঞ্জস্য যখন সর্বাপেক্ষা সুন্দর
হয়, তখনই স্থাপত্য সার্থক। এবং স্থাপত্যের এই
অনিন্দ্য সামঞ্জস্য যদি কাব্যে কিম্বা উপন্যাসে পাওয়া
যায়, তবে বলা হয়, কাব্যখানিতে ‘আরকিটেকটনিকাল’
মহিমা আছে—মহাভারতে আছে, ফাউন্টে আছে এবং
উয়ের অ্যান্ড পীসে আছে ; জ্যাঁ ক্রিস্তফ্ উত্তম উপ-
ন্যাস কিন্তু এ গুণটি সেখানে অনুপস্থিত। লিরিক বা
গীতিকাব্যে যদিও কম্পোজিশন থাকে—তা সে মতই
কম হ’ক না কেন—তাতে আরকিটেকটনিকাল বৈশিষ্ট্য
থাকে না। ‘আধেক ঘুমে নয়ন চুমু’ গানটি সার্থক
এবং এই নীতির প্রকৃষ্টতম উদাহরণ।”

আলিসাহেব ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এটুকু ইঙ্গিত দিয়েই
ক্ষান্ত হয়েছেন ; আমাদের সেটা আর একটু গভীরভাবে
বুঝে নিতে হবে।

উল্লিখিত গানে কবি একাধিক চিত্রকল্পের সাহায্যে
তার অন্তরের ভাবটি প্রকাশ করেছেন—সেখানে অর্ধ-
নিমগ্নার নয়নে যে স্বপ্ন জাগে তার অনেকগুলি চিত্র-
কল্পের কথা বলা হয়েছে। বনের ছায়া সেখানে কবির
মনের সাথী, পথের ধারে আসন পেতে সেখানে পিছন
ফিরে তাকিয়ে দেখার কোনো বাসনা কবির নেই, তবু
চৈত্রদিনের তপ্ত বেলায় সুদূর স্মরণপটে স্মৃতির
ঘরীচিকা জাগে, যথাক্রমে শাখার কপোত-কুঞ্জে কবির
নীরব ভাবনা বিজন বেদনায় ডাসতে থাকে। এ
‘কম্পোজিশন’ দানা বেঁধে ওঠেন—‘লিঙ্গাল’ ঘেঘের
মতো ভেসে ভেসে চলে গেছে, শরৎকালীন ‘কিউমিউ-

লাসে’র মতো স্তবকে স্তবকে, স্তূপে স্তূপে সঞ্চিত
হয়ে আরকিটেকটনিকাল মহিমার দৃঢ়তা পাননি।

ঐ যে সামঞ্জস্য-বিধানের কথা বলা হল, স্থাপত্যের
ক্ষেত্রে, তার একটি প্রধান গুণ : সরলতা এবং সংযম।
এ-কথা অবশ্য আধুনিক-বিশেষণ-বর্জিত কাব্য ও চিত্র-
শিল্পের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। আড়ম্বর বেশি
হলে, জটিল হলে, কিম্বা অলঙ্কারের আধিক্য হলে,
আমাদের চোখ পীড়িত হয়। ইল্‌ভুৎমিসের সমাধি-
সৌধের অভ্যন্তরে—আমরা পরে দেখব—অলঙ্কারের
আধিক্য কিছুটা রসভাস ঘটিয়েছে ; সেটা শিল্পীরা
নিজেরাই অনুভব করেছিলেন, কারণ পর-
বর্তীকালের ইমারতে অলঙ্করণের এই আধিক্য
পুনরায় সংঘটিত হয়নি। এই সরলতা গুণটিকে বিচার
করতে হবে দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, নির্মাণকারীর
দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়। জিনিসটা একটু ব্যাখ্যা করা যেতে
পারে : দর্শকের কাছে হুমায়ূন-মকবারার প্ল্যানিং
জটিলতর, কিন্তু বাস্তবে স্থপতিবাদের কাছে তাজ-
মহলের প্ল্যানিং জটিলতর। অথচ প্ল্যান বা ভূমি-
নকশায় তাজমহলের মূলে আছে মাত্র পাঁচটি বস্তু—
কেন্দ্রস্থলে একটি এবং ঈশান-নৈঋত-অগ্নি-বারু কোণে
চারটি ; অপরপক্ষে হুমায়ূনের সমাধিতে ভূমি-নকশা
বানাতে নকশা-নিষিদ্ধে কাজ শুরু করতে হয়েছে
নয়টি বস্তু থেকে। তাহলে তাজমহল কি-করে জটিল-
তর হয়? জবাব : তাজমহলের ঐ পাঁচটি বস্তু থেকে
যে খোঁচ-খাঁজ বার করা হয়েছে তার জ্যামিতিক হিসাব
আরও জটিল। পরবর্তী একটি অধ্যায়ে বিষয়টা বোঝা-
বার চেষ্টা করব। অবশ্য সেটা ঠিকমতো প্রাধিকান
করবার একটিই পথ—ঐ নকশায় সাহায্যে জ্যামিতির
‘ইন্সট্রুমেন্ট বক্স’ নিয়ে তাজমহল ও হুমায়ূন-মকবারার
প্ল্যানদুটি আঁকার চেষ্টা করা। তবুটা বন্ধে নেবার আর
কোনও সহজ ‘রয়্যাল রোড’ নেই !

সে যাই হোক, পূর্বে যে বলা হয়েছে—‘অজন্তার
চিত্র শ্বি-মাত্রিক, দিল্লী-আগ্রার স্থাপত্য দ্বি-মাত্রিক’,
সেখানে ‘মাত্রা’ শব্দটিকে আরও ব্যাপক অর্থে নেওয়া
যায়। যেন, অজন্তার চিত্রসম্ভারকে শ্বি-মাত্রিক একনাই
বলিনি যে, তাতে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থই শব্দ আছে, কেব
নেই ; সেগুলি শ্বি-মাত্রিক একনাই যে, আমাদের প্রশ্ন
মাত্র দুটি মাত্রার সীমিত : প্রাচীরচিত্রের বিকরবস্তুর কী,
এবং সেটা কতটা উৎকর্ষে। অজন্তার ক্ষেত্রে শিল্প-
দর্শনের আবশ্যিক তৃতীয়মাত্রার প্রশ্নটা : ‘কে গড়ে-
ছেন’ শিল্পীসত্তার পরিচয়, অনুপস্থিত। সহস্রাব্দ-
কালের চিরপ্রশ্নের বেদীসম্মুখে অজন্তা চিরনির্বাক,
বিরাট নিরন্তর ; ঐ অবিদ্য প্রশ্নটির একটিই জবাব :

কোনো অজ্ঞাত বৌদ্ধ প্রথম।

অপরপক্ষে দিল্লী-আত্ম-ফতেপুর-সিক্রিতে, অর্থাৎ যে ক্ষুদ্র ভূখণ্ড দীর্ঘ অর্ধ-সহস্রক ভারতবর্ষের রাজধানী হিসাবে ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যকে জন্ম দিয়ে লালন-পালন করেছে, সেখানে প্রতিটি শিল্পসম্পদকে তৈরি করতে হবে কে গড়েছেন এই প্রশ্নটির বাট-খাটির। কুব্ব-মিনার থেকে সফদরজঙ্ঘের সমাধিসৌধ, প্রতিটি স্থাপত্য-নিদর্শনে তদানীন্তন দিল্লীশ্বরের ব্যক্তিগত চরিত্রটুকুই শব্দ নয়, সমকালীন ভারতবাসীর হাসি-অশ্রু-স্বৈদ-রক্ত মিশে আছে। কান পাতলে শুনতে পাবেন সেই দেওয়ান-ই-আমের সম্মুখস্থ নককরখানা থেকে উচ্চকণ্ঠ ঘোষকের : 'হৌশিয়ার !' ইমান-ইনসাফের মালিক আত্ম-ভালার জিল্জুয়ার আবির্ভাবের ঘোষণা ; তখ্ব-ই-সুলেমান-আসান দীন দূনিয়ার মালিক শাহ-এন-শাহর দপ্তরগৃহে উচ্চারিত ফরমান ; জাম-ই-মসজিদের মিনার-চুড়ায় মগরিরের আইন-ওস্তে নামাজের দিগন্ত-অনুসারী আজান-ধ্বনি ; শিশ্মহালের আক'-ব্রতবে প্রতিধ্বনিত ইরানী-ইস্পাহানী অনিন্দ্য-নর্তকীর নৃপ-নিকণ অথবা সন্দৌখ জিয়া দায় হশীশীরূপের হিস্-হিসানি।

দুর্ভাগ্য আমাদের, এক্ষেত্রেও অজ্ঞতার অনবদ্য অধৃত প্রাচীরচিত্রের মতো শিল্পীদল আছেন নেপথ্যে। কুব্ব-মিনারের 'ফউন্ডেশান-ডিজাইন' কে করেছিলেন, তাজমহলের মূল পরিকল্পনাকার কোন হতভাগ্য অথবা বুলন্দ-দরওয়াজার আদি নিরামক কোন স্থপতিবিদ তা আমরা জানি না। তাদের মজুরিটি মিটিয়ে দিয়েই ইতিহাস বলেছে : তামাম্ শব্দ !

কী জানি, হয়তো সত্যি কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি তখন ! কী লাভ হত জানলে তাজমহলের মূল পরিকল্পনাকারের পিতৃদত্ত নাম মহম্মদ ইশা আফান্দ কিনা। তাঁর জীবন বেভাবে কেটেছে, আজ আর তার পরিবর্তন তো কিছুতেই করতে পারব না। বরং তিনি 'তাজমহল-পরিকল্পনাকার' 'এ্যানন্' হিসাবে শাস্বত-কাল বিশ্ববাসিত হয়ে থাকুন। 'হারিন' চট্টোপাধ্যায়ের জায়গা : Doctors' fees are heavy, lawyers' fees are high/Artists are just supposed to entertain and die-এস ঐতিহ্যের ব্যতিক্রম এ'রা হবেন কেমন করে—ঐ কুব্ব-বুলন্দ-দরওয়াজা অথবা তাজমহলের পরিকল্পনাকার ?

ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্য : কাকে বলি ? সহজ উত্তর-ভারত ভূখণ্ডে সহস্রাব্দকাল ধরে যে বৌদ্ধ-জৈন-ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের স্থাপত্য-শৈলী বিবর্তিত

হাঙ্কল মুসলমানদের আগমনে তা অতি দ্রুত করেকটি বৈশ্বিক পরিবর্তনে নবরূপ পরিগ্রহ করে। স্থানীয় স্থাপত্য-ঐতিহ্য নবাগতদের চিন্তাভাবনা সংযুক্ত হয়ে এই যে নব রূপায়ণ, তাকেই বলি ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্য। সে যেন অর্থনারীশ্বর মর্তি !

ইতিপূর্বে এদেশে ছিল মতুপ-তোরণ-মতম্ব সমান্বিত দেবতাদের উপাসনাগৃহ, মন্দির, কিছুর বিহার, প্রাসাদ বা দুর্গ। সাধারণ, এমন কি অর্থবানদের গৃহও এমন মালমশলায় তৈরী হত যে, তার অস্তিত্ব অজ্ঞ খুঁজে পাওয়া ভার। এই পরিমন্ডলে আবির্ভূত হল আগন্তুকদের চিন্তাধারা, যার বিকাশ দেখা দিল ত্রিধারায়। প্রথমতঃ মসজিদ, দ্বিতীয়তঃ মক্কারা এবং তৃতীয়তঃ, রাজাসিক প্রয়োজনে—ইমারৎ, কিল্লা, মিনার, দরওয়াজা প্রভৃতি।

"সেয়ুগে হিন্দুর জীবনে শেষ কথা ছিল ভক্তি। সূর্যমুখী ফুলের মতো তার সমস্ত কর্ম, চিন্তা, ধ্যান, ধারণা, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে ভগবানের নামে উদ্ভূত-মুখী। ঐহিক সম্পর্কে তারা যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়নি। যখন কা তব কালতা, কস্মে পত্ন, তখন প্রেম দিয়ে আর হবে কী ? মায়াময়মিদম্ অখিলং বিশ্বম্। কাজেই পিতাকে হতে হয়েছে পরমং তপঃ, স্বামীকে হতে হয়েছে পতিদেবতা, স্ত্রীকে হতে হয়েছে সহ-ধর্মিণী। নারী যে সহমৃতা হয়েছে তার কতটা প্রেমের আকর্ষণে আর কতটা পুণ্যলোভবশে তা বলা শক্ত। স্বয়ম্বরা যারা হয়েছেন, তাঁরা প্রেমে পড়ে নয়। সংযুক্ত পৃথ্বীরাজের গলায় মালা দিয়েছিলেন তাঁর খ্যাতি ও বৈভবের জন্য, যেমন একালের তরুণীরা অ'ংটি পরিয়ে দেন আই. সি. এস.-এর অংগুলিতে।

"মুসলমানেরাই আনল ভিন্ন জীবনাদর্শ। বৈরাগ্য-সাধনে মূর্ত্তি যে তাদের নয়। তারা পরকালকে থোড়াই পরোয়া করল ; ইহকালকে করল সর্বস্ব। তারা জীবনকে করল ভোগ, কাঁদলো, কাঁদলো এবং ভালো-বাসলো। তারা নারীর জন্য করল লুণ্ঠন, প্রেমের জন্য করল অপহরণ এবং প্রিয়জনের জন্য হনন ও বহু অপকর্ম সাধন। বলা বাহুল্য, এর সবগুলি সমর্থন-যোগ্য নয়। কিন্তু প্রেম কি কারও সমর্থনের অপেক্ষা রাখে ? মেনে চলে নীতির অনুশাসন ? অহল্যা করেছে সমাজের বা শাস্ত্রের সমর্থনের অপেক্ষা ? মহাভারতের অজ্ঞান করেছে ? বৃন্দাবনের কান্দ করেছে ? করেছে রিজিয়া বেগম, মেরী ওয়ালেস্কা বা সেডী হ্যামিলটন ?

"মুসলমানেরা প্রিয়তম-প্রিয়তমার স্মৃতিকে করতে চেয়েছে কালজয়ী। রাখতে চেয়েছে স্মারকচিহ্ন। তাই

সৌধ গড়েছে পিতার, পতির, পত্নীর, এমন কি উপ-পত্নীর সমাধিতে। হিন্দুরা তপস্বী, তারা দিয়েছে বেদ ও উপনিষদ। মুসলমানেরা শিল্পী, তারা দিয়েছে তাজ ও রঙমহাল। হিন্দুরা সাধক, তারা দিয়েছে দর্শন। মুসলমানেরা গুণী, তারা দিয়েছে সঙ্গীত। হিন্দুর গর্ব মেধার, মুসলমানের গৌরব হৃদয়ের। এই দুই নিরেই ছিল ভারতবর্ষের অতীত ; এই দুই নিরেই হবে তার ভবিষ্যৎ।”^২

ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যের মূলে প্রবেশ করতে হলে বাষাঘরের এই বহুপাঠিত বিশ্লেষণটি বিচার করে দেখা যেতে পারে। বাষাঘরের রচনাশৈলী অসাধারণ, বেধকারি আঙ্গণ ও ‘দৃষ্টিপাতের’ সমতুল্য ভাষা-মাধুর্য অন্য কোনো রম্যরচনায় সৃষ্টি হয়নি। এমন কি বিমান দৃষ্টিটায় ‘অকালমৃত্যু’ না হওয়া সত্ত্বেও স্বয়ং ‘বাষাঘর’ তার ‘দৃষ্টিপাতকে’ অতিক্রম করতে পারেন নি। কিন্তু ইন্দো-ইসলামী সংস্কৃতির বিষয়ে এই বহুল-উদ্ধৃত অনুচ্ছেদটি থেকে আমাদের যে বন্ধমূল ধারণা হয়েছে সেটা থেকে সংস্করমুক্ত হওয়ার প্রয়োজন।

প্রথম অনুচ্ছেদটি পড়ে মনে হয় প্রাক-মুসলমান যুগে হিন্দু নর ও নারীর মধ্যে পারস্পরিক প্রেম ছিল না, তাদের সমস্ত ক্রিয়াকর্ম ছিল ভগবানের নামে উৎসর্গীকৃত। ঐ অনুচ্ছেদেই তা অস্বীকার করে বলা হয়েছে সংযুক্ত থেকে একালের তরুণীরা বিবাহ করেছে খ্যাতি ও বৈভবের মোহে। খ্যাতি ও বৈভবের দিকে নিবন্ধদৃষ্টি ললনাকুলকে সূর্যমুখী ফুলের মতো ঈশ্বরমুখীন বলা চলে না। আবার এই পুণ্যলোভ বশবর্তী অথবা খ্যাতি-বৈভবের আকর্ষণে পড়া হিন্দু নরনারীর প্রসঙ্গে পরবর্তী অনুচ্ছেদে বলা হল, অহল্যা সমাজ ও শাস্ত্রকে অস্বীকার করে অবৈধ প্রেমে পড়েছে। ‘প্রেম দিয়ে আর কী হবে’ বাদের চিন্তাধারা তাদের ভিতর থেকেই লেখক বেছে নিয়েছেন অজুর্নকে, বৃন্দাবনের কানকে। শব্দের ঝঙ্কারে, রচনাশৈলীর মাধুর্যে আমরা সাময়িকভাবে খেয়াল করতে ভুলে যাই—লেখকের ‘র্যানডম সিলেকশন’—অহল্যা, রিজিয়া আর মেরী ওয়ালেস্কা তিনটি বিভিন্ন ধর্মকে প্রতি-নির্দেশ করছে! এদের নাম একই নিঃস্বাসে উচ্চারণের একটিই অর্থ—প্রেম কোন দেশে, কোনো যুগে সমাজ ও ধর্মের অনুশাসন মেনে চলেনি। আর সেটাই সত্য।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হল, ‘মুসলমানেরা পরলোককে খোঁড়াই পরোয়া করল’। আর সেটাই তাদের জীবনাদর্শ। ইসলামী স্থাপত্য কিন্তু সে-কথা বলে

না। যুগে যুগে তবু-জটিলে উঠে কসবার সন্ধান পেয়েই মুসলমান সুলতান/জাহাঙ্গীর/নবাবের দল সর্বপ্রথমে বা গড়েছে তা পরী বা উপপত্নীর স্মৃতিসৌধ নয়, আর্বাশিকভাবে—জাম-ই-মসজিদ। আর বাষাঘরের ঐ তুলনামূলক আলোচনার সবচেয়ে বড় যে কথাটি উপেক্ষিত তা হচ্ছে ঐ : জাম-ই! (জনতার জন)

হিন্দুধর্মে—অস্বীকার করে লাভ নেই, সাক্ষ্যের স্থান অনেক নিচে। বর্ণাশ্রম ধর্মের যে বাষাঘরই করুন, অচ্ছদ্দের ‘হরিজন’ নামে চূড়িত করে অথবা ‘দারিদ্র্য নারায়ণের সেবা’-র জিগির তুলে ঐ সাক্ষ্যের অভাবকে বৌদ্ধিকতা দিয়ে আঙ্গকের ধ্যান-ধারণায় মেনে নেওয়া কঠিন। ইসলামের মূল বক্তব্য সম্বন্ধীর মধ্যে সাক্ষ্য। তাদের একসাথে নামাজ, এক পাতে ইচ্ছারী, এমন কি মৃত্যুর পরেও এক কাতে শরনের বাক্সা। স্থাপত্যের নিরিখে মন্দির ও মসজিদ-এর প্ল্যানিং-এ এটাই হল মৌল প্রভেদ। সে প্রসঙ্গে এখনই আসব। কিন্তু তার আগে বলে যাই—বাষাঘরের এই শেখ পর্যন্তির বিষয়েও আমি একমত নই : হিন্দুর গর্ব মেধার, মুসলমানের গৌরব হৃদয়ের।

মধ্যযুগে আরবে, তুর্কিস্থানে, সিরিয়ার এক বিশেষ করে বৃহত্তর পায়সো দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ, শারীরবিজ্ঞান, রসায়ন প্রভৃতির যে মৌলিক চর্চা হয়েছে, তাতে তাদের মেধার অভাব ছিল বলে মনে হয় না। অপরপক্ষে ভারতবর্ষের ইতিহাসে দীর্ঘস্থায়ী সুলতানী ও মুঘল জমানায় সিংহাসনের লোভে কেষব কান্ড ঘটেছে—যা ইতিপূর্বে দেখিনি মোর্ষ, গুপ্ত, চালুক্য রাজবংশের ইতিহাসে, তাতে ‘মুসলমানের গৌরব হৃদয়ের’ একথাটাই বা মেনে নিতে পারছি কই? আত্মকেন্দ্রিক চিন্তাধারায় যেখানে পিছুহাতা-ডাড়াহাতা—অতি প্রিয়জনকে অন্ধ করে দেওয়া নৈমিত্তিক ঘটনা সেখানে ‘হৃদয়’ নিয়ে গর্ব করার অবকাশ অল্প।

বাষাঘরের মূল বক্তব্যটা অবশ্য নিশ্চয় মেনে নেব—হিন্দু-ভারত ইহলোকে স্মৃতিচিহ্ন রেখে যাকার কোনো চেষ্টাই করেনি। মরদেহ ভস্মীভূত হয়ে স্বর্গের পর স্মৃতিসৌধ গড়ে তোলার কথা তাঁদের কল্পনাত্তই আসত না। মোর্ষসম্রাটদের আমল থেকে গুপ্তবংশ অভিস্রব করে পৃথ্বীরাজ চৌহান পর্যন্ত কোনো হিন্দু রাজ্য নির্মাণ করাননি নিজের, প্রিয়জনের বা প্রিয়জন্যর জন্য কোনো পাষণ স্মৃতিসৌধ। রাজশূদ্র পুণ্ড্রলান্ধর দল গড়েননি পিতার স্মৃতিতে কোনো ইতম-উম-দৌল, অথবা কিংবদন্তি স্মার্যীর স্মরণে কোনো হুমায়ুন-কা-মক্কাবা। মন্দির তাঁরা গড়েছেন—কিন্তু তার নামের সঙ্গে নিজ নামটুকু পর্যন্ত যোগ করেননি।

আহিওল, কাদামী, ভুজেশ্বর, খাজুরাহোর অমৃত মন্দিরের নাম শুনে বোঝা যাবে না কোন মন্দিরটি কোন নৃপতির অধীনস্থলো নির্মিত। বৌদ্ধরা গড়েছেন চৈত্যা-বিহার, সঙ্ঘারাম ; শঙ্করাচার্য স্থাপন করেছেন মঠ নৈব্যৃত্তিক উদাসীনতায়। সমস্তই জগৎ হিতায়। এমন কি নতুন গ্রন্থ লিখে, দর্শনের নতুন সূত্র আবিষ্কার করে তা মূনি-ঋষিদের নামে চালাতে চেয়েছেন, স্বনামে নয়।

হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন উপাসনাগৃহ একান্তভাবে আত্ম-কেন্দ্রিক। তার গর্ভগৃহ অশ্বকরাজ্য, রহস্যঘন—প্রকৃত অধিকারীর জন্য অপারিসর 'অন্তরালের' আয়োজন। আগামর ভক্তসাধারণ সমবেত হয় মূলমন্দিরের সংলগ্ন জঙ্গমোহনে, মন্ডপে বা মন্দির-চাতালে। ইসলামে ধর্মচারণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, গণ-মানসের। তাই মসজিদ পরিকল্পনার ছন্দটা অন্য জাতের :

মসজিদ স্থাপত্য তিন দিক থেকে দেখার। অনেকটা পূর্বে উল্লিখিত কলেজ স্কোরারের বিদ্যালয়-সামনের মূর্তির মতো। ভারতবর্ষে মসজিদ আবশ্যিকভাবে পূর্বমুখী। তার হেতু নামাজ পড়তে হয় মক্কার দিকে মুখ করে, পশ্চিমদিকে ফিরে। এজন্য মসজিদের পশ্চিমদিকের দেওয়ালে ঠিক মধ্যস্থলে থাকে কুন্দুপির মতো একটি খিলান-ইসলামী ঐতিহ্যে তার নাম 'মিহরাব' ; তার পাশেই, সচরাচর উত্তরে, থাকে ইমামের আসন : 'মিন্বের'। মিহরাবের গারে একটি চিহ্ন থাকে—মক্কার দিক নির্দেশ করে, তাকে বলে—'কিবলা'। মসজিদের বৃন্দাবন পরিকল্পনা মক্কাস্থিত উপাসনাগৃহ 'কাবা'-র অনুসরণে। পশ্চিমদিকস্থ মূল উপাসনাগৃহ বা 'ইকান'-এর সামনে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, যার ফাসাঁ প্রতিশব্দ 'শেহান' যা থেকে আমাদের বাঙালয় 'শহনের মেঝে' কথাটা এসেছে। শেহানের কেন্দ্রস্থলে একটি চৌকর, হস্তপদাদি প্রক্ষালনের, অর্থাৎ অঙ্গুর প্রয়োজনে। প্রাঙ্গণের বাকি তিন দিকে স্তম্ভশোভিত অলিন্দ বা 'লিঙ্গন'। পূর্বপ্রান্তে মূল প্রবেশদ্বার। উত্তরে এক দক্ষিণে দ্বার থাকতে পারে, আবার নাও পারে ; থাকলে একটি হবে অপরাটের দর্পণ-প্রতিবিম্ব ; স্থাপত্যের পরিচায়ক বাক্য বলে, একটি অপরাটের 'জবাব'। মসজিদে প্রায় আবশ্যিক অঙ্গ হিসাবে থাকে অজান দেওয়ান উপবৃত্ত স্ট্রাক কোন স্থাপত্য-অঙ্গ। ইমারৎ সংলগ্ন হলে তাকে বলি মিনারেষ্ট বা মিনারিকা, বিচ্ছিন্ন হলে : মিনার।

ইসলামী স্থাপত্যের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য : মক্কারা বা সমাধিসৌধ। এ-জাতীয় পরিকল্পনা যাদাবরই করেছে প্রাক-মুসলিম ভারতে ছিল না। মসজিদের

প্ল্যানিং-এ স্থপতিবিদকে নানান রকম বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়, মক্কারা প্ল্যান ছকার সময় তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি। মক্কারা কেন দিকে মুখ করবে, বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র, অষ্টভুজ কী আকারের হবে তা নির্ধারণ করেন স্থপতিবিদ। তাতে গম্বুজ, মিনারিকা, গুলদস্তা, ছত্রী থাকবে কি থাকবে না তার কোনো শাস্ত্রসম্মত বিধিনিষেধ নেই। নিয়মের বাধাবর্ধি শব্দ এইটুকু :

মৃতদেহ থাকবে মাটির গভীরে। সেটিকে বলব : কবর। সিলিন্ডার আনুভূমিকে, অথবা আরও উঁচুতে বানাতে হবে 'সল্দোখ'। সেটি দেখতে ঠিক কবরের মতো ; কিন্তু বাস্তবে শূন্যগর্ভ। তার অবস্থান ঠিক কবরের উপরে। 'সল্দোখ'-এর ইংরাজী প্রতিশব্দ হিসাবে 'সেনোটোফ' কথাটা চলতে পারে। রেড-রোডের উত্তর প্রান্তে কলকাতা ময়দানে যে 'সেনোটোফটা' আছে, আমরা জানি, তার নিচে প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধে হত সৈনিকদের মৃতদেহ কবরস্থ নেই। 'সেনোটোফ' বা 'সল্দোখ'-এর বাঙালী প্রতিশব্দ আমার জানা নেই। এ-গ্রন্থে আমরা 'সল্দোখ' শব্দটাই তাই ব্যবহার করব। মক্কারায় আর একটি শাস্ত্রীয় নির্দেশ আছে—মৃতদেহ কাফিনে চিৎ হয়ে শোবে না, থাকবে পাশ ফিরে। আর কাফিনটা কবরে এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে অন্তিম শয়ানে শায়িত দেহটা পশ্চিমদিকে ফিরে থাকে। সচরাচর মৃতদেহের মাথা থাকে উত্তরদিকে এবং সে শোয় ডান পাশ ফিরে। প্ল্যানিং-এর প্রয়োজনে, নির্দিষ্ট ভূমির আকৃতি অনুসারে যদি স্থপতিবিদ মৃতদেহকে দক্ষিণদিকে মাথা করে শোয়াতে বাধ্য হন, তখন পরিকল্পনাকার মৃতদেহকে বাম পাশ ফিরে শাইয়ে দেন।

তৃতীয়তঃ রাজসিক প্রয়োজনে ইসলামের আবির্ভাবের পর নির্মিত হল নতুন জাতের 'সেকুলার' ইমারৎ—প্রাসাদ, কিল্লা, দরওয়াজা (তোরণ), সরাই (পান্থশালা), মায়খানা (আসবাগার), মিনার, দেওয়ান-ই-আম (প্রকাশ্য দরবার), দেওয়ান-ই-খাশ (অপ্রকাশ্য দরবার), হামাম (স্নানাগার), খোয়ব-গাহ (শয়নকক্ষ), রুগ্মহল, পিলখানা, আস্তাবল প্রভৃতি।

ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যে কালের ব্যাপ্তি : গজনির মাহমুদের ভারত আক্রমণের পর, কুৎবউদ্দীন আইবকের দাসবংশ প্রতিষ্ঠা থেকে তথাকথিত সিপাহী-নিয়োগ-তক্ষ প্রায় ছয় সাড়ে-ছয় শত বৎসর এই শৈলীর জীবনকাল। তার পূর্বেও সিন্ধু অঞ্চলে ইসলামী স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়, এবং ইংরেজ আমলেও

ইয়তো কিছু কিছু নির্মিত হয়েছে, কিন্তু ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যের জন্ম ও বিকাশের সময় হিসাবে এই অর্থসহস্রাব্দিকেই মোটামুটিভাবে চিহ্নিত করা যায়। এ-গ্রন্থে আমরা শুধু ভারতের রাজধানীতে ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যের বিবর্তনটুকু পর্যালোচনা করছি, তার বাহিরে বিভিন্ন আঞ্চলিক স্থাপত্য নিজস্ব গৌরবে মণ্ডিত হয়ে রূপায়িত হয়েছে—পঞ্জাব, বঙ্গদেশ, গুজরাট, জৌনপুর, মালোয়া, গুলবর্গা, বিজাপুর, বিদর, গেলকুন্ডা, খান্দেশ, কাস্মীর প্রভৃতি স্থানে আঞ্চলিক শৈলীর সংমিশ্রণে তা নব নব রূপে বিকশিত হয়েছে—সে-সব কথা আমরা এ-গ্রন্থে আলো-

চনা করছি না ; কারণ আমাদের মূল লক্ষ্য ভারতের রাজধানীর সীমিত চৌহান্দ—দিল্লী-আগ্রা-সেকেন্দ্রা ও ফতেপুর-সিক্রিতে পরিসীমিত। আমাদের মূল লক্ষ্য : এই আঞ্চলিক স্থাপত্যের নিরীখে রাজধানীর ইতিহাস-টুকু বুঝে নেওয়া।

সে যাই হোক, এই অর্থসহস্রকের ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যকে কালের হিসাবে দুটি মূলভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—সুলতানী যুগ ও মঙ্গল যুগ—সুলতানী-জমানা ও মঙ্গল-এ-আজম। বিভিন্ন রাজবংশের এবং সম্রাটের শাসনকালের নিরীখে তা আরও সূক্ষ্মতর ভাগে বিভক্ত করে আলে চনা চলতে পারে :

সুলতানী যুগ 320 বৎসর [1206 — 1526]

১। দাসবংশ	1206 — 1290 = 84 বৎসর
২। খিলজি বংশ	1290 — 1320 = 30 "
৩। তুগলক-বংশ	1320 — 1413 = 93 "
৪। সৈয়দ/লোদী বংশ	1414 — 1526 = 112 "

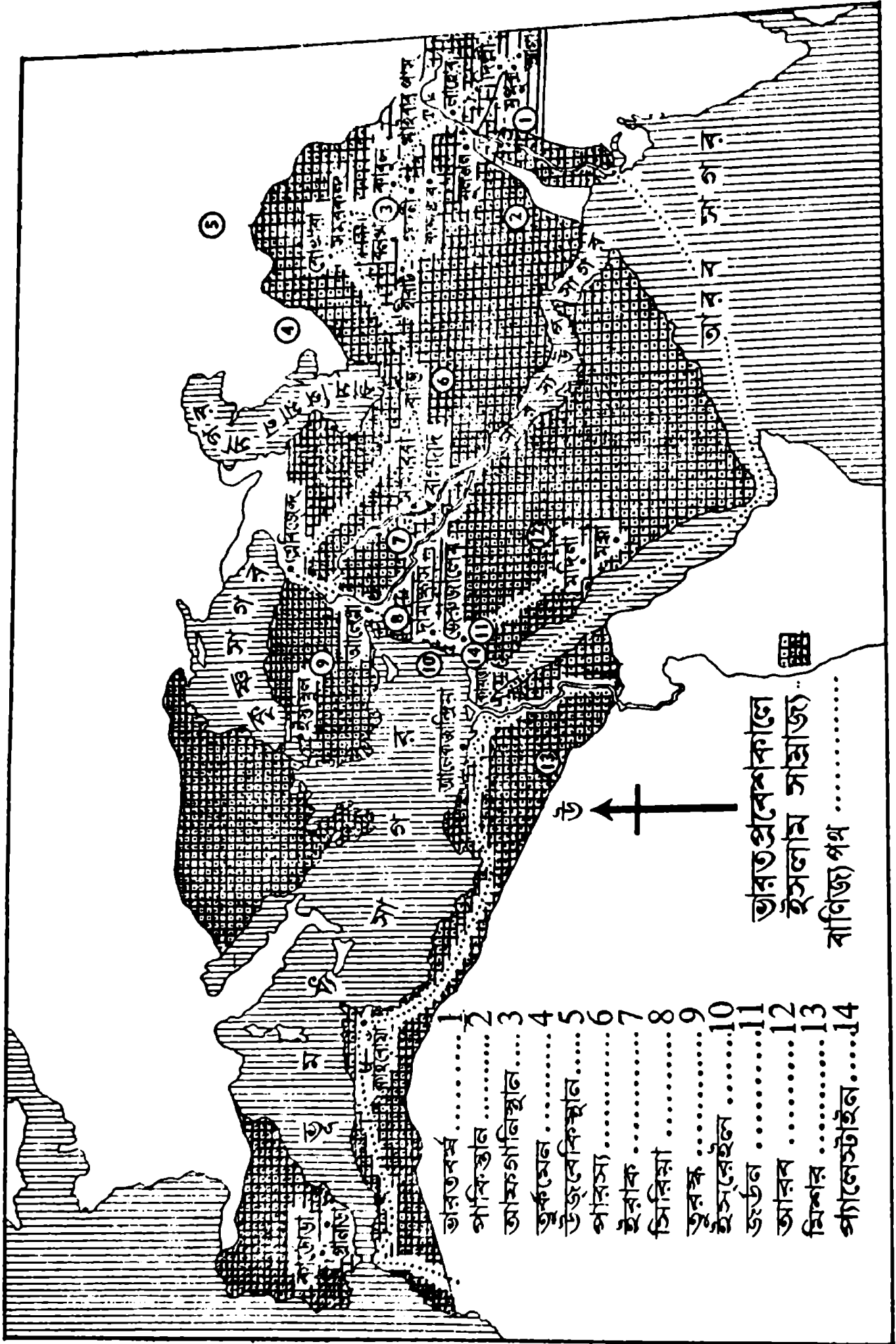
মঙ্গল যুগ 331 বৎসর [1526 — 1857]

১। জাহিরউদ্দীন বাবর	1526 — 1530 = 4 "
২। মহম্মদ হুমায়ুন	1530 — 1539 = 9 "
পূনরায় — 1554		
[শেরশাহ শর ও অন্যান্য আফগান-পাঠান সুলতান]	1540 — 1556 = 16 "
৩। জালালউদ্দীন আকবর	1556 — 1605 = 49 "
৪। নূরউদ্দীন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর	1605 — 1627 = 22 "
৫। খুররম শিহারউদ্দীন শাহজাহাঁ	1627 — 1658 = 31 "
৬। মহীউদ্দীন মুহম্মদ ঔরঙ্গজেব	1658 — 1707 = 49 "
৭। পরবর্তী মঙ্গলসম্রাটবৃন্দ (37)	1707 — 1857 = 150 "

কিন্তু এই তালিকা তো ইতিহাসের কালের বিভাগ। স্থাপত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বোধহয় শ্রেণীবিন্যাস আর একভাবেও হতে পারত—রাজধানীর অবস্থানসূচক :

স্থান	নাম	প্রতিষ্ঠাতা	স্মারিক (আনুমানিক)
দিল্লী	কুৎব-চমর	.. কুৎবউদ্দীন আইবক	.. 1210 — 1295
এ	সিরি	.. আলাউদ্দীন খিলজী	.. 1296 — 1319
এ	তুগলকাবাদ	.. গিয়াসউদ্দীন তুগলক	.. 1320 — 1325
এ	জহানপনাহ	.. মহম্মদ বিন তুগলক	.. 1325 — 1353
এ	ফিরোজাবাদ	.. ফিরোজশাহ তুগলক	.. 1354 — 1460
আগ্রা	সিকান্দ্রা	.. সিকান্দার লোদী	.. 1460 — 1530
এ	আগ্রা ফিল্লা	.. আকবর	.. 1530 — 1569
সিক্রি	ফতেপুর-সিক্রি	.. এই	.. 1569 — 1583
দিল্লী, লাহোর, } আগ্রা আকবর, জাহাঙ্গীর, } শাহজাহাঁ	.. 1584 — 1637
দিল্লী	শাহজাহানাবাদ (লালকিলা)	.. শাহজাহাঁ ও পরবর্তী মঙ্গল	.. 1638 — 1857

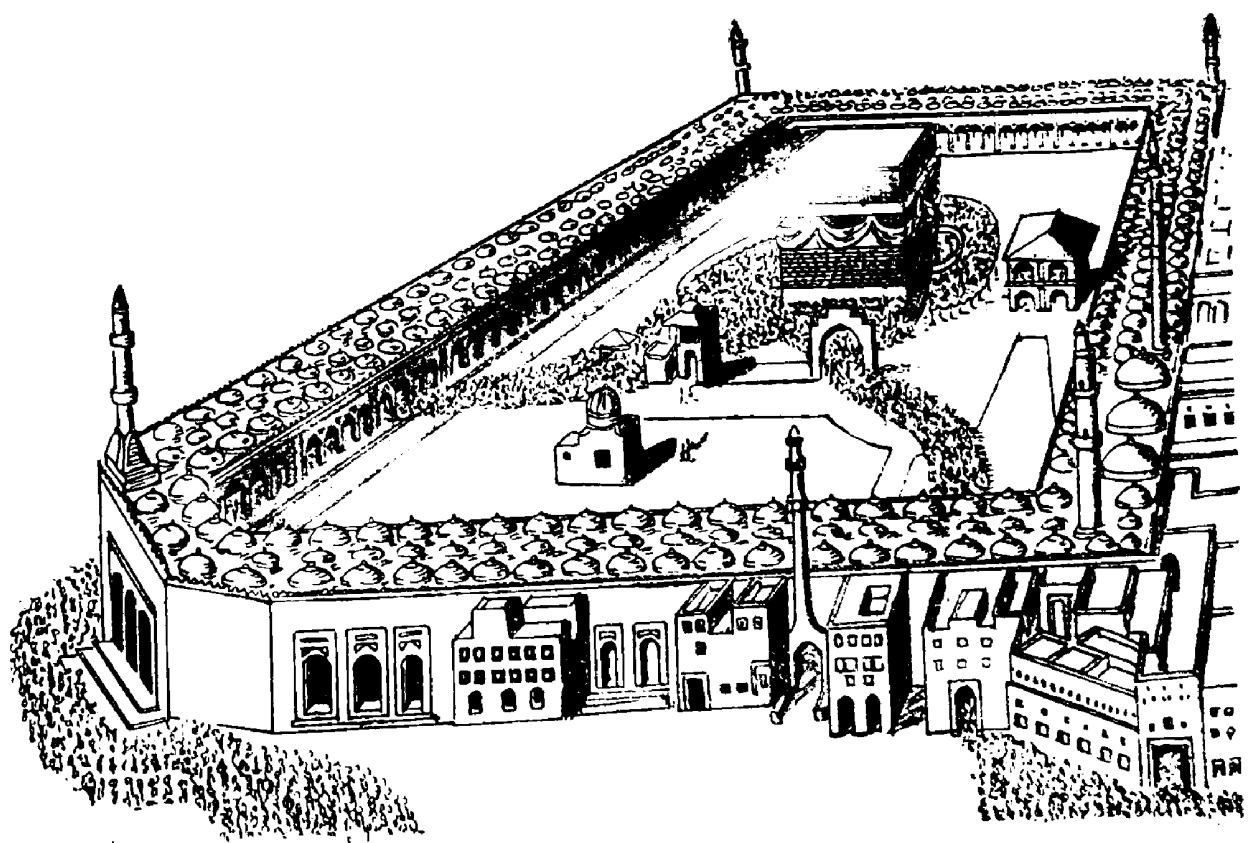
□



চিত্র-2.1 ভারত প্রবেশের পূর্বে ইসলাম-সাম্রাজ্য।

ଶାନ୍ତି-ଶୂଳାଂଶୁ ସ୍ଥାପତ୍ୟ

ଶାନ୍ତି-ଶୂଳାଂଶୁ
 ସ୍ଥାପତ୍ୟ



ଚିତ୍ର-2.2 ସମ୍ପାଦିତ କାବା।

১৫৬৩ ইখলাস স্বাধীনতা

‘ইন্দো-ইসলামী’ স্থাপত্যের জন্মদহৃত আপাত-দৃষ্টিতে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমপাদ। কিন্তু সম্ভার দীপাকার পশ্চাতে সকালবেলাকার সন্তে পাকা-নোর প্রসঙ্গটা একেবারে বাদ দেওয়া চলে না। নবা-গতরা যে ভাবধারা নিয়ে এল তার জন্ম ও বিকাশের কথাটা—যার ক্ষেত্র বহির্ভারতে, তার একটা চন্দ্রক-আলোচনা বোধহয় অপরিহার্য। তাই ‘ইন্দো-ইসলামী’ মন্দির-সম্মানে হয়তো প্রথমেই কিছুটা পক্ষপাতিত্ব করতে হবে। তার হেতু—স্কুলযুগ থেকেই প্রথমোক্তের সঙ্গে আমরা কমবেশি পরিচিত, তা ধর্ম হিন্দুই হই, অথবা মুসলমানই হই। তার সঙ্গে স্বচক্ষে বা বইয়ের পাতায় দেখা অসংখ্য ছবিতে প্রাক-ইসলামী ভারতীয় স্থাপত্যের সঙ্গে আমরা মোটামুটি পরিচিত ; কিন্তু প্রাক-ভারতীয় ইসলামী স্থাপত্যের বিষয়ে আমরা খুব কমই খবর রাখি। ভারত-বন্দগয়া-সাঁচী, মথুরা-সারনাথ-নালন্দা, কলিঙ্গ-খাজুরাহো-মহাকলীপুরম আমাদের অপরিচিত নয়, যেমন অজানা জেরুসালেম, বাগদাদ, দামাস্কাস, কাইরোয়া বা কার্দো-ভার স্থাপত্য-কীর্তি। খলিফা মোয়াইয়া, আবদল-মালেক, অথবা অল-ওয়ালিদদের নাম আমরা শুনিনি, যদিও তাদের স্থাপত্য-কীর্তি শেরশাহ, আকবর বা শাহজাহার জুলনায় অর্কিগুৎকর নয়। অথচ শেষোক্ত নামগুলি শুনলেই মনে পড়ে ছাত্রজীবনে ইতিহাস বইয়ের পৃষ্ঠায় মার্জিনে-লেখা তিনটি ‘V’ এবং একটি ‘I’! তাই জন্মদহৃত থেকে ভারতপ্রবেশের কাল পর্যন্ত ইসলাম কী-ভাবে বাহ্যবিস্তার করেছে, কী তাদের জীবন-দর্শন, জীবনযাত্রার পদ্ধতি এবং বহি-ভারতে কী-জাতের স্থাপত্য-কীর্তি তারা গড়েছে সেটা সংক্ষেপে জেনে নেওয়া ভালো। শব্দমাত্র সাল-শতাব্দীতে সময়কালটা ঠিকমতো মনে দাগ কটে না বলে মনে রাখতে চেষ্টা করবো—যেখানে ঐতিহাসের উল্লেখযোগ্য সময়কালীন ঘটনার নির্দেশ রেখে যাওয়া গেল।

মানব সভ্যতার আদি যুগের ইতিহাসে ইসলামের জন্মভূমি আরবের কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল না—ছিল তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। পশ্চিমে নীল নদের উপত্যকায়, উত্তর-পূর্বে দুই নদীর অববাহিকায়, উত্তর-পশ্চিমে ভূমধ্য-সাগরের উপকূলে। ইসলাম যখন দিগ্বিজয়ে বার হল তখন তারা সম্মুখীন হল সেই সব সহস্রাব্দীর ঐতিহ্যময় সংস্কৃতির : মেসোপটেমিয়া, পারস্য, সিরিয়া, মিশর, জর্ডিয়া, তুর্কিস্থান প্রভৃতির। ইসলাম তাদের জীবনদর্শনে তথা স্থাপত্যে বৈশ্বিক পরিবর্তন আনল দু-তিন শ বছরের ভিতর। সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত এসব সম্মুখশালী অগ্রসর দেশগুলি আরবের ভৌগোলিক অস্তিত্বটা হয়তো জানতো, কিন্তু সে বিষয়ে তারা কোনো কৌতূহল দেখায়নি। ওরা শব্দ জানতো—আরব মরুভূমির এখানে-ওখানে মরুদ্যান ঘিরে বাস করে কিছু যাযাবর বেদুইন ; তাদের মধ্যে লড়াই-কাজিয়া লেগেই আছে এবং সে মন্দির মূলে নেই কোনো রাজ্যবিস্তারের স্পৃহা অথবা ধর্মপ্রচারের বাসনা—নিতান্ত কোনো মরুদ্যানের পানীয় উৎসের অধিকার, অথবা দুই-বিঘা শস্যশ্যামল ভূখণ্ড। অথচ মাত্র এক শতাব্দীর ভিতরেই সেই যাযাবর বেদুইনের দল পরস্পরের বিভেদ-ম্বন্দ্র ভুলে এককাটা হল—বেরিয়ে পড়ল মরুভূমির সীমান্ত ছেড়ে দিকে-বিদিকে। জয় করে গেল প্রতিটি রাজ্য অপ্রতিহত গতিতে। 732 খ্রীষ্টাব্দে—মাত্র একশ বছরের ভিতরেই তাদের সাম্রাজ্য পশ্চিমে পর্তুগাল ও পূর্বে ভারত সীমান্তে পৌঁছে গেল—রোমান সাম্রাজ্যও কখনো এতটা বিস্তার লাভ করেনি। এই অবিশাস্য সাফল্যের মূলে আছে একটি মাত্র শব্দ : ইসলাম।

ইসলামের জন্ম : আরবের জনৈক বণিক আব-দুল্লাহ ওনয় মহম্মদের জন্ম 570 খ্রীষ্টাব্দে, মক্কা নগরীতে। মক্কা তখন ছিল ভারত মহাসাগর থেকে ভূমধ্যসাগরের দিকে যাবার পথে একটি প্রখ্যাত

মরুপাশ্ব-নগরী। সেখানে অবস্থিত ছিল বহু প্রাচীন যুগের একটি উপাসনাগৃহ : কাবা। 'কাবা' (Kaaba) শব্দটা এসেছে গ্রীক শব্দ Kubos থেকে ; যার অর্থ 'ঘনক' এবং যা-থেকে জন্ম নিয়েছে ঘনকের ইংরাজী প্রতিশব্দ cubic। কুরাণমতে আব্রাহাম-তনয় ইস্মাইল এই কাবাটি তৈরী করিয়েছিলেন ঈশ্বরের মর্ত্যাবাস হিসাবে। সে যাই হোক, কাবা ছিল প্রাক-ইসলামী যুগে আরব বেদুইনদের পবিত্র উপাসনাগৃহ।

মহম্মদের বয়স যখন চল্লিশ তখন থেকে তিনি ধর্মপ্রচার শুরু করেন। নিজেকে তিনি ঈশ্বর অথবা ঈশ্বরের অবতারও বলেননি ; বলেছেন ঈশ্বর তাঁকে দূতরূপে নির্বাচন করেছেন মাত্র। হজরৎ মহম্মদের বক্তব্য : ঈশ্বর এক, তিনি আল্লা ; মানব মাত্রেই কর্তব্য তাঁর শরণ নেওয়া ; অন্যায় অসত্য, পাপাচরণ থেকে বিরত হয়ে আল্লাহর উপাসনা করা। অন্যত-কালের ভিতরেই—যীশুর ক্ষেত্রে যেমন হয়েছিল, মহম্মদ মক্কার ধনশালী শাসকবর্গের বিরাগভাজন হয়ে পড়েন। বাধ্য হয়ে মক্কা ত্যাগ করেন তিনি। আব্দুবকর এবং ও কয়েকজন অনুচরসহ উত্তরদিকে যাত্রা করেন। সময়টা 622 খ্রীষ্টাব্দ। এইটিই ইসলামী পঞ্জিকার আদিবিন্দু—'হিজিরা মল' [ভারতবর্ষে তখন থানেশ্বরে হর্ষ, গোড়ে শাশক রাজ্যশাসন করছেন]। প্রায় পাঁচশ' কিলোমিটার উত্তরে এসে ওরা উপনীত হলেন এক অখ্যাত মরুপাশ্ব নগরীতে : যাব্বাব। ঠিক যে স্থানটিতে তাঁর পথপ্রান্ত উঠিটি অন্তিম শয়ানে শূয়ে পড়েছিল সেই স্থানটিতেই মহম্মদ গড়ে তুললেন একটি উপাসনা-আগার। সস্তর হাত লম্বা, ষাট হাত চওড়া একটি আয়তক্ষেত্রকে ঘিরে ফেলা হল অনুচ্চ প্রাচীর দিয়ে—রোদে-শুকানো কাঁচা-ইটের গাঁথনি, মরুভূমির দূরন্ত বালুঝটিকার হাত থেকে আশ্রয়স্বার্থে। পাঁচল-ঘেরা এই চারকোণা জমির দক্ষিণদিকে—যেদিকে মক্কার কাবাকে ছেড়ে আসা হয়েছে—সেদিকে, সবার আগে গড়ে তোলা হল একটি কক্ষ। তাল-খেজুরের গুঁড়িতে খেজুর-পাতায় ছাওয়া একটি কুটির। এটি ইসলাম-স্থাপত্যের আদিমতম ইবন (উচ্চারণ ইওয়ান, iwan)। তার দক্ষিণদিক, অর্থাৎ ইবানের বাহিরের দিক অলঙ্করণ-বর্জিত। ভিতর দিকে তৈরী করা হল বড়-জাতের কুলিঙ্গির মতো একটি খিলান—ইসলামী ঐতিহ্যের প্রথম 'মহর্রাব'। তার গায়ে একটি তাঁর-চিহ্ন—মক্কার দিক-নির্দেশক : প্রথম 'কিবলা'।

এই পরিকল্পনাই মসজিদ গঠনের মূল ছন্দ। মরুপাশ্বনগরী 'যাব্বাব'-এর বর্তমান নাম 'মদিনা'।

বহির্ভাগে ইসলামী স্থাপত্যের বিবর্তন

সেখানে আছে পরগম্বরের মসজিদ, সেই 632 খ্রীষ্টাব্দ থেকে। পূর্ব বঙ্গের হিউয়েন-ৎসাঙ ভ্রমতে এসেছেন।।

মদিনার এই আদিমতম মসজিদ পরবর্তী খলিফাদের রাজত্বকালে সম্প্রসারিত ও পুনর্নির্মিত হয়ে সম্পূর্ণ নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে—কিন্তু তার পরি-কল্পনার মৌল বিন্যাস আছে অপরিবর্তিত ; আর পর্তুগাল থেকে প্রাগজ্যোতিষপত্রে সেই মৌল ছন্দটি মেনেই সহস্রাব্দীকাল ধরে লক্ষ লক্ষ মসজিদ নির্মিত হয়েছে, মক্কার কাবার অনুসরণে নয়। মাক্কানে চতুষ্কোণ বীধানো চত্বর বা 'শেহান' ; আয়তক্ষেত্রের যে-প্রান্ত মক্কার দিকে পড়ছে [ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পশ্চিমে] সেদিকে 'মহর্রাব' ; তাতে 'কিবলার' চিহ্ন। মহর্রাবের পাশে একটি উচ্চবেদী—'মিস্বর', যেখানে দাঁড়িয়ে 'ইমাম' খুৎবা পাঠ করেন। শেহানের ব্যক্তি তিন দিকে যাত্রীদের জন্য 'লিয়ান' বা অলিন্দ, কেন্দ্র-স্থলে অজুর জলাধার। এ ছাড়া 'আজান'-এর জন্য একটি মিনার বা মিনারিকা।

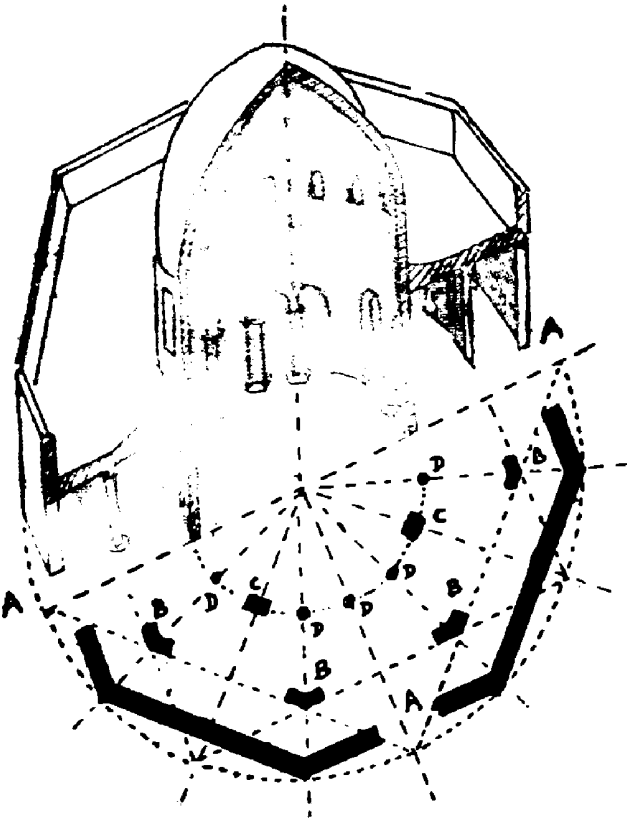
মক্কার 'কাবা' কিন্তু এ ছন্দ মেনে চলেনি। সেখানে মূল আকর্ষণ 'কাবা' আছে প্রাণের কেন্দ্রস্থলে। প্রবেশ তোরণটিও ঠিক মাক্কানে নয়। ইসলাম-ধর্মে মদিনা-মসজিদের চেয়ে মক্কার কাবার স্থান উচ্চ সন্দেহ নেই ; কিন্তু ইসলামী স্থাপত্যে মদিনা-মসজিদেরই গুরুত্ব বেশি। বোধকার তার হেতু : মদিনাই মুসলিম ধর্মের প্রথম মসজিদ—কাবার দিকে মুখ ফেরানো, যা স্বয়ং পরগম্বর কর্তৃক নির্মিত। মক্কার কাবা তো তার পূর্বযুগ থেকেই ছিল (চিত্র—2.2)।

আদি-খলিফাদের যুগ : হজরত মহম্মদের দেহান্তে তাঁর চারজন অনুচর ইসলামের নেতৃত্ব দেন। তাঁদের বলা হয়, প্রাচীনপন্থী আদি-খলিফা। তাঁরা হলেন যথাক্রমে, আব্দ বকর, ওমর, ওসমান ও আলী। চারজনেই বিচক্ষণ রণকুশলী। মহম্মদ তাঁর জীবিত-কালেই (630) মক্কা দখল করেছিলেন। চার-খলিফার যুগে একে একে পদানত হল ইরাক (637), সিরিয়া (640), মিশর (641) এবং পারস্য (650)। চার-খলিফার যুগ শেষ হল 661 খ্রীষ্টাব্দে। ততদিনে ভূমধ্যসাগরের প্রান্তে আফ্রিকায় অবস্থিত টিউনিশিয়া থেকে ভারতসীমান্তে বঙ্গ উপত্যকা পর্যন্ত ইসলাম বিস্তৃত সাম্রাজ্য বিস্তার করে ফেলেছে (চিত্র—2.1)।

পরগম্বরের দেহাবসানের অনতিকাল পরেই তাঁর বাণীগুণি আরবী ভাষায় সংকলন করা হয়। দীর্ঘ বিশ বছর ধরে পরগম্বরের মাধ্যমে প্রেরিত ঈশ্বরের

নানান নির্দেশ-ফরজ-তৃতীয় খলিফা হজরত ওস-
মানের আমলে সংকলিত হয়েছিল। সেইটিই ইস-
লামের পবিত্র কুর'ণ-গ্রন্থ। আরবী ভাষায় কুরাণ
অর্থ : আবৃত্তি।

অতীত সময়ে ইসলামের এই অভূতপূর্ব রাজ্য
কিস্তারের মূলে-আমর মনে হয়েছে-আছে তিনটি
হেতু। প্রথম কথা : ধর্মের সারসংক্ষেপ। ধর্মের মূলনীতি
মহাপাশ্চাত্য সারসংক্ষেপ বেদ-ইনদের বুদ্ধিসীমাকে অতি-
ক্রম করেনি। ইসলাম বলতে চেয়েছে : 'ঈশ্বর এক'।



চিত্র-2.3 ৩মের মসজিদ (জোব অব দ্য রক) [জেরুসালেম]।

তিনি আল্লা ; এবং নূর মহম্মদ তাঁরই প্রেরিত পুরুষ।
সহজ সরল কথা। প্রাগদত্তী সোপানদের হাজার দেব-
দেবী এবং তাদের হরেক রকম আচার-উপচারের
জটিলতা নেই ; বাইবেল-ইন খ্রীষ্টানদের মতো ধর্মবিশ্বাস
সূক্ষ্ম কচ্ছকি নেই। দ্বিতীয় কথা : প্রাকৃতিক বান-
র দ। ইসলাম বলতে চেয়েছে-ঈশ্বরের দৃষ্টিতে
প্রতিটি হুসনমান সমান প্রিয়। প্রেমী, ভাষা, অর্থ-
নৈতিক বা সামাজিক পদবী-দার কোনো ফরক নেই।
অজ্ঞাত নেই, হরিজন নেই, ইমাম-সোদার দল সে আল্লার
নেকনজরে আছেন এমন ইঙ্গিত নেই। এই প্রাকৃতিক ও
সাম্য সামাজিক বাহিনীর জীবন-ধর্মের সঙ্গে মেনে এক-

সূরে বাঁধা। তৃতীয় কথা : ইসলাম বলল-স্বর্গজাভের
সবচেয়ে সহজ পথ ইসলাম-ধর্মের প্রচারের জন্য যুদ্ধ-
ক্ষেত্রে প্রাণ দেওয়া। ফলে পাশ্চাত্য রাজন্যবর্গের
বেতনভুক সেনাদলের পক্ষে এই ধর্মীয় বাহিনীকে
প্রতিহত করা সম্ভবপর হল না। যে বাহিনীর প্রতিটি
সৈনিক 'সুইসাইড স্কায়াডে' নাম লেখাতে চায় তা
অজ্ঞেয় না হলেও দুর্জয়।

নূতন নূতন দেশের সাধারণ মানুষ এই ক্রম-অগ্রসর
বাহিনীকে উদ্ভারকারী বলে ধরে নিল। যে রাজ্যের
ঐতিহ্য যত প্রাচীন সে রাজ্যের মানুষ ততবেশি
নিপীড়িত। শাসক ও শোষিতের সম্পর্কটা ততই
দীর্ঘ, ততই তিক্ত। ইসলাম তাই দেশ, কাল, ভাষা,
জাতির গণ্ডি অতিক্রম করে দুই-তিন শতকের
ভিতরেই সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে আপন আধিপত্য
কিস্তারে সক্ষম হল।

ওমায়্যদ যুগ : পরবর্তী রাজবংশ ওমায়্যদ।
তাঁরা 661 থেকে 750 খ্রীষ্টাব্দ, প্রায় নব্বই বছর
ইসলাম জগতের নেতৃত্ব দেন। ধীরে, অতি ধীরে
ইসলামী সমাজের মধ্যে কিন্তু বিবর্তন ধারার কাজ
শুরু হয়েছে। বংশের দ্বিতীয় খলিফা আবদল
মালিক (685-705)-এর জীবন ঠিক হজরত মহম্মদ
বা তাঁর অনুচর-চতুষ্টয়ের জীবনের সঙ্গে একতান
রচনা করে না। সময়ের ব্যবধান অল্প-কিন্তু বোধ-
করি যথেষ্ট! লেলিন থেকে বেজনেভে সংক্রামণের যে
সময়ের ব্যবধান সেটুকুই। আবদল মালিক জেরু-
সালেমে অনেকগুলি মোকাম বানালেন। প্রাসাদ,
প্রমোদ-ভবন, শিকার-ভবন, ইত্যাদি। এবং মরিয়্যা
পর্বতচূড়ায় 'কুব্বে-এস-সক্কারাহ' মসজিদ-
ইংরাজীতে 'ডোম অব দ্য রক'।

খলিফা আবদল মালিক লক্ষ্য করলেন, সিরিয়া
বিজয়ের অর্ধশতাব্দী অতিক্রম করার পরেও স্থানীয়
মুসলমানেরা বছর বছর মক্কা ও মদিনায় দৌড়ায় তীর্থ
করতে। দেশ-বিদেশের মানুষের মূলে আকর্ষণ রাজ-
ধানী নয়, ঐ মক্কা ও মদিনা। ফলে মক্কা ও মদিনার
উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে-'টুরিস্ট' সব যুগেই, সব
দেশেই লক্ষ্যমাত্রী। ফলে আরবের সঙ্গে টেকা দিতে হলে
রাজধানীতে একটা ভালো জাতের ধর্মীয় আকর্ষণ
চাই। কিন্তু তাঁর রাজধানী দামাস্কাসের কোনও
ঐসাগিক ঐতিহ্য নেই। খলিফা দূনিয়ার মালিক,
কিন্তু 'দীন'-এর দাস। শরিয়তী নির্দেশ মেনে না
চললে মসজিদ-নির্মাণ হবে পণ্ডপ্রম। তাই বুদ্ধিমান
খলিফা রাজধানীর পরিবর্তে নয়া-মসজিদটি বানাতে

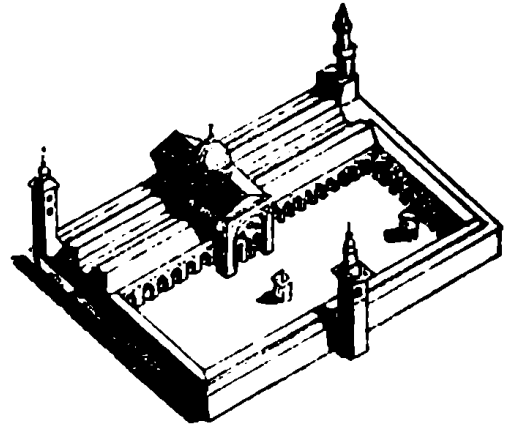
চাইলেন সামান্য কিছু দক্ষিণে : 'জেরুসালেম'-এ। এ উপাসনাগার যুগে যুগে এতবার সংস্কৃত হয়েছে যে, আদিম অবস্থায় এর কী রূপ ছিল তা অনুমান-নির্ভর। এটিকে কিন্তু আমাদের একটু খুঁটিয়ে দেখতে হবে, কারণ দিল্লীর সুজতানেরা এই স্থাপত্য-কীর্তি থেকে অনেকগুলি অনুপ্রেরণা আমদানী করেছেন এদেশে। কুৎবউদ্দীন আইবকের তৈরী আদিমতম কুওতুল মসজিদের 'মাখসুদাহ' এই মসজিদের অনুসরণে। এ-ছাড়া সৈয়দ-লোদী যুগ থেকে শের-শাহ পার হয়ে আকবর-জমানা পর্যন্ত এই মসজিদের আটকোণা প্ল্যানিং অনুসৃত হয়েছে।

স্থান-নির্বাচন নিখুঁত। জেরুসালেম যেন তিন-মাথার মোড়। পশ্চিমে কায়রো ও আলেকজেন্দ্রিয়া, দক্ষিণ-পূর্বে মক্কা-মদিনা, এবং অল্প উত্তরে ইসলাম জগতের তদানীন্তন রাজধানী দামাস্কাস। জেরুসালেমের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। মরিয়্যা পর্বত চূড়ার ঐ বিশেষ স্থানটি নানাকারণে মুসলীম তীর্থ। ওল্ড-টেম্পলমেন্ট মতে সলোমন (951 খ্রীষ্টপূর্ব) এখানেই তাঁর বিখ্যাত উপাসনাগারটি নির্মাণ করেছিলেন, যা দেখে যীশু বলেন, 'এ মন্দিরের একখানা পাথরও থাকবে না।' বাস্তবে বিধর্মীদের আক্রমণে প্রথম শতাব্দীতে সলোমনের মন্দির বিধ্বস্ত হয়েছিল। তাছাড়া কিংবদন্তী বলে, এই মরিয়্যা পর্বতচূড়া থেকেই হজরৎ মহম্মদ তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সশরীরে সন্তমসর্গে আরোহণ করেছিলেন। নিঃসন্দেহে স্থান-নির্বাচন সুযুক্তিপূর্ণ।

মূল ইমারতটি আটকোণা (চিত্র-2.3)। তার তিন দিকে তিনটি প্রবেশদ্বার (A); কিব্‌লার দিকে রুদ্ধ প্রাচীর। ইমারতের ভিতর বাহিঃস্থ অষ্টভুজের আটটি কোণার বিপরীতে আটটি স্তম্ভ (B)। তার ভিতরে আর একটি বৃত্তের বরাবরে চার কোণায় চারটি প্রায়স্তম্ভ (Pier—C চিহ্নিত) এবং তার ফাঁকে ফাঁকে তিনটি করে স্তম্ভ (D)। গোলাকারে সাজানো এই C ও D-চিহ্নিত স্তম্ভের উপর দেওয়াল গেঁথে গম্বুজটি বসানো। বর্তমানে গম্বুজ একটা নয়, দুটো—যাকে বলে 'ডাবল-ডোম' : তার মাঝখানে ফাঁক, যাতে মেরামতির প্রয়োজনে মানুষ ঢুকতে পারে। আরও লক্ষণীয়, বাহিরের প্রাচীরের সঙ্গে গম্বুজকে যুক্ত করে যে ছাদ তার ঢাল বাহিরের দিকে।

আবদল মালিকের পরবর্তী খলিফা অল-ওয়ালিদ (705-715) আর এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। জেরুসালেম নয়, দামাস্কাসেই একটি মসজিদ বানাতে হবে। মসজিদ নির্মাণ পূণ্যকাজ : তা-ছাড়া রাজ-

ধানীতে একটি উপযুক্ত জাম-ই-মসজিদ না থাকলে চলে? গড়ে উঠল বিখ্যাত দামাস্কাসের মসজিদ (চিত্র-2.4)। তার মাপ 156 মিটার x 100 মিটার। ঐতিহাসিক ফিশোল' বলছেন, হৈমরুজ্জের সৈন্যদল এ মসজিদে আগুন ধরায়। তাতে সেটি প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পরবর্তী যুগের কোনো খলিফা সেটি পুনর্নির্মাণ করেন। সুতরাং এ-ক্ষেত্রেও আদিম রূপ কী ছিল তা অনুমাননির্ভর। বর্তমান শতাব্দীর প্রথমদিকে একজন পর্যটকের আঁকা স্কেচের অনুসরণে বর্তমান অবস্থাটা দেখাবার চেষ্টা করছি। কিন্তু গম্বুজ বানতে সিম্বহস্ত ইসলামী স্থাপতি ক্রমাগত দো-চালা বানিয়ে গেছেন, এটা মানতে মন চায় না। আর একজন পণ্ডিত বলেন, "গত শতাব্দীতেও এই মসজিদ এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের কবলে পড়ে।



চিত্র-2.4 দামাস্কাসের মসজিদ।

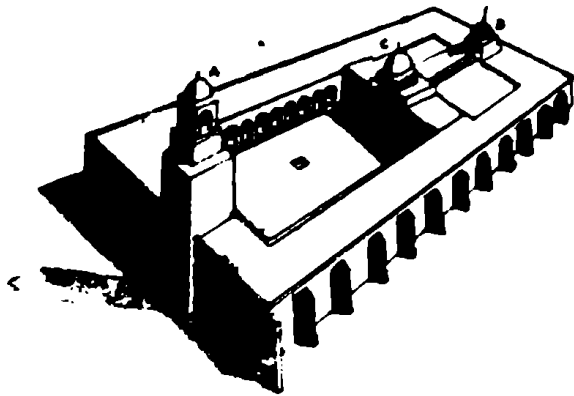
তবে কি ধরে নেব, নিতান্ত হাল-আমলের সিরিয়ান এঞ্জিনিয়ার রাফ্টার-পার্লিন সহযোগে সম্ভার কিস্তি মাং করতে চেয়েছেন?

স্কেচে দেখছি, তিনটি মিনারিকা তিন জাতের। এমনটোও আমাদের প্রত্যাশার বাইরে। কেন্দ্রস্থ মিনারিকার খানদানীবদন যেমনই হোক, দু-পাশের দুটি হওয়া উচিত ছিল—ইসলামী ঐতিহ্য একে অপরের 'জবাব'।

খলিফা এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার প্রভেদটা যে ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে একথা আগেই বলেছি। সামা ও ভ্রাতৃদের আদর্শটা জীবন-যাত্রার আর পাঁচটা ক্ষেত্র ছেড়ে ক্রমশঃ সীমিত হয়ে আসছে মসজিদের চৌহদ্দীতে। ক্লাস-বাসনের অনুসঙ্গ হিসাবেই হয়তো, এই যুগে সম্মিলিত করেছিল আরবী প্রেমের কবিতা। উমর-ইব্ন আবি রাবিয়ার প্রেমের কবিতা সুবিখ্যাত, যদিও সে-আমলের

মোহাম্মদের মতে সেগুনি 'আল্লাহর দূতীর' সবচেয়ে
 ছন্দ পাপ। মক্কা ও মদিনা সম্বন্ধে সমস্ত আরব
 সাম্রাজ্যে নৃত্য-গীত ও কবোঁর বিকাশ ঘটে।

ইতিহাস কহে, ওয়ারিয়দ বঙ্গের শেখ খলিফা
মারওয়ারের আমলে—অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি—
একটা কলহ মাথা চম্ভ দিয়ে উঠল। একপক্ষে হজরত
মহম্মদের জামাতা অলীর বংশধরেরা, এবং মহম্মদের
বুদ্রপ্রাট আশ্বাস বংশীররা অপরপক্ষে ওয়ারিরা বংশী-
ররা। অর্থাৎ কারবালা প্রান্তরের সেই বিবাদ সিদ্ধ।
[ইতোমধ্যে মহম্মদ বিন কায়েমের সিদ্ধ অভিযান
(712) সমাপ্ত]। এই সাম্প্রদায়িক বিরোধে অধিকাংশ
ওয়ারিয়দ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নিহত হলেন—শব্দমাণ
একজন প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেলেন স্পেন-অঞ্চলে।



চিহ্ন-2.5 কারবোন্সারি বস্তুজিন।

সেখানে কার্ণাভ নগরীক (চিত্র-2.1) রাজধানী করে তাঁর কণ দীর্ঘ অড়াই নতানী রাজত্ব করে। কার্ণাভাতে অতি-অপূর্ব একটি মসজিদও নির্মিত হয়। কিন্তু বে-হেতু তার প্রভাব ভারতের ইন্দো-ইসলামী সম্পর্কের প্রভাবান্বিত করান, তাই তার কথা অনুভব যেনে কান্না। অপরদিকে বিজয়ী আব্বাসিরা 751 খ্রীস্টাব্দ থেকে আরব, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, তুরস্ক ও ইরান রাজত্ব করে।

[illegible]

কেন্দ্রস্থলে সবুজ-গন্ধকওয়ালা প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ।
রোমেন-শুকানো ইটের তৈরী সে প্রাসাদের আশ্র চিহ্নগঠ
নেই।

মনস্করের পরবর্তী খলিফা অবশ্য আমাদের অপরিচিত নন ; তিনি আরবা-রজনীখাত হারুণ-অল-রাসিদ (786-809)। তিনি নাকি জন্মলেশে রাতেই বাগদাদ দেখতে বের হতেন। বাগদাদ তখন মেন শাহিবীর কেন্দ্রবিন্দু। প্রথম যুগে বস্তাকার শহরের কেন্দ্রস্থ ক্ষুদ্রতর বস্তুর ধারে ধারে—কনোট-সার্কাসের ভাষায় 'ইনার-সার্কোসে'—স্থান দেওয়া হত বিশিষ্ট বিদেশী বণিকদের। কিন্তু ক্রমশঃ নিরাপত্তার প্রয়োজনে শহরকে ঢেলে সাজাতে হল। বিদেশী বণিকদের পাশ্চশালাগুদলি অপসারিত হল বহুতর বস্তুর বাহিরের দিকে। রথচক্রের নেমিতে গাঁথা স্পোকের মতো এক-এক রাজপথে এক-এক জাতির দোকান—আর্মেনিয়ার কাপেট, সিরিয়ার কাচের পানপাত্র, দামাস্কাসের রেশম, হিন্দুস্থান থেকে আমদানীকরা হাতীর দাঁত, কপূর, চন্দনকাঠ, দারুচিনি-এলাচ-জব্বাণ এমন কি গুড়ারের খজা পর্যন্ত। পথের বাঁকে বাঁকে জুড়ার আচ্ছা। সেখানে রাতারাতি আমীর আর ফকির কিস্মতের হাত-ফিরি করে। তারই ফাঁকে ফাঁকে সরাইখানা, হরেক-কিসিমের সিরাজী, আর নৃত্যগীতের আসরে খাপসদরং সাকী। খলিফারা আসরফি আর দামাস্কাসী ছোরা মাজার বেঁধে যেখানে জ্বালাতে হয় দেশবিদেশের বণিক, আসব পরিবেশন-কারিগীর কানে কানে বলে,

সকল ভোরি সন্ধ্যা দেখনে কো আতি হয় সাঁকি,
 ওয়ার্না পানে কো তো মান্নখানা ওর ভি হায়!
 পহলে তো শেখনে আঁকে দেখা ইমর-উমর
 ফির সব কুখান্দি দাখিল-ই-মান্নখানা হো গয়ে।*

এই অঞ্চলেই—নবম শতাব্দীতে, আফ্রিকার উত্তরে
 ভিউটনিসিরাতে গড়ে উঠেছিল আর একটি সমৃদ্ধিশালী
 বাণিজ্যকেন্দ্র। কুম্ভানাগরের উপর দিয়ে যে-সব বাণিজ্য-
 করী পাল কুলে হিন্দুস্থান আর স্পেনের মধ্যে বাতা-
 রাত করে তারা দৃ-দৃষ্ট জিকিরে নেয় কারোয়ারী নগরে
 (চিত্র 2.1)। এখানে যে বস জিপটি গড়ে তোলা হল

• ଯେଉଁର ସମ୍ପର୍କ ସାମାଜିକ ସେବାରେ ଥିବେ ସେହି ସେବାରେ ସାମିଲ ହେବେ ।
ଆମ ସମାଜର ଯେଉଁ ଲୋକେ କୃଷିରେ ନିଜର ଆଜିବ କଟି ଲଗାନ୍ତି,
ସବୁ ସମାଜିକ ସେବାରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
କୃଷିରେ ଲାଗିଥିବା ଲୋକେ ସେବାରେ ସାମିଲ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

তার প্ল্যানিং-এ জেরুসালেম আর দামাস্কাসের মসজিদের প্রভাব অনস্বীকার্য। এ-ক্ষেত্রে (চিত্র-2.5) মিহ্রাবের বিপরীতে অবস্থিত প্রধান তোরণটির উপরেই নির্মিত হল আজান-মিনারিকা (A)। প্রবেশ-তোরণটির অবস্থান কিন্তু কেন্দ্রীয় নয়। একপাশ ঘেঁষে। মিহ্রাবের উপরের গম্বুজটি অসমাক ফলের মতো পল-তোলা (B); যদিও তার সম্মুখস্থ ইবানের গম্বুজ ঐ জাতের অলঙ্করণ নেই (C)। এখানে দেখছি, ঐ B-চিহ্নিত গম্বুজে নেই আশ্চর্য পরীক্ষাটি করা হয়েছে—যা নিয়ে দেশে দেশে, যুগে যুগে স্থপতিবিদেরা ভেবেছেন : কী করে চতুষ্কোণ কক্ষের উপর গোলাকৃতি গম্বুজকে বসানো যায়। স্থাপত্যের এই চিরন্তন সমস্যাটি বারে বারে সমাধান করা হয়েছে, তা-সত্ত্বেও নতুন ক্ষেত্রে সে সমস্যা আবার নতুন করে সমাধান করতে হয়েছে। ভারতবর্ষে ইসলামী স্থাপত্যে এই সমস্যা—চতুষ্কোণ কক্ষের উপর গোলাকৃতি গম্বুজ বানানোর কায়দাটা, ঠরোদশ শতাব্দী থেকে নানাভাবে সমাধান করা হয়েছে। ইলফুর্মিসের সমাধিসৌধে ‘স্কুইণ্ট’-পদ্ধতিতে হিন্দু কারিগরেরা যেভাবে সে সমস্যার সমাধান করলেন তা একটা আবিষ্কারই। কারণ স্থানীয় কারিগর, যারা হিন্দু অথবা সদ্য ধর্মান্তরিত মুসলমান, তারা এমন জিনিস জ্ঞানত না। কী-ভাবে এই সমাধান করা গেল সে-সব কথা পরে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে; আপাতত শুধু উল্লেখ করে যাই—এই পদ্ধতিটি কিন্তু ইসলাম আবিষ্কার করেনি, অনুকরণ করেছে মাত্র। বাইজেন্টিনাম স্থাপত্য থেকে। তারাও মূল আবিষ্কারক নয়—এর আদি জনক ইরানের ‘সাসানিয়ান’রা। পারস্যের ফিরোজাবাদে চতুষ্কোণ কক্ষের চারপ্রান্তে ‘স্কুইণ্ট’-পদ্ধতিতে গড়া খিলানের উপর গোলাকৃতি গম্বুজ গড়া হয়েছিল তৃতীয় শতাব্দীতে। আশ্চর্যের কথা, তার কিছুটা আজও টিকে আছে। ইলফুর্মিসের ঠরোদশ শতাব্দীতে গড়া প্রথম ভারতীয় গম্বুজটি নির্মিত।

আর একটি প্রশ্ন : সামনের দিকে A-চিহ্নিত মিনারিকাটি এমন এক-পেলে করে বানানো হল কেন? ইসলামী স্থাপত্যের অস্কেলা-অঙ্গ প্রতিসাম্য বা Symmetry-কে এভাবে উপেক্ষা করা হল কী কারণে? একটাই সম্ভাব্য জবাব—ঠিক সম্মুখে নির্মিত হলে মিনারিকাটি মিহ্রাবের উপরে গম্বুজকে অড়াল করে রাখে। সমাধানটিকে খুব ভালো জাতের কলডে পারি না। একই সময় ইলেকা-ইসলামী স্থপতি অসক ভাঙ্গোভাবে সমাধান করেছেন—আজা-মিনারী আজ-ই-

মসজিদে, দু-প্রান্তে দুটি মিনারিকা তুলে।

এই আত্মসাদ-যুগে রাজধানী বাগদাদের সামান্য উত্তরে টাইগ্রিস নদীতীরে সাকরুর হয়ে পড়েছিল একটি অভ্যন্তরীণ মসজিদ। সেখানকার কিছু স্থাপত্যকীর্তি আজও বর্তমান। এখানকার মসজিদে পরেটেড-অর্ডার যেখানকার স্থাপত্যের ইতিহাসে এক নতুন আবিষ্কার। মিনারাটি কিন্তু অতীতপূর্ব নয়। তাকে মেসোপটেমিয়ার আদিম যুগের ‘জিগ্‌স্‌রাক’-এর ছাপ। এই যুগে মুসলিম স্থাপত্যে একটি নতুন ধারার যুগ হল—অলঙ্করণ স্বকম্পার। ইতিপূর্বে মুসলিম স্থাপত্যের অলঙ্করণে পল্লবকী বা মনুস্কর্মীত যুব বোশ দেখা যেত না। কুরান-সারিফের একটি শ্লোকের এমন ব্যাখ্যা করা হয়েছিল যাতে মনে হয়—মুসলমান স্থাপত্যে জীবন্ত কোনো কিছু খোদিত বা আঁকিত করা গাঁহিত কাজ। এই আত্মসাদ-যুগেই দেখা গেল ব্যাপকভাবে এ-মতকে অস্বীকার করা হয়েছে। কল-লতা-পাতার সঙ্গে মসজিদে, মক্কার এক অন্যান্য স্থাপত্যকীর্তিতে খোদাই করা হয়েছে পল্লবকী এমন কি মনুস্কর্মীও। এই অলঙ্করণ ছিল তিন জাতের—প্রথমতঃ, গ্রীক ও রোমান নকশার প্রাদুর্ভাবের স্মরণ বা পঙ্খের কাজ। দ্বিতীয়তঃ, জ্যামিতিক নকশা—সচরাচর সরল-ত্রৈক্য সমাহার, চতুর্ভুজ, ষড়ভুজ ও অষ্টভুজের অঙ্কিত সূক্ষ্ম ক্রিয়াল। ভারতবর্ষে যার চরম পরিণতি মুগল জমানায়—ফতেপুর-সিরি এবং ইতম-উদ্‌দৌলার। তৃতীয়তঃ, পল্লবজাতীয় উপর আঁকা (ফ্রেস্কো এবং টেম্পারার উভয় পদ্ধতিতেই) কল-লতা-পাতার অসরল-রেখার আঁকান। এ-কম ও চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে ফতেপুর-সিরিতে, ইতম-উদ্‌দৌলার এক শাহজাহা-জমানিতে।

আত্মসাদ কণীর হারুদ-জান-রসিব এবং তার পুত্র মামুদ-এর অয়লে বাগদাদ ও সামাররার জ্ঞান-চর্চা প্রভুতভাবে বিকশিত হয়। বাগদাদের House of Wisdom বা প্রজ্ঞা-সৌধে হুনাইন ইবন ইসরা-এর তত্ত্বাবধানে প্রাচীন যুগের অনেক অনেক পণ্ডিতের রচনা আরবিক ভাষায় অনূদিত হল : অরিস্টোডল, এ্যারিস্টটল, থালেন, ইউক্লিড, টলেমি, প্লেনেট। আরবী দার্শনিক কিশ প্রায় আড়ম্বরণেই রচনা করলেন, সত্য বিবরণে : সম্প্রতি, রসায়ন, জ্যোতিষ, গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থ, দর্শন প্রভৃতি। পরসের রূপী বা রাতীর (বর্তমান ডেহরান) জবি-কনী রহজেল্ দারীর ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উপর প্রায় বেঞ্চনীটি রচনা রচনা করেন—আরব, পরস্য ও

হিন্দুস্থানের ভেখগদের বিভিন্ন পন্থার সন্মিলন সমন্বয়ে। অষ্টম শতাব্দীতে এক যুগান্তকারী আবিষ্কারে এই জ্ঞানচর্চার হোমোনিতে যেন নতুন সমিধ সংযুক্ত হল : কাগজের আবিষ্কার। শতাব্দী না ঘুরতেই সমরকন্দ, সামাররা, এবং বাগদাদে তৈরী হল কাগজ তৈরীর কারখানা—আম্বাসীদ-জগতের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে জ্ঞানচর্চার ফলশ্রুতি প্রসারিত হতে থাকে কাগজের বৃক্কে কালির আঁচে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারে, বাণিজ্যের সুবন্দোবস্তে প্রভূত উন্নতিসাধন করা সত্ত্বেও আম্বাসীদদের সাম্রাজ্য কী রাজনৈতিক, কী সামরিক, কোন দিক থেকেই পূর্ব-বর্তী ওমায়্যদদের মতো দৃঢ়তা পায়নি। তার মূল হেতু—আম্বাসীদ খলিফার দল বংশানুক্রমিকভাবে একটি চ্যান্টার শিকার হয়েছিলেন : পূর্বযুগের ওমায়্যদ আরব অমাত্যদের তাঁরা বিশ্বাসভাজন মনে করতে পারেননি—তাঁদের অনমনীয় দৃঢ়তার জন্য। পরিবর্তে খলিফার দল ক্রমাগত নিভর করে গেছেন অনারবী তুর্কীদের উপর। আরবীয় পান্ডিতেরা প্রায় বাধ্য হয়েই ক্রমশঃ রাজ্যশাসন ও সেনাবাহিনীর দায়-দায়িত্ব ত্যাগ করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার দিকে ঝুঁকলেন। হিন্দু-স্থানের ইতিহাসে সমান্তরাল ঘটনার কথা মনে পড়বে ঔরঙ্গজেবের হিন্দুবিদ্বেষের ফলাফলে। যে আকবরের সাম্রাজ্যে স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন মানসিংহ, চৌডরমল্ল, রাজা বীরবল, তাঁরই অধস্তন পুরুষ হিন্দুবিদ্বেষের বিষবাম্পকে মূলধন করে ধরিয়ে দিলেন মৃগল-সাম্রাজ্যের দৃঢ় বনিয়াদ। এক্ষেত্রেও ঘটনা প্রায় একই খাতে বহেছে। হারুন-আল-রাসিদ স্বয়ং তাঁর বাহিনীর সৈন্যপত্রের দায়িত্ব দিলেন তুরস্কের এক নও-জোয়ান লিপাহ-সালারকে, উপযুক্ত প্রবীণ আরবীয় সেনাপতি-দের উপেক্ষা করে। তাঁর পুত্র নিজ দেহরক্ষীবাহিনী নির্বাচন করলেন শূদ্ধমাত্র তুর্কী সৈন্য থেকে। আরব-তুর্কী সম্পর্ক ক্রমশঃ এমন তিক্ত হয়ে পড়ল যে, খলিফা আরবী-সংস্কারিষ্ঠ বাগদাদ ত্যাগ করে রাজধানী সিরিয়ে নিয়ে গেলেন সামাররায়। সেখানে নির্মিত হল এক প্রকাণ্ড কিল্লা ও প্রাসাদ—বাল্কুবারা প্রাসাদ, দৈর্ঘ্যে বা এক কিলোমিটার! এই প্রাসাদের ধ্বংসাত্মক অঙ্ক ও অমাদের কিম্বদন্তি উদ্ভব করে।

নবম-শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে অধিকাংশ আম্বাসীদ খলিফা ক্রমেই হয়ে পড়েন তুর্কী জঙ্গীরাবাদের হাতের কীড়নকর্মত। একে একে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকার হস্তান্তরিত হতে থাকে প্রাদেশিক তুর্কী শাসনকর্তা বা মনসবদারের হস্তে। সিরিয় হস্তচ্যুত হল ৪৬৪ খ্রিস্টাব্দে। সেখানে ফাতিমা-বংশীয় সুল-

তানেরা কায়রো নগরীকে রাজধানী হিসাবে নির্বাচন করে। সেখানে গড়ে উঠতে থাকে নব নব স্থাপত্য-কীর্তি। তারপর সেখানে আসে মামলুকেরা।

সেলজুক ও অটোমান তুর্কী সুলতান : একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে সেলজুক তুর্কী শাসন-কর্তারা হয়ে পড়েন আম্বাসীদ খলিফার ‘দক্ষিণহস্ত’ ; শতাব্দী না ঘুরতেই সেই দক্ষিণহস্ত খলিফার মন্ডতি দেহভারমুগ্ধ করে উঠে বসল তত্ত্ব তাউসে! আরব-পারস্য-আফগানিস্থান অঞ্চলের বিস্তৃত সাম্রাজ্যে তারাই হয়ে গেল স্বাধীন সুলতান। এর পরেই বাইজেন্টাইনের সঙ্গে এদের সংঘর্ষ বেধে গেল, ফলে পুনরায় জেরু-সালেম দখল করল তুর্কীরা। মালিক শাহ (1072-1092)-এর আমলে, তাঁর কুটকৌশলী উজীর নিজাম-উল-মুল্ক-এর দৌলতে সেলজুকী তুর্করা ক্ষমতার ভূগঙ্গাশীর্ষে ওঠে। ভারতবর্ষে তখন একচ্ছত্র কেউ নেই—কিন্তু হিন্দুস্থানের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন কীর্তিমান নৃপতি স্ব স্ব রাজ্যে সুশাসন বজায় রেখেছেন, গড়ে তুলছেন আঞ্চলিক শৈলীতে হিন্দু-স্থাপত্য : দাক্ষিণাত্যে রাজেন্দ্র চোল (1070-1122), কল্যাণে ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য (1076-1127), পূর্বাতে অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গা (1076-1148), কাশ্মীরে হর্ষ (1089-1101) এবং খাজুরাহোতে কীর্তিবর্মন চন্দেলরাজ (আঃ 1098)।

এরপরেই সেলজুকী তুর্ক-দের সৌভাগ্য-গগনে সূর্যদেব পশ্চিমে ঢললেন। দুর্ভাগ্য এল তিন দিক থেকে। এক : ক্রুসেড! খ্রীষ্টান জগৎ জেরুসালেম উদ্ধার করবার প্রতিজ্ঞায় একে একে অভিযান পাঠায়। ইউরোপীয় সভ্যতা এই সূত্রে পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ইসলামের এক একতাবন্ধ প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠে। দুই : বাইজেন্টাইন রাজক্ষমতার প্রত্যাঘাত। এবং তিন : মধ্যচীনের মঙ্গোলিয়া-অঞ্চল থেকে এক নয়া-বিভীষকা : চৌলিগস্থান! সেলজুকী সৌভাগ্যসূর্য অতি দ্রুত ঢলে পড়লেন পশ্চিমাকাশে।

সেলজুকী-তুর্কী আমলে স্থাপত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য মসজিদের সঙ্গে অঙ্গাগীভাবে মাদ্রাসার আবির্ভাব। আগেই বলেছি, পূর্ববর্তী যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা প্রভূতভাবে প্রসারলাভ করেছিল—তারই প্রতিফলনে ধর্ম ও জ্ঞানচর্চা সম্পৃক্ত হল। মসজিদের মিত্রাণের দুইপাশে সংযুক্ত হল মাদ্রাসা। মূলতঃ সিরিয়তী শিক্ষার আয়োজনে, কিন্তু এ সঙ্গে চলল জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানান শাখা-প্রশাখায় চর্চা। আমরা পরবর্তীকালে দেখব এই চিন্তাপাথার, আলোউদ্দীন

খিলজীর আমলে হিন্দুস্থানের ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যকে কী-ভাবে প্রভাবিত করেছে। সেখানেও মাদ্রাসা সংযুক্ত হল মসজিদের অঙ্গ হিসাবে। তার পূর্ণ পরিণতি ফিরোজশাহ তুগলকের আমলে। সে যাই হোক, সেলজুকী-স্থাপত্যের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল মসজিদ সংলগ্ন—‘মাখসুদরাহ’। সুলতান বংশীয়দের জন্য মসজিদ লিয়ানে নির্দেশিত হল একটি পৃথক স্থান—প্রভূতভাবে অলঙ্কৃত খিলান-সম্বলিত এই নূতন যোজনাটি শব্দে মসজিদ প্ল্যানিং—এই নয়, মুসলিম ঐতিহ্যের সাম্যবাদী ধ্যান-ধারণাতেও আনল একটা বিরাট পরিবর্তন। এ-ক্ষেত্রেও আমরা দেখব, ঐ দ্বিতীয় ধারণাটি থেকেই ভারতবর্ষের প্রথম সুলতান কুৎব-উদ্দীন আইবক তাঁর কুওতুল মসজিদে কী-ভাবে ‘মাখসুদরাহ’-র অনুকরণ করেছেন। তৃতীয়তঃ, এই সঙ্গে এল মসজিদ-সংলগ্ন গোলাকৃতি মিনারিকা, যাকে ইংরেজিতে বলে ‘মিনারেট’। তাছাড়া প্রবেশ-তোরণে ফুল-লতা-পাতা নকশার খাঁজে খাঁজে আরবী ভাষায় লেখা কুরান-সরিফের বাণী—যা নাকি আমরা যথেষ্ট দেখতে পাই ভারতবর্ষে, একেবারে আদিম যুগ থেকে শেষ যুগে—কুৎব-এ, আজমীরের আড়াই-দিন-কা ঝোপড়া থেকে তাজমহলে—তাও এঁদেরই প্রথম প্রবর্তন।

চতুর্দশ-শতাব্দীর উষা মুহূর্ত থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ইসলাম-জগতের নেতৃত্ব দেয় অটোমান তুর্স্ক জাতীয়রা। ইস্তাম্বুলে (কন্সতান্তিনোপলের ইসলামী নাম) এদের জমানাতে অনেকগুলি মসজিদ নির্মিত হয়। একটা কথা মনে রাখা দরকার—ভারত-বর্ষে সাধারণ মানুষের ধারণা যে, ইসলাম ধর্মে মনুষ্য মূর্তি আঁকা বা খোদাই করা নিষিদ্ধ। এজন্য ভারত-বর্ষে ইসলামী স্থাপত্যে মনুষ্যমূর্তি বিরল। জাহাঙ্গীরের প্রচেষ্টায় মিনিয়েচার পোয়েট যথেষ্ট প্রসারলাভ করে—হাতীর দাঁতের উপর সৌখীন প্রতি-কৃতিতে দেখেছি—আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহাঁ, আলমগীর এবং নূরজাহাঁ, মমতাজ প্রভৃতির মূখ্যকৃতি—পোয়েট। ফতেপুর-সিক্রিতে—পরে আমরা দেখব—বিস্মলী আকবর বাদশাহ্ সিয়ামণ্ডলীদের ঐ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাবটি স্বীকার করেননি। বিভিন্ন ইমারতে তিনি মানুষের ছবি আঁকিয়েছিলেন—অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার, এমন কি প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনীর। রাধাকৃষ্ণের যুগলচিহ্ন সমেত। কিন্তু আকবর বাদশাহ্ তো নিতান্ত ব্যতিক্রম। সাধারণ-ভাবে বলা যায়—মুসলিম-স্থাপত্যে ইনসানিয়াৎ-প্রতি-বিস্মিত প্রাচীরচিত্র বিলুপ্ত না-হয়। হজরত

মহম্মদ রশদুলের আলোকে তো নিতান্ত ‘চ্যাব’।

অথচ অটোমান-তুর্কীদের জমানার অনেক-অনেক তস্বির ইরান-তুরানে আঁকা হয়েছে, মসজিদ-প্রাচীরেও, স্বয়ং পয়গম্বরের কীর্তি-কাহিনী বিজ্ঞাপিত করেও। কৌতূহলী পাঠককে অনুরোধ করব রিডার্স ডাইজেষ্ট প্রকাশিত ‘The Last Two Million Years’-গ্রন্থের 151 পৃষ্ঠাটি দেখতে। মসজিদ-প্রাচীরে অঙ্কিত সে তস্বিরে মহম্মদের জীবনের একটি ঘটনা বিচলিত। ঘটনা মজার। পয়গম্বরের বিজ্ঞবাস্তবক অমৃতবাণী সহ্য করতে না পেরে বিক্ষুব্ধ-মজাবাসী তাঁকে পাথর ছুঁড়ে মারছে। হজরতের একান্ত-অনুচর আব্দ-বকর তাড়ের শান্ত করতে চাইছেন। এ-চিত্রে শিল্পী হজরত মহম্মদের দেহাকৃতি এঁকেছেন, মুখটুকু বদে। হয় কুরান-সরিফের নির্দেশ স্মরণ করে, অথবা সাহস না পেয়ে। তাঁর মাথার পিছনে একটি অগ্নিশিখা—অনেকটা হিন্দু বা খ্রীষ্টান-শৈলীতে দেবতা বা সাধু-সন্তদের মাথার পিছনে যেমন ‘হ্যালো’ বা ‘জ্যোতিঃ-ছটা’ দেখা যায়। ভারতবর্ষে মুসলিম শিল্পে এই ‘হ্যালো’ এসেছে শাহজাহাঁনী জমানায়।

স্মরণ্য—এ চিত্রটি যখন পারস্যদেশে আঁকা হচ্ছিল, ততদিনে হিন্দুস্থানে সুলতান শেরশাহ শূর সাসারামে তাঁর সমাধিসৌধ সমাপ্ত করেছেন, দিল্লীতে পুরানা-কিল্লা শেষ করেছেন, ‘পঞ্জাব-বঙ্গাল বাদশাহী-সড়ক’ (গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড)-এর ধারে ধারে নির্মাণ করিয়েছেন গণনাভীত সরাইখানা। তার একান্তিতও কিন্তু—পয়গম্বর দূর-অস্ত—স্বয়ং শেরশাহ শূরের একখানাও ছবি নেই!

বহির্ভারত পরিক্রমা শেষ করে ‘সর্বতীর্থ-সার’ স্বদেশে ফিরে আসার সময় হয়েছে।

অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের একটা মৌল পার্থক্য অনস্বীকার্য। অন্যান্য রাজ্য—এমন কি অতি প্রাচীনকালের ঐতিহ্যবাহী মিশর, পারস্য, তুরান প্রভৃতিও ইসলামকে গ্রহণ করল সম্পূর্ণভাবে। তারা ধর্মান্তরিত হয়ে গেল। নূতন ধর্ম, নূতন আদর্শ, নূতন জীবনবেদকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করল। ভারত-বর্ষ তা করল না। আপন জ্ঞানকরসে জীর্ণ করে যে-ভাবে সে ইতিপূর্বে গ্রীক-শক-পহলব-মুচি সংস্কৃতি গ্রহণ করেছিল সেভাবেই ইসলামকে আত্মসাৎ করতে চাইল। গ্রীক-শক-মুচিরা এখানে অস্ত্রবাসীর মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করেছে—সাম্রাজ্য বিস্তার করে স্থায়ী আসন পাতেনি। এই সহজ সরল সত্যটা ভারত-বর্ষ বুঝল না। চার্বকের নিরীশ্বরবাদিতা, বৃশ্বেশ্বরের অপৌরুষেয়তার বিষয়ে, ইশ্বরের বিবরণে, নীর-

বাক্যে সহ্য করে সে ভেবেছে ইসলামকেও একই-
ভাবে মেনে নেওয়া যাবে। তা গেল না। যাওয়ার
কথাও নয়। অপরের বিশ্বাস আধা-আধি মেনে নিয়ে,
মানিয়ে নিয়ে, মাঝপথে রফা করার উপাদান যে
আমলগুদদের ভিতর নেই, এটা চূড়ান্তভাবে বোঝা
গেল আকবর-বাদশাহর 'দীন-ইলাহী' ধর্মপ্রবর্তনের
কর্তৃত্ব। তাই কাম্বোজ থেকে দাক্ষিণাত্য, প্রাগ্-
জ্যোতিষপুর থেকে ম্বারকা পদানত করেও ইসলাম
ছয় শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষে রুয়ে গেল সংখ্যালঘুরূপে।
সংখ্যাগরিষ্ঠ দল জিজ্ঞাসা কর জুগিয়েও আঁকড়ে রইল
তার ধর্মবিশ্বাস। শাসনদণ্ড হস্তান্তরিত হবার পর
সেই সংখ্যালঘু প্রাক্তন-শাসক দল নিরাপত্তার আশ্রয়
খুঁজল 'সেপারেটে ইলেকটরেটে'; পরে 'পাকিস্তান'-এ।
রাজনীতির ক্ষেত্রে 'ইন্দো' আর 'ইসলাম' কোনদিনই
হাতে হাত মেলাতে পারেনি।

কিন্তু রাজনীতিই তো মানবসভ্যতার সবটুকু নয়।
ধর্মের জিগির তুলে বন্ধন মানুষজনকে খোঁপিয়ে তোলা
হয়নি তখন তারা—এ হিন্দু ও মুসলমান নিরস্ত্র গ্রাম-
বাসীরা। শহরবাসীরা, পাশাপাশি বাস করেছে। পর-
স্পরের সুখে আনন্দ করেছে, দুঃখে কঁদেছে। ক্ষেত্রে-
ঝামাঝে, কলকরখানায় তারা ক্রমশঃ বৃদ্ধিতে শিখেছে
হিন্দু ও মুসলমান দুটো আলাদা জাত নয়, এক জাত।
জাতের রকম ফের হয়েছে—আসিতদল ও নাসিতদল।
একপক্ষে বিত্তশালী হিন্দু-মুসলমান জমিদার-জোত-
দার-মিলমালিক, অপরপক্ষে হিন্দু-মুসলমান ভূমিহীন

কৃষক, বর্গাদার, শ্রমিক! তাই জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে,
শিল্পের ক্ষেত্রে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মিলন সার্থক
হওয়ায় কোনো বাধা হয়নি। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়
মিঞা-কি-মল্‌হার গেয়ে বিভোর হন, জয়নাল আবেদিন
দুর্গা প্রতিমার স্কেচ এঁকে বৃন্দ হন। নৃত্য, সঙ্গীত,
চিত্রশিল্প, লোক-গাথা, লোকসঙ্গীতে ইন্দো-ইসলামী
ভাবধারা মিলে মিশে একাকার হতে পেরেছে।

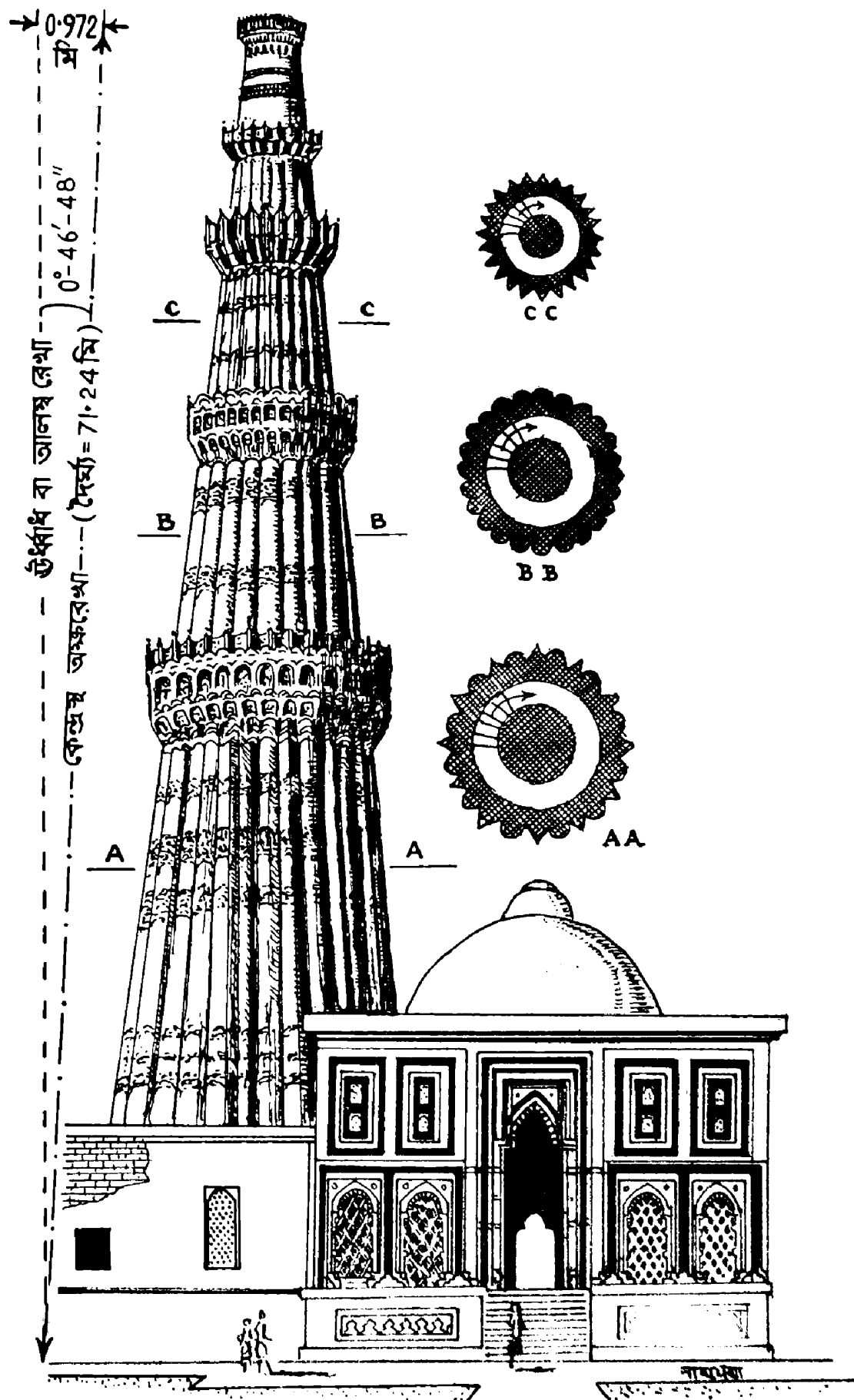
স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও তাই। এখানেও প্রথম দিকে—
আমরা ক্রমশঃ দেখব্—মিল হয়নি, গোঁজামিল হয়েছে।
চম্কে উঠবেন না যদি বলি—ইসলামী ইতিহাসের
প্রথম তিনশ বছর, আকবরী-জমানাতক্, 'ইন্দো-
ইসলামী স্থাপত্য' বলে কিছু ছিল না।

মহা মহা পণ্ডিতরা বলে গেছেন জানি—কিন্তু
কুৎব মিনার থেকে হুমায়ূনের সমাধির কোনো একটিও
কি 'ইন্দো-ইসলামী' স্থাপত্যের? তাহলে তো ব্রিস্টলে
রাজা রামমোহনের সমাধিকে বলতে হয় 'ব্রিটিশ-টুন্স' ;
'রাডিসার্ড' কিপলিংকে ভারতীয় লেখক! কুৎবউদ্দীন
আইবক থেকে হুমায়ূনতক্ ভারত-ভূখণ্ডে 'ইসলামী
স্থাপত্য' গড়ে গেছেন মাত্র। সে-অর্থে ইন্দো-ইসলামী
স্থাপত্যের জন্ম আগ্রা-কিল্লায়—জাহাঙ্গীর মহালে।

না, অতটা গোঁড়া দৃষ্টি দিয়ে দেখলে চলবে না।
ভারত-ভূখণ্ডে ইসলামী স্থাপত্যকেও আমাদের
আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করে দেখতে হবে। আর তাহলে
আমাদের প্রথম পাঠ :

দাস-বংশ।

□



৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫

চিত্র 3.1 কুম্ভ মিনার ও আশাই দরওয়াজা।

দিল্লী-প্রক্টেবোর ভৌগোলিক অবস্থান

(চিত্র-3.2)

ক্রম	বিষয়	ডাউনিং	ক্রম	বিষয়	ডাউনিং
1 ..	অশোক শিলালিপি	G-9	31 ..	পুৱানা কিল্লা	F-6
2 ..	অশোক স্তম্ভ	F-7	32 ..	বদরপুরে সরাই	J-12
3 ..	আজমীরী দরওয়াজা	E-4	33 ..	বড়া-গম্বুজ	E-7
4 ..	আদিলাবাদ	H-12	34 ..	বল্কনের সমাধি	D-11
5 ..	আধম খাঁ মক্‌বারা	C-11	35 ..	বাগ্-ই-আলম-কা গম্বুজ	D-9
6 ..	আরব সরাই	F-7	36 ..	বুহলদল লোদীর সমাধি	F-10
7 ..	ওয়ারিজাবাদ	E-1	37 ..	বেগমপুরী মস্‌জিদ	D-10
8 ..	কদম সরীফ	D-4	38 ..	ভুলি-ভাটিয়ারী-কা মহল	D-5
9 ..	কাবুলী দরওয়াজা	F-5	39 ..	মথ্ মস্‌জিদ	E-9
10 ..	কালে খাঁ-কা গম্বুজ	E-8	40 ..	মালচা-মহল	C-6
11 ..	কাশ্মীরী দরওয়াজা	E-3	41 ..	মুহম্মদ শাহ্ সৈয়দ মক্‌বারা ..	E-7
12 ..	কুওতুল-ইসলাম মস্‌জিদ	D-11	42 ..	মন্তর-মন্তর	E-5
13 ..	কুংব মিনার	D-11	43 ..	যোগমায়া মন্দির	C-11
14 ..	কোটলা ফিরোজশাহ্	F-5	44 ..	রৌশনারা বাগিচা	C-3
15 ..	কোটলা ম্‌বারকপুর	E-8	45 ..	লাল্-কিল্লা	E-4
16 ..	খান্-ই-খানান্ মক্‌বারা	F-7	46 ..	লালকোট	C-11
17 ..	খান্-ই-জাহান তিলাখানী	F-7	47 ..	লাল গম্বুজ	E-10
18 ..	খিড়কি মস্‌জিদ	E-10	48 ..	লোদী বাগিচা	E-7
19 ..	গিয়াস্‌উদ্দীন মক্‌বারা	G-12	49 ..	শালিমার বাগ	A-1
20 ..	জাম-ই-মস্‌জিদ	E-4	50 ..	সিপাহী-বিদ্রোহ স্মারক	D-3
21 ..	জামালি-কামালী মস্‌জিদ	D-11	51 ..	শীশগঞ্জ গুহ্মবারা	E-4
22 ..	জাহাজ মহল	C-12	52 ..	শেখ্ আল্লাউদ্দীন মক্‌বারা ..	E-10
23 ..	তুগল্‌কাবাদ	G-11	53 ..	সফরজাত্ মক্‌বারা	D-7
24 ..	তুর্কমান দরওয়াজা	E-4	54 ..	সব্জ্ বজ্জ	E-7
25 ..	দরগা কুংব-সাহিব	C-11	55 ..	সিরি	E-10
26 ..	দরগা খাঁ মক্‌বারা	E-8	56 ..	সুন্‌হারি মস্‌জিদ	E-4
27 ..	দিল্লী দরওয়াজা	F-4	57 ..	সুলতান ঘরী	A-11
28 ..	নজফ্ খাঁর কবর	E-8	58 ..	স্মক্ কুন্ড	H-13
29 ..	নাই-কা-কোট	H-12	59 ..	হুসায়নের সমাধি	F-7
30 ..	নিজামউদ্দীন আউলিয়া	F-7	60 ..	খোস-ই-খাশ্	D-9

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দাস-বংশ

উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা	সময়কাল (খ্রিঃ)	বর্ষ
মহম্মদ বিন-কাসেমের সিন্ধু বিজয় (ডামবোর)	..	711
স্বত্বগাঁনের শেষ বার ভারত লুণ্ঠন	..	987
হিন্দু রাজা জয়পাল পরাজিত	..	1001
তরাই-এর বংশে দিল্লী-অঞ্চলে হিন্দু রাজত্বের অবসান	..	1192
কুৎবউদ্দীন আইবক কর্তৃক লাটকোটে 'দাস-বংশের' প্রতিষ্ঠা	..	1198
কুৎব মিনারের বনিয়াদ, কুওওতুল মসজিদ ও আড়াই-দিন-কা কোপড়া (আজমীর) শেষে কুৎবউদ্দীনের মৃত্যু	..	1210
ইল্‌তুৎমিশের অভিযেক	..	1211
কুৎব মিনারের অধিকাংশ কাজ, মসজিদ সম্প্রসারণ, নাসিরউদ্দীনের মৃত্যু (বাঙলায়) ও সুলতান ঘারী নির্মাণ	..	1229
ইল্‌তুৎমিশের মৃত্যু (কুৎব-চত্বরে সমাধি)	..	1236
সুলতান রেজিয়ার মৃত্যু (সমাধি অর্চিহিত)	..	1240
সুলতান নাসিরউদ্দীন (মৃঃ 1266) ও বল্লবনের (মৃঃ 1287) কোনো উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য কীর্তি নাই		
বংশের শেষ সুলতান কাইম্বরের মৃত্যু		1290

দাস-বংশ শব্দটা ব্যবহারের জন্য একটা কৈফিয়ৎ অপরিহার্য হয়ে পড়ছে। শব্দটা ইদানিংকালে ঐতিহাসিকেরা পছন্দ করেন না। তা সে বাই হোক, ঐ শব্দটা থেকে প্রথমই আমাদের সংস্কারমুক্ত হয়ে নিতে হবে—না হলে এই রাজবংশের ইতিহাস তথা স্থাপত্য-চিন্তার গভীরে আমরা প্রবেশ করতে পারব না। 'দাস' বা 'স্লেভ' কথাটা শুনলেই আমাদের মনে যে ধারণা হয়—বাহিনীরতীর ইসলাম-সাম্রাজ্যের, বিশেষ করে তুর্কীদের 'দাস' সে অর্থবহ নয়। 'দাস' বললেই আমাদের মনে পড়ে মিশরের পিরামিড তৈরির কাজে শ্রমিকদের অবর্ণনীয় দুর্দশা, স্পার্টাকাসের বিদ্রোহ, আঙ্কল টমস্ কেরিক। খেয়াল করে দেখি না—সে পরিবেশে আইবক বা ইল্‌তুৎমিস্ নিতান্তই অসম্ভব। তুর্কী দাস-প্রথা সম্পূর্ণ অনজ্ঞাতের প্রতিষ্ঠান।

তার স্বরূপটা প্রণিধান করতে হলে ঐতিহাসিক টেনেনবী অনুসরণে এ-প্রথার মূলে প্রবেশ করতে হবে। এই দাস-প্রথা ওদের সমাজব্যবস্থায় অনুপ্রবেশ করেছে প্রাগদূর্তী বেদুইন-জীবন থেকে। আরব-ভূখণ্ডে তৃণ-ভূমিতে সমাজজীবন ছিল ত্রিস্তরে : সপরিবার ভ্রাম্যমাণ বেদুইন, তার মেঘঘুৎ এবং তার কুকুর-বাহিনী ; চাষের জমি নয়, উট-গরু-ভেড়াই সেই অনুর্বর তৃণখণ্ডে একমাত্র সম্পদ, আর তাদের তদারকী, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজন সর্বাশিক্ষিত প্রভুভক্ত একদল অশ্ব ও কুকুর। আরব মরুভূমির বাহিরে এসে, সাম্রাজ্য গড়ে, প্রাসাদ বানিয়ে বিলাস-বাসনে আকণ্ঠ নিমগ্ন হয়েও ওদের সেই ত্রিস্তর-বিশিষ্ট আদিম মানসিকতাটা হারিয়ে যায়নি। বেদুইন-সদার বর্তমানে কিল্লাদার, জায়গীরদার, অথবা প্রাদেশিক শাসনকর্তা ; গবাদি পশু প্রজাসাধারণে

রূপান্তরিত। গরু দিত দুধ, মেঘ দিত পশম ; এরা দেয় শস্য, ফসল, শ্রম। কিন্তু সেই প্রভুভক্ত কুকুর ? যারা ভাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে এই রূপান্তরিত মেঘমুখকে, রক্ষা করবে নেকড়ের আক্রমণ থেকে ? ঐ 'ওয়াচ-ডগ'-এর শূন্যস্থান পূরণ করতে গড়ে উঠল দাস-প্রথা। তাদের হতে হবে প্রভুভক্ত, শক্তিশালী, জাতিব-অনুভূতি-সর্বস্ব এবং চিন্তাশক্তি-বিরহিত।

তুর্কী দাস-প্রথা একটি অভূতপূর্ব প্রতিষ্ঠান—প্রাগবর্তী মিশর, মেসোপটেমিয়া, রোমের অনুকরণে নয়। এই প্রতিষ্ঠান থেকেই নির্বাচিত হত সম্রাটের সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ধাপের জঙ্গী মানুষ : সেনাপতি, মন্ত্রী, প্রাদেশিক শাসনকর্তা এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে রাষ্ট্রনায়ক ! অশ্চর্যের কথা, এদের অধিকাংশই জন্মসূত্রে মুসলমান নয় ! তুর্কী দেশের অধিকাংশ দাসই খ্রীষ্টান পিতামাতার সন্তান। বিদেশ জয় করার সময় তাদের ধরে আনা হত—নিতান্ত বাল্যকালে। পশ্চিম সীমান্ত থেকে দলে দলে ঐ শিশুদের, বালকদের, আমদানী করা হত ইস্তাম্বুলের ক্রীতদাস হাটে। সেখানে তাদের বাছাই করা হত—দু-দলে বিভক্ত করা হত। একদল সুদর্শন, কিন্তু দুর্বল, তারা ইশুক্ অগলান। নিম্নশ্রেণীর। তাদের প্রেরণ করা হত একটি বিশেষ শিক্ষায়তনে। শিক্ষান্তে তারা নিয়োজিত হত বাদশাহের খিদমৎগার-বাহিনীতে। দ্বিতীয় দল, তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ : আজেম্ অগলান। তারা সুদর্শন না হলেও চলবে, ভারসহ বা শক্তিশালী হওয়া চাই। এদের প্রেরণ করা হত, প্রথম পর্যায়ে বিভিন্ন আমীর-মালিকদের হেপাজতে রক্ষিত ক্রীতদাসশালায়। সেখানে শিক্ষা সমাপনান্তে তারা এসে পরীক্ষা দিত, এবং প্রবেশ করত বাদশাহী বাহিনীতে। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে ফিরে যেত শিক্ষায়তনে। আরও কঠোর পরিশ্রমের জন্য উপযুক্ত হতে।

সেখানে তারা দুই ধারায় শিক্ষিত হত। প্রথম : কার্যিক শ্রম, কষ্টসহিষ্ণুতা, সাহসিকতা, অশ্বচালনা, অস্ত্রশিক্ষা প্রভৃতি। এদিক থেকে স্পার্টা অথবা তার পরবর্তী রোমান গ্ল্যাডিয়েটোরের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি তুলনীয়। দ্বিতীয় : শরিয়তী শিক্ষা। শিক্ষার্থীর মন থেকে তার বাল্য-কৈশোরের যাবতীয় স্মৃতি ও ঐতিহ্য সমূলে উৎপাটিত করে ফেলা হত। এ-দিক থেকে ব্যবস্থাটি ছিল অভূতপূর্ব। মিশর-গ্রীস-রোম নয়, এবার সাদৃশ্য পাওয়া যাবে হিটলারের 'গেস্টাপো' বাহিনীতে। যাকে বলে 'মগজ ধোলাই' !

শিক্ষান্তে ওরা সেনাবাহিনীতে নতুন শিক্ষার আসরে আসত। তাদের বলে : জেনিসারি। এখানেও

তাদের সেভাবে সময় বিদ্যায় শিক্ষিত করে তোলা হত তার সঙ্গে স্পার্টার শিক্ষায়তনের সাদৃশ্য আছে। ওফার এই স্পার্টার বীরবন্দ ছিল মৃত, তার সম্পত্তির অধিকারী হতে পারত। জেনিসারিরা দাস, ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার বাঞ্ছত।

এই ব্যবস্থাপনার একটিই উদ্দেশ্য দিক-উন্নতির পথ উন্মুক্ত। একমাত্র যোগ্যতার মাপকাঠিতে প্রতিটি সৈনিকের বিচার হত। জেনিসারিরা সেনাপতি হতে পারত, শাসনকর্তা হতে পারত, এমন কি মালিকের কন্যাকে বিবাহ করে তার পরিবারভূক্ত নিকট আত্মীয় হওয়াও অসম্ভব নয়।

সে-সব ক্ষেত্রে ঐ ক্রীতদাস বা জেনিসারি মালিকের দক্ষিণ হস্ত হয়ে উঠত। মালিকের দেহান্তে তার সন্তান নয়, ক্রীতদাসই হয়ে বেত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

'দাস'-বংশের প্রতিষ্ঠাতা কুবুউদ্দীন আইবক সেই ধারারই এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

হিন্দুস্থানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ইসলামের সম্পর্কে প্রথম আসে অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে। 711-12 খ্রীষ্টাব্দে, ওমানিয়দ যুগেই ইরাকের শাসনকর্তা হজ্জাদের নৌ-সেনাপতি মহম্মদ-বিন-কাশেম নিম্ন সিন্ধ উপত্যকা জয় করে একটি ক্ষুদ্র আরব উপনিবেশ স্থাপন করেন। করাচির প্রায় পঁয়ষাট কিলোমিটার পূর্বে 'ভামবোর' নামক স্থানে মাটি খুঁড়ে সেই আদিম আরব উপনিবেশের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। তার ভিতর একটি মসজিদকেই বলা যায় বৃহত্তর ভারত উপমহাদেশে প্রাচীনতম ইসলামী স্থাপত্যকীর্তি। মূলতান অঞ্চল 713 খ্রীষ্টাব্দে ইসলাম-অভিযানের শিকার হয়। প্রথম যুগে কিন্তু বিজয়ী-বিজিতের সম্পর্কটা অত তিক্ত ছিল না। হিন্দু ও মুসলমান ঐ মূলতান ও সিন্ধু-অঞ্চলে নির্বিবাদে বসবাস করেছে, একে অপরের চিন্তা-ভাবনার হাতফির করেছে¹। আরবীরা হিন্দুস্থান থেকে শিখেছে দর্শন, ভেষজ বিজ্ঞান, জ্যোতিষ এবং অক্ষশাস্ত্র। এমন কি বাণিজ্যের সড়ক বেয়ে সে জ্ঞান-গরিমা যুরোপ-খণ্ডে নিয়ে গেছে। 'এক' থেকে 'নয়' সংখ্যা ও শূন্যের ব্যবহার এই আমলেই আরব শিখেছে ভারতের কাছে, শিখিয়েছে যুরোপকে। উত্তরণের স্বীকৃতি রয়ে গেছে এই সংখ্যাতত্ত্বের নামের ভিতরই : 'রকম-ই-হিন্দু' : হিন্দুস্থানের সংখ্যা। আমীর খসরোর জবানীতে জানতে পারি, আরবী জ্যোতিষ-শাস্ত্রবিদ আব্দু মশার কাশীতে এসে দীর্ঘ দশ বছর ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান শিক্ষা করে যান।

হকীমে কদলে গেল সবুজশীনের ভরত আকস্মিকের (১৪৬-১৪৭) সমসাময়িক, এক আরও বেশি করে তাঁর পুত্র সুলতান মাহমুদের উপস্থিতি ভারত-মুদ্রণে। দ্বিতীয় মহম্মদের জন্মস্মৃতি (১০০১) ভারতীয় হিন্দু রাজা জয়পাল পরাজিত হলেন; তার পশ্চিম বছর পরে মৃত্যু হইল সোমনাথের মন্দির। তবু উত্তর-পশ্চিম বর্ষে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে তখনও ইসলাম ছাড়াপাত করেনি। আরও প্রায় দু'শ বছর পরে গজনির সুলতান মহম্মদ বিন সাম-বার সহজ পাকিস্তান মহম্মদ ঘোরী, এলেন উপস্থিতি ভারত-মুদ্রণের বাসনা নিয়ে; ১১৭২ খ্রিষ্টাব্দে তবাই-এর বৃষ্ণ থেকে দিল্লী অঞ্চলে হিন্দু রাজত্বের অবসান হন কল ধরে নেওয়া যায়। মহম্মদ ঘোরীর হাতে চোহান বংশীয় পৃথ্বীরাজ-বার রাজধানী ছিল দিল্লীর লাট-কোট অঞ্চলে—পরাজিত ও নিহত হলেন।

ভারত জয় করে মহম্মদ ঘোরী কোনো উত্তরাধিকারী নির্বাচন করে যাননি। ১২১০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বন্ধন নিহত হলেন তখন সে অধিকার বর্তালো কুৎব-উদ্দীন আইবকের উপর। কুৎবউদ্দীনের জীবন কেন উপন্যাসের উপাদানে গল্প। তুর্কীস্থানের একজন সামান্য ক্রীতদাস হিসাবে তাঁর জন্ম। অতি শৈশবে তাঁকে নবমীর মূল্যে বিক্রি করেছিলেন নিশাপুরের এক কল্যাণীয়েব। তিনিই 'আজম-আগলান' ঐ ক্রীতদাস কলকটিকে লেখাপড়া শেখান, অশ্বারোহণ ও যুদ্ধবিদ্যার শিক্ষিত করে তোলেন। নিত্যন্ত ব্যব্যয়িক মনোবৃত্তি থেকে—অর্থাৎ বিক্রয়ের সময় ক্রীতদাসটি কতটা বৃদ্ধি মূল্যে আহরণে সমর্থ হয়। কুৎব-এর জীবনে কিন্তু সেই বাণিজ্যিক-প্রয়োজনে-লব্ধ শিক্ষা প্রচলিত কার্যকরী হইছিল। গজনির বাদশাহে বোদিন কল্যাণীয়েব ঐ ক্রীতদাস তরুণটিকে নিলামে তুললেন তখন আকর্ষণ হলেন স্বয়ং মহম্মদ ঘোরী। প্রথম বৃষ্ণে মহম্মদ ঘোরী বৃদ্ধটিকে নিয়োগ করলেন 'আমীর-ই-আমর' হিসাবে—অর্থাৎ অশ্বারোহণের প্রধান কর্মকর্তারূপে। করণ ছিল। কুৎব ছিলেন অতি দক্ষ অশ্বারোহী। চিনতে ভুল হয়নি মহম্মদ ঘোরীর। সেই সামান্য চাকুরী মূল্যবান করেই কুৎবউদ্দীন এই দুনিয়ার দুর্ভিক্ষ-সাতের কোণা শ্রদ্ধ করেন, আর শেষ অঙ্কে দেখে গেল তিনি দিল্লীস্থির!

লাহোর থেকে গজনিতে প্রত্যাবর্তনের পথে দিল্লীস্থির মহম্মদ ঘোরী গুপ্তচরদের ছুরিকার প্রাণ হারালেন। কেউ বলে 'খোবর' সম্প্রদায়ের মুসলমান, কেউ বলে 'ইসমাইলী' সম্প্রদায়ের কোনো গুপ্তচর-কের কাজ। রাজপুত্র গজা, যা একজন সমসাময়িক

মুসলমান ঐতিহাসিকও মনে নিয়েছেন শোনার অন্ত কথা : পৃথ্বীরাজ পরাজিত ও বন্দী হবার পর নাকি নিহত হননি! বোধকরি ঐ কালের রাজ্যটিকে গজনির চিহ্নিরাখানার স্থাপন করার বাসনা ছিল মহম্মদ ঘোরীর অন্তরে—তাই তাকে অশ্ব করে নিয়ে চলেছিলেন জিন্দা। লাহোর থেকে গজনি ফেরার পথে একদিন ঐ অশ্ব পৃথ্বীরাজ সুযোগমত স্বহস্তে মহম্মদ ঘোরীর বক্ষপঞ্জরে তাঁর ছুরিকাটি আমূল বিদ্ধ করে দেন। সে যাই হোক, মৃত সুলতানের মরদেহ গজনি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হল। সেখানেই সমাধিস্থ হল।

ঘোরীর কোনো পুত্রসন্তান ছিল না। কিয়মানের শাসনকর্তা তাজউদ্দীন মালিকউজ্জ্ব উঠে বসলেন গজনির মসনদে এবং কুৎব পেলেন ভারত শাসনের অধিকার। অচিরেই দুজনের সংঘাত বাধল এবং সে গৃহযুদ্ধে বিজয়ী হলেন কুৎবউদ্দীন। উঠে বসলেন গজনির মসনদে। মালিকউজ্জ্ব নির্বাসিত হলেন। কিন্তু হঠাৎ সুলতান কুৎব বিলাসের স্রোতে গা ভাসালেন। গজনির আমীর মালিকেরা বিরক্ত হয়ে নির্বাসিত মালিকউজ্জ্বকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করল। কুৎব-এর বাদশাহী খোয়াব ভাঙতে না ভাঙতেই দেখা গেল তিনি পরাজিত। কুৎব তৎক্ষণাৎ গজনির মসনদের আশা ত্যাগ করে রওনা দিলেন হিন্দুস্থানের দিকে। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন, কুৎবউদ্দীন আইবক ঐ কয় মাসের বৃদ্ধবকী না করলে—মাদিরা ও নর্তকীদের নিয়ে আবুহোসেনী খোয়াবে না মাতলে হয়তো ভারত-বর্ষের ইতিহাস ভিন্ন খাতে বইত! সেই ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই গজনি ও দিল্লী একসঙ্গে বাঁধা পড়ে যেত—যা হইছিল, ক্ষণিকের জন্য হলেও, আরও প্রায় তিনশ বছর পরে—বাবুর বাদশাহের আমলে, এবং আকবরশাহী জমানাতে।

কুৎবউদ্দীন আইবক দিল্লীতে এসে নতুন রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা করলেন—যার প্রচলিত নাম 'দাস-বংশ', যদিও ইদানিংকালের ঐতিহাসিকেরা কথাটা পছন্দ করেন না। রাজধানী স্থাপন করলেন লাটকোট-এ, অর্থাৎ পূর্ববৃষ্ণের চোহান বংশীয় পৃথ্বীরাজের দুর্গ এলাকায়। বর্তমানে জায়গাটার নাম কুৎব-চহর (চিত্র-৩.৩)। সেখানে পূর্ববৃষ্ণ থেকে ছিল একটি দুর্গ, প্রাসাদ, মন্দির ও নগরীর নানান জাতের সৌধ। কুৎবউদ্দীন আইবক সবপ্রথমেই নির্মাণ করতে চাইলেন একটি জাম-ই-মসজিদ। তার নাম : 'কুওও-তুল মসজিদ'। ভিত্তি স্থাপন করলেন একটি বিজয় মিনারের—যা হতে চলেছে বিশ্বের বিস্ময় : কুৎব মিনার।

শেষ করে যেতে পারলেন না। খুব সম্ভবত শব্দ বনিয়াদটুকুই গড়া হয়েছিল তাঁর অমলে। মাত্র চার বছর সুলতানী করে তাঁর দেহাবসান ঘটল। নিতান্ত আকস্মিকভাবে। কথায় বলে—সাপড়ে সাতদিন, আর সাপের একদিন। কুৎব ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ সাপুড়ে—না, বক্ষপদ সরীসৃপ নয়। তাঁর বাহাদুরী ছিল চতুষ্পদ অশ্ব নিয়ে। আগেই কল্যাঁছ, অশ্বারোহণ এবং অশ্বপরিচালনায় আইবকের ছিল অসামান্য দক্ষতা। বস্তুত তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরুরই করেছিলেন ‘আমীর-ই-আবদুর’ হিসাবে অশ্বাবাসের অধ্যক্ষ-রূপে। সেই অশ্বের লাগাম ধরেই মৃত্যু বরণ করলেন দিল্লীশ্বর।

লাহোরের ময়দানে আয়োজন করা হয়েছে ‘চৌগান-এর। চৌগান ঘোড়ার পিঠে চড়ে হাঁকি খেলা—অর্থাৎ পোলো। সুলতান তদানীন্তন ভারতের শ্রেষ্ঠ চৌগান-খেলায়াড়। লাহোরের খেলার সুলতান কয়টা গোল দির্ঘেছিলেন ইতিহাসে লেখা নেই, শব্দ লেখা আছে দুরন্ত তুরগের সওয়ার তুর্কী-সুলতান যখন ছিটকে পড়লেন মাটিতে তখন খেলা বন্ধ হয়ে যায়। আমীর মালিকেরা ছুটে গিয়ে দেখে বিচূর্ণ-শির সুলতান ইহলোক ত্যাগ করেছেন।

দীক্ষিজয়ী গ্রীকবীর সেকেন্দার শাহ্ যখন মৃত্যুশয্যায় তখন তাঁর অনুচরেরা বুকুে পড়ে শেষ প্রশ্ন পেশ করেছিল : মহামহিম সম্রাট ! বলে যান, এই বিশাল গ্রীক সাম্রাজ্য কে আপনার উত্তরাধিকারী?

জীবনের শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে সকৌতুকে এই কৌতূহলের শেষ শাস্বত জবাব দিয়ে গিয়েছিলেন ম্যাসিডোনিয়ান আলেকজান্দার : যার ক্ষমতা সব চেয়ে বেশি !

কুৎবউদ্দীন আইবককে সে প্রশ্নটা পেশ করার সুযোগ পায়নি আমীর মালিকের দল। অশ্বপৃষ্ঠ থেকে পতনমাত্র মৃত্যু হয়েছে। কুৎব পুত্রহীন। তাঁর একটি কন্যা আছে। সে বিবাহিতও বটে। কিন্তু জামাতা থাকে দূর বাদাউনে। তাকে ডেকে এনে তত্ত-তাউসে বসানোর সময় কই? ওয়রাহের দল হাতের কাছে উপস্থিত আরাম বক্সকে বসিয়ে দিল শূন্য মস-নদে। ‘আরাম বক্স’ লোকটা যে কে, এ নিয়ে ঐতি-হাসিকেরা অনেক জল ঝোলা করেছেন। কেউ বলেন, কুৎব-এর দস্তক পুত্র, কেউ জারজপুত্র, কেউ বলেন ভাই। সে যাই হোক, আরাম ডায় প্রকৃত পরিচয়টা অচিরেই জানিয়ে দিল : সে সার্থকসামা! অর্থাৎ অপদার্থ।

তিত-খিরত আমীর মালিকেরা অতঃপর আহনান

জানিলো কুৎব-এর জামাতা শামসউদ্দীন ইল্-তুং-মিস্কে। শব্দ-এর মতো তারও বিচিত্র জীবন—সে-ও নিজ ভাগ্য নিয়ে গড়েছে। আহনানমাত্র বাদাউনের জারগীরদার ইল্-তুং-মিস্ সৈন্য এসে উপস্থিত হল দিল্লীতে। অনুরাসে পরাজিত করল অরার বক্সকে। উঠে বসল শব্দ-এর মশায়ের শূন্য তত্ত-তাউসে। অর-মের কী হল, সেটা লেখা বাহুল্য।

ইল্-তুং-মিসেরও জন্ম ঠাঁতদাস হিসাবে, তুর্কী-স্থানে। শোনা যায়, অশ্ব-দেখতে ছিলেন তিনি। বৃষ্টিদীপ্ত, গৌরবান্বিত, সুগঠিত দেহাবসর। কুৎব-উদ্দীন দাস-হাটে তাকে ভ্রম করেন, প্রথমে সহচর ও পরে বাদাউনের শাসনভার অর্পণ করেন। অরও পরে তাঁর রূপ ও গুণে মুগ্ধ হয়ে কন্যাটিকে তাঁরই হস্তে সমর্পণ করেন।

ইল্-তুং-মিস্ দীর্ঘ ছাশ্বশ বছর সুলতানী করেন। অত্যন্ত দক্ষ শাসক। সমসাময়িক ইতিহাসকার বল-ছেন,^১ তাঁর মতো ধার্মিক, ধনালু, জ্ঞানী ও ধার্মিক-দের-প্রতি-সম্মতিভিত্তি কোনো মহমানুষ কোনদিন সিংহাসনে বসিনি।

ইল্-তুং-মিসের সাম্রাজ্য-বিস্তার, শাসন-সুবন্দা, রাজস্ব-আদায় পর্ষাতি ইত্যাদি আশ্রয়ের এভিরায়ের বাইরে। তাঁর স্থাপত্যকীর্তি মূলতঃ দ্বিধায়ার বিস্তার। এক : কুৎবউল-ইসলাম মসজিদের সম্প্রসারণ এবং নিজ সমাধি। দুই : বিশ্বের বিশ্বস্ত কুৎব মিনার। এবং তিন : সুলতান ঘরানী সমাধিসৌধ। প্রথমটির উপাদান হিন্দু-জৈন মন্দিরের বন্যসম্পদ, দ্বিতীয়টির দাচী ও পাষাণ এবং শেষোক্তটির উপাদান বৃক্ষ সুলতানের পাক্কির-অশ্রু ও শোণিতে গাঁথা!

উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সুলতান ইল্-তুং-মিসের কোনো দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। মহম্মদ জোরীর মত তিনি নিঃসন্তান নন, কুৎবউদ্দীনের মতো অশ্রুতক নন। তাঁর চার ছেলে, দুই মেয়ে। তার ভিতর সুলতান শ্যাবিকভাকেই নিবাচন করেছিলেন কোন্টপুত্র শাহজাদা নাসিরউদ্দীনকে। পিতার উপযুক্ত পুত্র—বেশন সুদর্শন, ভেমানি দক্ষ। পিতার আদেশে সে একের পর এক দীক্ষিজয় করেছে। অবশেষে সুলতান তাকে পাঠিয়েছেন বঙ্গদেশে, প্রাদেশিক সুবোধ্যরূপে কিছুটা খামনের অভিজ্ঞতা সঞ্চার করতে। সেখানেই দুর্ভাগ্যবশত, এক বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে শাহজাদা নিহত হলেন। তাঁর প্রাণহীন দেহ নীত হল দিল্লীতে।

বৃক্ষ ইল্-তুং-মিস্ জীবনে প্রথম বঙ্গদেশে পেলেন। তৈরী করলেন সেই পুত্রের জন্য এক সমাধিসৌধ—সুলতান ঘরানী। তারও-তুৎ-না না হলোও দিল্লীতে

প্রথম উল্লেখযোগ্য সমাধিসৌধ। অসামান্য তার গঠন-চাতুৰ্য। যা ভবিষ্যতেও কেউ অনুকরণ করেনি।

এরপর ইল্‌ডুখিস্ বা করলেন, তা কেউ আশা করেনি—তিনি নিজের উত্তরাধিকারী হিসাবে নির্বাচন করে গেলেন—অপর তিন পুত্রের মধ্যে কাউকে নয়, তার জ্যেষ্ঠা কন্যা, অবিবাহিতা কিশোরী মেয়ে রেজিয়া বেগমকে। সুলতানের দেহান্তে কিন্তু আমীর মালিকেরা সম্মুখের সেই নির্বাচন খোলা মনে গ্রহণ করতে পারল না। ঠের কসবে দিল্লীর তক্ত-তাউসে? ঠেরা আল্লাহ! তারা রেজিয়া-বিবিকে দূরে হঠিয়ে মসনদে এনে বসালো সুলতানের অবশিষ্ট পুত্রগণের সর্বজ্যেষ্ঠ রুক্নুদ্দীন ফিরোজশাহকে। দুর্ভাগ্য ভ্রমের এবং রুক্নুদ্দীনের—লোকটা অপদার্থ। কিলাসী, অস্থিরমতি এবং সুলতানী দায়িত্ব নেবার ক্ষমতারহিত। দেওয়ান-ই-আমে লোকটা নিত্য গর-হাজির—সুবো-সাম দাখিল-ই-হারেম হয়ে দিন কাটায়। তার উপর ঐ পুত্র-সুলতানকে শিখণ্ডী করে তার গর্ভধারিণী—শাহ্‌ তুখান (সে কিন্তু রুক্নুদ্দীনের কন্যা নয়, একজন তুর্কী গৃহসেবিকামাত্র, যাকে সুলতান ইল্‌ডুখিস্ পরে বিবাহ করেছিলেন) বোরখার অন্তরাল থেকে যথেষ্ট অপশাসন শুরু করল। এতদিনে আমীর মালিকেরা তাদের ভুল বুঝতে পারল—উপলব্ধি করল, কেন বেহেশত-আসীন সুলতান ঠেরকে বসাতে চেয়েছিলেন তক্ত-তাউসে।

রুক্নুদ্দীনকে অপসারণ করে তারা এবার রেজিয়া সুলতানকে এনে বসালো দিল্লীর মসনদে। রেজিয়া যে এ-কাজে সম্পূর্ণ উপযুক্ত আঁচরেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী অমাত্য-কর্স রুক্নুদ্দীন নামে এক শিপাহীসাজারের নেতৃত্বে অত্যাচার করল দিল্লী কিল্লা। বোরখার অন্তরাল থেকে নয়, অঙ্গুষ্ঠে রেজিয়া স্বয়ং এ বিদ্রোহ দমন করেন। বিদ্রোহী বাহিনী অনতিদিল্লীতে তার বশ্যতা মেনে নেয়। রুক্নুদ্দীন কোনোক্রমে প্রাণ নিয়ে পালায়। ঐতিহাসিক মীনহাজ-উস-সিরাজ কলছেন, লক্ষ্মণাবতী থেকে দেবগিরি, বাতলা থেকে সিন্ধু প্রদেশ-কটি প্রদেশ-লিক শাসনকর্তা রেজিয়া সুলতানের বশ্যতা অকুণ্ঠ-চিত্তে মেনে নিয়েছিলেন।

সুলতানা রেজিয়ার শাসনকাল কিন্তু অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত—মাত্র চার বছরের। আর এই কেন্দ্রীয়ক ঘটনার গভীরে আছে সেই চিরাবর্তনিক বস্তুটি : মহম্মদ।

সুলতানা রেজিয়া পূর্ণসৌন্দর্য, সুন্দরী, সুভদ্রা এবং অবিবাহিতা। রাজসভার অনেকানেক উচ্চ-

ভিসাধীর মনোগত বাসনা ঐ পাণিপীড়নের। একাধিক কারণে—যদিও সবচেয়ে বড় হেতু : দিল্লীর তক্ত-সুলেমান! রেজিয়া যদি তার ভিতর সবচেয়ে শক্তিমান রাজপুরুষটিকে সময় থাকতে বিবাহ করত তাহলে দিল্লীর তক্ত-তাউসে-আসীন এই একমাত্র ভারতীয় মহিলাটির শাসনকাল কুইন ভিক্টোরিয়ার মতো হয়তো দীর্ঘস্থায়ী হত। হতে পারল না, তার হেতু, আগেই বলেছি সেই চিরমহাস্যবৃত্ত বস্তুটির প্রভাবে : প্রেম।

সুলতানা যাকে হৃদয় দিলেন, তার নাম জালাল-উদ্দীন মাকুং। লোকটা আদৌ খানদানী নয়—ক্বীত-দাস। তার চেয়েও বড় কথা লোকটা আরবী, ইরানী, ইম্পাহানী, তুর্কী বা আফগানী নয়—এশিয়াখণ্ডের মানু্যই নয়, সে কাফ্রি। আর্বির্সিনিয়ান। আনার-কলির বরণ নিয়ে অসংখ্য আমীরজাদা দেওয়ান-ই-খাশ্‌ আলো করে থাকে প্রতিদিন—আর সুলতানার নজর হল কি না এক আবলুশ কালো কাফ্রির উপর। ‘ছিঃ!’ বললে যেন তৃপ্ত হয় না, বলতে ইচ্ছে করে : ‘তোবা! তোবা!’

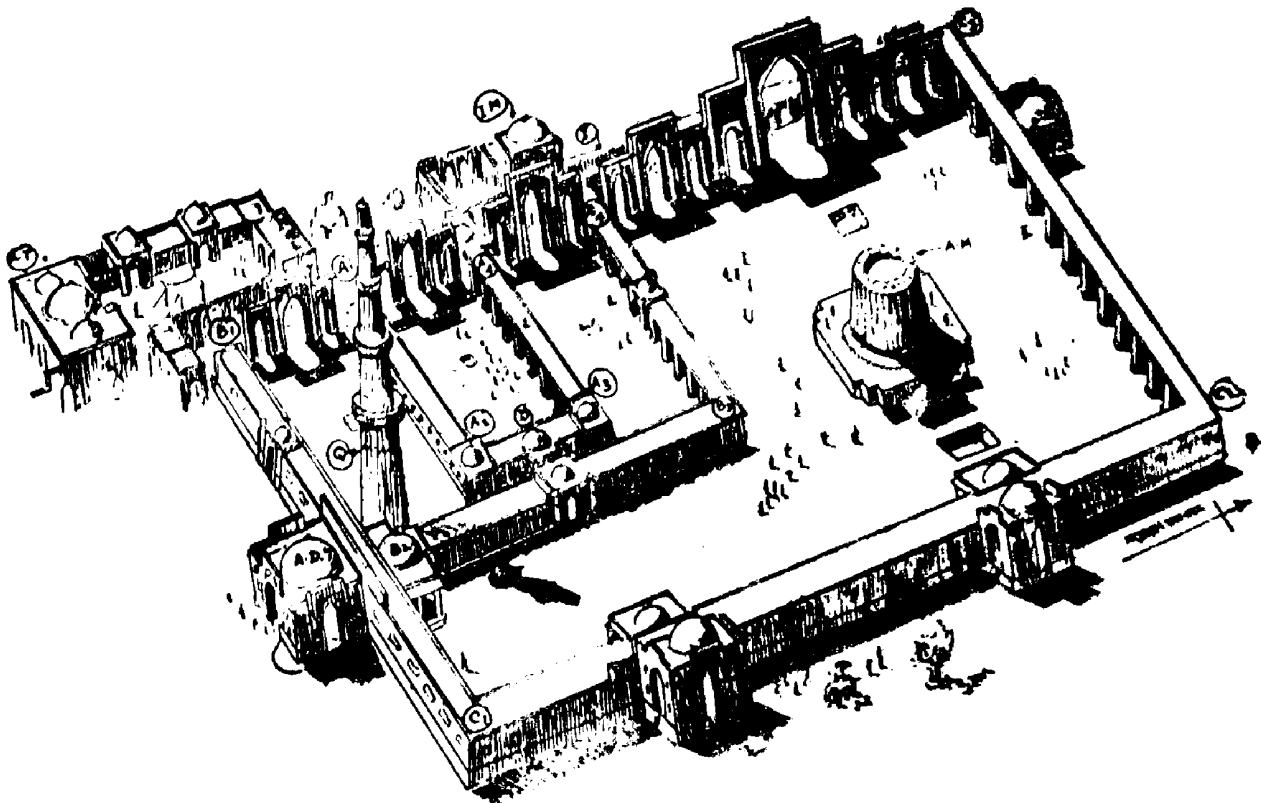
অবশ্য প্রকাশ্যে সুলতানা কোনো বেচাল ব্যবহার করেছেন এমন অভিযোগ তার শত্রুতেও করেনি। মীন-হাজ বলেছেন,^৩ “The Abyssinian only acquired favour from the Sultana.” (আর্বির্সিনিয়ান ক্বীত-দাসটি শুধু সুলতানার নেকনজরে ছিল)। ফেরিস্তার একমাত্র অভিযোগ,^৪ “A very great degree of familiarity was observed to exist between the Abyssinian and the Queen, so much so, that when she rode, he always lifted her up on the horse by raising her up under the arms.” (আর্বির্সিনিয়ান ক্বীতদাস ও সম্রাজ্ঞীর অন্তরঙ্গতা দৃষ্টিকটু পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। যেমন বলা যায়, সুলতানা যখন অম্বারোহণ করতেন তখন ঐ নিম্নো-যুবকটি দই বাহুবন্ধে জড়িয়ে তাঁকে খোড়ার পিঠে বসিয়ে দিত।)

গাঢ়দাহনের হেতু অনস্বীকার্য। দিল্লীর তাবৎ আমীর মালিক এবং তাদের সুযোগাযুগ পুত্রগণ কি ও-কাজটা পারে না? ঐ নাগিস্-কলির মতো হাল্কা সুলতানকে বাহুবন্ধে বন্দী করে আলতোভাবে খোড়ার পিঠে বসিয়ে দিতে?

প্রথম প্রকাশ্য বিদ্রোহ করল শাহহিন্দ-এর সুবে-দার আগতুনিয়া। রেজিয়া সে বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে অনুভব করলেন, পয়ের এলা থেকে মাটি সরে গেছে। যারা ছিল অনুরাগী, বিশ্বস্ত অনুচর, শত্রু-

নুখায়ী, তারা আজ বিপক্ষ-শিবিরে! তার মূল হেতু
 মাৎস্যবধ! তবু অকুতোভয়ে সুলতানা অগ্রসর হলেন
 গারহিন্দ-এর দিকে। দূর্ভাগ্য দিল্লীশ্বরীর-এ যুদ্ধে
 বন্দিনী হলেন তিনি এবং নিহত হল তাঁর বিশ্বস্ত
 পার্শ্বচর সেই আবিসিনিয়ান-আফ্রিক এবং প্রেমের
 মল্লো ক্রীতদাস, যাকুৎ।

বসিয়ে দিয়েছে তাঁর ছোটভাই মাইজউদ্দীনকে। সুল-
 তানা স্বামীর সৈন্যদলের নেতৃত্ব দিয়ে উপনীত হলেন
 দিল্লীতে। কিন্তু যে কুল তিনি করেছেন যৌবনের
 প্রারম্ভে তা আর শোধরাবার তখন উপায় নেই।
 দিল্লীর কাছাকাছি পৌঁছে দেখলেন তাঁর স্বামীর অনু-
 চরেরা ওঁদের দৃজনকে ফেলে পাঁচিয়েছে!



চিত্র-3.3 কুতুবুল ইসলাম মসজিদ ও কুব মিনার।

[চমোদন শতাব্দীর কল্পিত চিত্র]

কুতুবুল মসজিদ চব্বর	..	কুৎবউদ্দীন আইবককৃত	A ₁ A ₂ A ₃ A ₄
এ সম্প্রসারণ	..	ইলতুংমিস্ কর্তৃক	B ₁ B ₂ B ₃ B ₄
এ পুনঃ-সম্প্রসারণ	..	আলাউদ্দীন খিলজীকৃত	B ₁ C ₁ C ₂ C ₃
কুৎব মিনার	..Q	ইলতুংমিসের সমাধি সৌধ	I.M.
আলাই মিনার	..A.M.	আলাই বরগরাজা	A.D.
আলাউদ্দীনের সমাধি	..	A.T.	

বন্দী সুলতানা বাধা হয়ে বিবাহ করলেন যিন্নোহী
 অলতুনিয়াকে। কিন্তু তাতে অপরাপন্ন আত্মীয়
 মালিকদের ঈর্ষান্নি প্রশমিত হবে কেমন করে? তারা
 সুলতানার অসদৃশ্যস্থিতির সদ্বোধে দিল্লীর মসনদে

13 অক্টোবর 1240 খ্রীষ্টাব্দে মাইজউদ্দীন বাহরাম
 এর হস্তে সুলতানা রেজিয়া বন্দিনী হলেন আবার।
 রাতি প্রভাত হল, ভগ্নী ও ভগ্নিপতির মৃতদেহ
 পবনলিত করে বাহরাম বসলেন সিংহাসনে!

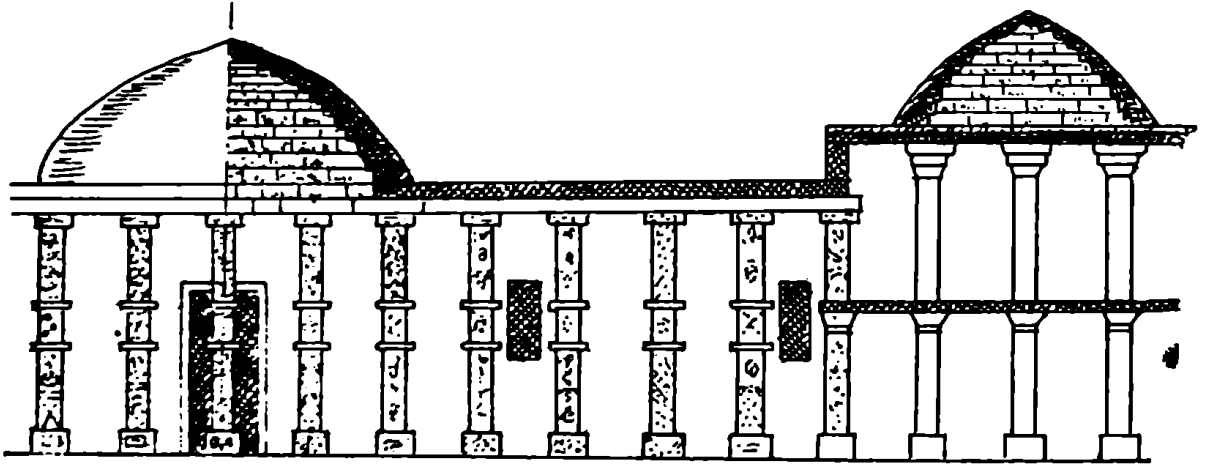
সুলতানা রেজিয়ার এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে একটি মহান সম্ভাবনার উপর যবনিকাপাত ঘটল। রমণীর অর্ধনিরুপ্তো দিল্লী-আগ্রা এলাকায় একাধিক স্থাপত্য-কীর্তি নির্মিত হয়েছে—হুমায়ূনের সমাধি, ইত্যমদ-উদ্দৌলা, অথবা আগ্রার জাম-ই-মসজিদ। কিন্তু সেই রমণীকুল তক্ত-তাউসে সমাসীন ছিলেন না কোনদিন। প্রকাশ্য দরবারে অনবগৃহীত দরবার করেননি; কিম্বা লোহজালিকে নারী-হৃদয়ের যদুগুচ্ছাসকে সুসংবদ্ধ করে সামসেরহস্তারূপে অশ্বপৃষ্ঠে লড়াই ফতে করেননি। রেজিয়ার অকালমৃত্যু না হলে হয়তো ভারতের ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যে নতুন কিছু দেখতে পেতাম আমরা। হিন্দুস্থানের এই একমাত্র সুলতানার সমাধি কোনটা সে-বিষয়েও পশ্চিমেরা একমত হতে পারেননি।

পরবর্তী সুলতানেরা—মুইজউদ্দীন, আলাউদ্দীন, কারকোবাদ, কারমুরের দল অপদার্থ। ইল্-তুমিসের কনিষ্ঠপুত্র নাসিরউদ্দীন ধর্মাস্রা ছিলেন। কুরাণ অনুলিপি করে নাকি তাঁর গ্রাসাচ্ছাদনের আরো-জন হত! কিন্তু দিল্লীশ্বর হবার মতো গুণ সেই পুত্রাশ্বার ছিল না। সেটা বরং ছিল তাঁর শ্বশুর এবং ইল্-তুমিসের জামাতা গিয়াসউদ্দীন কুব্বনের। কিন্তু তিনিও কোন স্থাপত্যকীর্তি রেখে যেতে পারেননি। মঙ্গোল আক্রমণ প্রতিহত করতেই তাঁকে সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হত। পারসিক কবি আমীর

অমলের স্থাপত্যকীর্তিগুণি দেখে নিই :

কুওওতুল-ইসলাম মসজিদ : দিল্লীর তক্ত-তাউসে আসীন হয়ে কুৎবউদ্দীন আইবক সর্বপ্রথমে নির্মাণ করালেন একটি জাম-ই-মসজিদ। যার নাম : 'কুওওতুল-ইসলাম' মসজিদ। তার অর্থ : ইসলামের শক্তি। নামকরণের মাধ্যমে নবগতের শক্তিমত্তার অসাহসু প্রকাশ ঘটেছে বলে অভিযোগ করা ঠিক নয়, কারণ ইসলাম অন্যান্য ধর্মের—হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, জরথুষ্ট্র, খ্রীষ্টান প্রভৃতির তুলনায় ধর্মপ্রচারে ভিন্ন পথের যাত্রী। বিধর্মীর অন্তর সে যদুস্তি-তর্ক-প্রেম-সহনশীলতা দিয়ে জয় করতে চায়নি, তরবারির অগ্র-ভাগ দিয়ে সে সর্বদেশে, সর্বকালে ধর্মের পথে বাধা অপসারণ করেছে। ফলে, মসজিদের নাম 'ইসলামের শক্তি' হওয়া অপ্রত্যাশিত নয়।

মসজিদের প্ল্যানিং একটি আয়তক্ষেত্র। চিরা-চরিত পদ্ধতিতে তার পশ্চিমে মূল উপাসনাগৃহ; পূর্বে একটি গম্বুজের (চিত্র—3.3D) ভিতর দিয়ে প্রবেশ দ্বার। তিন পাশে বারান্দা—সারি-সারি স্তম্ভের উপর সমতল ছাদ। ইসলামী স্থাপত্যে যার নাম লিয়ান (L)। চিত্র—3.3-তে কুৎবউদ্দীন আইবক নির্মিত আদি মসজিদের চৌহান্দি $A_1 A_2 A_3 A_4$ আয়তক্ষেত্রে বিধৃত।



চিত্র-3.4 কুওওতুল মসজিদের সেকশন।

কসরৌ এর রাজকোষে জীবিত ছিলেন। যার সমাধি আছে দিল্লীতে—নিজামউদ্দীন আউলিয়ার। কুব্বনের সমাধি সম্পূর্ণ ভগ্নদশায়, কিন্তু তাতেই আছে এক বৈশ্বিক চিত্রাধারা : স্তরত-স্বকৃন্দ নির্মিত প্রথম প্রকৃত-খিলান, বা true-arch!

ইতিহাস আলোচনা আপাতত স্থগিত রেখে, এবার আসুন, আমরা প্রথম সুলতানী জমিনায় দিল্লী

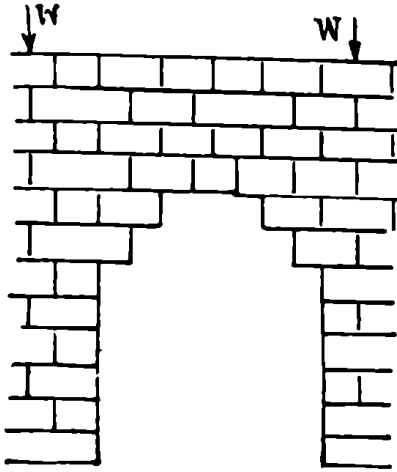
পরবর্তী সুলতান ইল্-তুমিস্ এই মসজিদটি সম্প্রসারিত করেন। তার চৌহান্দি ঐ চিত্রে $B_1 B_2 B_3 B_4$ রেখায় দেখানো হয়েছে।

তারও পরবর্তী যুগে, বস্তুত পরবর্তী খিলজী-বংশের আলাউদ্দীন খিলজীর আমলে—যাঁর পরিচয় পরের পরিচ্ছেদে পাওয়া যাবে—এই মসজিদটি আরও বড় করে সম্প্রসারিত করা হয়। আলাউদ্দীনের মস-

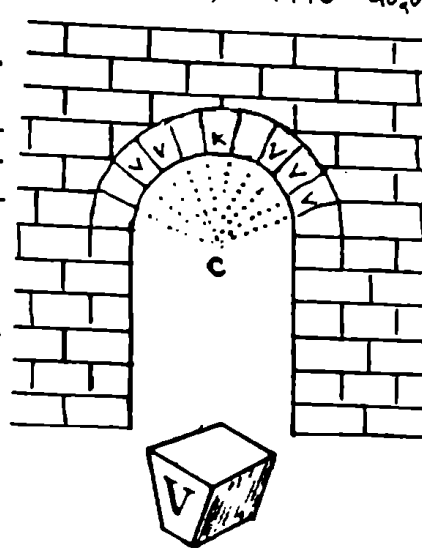
জিদ্-চৌহান্দ B₁ C₁ C₂ C₃ রেখায় সীমায়িত।

চিত্র-3.3-তে কুওতুল মসজিদ এবং তার সংলগ্ন অন্যান্য স্থাপত্যকীর্তি যা দেখতে পাচ্ছেন তা আজকের ধ্বংসাবশেষের নয়। আর্কিওলজিকাল ডিপার্টমেন্টের সূত্র ধরে পার্সি ব্রাউন সাহেবের অনুসরণে আমরা বরং আলাউদ্দীনের মৃত্যুকালের অবস্থাটা কল্পনায় দেখবার চেষ্টা করেছি। কুৎব-চত্বর ভ্রমণকালে এই নকশাটা হাতের কাছে থাকলে অনায়াসে বদ্বতে পারবেন কোন্ ভূগম্যস্থাপকার কীর্তি।

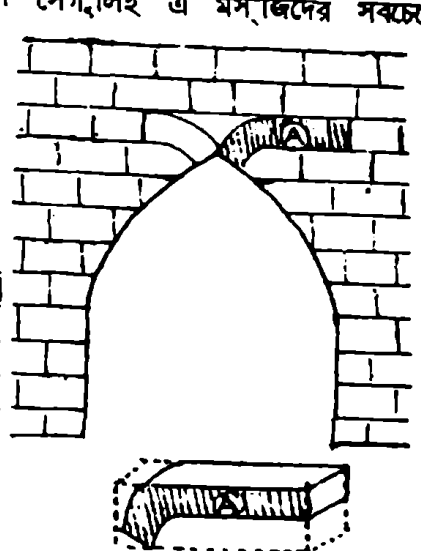
এই কুওতুল-ইসলাম মসজিদে হিন্দু ও মুসলিম স্থাপত্যের একটি অদ্ভুত সংমিশ্রণ হয়েছে। আকবর পরিকল্পিত ফতেপুর-সিক্রিতে—আমরা পরে দেখব—হিন্দু-মুসলিম স্থাপত্যের সজ্ঞানকৃত সৃষ্টি মিলন ঘটেছে, প্রীতির বন্ধনে, দেওয়া-নেওয়ার ছন্দে ;



চিত্র-3.5 কবেলিঙ পদ্ধতি।



চিত্র-3.6 প্রকৃত-খিলান।



চিত্র-3.7 আইবক্কৃত খিলান।

এখানে তা নয়। এখানকার সংমিশ্রণ বিজিত ও বিজয়ীর বাধ্যতামূলক সহাবস্থান। কারণ কুৎবউদ্দীন কিল্লা রায় পিথোয়ায় সাতাশটি হিন্দু ও জৈন মন্দির ধ্বংস করেন।^১ সেই মন্দিরের স্তম্ভগুলি সংগ্রহ করে এই মসজিদের লিয়ানের অলিন্দ নির্মিত হয়। লিয়ানের উচ্চতা বৃদ্ধি করতে দুটি স্তম্ভকে মাথায়-মাথায় বসানো হয়েছে (চিত্র-3.4)। মসজিদ-চত্বরের উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব কোণায় আবার ঐ স্তম্ভগুলিকে একরন্দায় সাজিয়ে মিতল মোকাম বানিয়ে ছন্দবৈচিত্র্য ঘটানো হয়েছে। তাই এ মসজিদের স্তম্ভে হিন্দু-ভাস্কর্যের ছাপ—ফুজ-লতা-পাতা, পশ্ম-শঙ্খ-বট্টা-চক্র সবই হিন্দু-শৈলীর কারুকার্য। এমন কি অভিনিবেশের সঙ্গে লক্ষ্য করলে অথবা গাইডকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলে খুঁজে পাবেন চতুর্ভুজ দেবতার মূর্তি।

স্তম্ভ শোভিত লিয়ান নয়, এ মসজিদের সবচেয়ে দর্শনীয় বস্তুটি উপসনা-কক্ষের সম্মুখস্থ খিলান-সমন্বিত প্রস্তর-প্রাচীর ইসলামী স্থাপত্যে যার অভিনা : মাখসুদরাহ্। কুৎবউদ্দীন নির্মিত আদিম মসজিদে আছে পাঁচটি খিলান, কেন্দ্রস্থটি উচ্চতর, দু-পাশে দুটি অপেক্ষাকৃত ছোট। ইলুভ্রমিসের সম্প্রসারিত অংশে এক-একদিকে তিন-খিলান-ওয়ারা দুটি মাখসুদরাহ্ এবং আলাউদ্দীন কিলজী শব্দমাত্র উত্তরদিকে মসজিদ সম্প্রসারণকালে নির্মাণ করেন পর পর নয়টি খিলান। এর ভিতর আলাউদ্দীন-নির্মিত খিলানের চিহ্নমাত্র নেই। ইলুভ্রমিস-মাখসুদরাহ্-র সামান্য ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয় : অথচ কিম্বদন্তি-মতঃপরম্—সর্বপ্রথম-নির্মিত আদিম পাঁচটি খিলানের তিনটি এখনও অটুট। সেগুন্দিই এ মসজিদের সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আসুন, কাছে গিয়ে দেখা যাক। আদিম মাখসুদরাহ্-র দৈর্ঘ্য 33 মিটার, প্রতীক 2.56 মিটার এবং উচ্চতা 15.25 মিটার। কেন্দ্রীয় খিলানের উচ্চতা 13.5 মিটার এবং তার স্প্যান 6.6 মিটার। স্থাপত্যের পরিভাষায় এক নিঃস্বাসে বলতে পারি—“স্থানীয় স্থপতির পাশ্চিম-এশীয় আর্কুয়েট (arcuate) প্রথার সঙ্গে পরিচিত না থাকার ফলে এই খিলানগুলি নির্মাণে ভারতে-প্রচলিত ট্রাবকট (trabecate) প্রথার প্রয়োগ করেন।”^২ পণ্ডিত কতি হস্ততো বন্ধে নেবেন কী বলা হল, কিন্তু আপনার আমার মত সাধারণ পাঠকের তাতে নিঃস্বাস রুদ্ধ হবার উপক্রম হবে। তাই একটু বিস্তারিত আলোচনায় জেনে নিতে হচ্ছে ‘আর্কুয়েট’ ও ‘ট্রাবকট’ পদ্ধতি কাকে বলে।

সোজা কথায়, ভারতীয় স্থপতি 'আর্চ' বা 'প্রকৃত-খিলান' বানাতে জানতো না। তাহলে তারা দরজা-জানালায় ফোকরের উপর কী-ভাবে গাঁথনি করত? মন্দিরের চুড়ায় রেখ-শিখর, পীড়-শিখর প্রভৃতিই বা বানাতে কোন কায়দায়? সংক্ষেপে তার জবাব : কবোঁলিঙ করে। সেটা কী? কায়দাটা হচ্ছে—প্রতিটি রম্মায় পাথরখানাকে সামনের দিকে সামান্য একটু ঝুঁকিয়ে বসাতে হবে। যাতে প্রতিটি রম্মায়—অর্থাৎ জমির সমান্তরাল 'লেয়ার'-এ, ফাঁকটা অল্প একটু করে কমে আসে। চিত্র-3.5-এ কায়দাটা দেখানো হয়েছে। এ পদ্ধতিতে ভারসাম্য তখনই রক্ষিত হবে যখন ফোকরের বিপরীত-প্রান্তে গাঁথনির ওজন (w) চাপবে, ঝুঁকে থাকা অংশটাকে পিছন দিক থেকে চেপে ধরে রাখবে।

প্রকৃত-খিলান বা আর্চ কিন্তু এভাবে গাঁথা হয় না (চিত্র-3.6)। সেখানে ইট বা প্রস্তরখণ্ডগুলিকে বিশেষভাবে ছোট্টে নিয়ে কেন্দ্রবিন্দুর (c) দিকে মুখ করে বসানো হয়। এগুলিকে বলে ভসোর (v)। লক্ষণীয়, তার নিচের দিকটা সরু, উপর দিকটা মোটা—অনেকটা কাঠের গজাল বা চৌকো ফুলগাছের টবের মতো। আর প্রতিটি ভসোরের পাশের রেখাগুলি কেন্দ্রবিন্দুর দিকে সম্প্রসারিত করলে তা ঐ c-বিন্দুতে মিলে মিশবে। সেই রেখাগুলি টানার পর হয়তো আপনার মনে পড়ে যাবে অতি শৈশবে নিজের হাতে আঁকা সূর্যোদয়ের ছবির কথা! খিসানের কেন্দ্রস্থলে সূর্যোজ ভসোরটি জ্যেষ্ঠ কুলীন—তার নাম কী-স্টোন (k)। ভসোরগুলি এমন কায়দায় সাজানো হয় যাতে কেন্দ্রস্থ কী-স্টোন তার দু-পাশের ভসোর-সখীর স্কেথে পার্শ্বচাপে দেহভার ন্যস্ত করে। তারা দুজন আবার দু-পাশের দুই সখীর গা-টেপার্টেঁপ করে। কোনো ক্ষেত্রেই কোনো উত্তম সিনেমা নায়ক এলে যেমনভাবে খবরটা চাঁকিয়ে যায় প্রায় সেভাবে ভসোরের দল পার্শ্ববর্তীদের চাপ দিতে দিতে ওজনটা দু-পাশের খাম্বারায় (pier) পাচার করে।

সাতশোটা হিন্দু মন্দির খুলিসাং করে মহামহিম সুলতান কুবকউদ্দীন আইবক তো কুওতুল মসজিদের লিহান, ইবান বানালেন, কিন্তু তৃপ্ত পেলেন না। না পাওয়াই স্বভাবিক। সদ্যসম্পত্ত মসজিদটি দেখতে হল ঐ হেঁদুদের, কককদের, পুতুলপুজার ঘরখানার মতো! 'ইসলামের শক্তি' তাতে আদৌ পরিলক্ষ্য নয়। তাই সুলতান চুকুম দিলেন বানাও এক মাথসুদাহ। মদিনার মকরান পরগনবর যে মসজিদটি নির্মাণ করিয়েছিলেন তাতে খলিফা ওসমান তাঁর করিয়ে-

ছিলেন একটি মাথসুদাহ; জেরুসালেমের ওমরের মসজিদেও (ডোম-অব-দা-রক) আছে মাথসুদাহ। ঠিক তেমন জিনিস চাই। আর খিলানের বদনখানা হবে অর্ধচন্দ্রাকৃতি নয়, সূচীমুখ অশ্বখুরাকৃতি। অশ্ব নিয়েই তাঁর জীবনে হাতেখড়ি, যদিও সুলতান তখনও জানতেন না—ঐ অশ্বখুরেই তাঁর জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটি বাঁধা।

স্থানীয় স্থপতি : হিন্দু অথবা সদা ধর্মান্তরিত হিন্দুস্থানী মিস্ত্রি পড়ল মহা ফাঁপরে। খিলান তারা না চেনে তা নয়, সাঁচীস্তূপের চারপ্রান্তে চারটি তোরণের বয়স তখন হাজারের উপর, খাজুরাহোর কাণ্ডারীয় মহাদেও অথবা ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরে বিরাট-বিরাট ফাঁক তারা পূর্ণ হতে দেখেছে। সেগুলি কিন্তু খিলান নয়। খিলানের আকৃতিটাও তারা দেখেছে—অজ্ঞতার নানান চৈত্রে এবং ধামেক স্তূপে। কিন্তু সেগুলি তো ভারবাহী খিলান নয়। এ যে নিঃসঙ্গ-নায়ক—'ফ্রি স্ট্যান্ডিং' খিলান! এ খাড়া থাকবে কেমন করে?

তা হোক, তবু তাদের ধমনীতে বইছে সহস্রকের স্থাপত্য-ঐতিহ্য! অসামান্য তাদের দক্ষতা। এ সমস্যার সমাধান তারা করল অপূর্ব উদ্ভাবনীশক্তির মাধ্যমে। কোনো জোড়াতালি দেওয়া সাময়িক সমাধান নয়—সে তোরণ আজও মাথা খাড়া রেখে সালাম জানাচ্ছে সেই অজ্ঞাতনামা আবিষ্কারকদের। ওরা সমাধান করল 'ট্রাবিয়েট'-পদ্ধতিতেই—ক্রমশঃ ঝুঁকে থাকা কবোঁলিঙ কায়দাতেই। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে কারও বুঝবার উপায় নেই সেগুলি আদৌ আর্চ নয়! ম্বয়ং সুলতান পর্যন্ত বুঝতে পারেননি—ঐ পাঁচটি খিলান নিখুঁত খিলান হওয়া সত্ত্বেও আদৌ আর্চ নয়! তারা হেঁদু-রীতিতেই খাড়া।

ফলে কুব-দর্শনকালে ঐ বিস্ময়কর আবিষ্কারটি খুঁটিয়ে দেখতে ভুলবেন না (চিত্র-3.7)। A-চিহ্নিত পাথরখানি কী-ভাবে কেটে বার করা হয়েছে তাও এ-চিত্রে বোঝাবার চেষ্টা করা গেছে।

এই খিলানগুলি হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের পাথর দিয়ে গাঁথা নয়—আনকোরা পাথর খুঁদে বানানো। তার গারে যে অলঙ্করণ তার ইসলামী ঐতিহ্য, যদিও তা উৎকীর্ণ করেছে হয়তো কোনো হিন্দুভাস্কর, অথবা সদা-ধর্মান্তরিত মসলমান। তোরণের ধার বরাবর খাড়া করে লেখা আরবী হরফে কুরাণ-সরিফের বাণীও ভারত-ভূখণ্ডে এই প্রথম রচিত হল। যার সম্বন্ধে সুলতানী-যুগের ঐতিহাসিক^১ বলছেন, "তোরণের পাথরগায়ে কুরাণের বাণী এমনভাবে খোদিত,

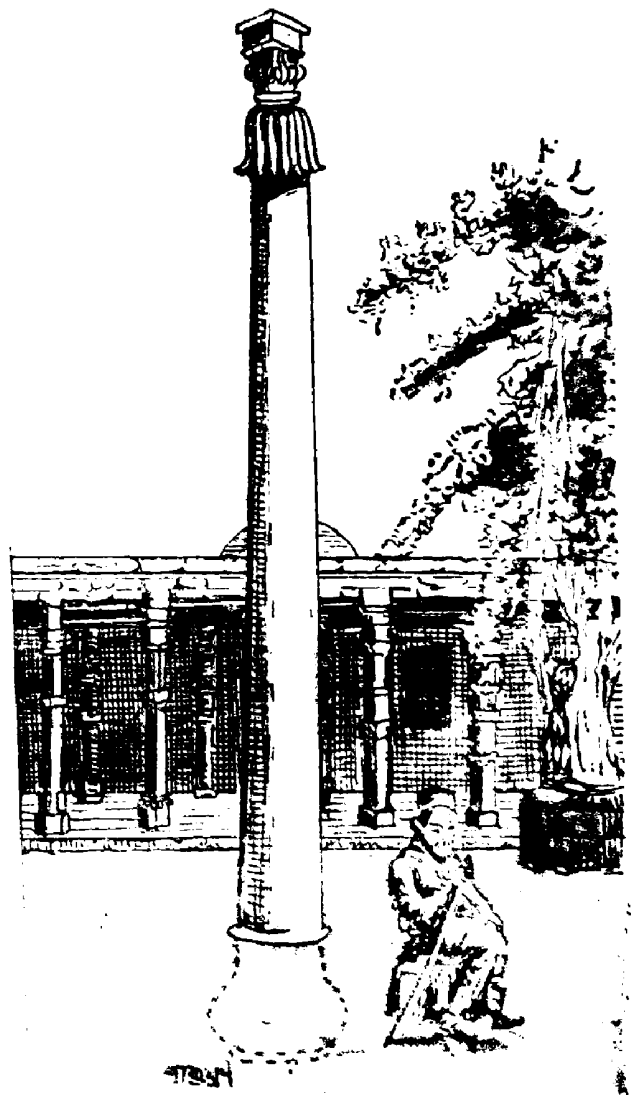
যা মোমের উপরেও লেগা যায় না। উদ্‌গামী আখর-
গুলি দেখলে দর্শকের মনে হয় কুরানের বর্ণী আশ্রা-
তালার দিকে প্রসারিতবাহু হয়ে আশ্মানে উঠেছে ;
আবার পাশের লাইনের সোপান বেয়ে তা যখন জমিন-
সামিল হতে চায়, তখন মনে হয় এ যেন ঈশ্বরের বিগ-
লিত করুণাধারা।”

লৌহস্তম্ভ : মাখসুদরাহ্‌র সম্মুখে বিশ্ববিখ্যাত
লৌহস্তম্ভ (চিত্র-3.8)। উচ্চতায় 7.2 মিটার, যার
93 সেন্টিমিটার ভূগর্ভে প্রাথিত। তার গায়ে উৎকীর্ণ-
করা একটি লিপিপাঠে জানা যায়, জনৈক চন্দ্ররাজা
কোনো বিষ্ণুমন্দিরের সম্মুখে এ গরুড়ধ্বজাট
নির্মাণ করান। পণ্ডিতদের মতে ঐ চন্দ্ররাজা বাস্তবে
শ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা বিষ্ণুদিত্য (375-413 খ্রিঃ),
যাঁর সভাকর্তা ছিলেন শ্বয়ং কালিদাস। গরুড়ধ্বজাট
চৌহান-বংশীয় কোনো নৃপতি-সম্ভবত পৃথ্বীরাজের
পূর্বপুরুষ অনঙ্গপাল নিয়ে এসে (কোথা থেকে জানা
নেই) তাঁর কোনো বিষ্ণুমন্দিরের প্রবেশদ্বারে স্থাপন
করেন। সুলতান কুৎবউদ্‌দীন সেটি তাঁর মসজিদ-
চত্বরে প্রতিষ্ঠা করার পূর্বে স্তম্ভের সর্বোচ্চস্থানে
নির্মিত গরুড়টির গর্দানা নিলেন। লৌহস্তম্ভটি
আদ্যন্ত নিখাদ লোহা দিয়ে বানানো। অত্যন্ত আশ্চর্যের
কথা—দীর্ঘ দেড় হাজার বছর ঝড়-জলের মধ্যে পড়ে
থেকেও ঐ লৌহস্তম্ভটিতে কোনো মরিচার দাগ
নাগেনি। কী-ভাবে সে-আমলে ঐ প্রকাণ্ড লৌহ-
স্তম্ভটি নির্মিত হয়েছিল, আর কেনই বা তাতে মরচে
ধরেনি তার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা আজও মেলেনি।
রিডার্স ডাইজেষ্ট তাঁদের সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থে বলে-
ছেন—“বিশ্বে যে-সব সমস্যার সমাধান বিজ্ঞান আজও
করতে পারেনি তার ভিতর রয়েছে এই প্রশ্নটা।

ফাগুসন-সাহেবের একটি গ্রন্থে” এ বিষয়ে একটি
কৌতুককর সংবাদ পেলাম। জেনারেল ক্যানিংহ্যাম
তাঁর রিপোর্টে (1871) লিখেছিলেন, স্তম্ভটি মাটির
গভীরে 10.6 মিটার (35 ফুট) গাঁথা আছে! তার
মানে স্তম্ভটির মোট দৈর্ঘ্য $22+35=57$ ফুট। এ
কথা পুরাতত্ত্ব বিভাগের রিপোর্টে লিখে ক্যানিংহ্যাম-
সাহেবের নিজেরই কেমন যেন সন্দেহ হল। বিশ্বস্ত
অনুচর পাঠিয়ে তিনি পুনরায় মাপ নেবার ব্যবস্থা
করেন এবং দেখেন স্তম্ভটির বনিয়াদ যাত্র 20 ইঞ্চি।
কলাবাহুদ্বা, প্রাথমিক মাপ নির্ধারণের সময় ঠিকাদার
35 ফুট পাথর খননের মজুরি আদায় করতে স্থানীয়
কর্মচারীর বামহস্তে কিঞ্চিৎ মদ্রা গুঁজে দিয়েছিলেন,
যাতে তার দক্ষিণহস্ত মাপের খাতায় 20 ইঞ্চিকে 35

ফুটে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়! অতীতে ঠিক-
দার প্রভুর কী হয়েছিল পুরাতত্ত্ব বিভাগের রিপোর্টে
সে-কথা লেখা হয়নি। বোধকার তাঁরই অসন্তোষ
পূর্বদলের সাক্ষাৎ এই অমর গ্রন্থকার পেরোঁছিল তার
প্রথম যৌবনে বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্পে!

অবশ্য শৃঙ্খলিত বিশ ইঞ্চি বনিয়াদ নিয়ে অতবড়
একটা লৌহস্তম্ভ এত শতাব্দী কী করে ঝড়-আছে
সেটাও একটা রহস্য!



চিত্র-3.8 লৌহস্তম্ভ।

মুরোপখণ্ডে সে আমলে লৌহ-চাক্ষাই প্রযুক্তিবিদ্যা
বা ‘মেটালার্জি’ এতটা উন্নত হয়নি বলেই পশ্চিম-
খণ্ডের কাছে কুৎখ মিনারের লৌহস্তম্ভ সমাধানের
অতীত একটি সমস্যা। এশিয়াখণ্ডে কিন্তু ঐ কিস্ময়ের
জড়ি আছে—মহাচীনে উকুরার পর্বতের পাদদেশে

1080 খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত একটি অনূরূপ লৌহস্তম্ভ আছে। 13 ডগা, উচ্চতা 23 মিটার, ওজন 53.3 টন। সেটিতেও প্রায় হাজার বছরে কোনো মরিচার দাগ ধরেনি।¹⁰

কুংব মিনার : মজুতবা অঃলী লিখছেন¹¹ “কুংব মিনার পৃথিবীর সবশ্রেষ্ঠ মিনার। ইংরেজ পর্বত একথা স্বীকার করেছে। আম্চব মনে হয় যে, এর পূর্ববর্তী নিদর্শন এদেশে নেই, ইরান-তুরানেও নেই। বহু স্থপতির বহু এক্সপেরিমেন্টের সম্পূর্ণ ফায়দা উঠিয়ে তাক্স নির্মিত হল—কিন্তু মিনারের ক্ষেত্রে কুংব প্রথম এবং শেষ এক্সপেরিমেন্ট। এ ধরনের বিজয়-স্তম্ভ পূর্বে কেউ করেনি, কাজেই গুর্জারের বিস্ময়ের অবশিষ্ট নেই যে, হঠাৎ স্থপতি এ সাহস পেল কোথা থেকে? কয়নিংহ্যাম, ফার্দুসন, কার, স্টিফেন, স্যার সৈয়দ আহমেদ অনেক ভেবেচিন্তেও, এর কোনো উত্তর দিতে পারেননি।”

কুংব যে ভারত-ভূখণ্ডে অন্য সে-কথা একশবার ; কিন্তু এ-পরীক্ষা যে ইতিপূর্বে হয়নি তা কলা ঠিক নয়। উচ্চতার এ মিনার নির্মাণ সময়ে অপরাধেয় ছিল, অজ্ঞও ভাই। কায়রোর হাসান-মসজিদের মিনারিকা অবশ্য উচ্চতর ; কিন্তু সেটি একটি ইমারতের অঙ্গ, মিনারিকা—বিচ্ছিন্ন মিনার নয়। সুতরাং কুংব উচ্চতার চির অপরাধিত।

কিন্তু এ-ধরনের মিনার ইরান-তুরানে নেই—আলী-সাহেবের ও-কথাটা মনে নেওয়া যায় না। ইসলামী-ঐতিহ্যে বিচ্ছিন্ন মিনার—যা নাকি কোনও সৌধের সংলগ্ন মিনারিকা নয়—তারও একটি ধারাবাহিক ইতিহাস আছে ; এবং কুংব মিনার সেই বিবর্তন ধারারই ক্রমিক ; স্বকল্প স্থাপত্য-কীর্তি নয়।

আফগানিস্থানে সম্প্রতি (আলী-সাহেবের তিরোধানের পরে না হলেও, নিঃসন্দেহে ঐ রচনার পরবর্তী কালে) সেনরোজ প্রদেশের শাহ পোশ-এ বননকালে একটি মিনারের ধ্বংসাক্ষেপ আবিষ্কৃত হয়েছে। একটি মসজিদের অন্তর্দ্বারে সেই মিনারটি নির্মিত হয়েছিল নবম অথবা দশম-শতাব্দীর প্রথম পাদে। সামানি-ইটের তৈরী এই মিনারের শৃঙ্গ পাদদেশ-টুকুই আবিষ্কৃত হয়েছে—কিন্তু তার জ্ঞান কুংব মিনারের জন্মে গড়া। একাট করে কোণ এক একটি করে প্রেক্ষাপ্রতি (বাণী) পর পর সাজানো, ঠিক যেমনটি দেখতে পাই কুংব-এ। বিশেষজ্ঞ প্রি অর. সেন-গুপ্তের মতে এই মিনারটি¹² সারানিং-এ পূর্ব-বঙ্গ নির্মিত সামানি-বংশের বুদ্ধগিরি শাসক ইস্মাইল

(892-907) নির্মিত একটি মিনারের ছাপ পড়েছে। সেটিও নাকি প্রথম নয়—তারও পূর্বে নির্মিত হয়েছিল আফগানিস্থানের প্রাচীনতম মসজিদে একটি মিনার—স্থানীয় লোকেরা যার পরিচয় দিতে বলে বল্ক-এর ‘নাও গাম্বাদ’ (Naw Gumbad—‘নয়া গম্বাজ’)। কে জানে এ ঐতিহ্যের উৎসমুখে দুই-নদী উপত্যকার ‘জিগদুরাং’-এ যেতে হবে কি না। সেক্ষেত্রে কুংব-এর আদি-উৎস বোধকারি ওল্ড-টেস্টামেন্ট বর্ণিত ‘বাবেল’-এর আকাশচুম্বী মিনার।

কুংব মিনারের সঙ্গে শাহ-পোশ মিনারের কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেও তার পরিকল্পনা যেন বেশি করে ছাপ ফেলেছে ‘জাম’-এ নির্মিত গীয়াউদ্দীন ঘোরীর (1157-1202) অপর একটি মিনার। বাস্তবিকপক্ষে, ঘোরীর অনেকগুণি বিজয় মিনার নির্মাণ করেছিলেন আফগানিস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলে। ঘোরী-বংশের অন্যতম নিয়ামক আলাউদ্দীন (1151-1157) প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক জুজ্জানী (Juzjani) লিখছেন, পরাজিত গজনির শাহ-এর হাত থেকে শাসন-ক্ষমতা গ্রহণ করে নিষ্ঠুর আলাউদ্দীন রাজধানীকে ভস্মীভূত করে, এবং ‘জাহান-সুজ’ (জাহান : পৃথিবী ; সুজ : দখলকারী) খেতাব গ্রহণ করে একটি নতুন রাজধানীর পত্তন করে—‘ফিরোজ কোহ’। সেখানে সে একাধিক মসজিদ এবং মিনার বানায়। সবচেয়ে নৃশংস ও ন্যাকারজনক সংবাদ হল—ঐতিহাসিক জুজ্জানী বলছেন—সম্রাটের অভিলাষ অনুসারে ঐ মসজিদ ও মিনার গেঁথে তোলার সময় জল ব্যবহার করা হয়নি—মশলা প্রস্তুত করতে জলের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছিল পরাজিত বিখর্মী বন্দীদের রক্ত!!¹³

এখানেই ধারাবাহিকতায় ছেদ টানা যাচ্ছে না। ফার্দুসন-সাহেব তাঁর অমূল্যগ্রন্থে¹⁴ বলছেন, কুংব-এর পূর্ব-বঙ্গে গজনীতে দুটি মিনার গেঁথে তোলা হয়েছিল, যা কুংবউদ্দীন আইবক নিঃসন্দেহে দেখেছেন ভারত প্রবেশের পূর্বে। প্রথমটির নির্মাতা গজনির মাহমুদ (997 খ্রীষ্টাব্দ) ; অপরটি তাঁর পুত্র মাসুদ-এর। ময়ূপ্রান্তরের মাঝখানে দণ্ডায়মান এ-দুটি নিঃসঙ্গ মিনারও কোনো মসজিদ বা ইমারতের অঙ্গ নয় ;—স্বয়ংসম্পূর্ণ মিনার। ফার্দুসনের দৃষ্টান্ত্য গ্রন্থ থেকে দীর্ঘতর মিনারটির একটি স্কেচ আঁকার চেষ্টা করছি (চিত্র—3.9)। দূরে মাসুদ নির্মিত দ্বিতীয় মিনারটিকেও দেখা যাচ্ছে। প্রথমোক্ত মিনারটি 42.7 মিটার (140 ফুট) উঁচু। মিনারটি নিচের দিকে অষ্টভুজ-দুটি বর্গক্ষেত্র একে অপরের কর্ণের সমান্তরালে বসিয়ে বানানো। উদ্ভাষণ বৃত্তাকার।

কুংব মিনারের সঙ্গে এই গজনী-মিনারের তুলনা-মূলক বিচার করলে আমরা দেখব উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে 140 ফুট থেকে 242 ফুটে। শ্বেতল-পরিবর্ণনা বর্ণিত হয়েছে চারতলার বিস্তারে। নিচেকার দুটি বর্গক্ষেত্রের 'চার-দুকুনে আট' কোণার পরিবর্ণনা সম্প্রসারিত হয়েছে তিনটি বর্গক্ষেত্রের 'তিন-চারে বারো' কোণায়, এবং ঐ বারোটি কোণার মাঝে মাঝে 'বাণী' সংযোজিত করে।

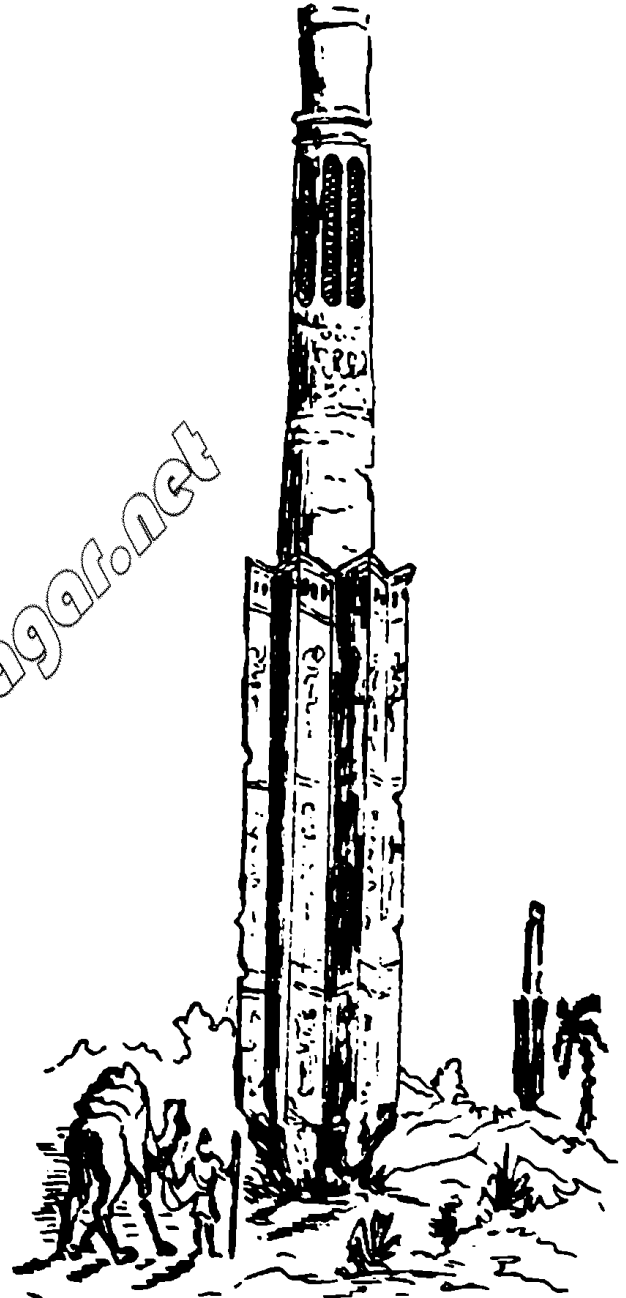
আলী-সাহেব আজকে নেই, না হলে আমি তাঁর সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিতাম।

তবে ও'র এটা 'নিষাস্' হক্-কথা : এ পরীক্ষায় কুংব মিনার হচ্ছে খামোশ্। কেউ তাকে অতিক্রম করার দৃঃসাহস দেখায়নি—কী উচ্চতায়, কী স্থাপত্য-সৌন্দর্যে, কী সৌন্দর্যে। একেবারে যে দেখায়নি, তাও বলা যায় না ; বরং বলব—যারা সে দৃঃসাহস দেখাতে চেয়েছে তারা স্থাপত্যের ইতিহাসে উপহাস্যস্পদই হয়েছে মাত্র। যেমন, আলী মিনারে আলাউদ্দীন খিলজী, অথবা কলকাতার গড়ের মাঠে অষ্টারলোনি মিনারে ইংরাজ।

তাই আলী-সাহেবের উদ্দেশ্যে মাথার টুপি খুলেছি যখন তিনি ঐ তথ্যটাই ব্যক্ত করেছেন তাঁর অননুক্রমণীয় রসমণ্ডিত ভাষায়, “কুংবের সঙ্গে পাল্লা দিতে আর কোনো মিনার কখনো মাথা খাড়া করেনি। দীর্ঘ আট শতাব্দী ধরে বহু বাদশা বহু ইমারৎ গড়ে-ছেন, কিন্তু 'কুংবের চেয়েও ভালো মিনার গড়েনি'—এ সাহস কেউ দেখাননি। যে ইংরেজ দিল্লীতে সেক্রেটারি-য়েট, রাজভবন গড়ে, কলকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বানিয়ে নিজেকে অতুল বিড়ম্বিত করেছে সেও কিলক্ষণ জানতো কুংবের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কোনো স্থপতির কর্ম নয়। (অষ্টারলোনি মনুমেণ্টে কেনো কলাপ্রচেষ্টা নেই বলে সেটাকে কুংবের সঙ্গে তুলনা করা অনায়—সেটাকে চটকলের চোঙার সঙ্গে তুলনা করা যায়। বড়বাজারের দালানকোঠার সঙ্গে কেউ তাজের তুলনা করে না।)^{১৫}

মিনার হয়নি, কিন্তু মিনারিকা হয়েছে। অসংখ্য। কিন্তু তাদের আবির্ভাব অন্য উদ্দেশ্যে—কুংবের সঙ্গে পাল্লা দিতে নয়। ইমারতের শোভাধর্ষন করতে। এ বিষয়েও আলী-সাহেবের আর একটি অনুচ্ছেদ অনবদ্য—“আপন মহিমায়, নিজস্ব ক্ষমতায় যে স্তম্ভ দাঁড়ায় তার নাম মিনার, এবং মসজিদ, সমাধি কিংবা অন্য কোনো ইমারতের অঙ্গ হিসাবে যে-মিনার কখনো থাকে, কখনো থাকে না, তার নাম মিনারেট—মিনারিকা। কুংবের পর পাঠান-মোগল বিস্তার মিনারেট গড়েছে :

কিন্তু সেগুলোও কুংবের ধারকাত্রে আসতে পারে না। তাজের মিনারিকা ভূকন্যাব্যাত ; কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি শিল্পী সেখানে নতুনভাবে হার মেনে নিয়ে সেটাকে সাদামাটার চরমে পৌঁছে দিয়ে খাড়া করেছেন। পাছে লোকে তাঁর মিনারিকার সঙ্গে কুংবের



চিত্র—3.9 গজনী মিনার।

তুলনা করে লজ্জা দেয়। তাই তিনি সেটিকে গড়েছেন এমন ন্যাড়া করে যে, কুংবের মন অক্লান্তও কেন কুংব-কে স্বরণ না করে। না হলে যে তাজের সবাত্ত গহনার ছড়াছড়ি তার চরখানা মিনারিকার-হস্তে 'নোয়া-টুকু'-র চিহ্ন নেই কেন? ওদিকে দেখুন, হুমায়ূনের

সমাধিনির্মাতা ছিলেন আরও ঘড়ের তিন তাঁর ইমারতটি গড়েছেন মিনারিকা সম্পূর্ণ বজ্রন করে।”

ইরাজীতে থাকে বলে critical appreciation—
কিম্বদন্ত-মূলক মূল্যায়ন, সেটা আর আমাকে কষ্ট করে করতে হচ্ছে না। অগ্রজ সাহিত্যিক এ ডীল-এ তাঁর তুরূপের টেকাটি পেড়েই লীড দিয়েছেন। তাই বাধ্য হয়ে ও হাত পাশিয়ে আমি বরং সাদামাটা ভাষায় কুৎসের বহিঃরণ ও গাণিতিক পরিচয়টা দিই :

অনুমান করা হয় প্রথম তল পর্যন্ত (29.5 মিঃ) পৌছবার অনেক পূর্বেই কুৎসউদ্দীন আইবকের এন্ডেকাল হয় ; বাকি তিনটি তলা গেঁথে তোলে তাঁর দামাদ ইল-তুৎমিস্। সর্বসমেত উচ্চতা 71.24 মিটার বা 234 ফুট। ভূমি-অংশে বস্তুর ব্যাস 14.32 মিটার, এবং উপরের অংশে 2.75 মিটার। সর্বসমেত সোপান সংখ্যা 379 ; মিনারটি নাকি দূ-দূবার বজ্রপাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ; যথাক্রমে 1326 এবং 1368 খ্রীষ্টাব্দে। প্রথমবার মুহম্মদ তুগলক এবং দ্বিতীয়-বার ফিরোজশাহ তুগলক সেই ক্ষতিগ্রস্ত মিনারের মেরামতি করান। আলাউদ্দীন খিলজীও কিছু মেরামতি করান। আরও পরে 1503 খ্রীষ্টাব্দে সিকান্দার লোদী মিনারের সর্বোচ্চ তলটি পুনরায় মেরামতি করান। প্রাথমিক অবস্থায় এটি চারতলা মিনার ছিল ; ফিরোজশাহ মেরামতির সময় সর্বোচ্চ তলটি দু-ভাগে বিভক্ত করেন—ফলে বর্তমানে ওটা পাঁচতলা। প্রাথমিক অবস্থায় সবটাই ছিল লাল-পাথরের গাঠনি ; ফিরোজশাহ মেরামতির সময় উপরের দুটি তলা সাদা মার্বেল দিয়ে তৈরী করান।

কুৎসের একতলা, দোতলা, তিনতলার ‘সেকশানাল স্ক্যান’ কেমন হবে তা চিত্র-3.1-এ একে দেখাবার চেষ্টা করেছি। অর্থাৎ মনে মনে জমির সমান্তরালে করাচ ঢালিয়ে কুৎসকে বিভিন্ন তলার ‘থোড়-কাটর’ মতো কেটেছি। বাঁরা মনে মনেও কুৎসকে করাচ দিয়ে কাটতে সাহস পাবেন না, তাঁরা না হয় মনে করুন—গাঠনি এ A-A অথবা B-B রেখা পর্যন্ত ওঠার পর বিরাগিবাবার আশীর্বাদে স্ক্রুশরীরে ঠগ্নোদশ শতাব্দীতে হাজির হয়ে ভারত উপর চড়ে নির্ণয়মান কুৎসের বদনখানি নিচু দিকে মূখ করে দেখছেন।

নিচের তলার চম্বিশটি পল-তোলা। পর্যায়ক্রমে একটি গোলাকৃতি, একটি কোণ-বাঁশি। আলী-সাহেবের ভাষায় “একটা বাঁশ, একটা কোণা পর পর সাজানো।” তার মানে নকশায় দেখুন পর পর দুটি বাঁশ কেন্দ্রিকভাবে 30 ডিগ্রি কোণ রচনা করেছে। আর তাকেই দূ-আধখানা করে কোণপালি সাজানো।

দ্বিতলেও চম্বিশটি খাঁজ, প্রতিটি খাঁজ কেন্দ্রে 15 ডিগ্রি কোণ রচনা করেছে। এবং তারা গোলাকৃতি বা ‘বাঁশি’। তিন তলাতেও সেই চম্বিশ ডিগ্রির ছন্দ, অর্থাৎ 15 ডিগ্রির ব্যবস্থাটা পাকা আছে, যদিও এবার বাঁশি খোয়া গেছে, সবই কোণাকৃতি। এর উপরে তুরীয় অবস্থা—না বাঁশির তান, না কৌণিক অন্তরায় ; স্রেফ গোলাকার। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই ছন্দ বদলাবার অনুপ্রেরণাও এসেছে গজনীর মাহমুদী মিনার থেকে, যদিও ব্যাপকতায়, বিন্যাসে, এবং জ্যামিতিক সূক্ষ্মতায় কুৎস তুলনামূলকভাবে তার পূর্ব-সূর্যকে অনেক অনেক পিছনে ফেলে গেছে।

মিনার যে ক্রমশঃ মোটা-থেকে-সরু হয়ে উঠেছে তার মৌল হেতু নিঃসন্দেহে দৃঢ়তা বা ভারসাম্যের প্রয়োজন। যে ইমারত তলায় চওড়া, উপরে সরু তা দীর্ঘস্থায়ী ; যেমন মিশরের পিরামিড—ঝড়ে উল্টে পড়ার সম্ভাবনা সেখানে আদৌ নেই। এখানে কিন্তু স্থপতি ভারসাম্যের প্রয়োজনের চেয়েও এই সরু-মোটর ছন্দটা বেশি প্রকট করেছেন। উদ্দেশ্য : দর্শকে বিভ্রান্ত করা ! অর্থাৎ মিনার বাস্তবে যত উঁচু, এজন্য তার চেয়েও সেটা বেশি মনে হয় যে ছন্দে দিল্লীর জাম-ই-মসজিদ, বা তাজের মিনারিকা মোটা-থেকে-সরু হয়েছে এখানে সেই ছন্দটা আরও প্রকট।

কুৎস সম্বন্ধে একটি বিভ্রান্তিকর তথ্য কেউ কেউ প্রচার করতে উন্মুখ—“কুৎস একটি হিন্দু মানমন্দির।” নিতান্ত অব্যবহৃত উক্তি বলে এ-প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু কয়েকজন স্থাপত্যবিদ্যায় পণ্ডিতের সঙ্গে কথা বলে দেখছি, এ-জাতীয় সংশয় তাঁদের মনেও আছে। কুৎসের গায়ে খোদাই-করা কুরানের বাণীকে তাঁরা মনে করেন পরবর্তী সংযোজন ; নিতান্ত ইসলামী-ঐতিহ্যের ‘স্ট্যালেক্টাইট’—যা ভার-বাহী অঙ্গ হওয়ায় পরবর্তী সংযোজন হতেই পারে না—দেখেও তাঁরা স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেন না। ঐদের ধারণা এ মিনার আদিত নিৰ্মাণ করিয়েছিলেন পৃথ্বীরাজ চৌহান—দ্বিবিধ উদ্দেশ্যে। এক : জ্যোতির্বিদ্যা ; মানমন্দির হিসাবে। দুই : যাতে তাঁর বিধবা কন্যা মিনার-চড়া থেকে প্রতীহ যমুনা দর্শন করতে পারেন। কুৎস থেকে যমুনার যে তদানীন্তন দূরত্ব তাতে প্রাক-গ্যালিলেও যুগে যে মিনার-চড়া থেকে যমুনা দর্শন সম্ভবপর নয়, এটাও তাঁরা মানতে রাজী নন। ফলে, এবিষয়ে কিছু আলোচনা করতে হল।

এ-রকম একটা ভ্রান্ত ধারণার মূলে আছেন কিছু ভারত-অভিমানী তথাকথিত হিন্দু পণ্ডিত, যাঁদের মূলমন্ত্র একটি প্রচলিত প্রবাদে বিধৃত :—“যা নাই

ভায়তে, তা নাই ভায়তে।” অর্থাৎ মহাভারতে সে কথা বলা হয়নি তা অতীতেও ছিল না এবং বর্তমান ভারত-বর্ষে থাকতে পারে না। তাঁদের মতে এয়ারক্রাফট হচ্ছে পদ্রুপকরণের বিবর্তিত রূপ, এ্যাটম-বোমা পাশ্চাত্য ব্রহ্মাস্ত্রের। হিন্দু ঐতিহ্যের এই কট্টর ধনুজাধারীদের মধ্যে সাম্প্রতিককালে খ্যাতিলাভ করেছেন শ্রী পি. এন. ওক। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির নামেই তাঁর চিন্তাধারার পরিচয়। যথা : (i) Delhi's Red Fort is Hindu Latkot, (ii) Lucknow's Imambara are Hindu Palaces, (iii) Some Blunders of Indian Historical Research, (iv) The Taj Mahal is a Hindu Temple, (v) Who Says Akbar was Great?—গ্রন্থগুলি আদ্যন্ত পাঠের মত সময়, কৌতূহল ও মানসিকতা আমার নেই—কিছু কিছু পাতা উল্টে দেখেছি মাত্র। গ্রন্থাগার থেকে সংগৃহীত শেষোক্ত পুস্তকে পূর্ববর্তী পাঠকের একটি কৌতুককর মন্তব্যের কথা মনে পড়ছে। প্রথম পৃষ্ঠায় শিরোনামার পরে পেন্সিলে লেখা আছে—বোধকরি গ্রন্থকারের প্রশ্নের জবাবে : “Entire Forest, Except Oak !”

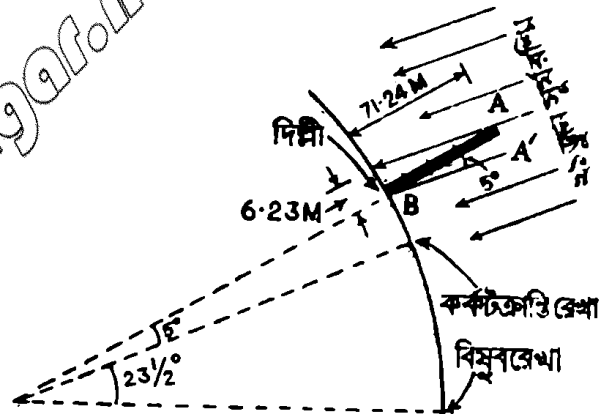
এক শ্রেণীর হিন্দু পাঠক যে এ-জাতীয় গ্রন্থ পাঠ করে আত্মশ্লাঘা অনুভব করেন ও আনন্দ পান—এ কথা অস্বীকার করা যায় না। না হলে প্রকাশক কেন এ ধরনের বই পর পর ছেপে যাবেন? দুঃখ হয়, যখন দেখি এ-সব তথ্যের উপর নির্ভর করে সত্যিকারের ক্ষমতাবান লেখক ও পণ্ডিত তাক লাগাবার চেষ্টা করছেন। ব্যাপক আলোচনা পরিহার করে আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গে ফিরে যাই। কুংবের প্রসঙ্গে।

কয়েক বছর পূর্বে (তারিখ বলতে পারছি না, আমার কাছে যে কার্টিংটা আছে তার তারিখটা পড়া যাচ্ছে না) স্বনামখ্যাত বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রাবন্ধিক শ্রী অরূপরতন ভট্টাচার্য আনন্দবাজারের রবিবাসরীয় অংশে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন : “কুতুব মিনার কি একটি হিন্দু মানমন্দির?” সেই প্রবন্ধে ও-পক্ষের যে যুক্তিগুলি দেখানো হয়েছে সেগুলি আলোচনা করলেই আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারব।

অরূপবাবুর সিদ্ধান্ত দাঁড়িয়ে আছে একটি অত্যন্ত ভুল তথ্যের উপর—কুংব মিনার আলম্ব নয় (ভাটিকাল নয়) দক্ষিণদিকে ৫ ডিগ্রি হেলে আছে। এটি নাকি ঘটনাচক্রে হয়নি, স্থপতিবিদ সজ্ঞানে মিনারকে দক্ষিণদিকে হেলিয়ে বানিয়েছেন—যেহেতু সেটি একটি হিন্দু মানমন্দির। মূল্যবোধে তিনি বলছেন, “আপনারা ইটালী দেশের পীসা নগরীর Leaning Tower বা হেলানো স্তম্ভের কথা শুনেননি।

সঙ্গে সঙ্গে কী-ভাবে এটা সম্ভব হোক অস্বাভাবিক হয়েছেন, এবং পরে, সহজে এটি প্রমাণ করা সম্ভব নয় মনে করে দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। কিন্তু দীর্ঘশ্বাস ফেলার কিছু নেই। কুংব মিনার আমাদের দেশের মাটিতে ঐ জাতীয় একটি হেলানো স্তম্ভ। এটি ভূমির সঙ্গে লম্বভাবে না থেকে দক্ষিণদিকে ৫ ডিগ্রি কোণ রচনা করে অবস্থান করছে। কিন্তু দিল্লীর পটভূমিতে এই যে মানমন্দির, এটির ৫ ডিগ্রি দক্ষিণে হলে থাকার যৌক্তিকতা কোথায়? যৌক্তিকতা আছে...”

অতঃপর শ্রীভট্টাচার্য পাঠককে বুঝিয়ে দিয়েছেন—সজ্ঞানকৃতভাবে মিনারকে দক্ষিণদিকে হেলিয়ে নির্মাণ করানোর উদ্দেশ্য : যাতে প্রতিবছর একুশে জুন তারিখে মধ্যাহ্নকালে মিনারের কোনো ছায়া না পড়ে। যদি নাই পড়ে, তাতে কোন্ চতুর্ভুজ লাভ হবে? সে-কথায় পরে আসছি। আপাতত বুঝে নিই, কেন ঐদিন, ঐসময়ে ছায়া পড়বে না।



চিত্র—3.10 কুংব কি হেলানো মিনার?

একুশে জুন তারিখে মধ্যাহ্নকালে সূর্য ককটিকান্তি রেখার উপর ‘জেনিথ’-এ থাকবে। ফলে, পৃথিবীতে ককটিকান্তি রেখার উপর কোনো সূউচ্চ মিনারের ছায়া মধ্যাহ্নকালে ঠিক তার পাদদেশেই পড়বে। ছায়া দেখা যাবে না। কিন্তু দিল্লীর অক্ষাংশ ২৮½ ডিগ্রি উত্তর। অর্থাৎ ককটিকান্তি রেখা (২৩½ ডিগ্রি) থেকে ৫ ডিগ্রি উত্তরে। সুতরাং, দিল্লীতে অবস্থিত কোনো মিনার যদি দক্ষিণদিকে ৫ ডিগ্রি হেলে থাকে তাহলে তার ছায়া ঐদিন, ঐসময়ে পড়বে না। এ-পর্যন্ত অরূপ-রতনবাবুর সঙ্গে আমরা একমত। যদিও এখনও একটু সন্দেহ আছে তাঁরা চিত্র—3.10 দেখে ততটা বুঝে নেবার চেষ্টা করুন। B-বিন্দু হচ্ছে দিল্লী নগরী। মিনার যদি আলম্ব রেখার (BA) সঙ্গে ৫

ডিগ্রি কোণ রচনা করে BA' অবস্থানে থাকে তাহলে সেটা ত্রিভুজ, ঐসময়ে সম্ভবতঃ সমান্তরাল হয়ে যায় - ছায়া পড়ে না।

এখন আলোচনা স্থিতিস্থাপক বইবে। এক : যে প্রশ্নটা মূলতঃই আছে, অর্থাৎ, তাতে কোন চতুর্ভুজ লাভ হবে? দুই : অরূপরতনাবাদ এ-তথ্য কোথায় পেলেন?

প্রথম প্রশ্নটা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। জ্যোতির্বিদ্যার কোন পরীক্ষার প্রয়োজনে অতবড় মিনারকে হেলানো হল? প্রয়োজন যদি থাকে তাহলে দিল্লী, কাশী, উজ্জয়িনী বা জয়পুরের মন্দির-মন্দিরের এমন হেলানো-মিনার তৈরি করা হল না কেন? বরং মিনার যদি আলম্ব হত তখন যেপে দেখা যেত ছায়ার দৈর্ঘ্য 6.23 মিটার। যে-হেতু মিনারের দৈর্ঘ্য 71.24 মিটার তাই জ্যোতির্বিদ্যার আঁক কষে কলতে পারতেন দিল্লীর অক্ষাংশ = $\tan^{-1} (623/71.24) = \tan^{-1} 0.874 = 5$ ডিগ্রি উত্তর (ছায়া যেহেতু উত্তরে পড়েছে)।

দ্বিতীয় প্রশ্নটা আরও বিজ্ঞানবিরোধী। পাঁচ ডিগ্রি দক্ষিণে হলে থাকার তত্ত্বটা অরূপরতনাবাদ কোথায় পেলেন? তিনি নিজেই থিওডোলাইট ঘাড়ে করে দিল্লী গিয়ে মাপেছেন, তা বলেননি; আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের গ্রন্থ ঘেঁটে এ-তথ্য উদ্ধার করেছেন কিনা সে-কথাও জানাননি। এমন কি প্রী পি. এন. ওক্সের 'Some Blunders of Indian Historical Research' থেকে সংগ্রহীত কিনা তাও বলেননি। শুধু আপত্তিকার মতো তথ্যটা ঘোষণা করেছেন।

আমি সহজলভ্য গ্রন্থে জবাব পাইনি। অথচ অনেক পণ্ডিতই মৌখিক জানালেন, কুংব যে হলে আছে এটা তাঁরা শুনছেন। পাঁচ ডিগ্রি কিনা তা কলতে পারেন না। কথা হয়ে ডাইরেক্টর জেনারেল, আর্কিওলজিকে প্রশ্নটা পেশ করি। তাঁর দপ্তরের অফিসার প্রী আর. সেনগুপ্ত আমাকে অনুগ্রহ করে জানালেন যে, মিনারটি $0^{\circ}46'48''$ হলে আছে (দক্ষিণে কিনা তা-ও বলেননি)¹⁷। সাদা কথায়, একদিকে পৌনে এক ডিগ্রি হলে ক্ষেত্র। পৌনে এক ডিগ্রিকে পাঁচ ডিগ্রি বলা মানে অশেষ প্রায় সাতপ পারসেন্ট ভুল—স্বাভাবিক আসমান-জমিন! নিঃসন্দেহে ফাউন্ডেশন বা বনিয়াদ একদিকে কসে বাওয়ার এটা হয়েছে। কোনো মানমন্দির-স্থপতির সম্মানকৃত কীর্তি নয়!

অরূপরতনাবাদ তাঁর প্রবন্ধের উপসংহারে কলছেন, "কুংব মিনার কারা নির্মাণ করেছেন, সে-কথা সঠিক কলতে পারি না। কিন্তু বিতর্কমূলক সে আলোচনার বাহিরে গিয়েও একথা নিঃসংশয়ে কলা যায় যে,

মিনারটিকে মানমন্দির হিসাবে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে।"

অবশ্য "নিঃসংশয়ে" এই স্থিতিস্থাপক ঘোষণা করার পূর্বে লেখক আরও দুটি যুক্তির অবতারণা করেছেন। যথা :

(i) "এর ভিত্তিভূমি সাতাশটি বাহুবিশিষ্ট একটি বহুভুজ। বাহুরূপটিও সাতাশটি অর্ধবৃত্তাকার ও কৌণিক বিভাগে বিভক্ত আছে।... হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্রের ক্ষেত্রে সাতাশ সংখ্যাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা জানেন যে, চান্দ্র-তিথি সংক্রান্ত বিভাগের যে সাতাশটি নক্ষত্র আছে, সেটি হিন্দু উদ্ভাবন বলেই স্বীকৃতি পেয়েছে..."

এ-ক্ষেত্রে থিওডোলাইট যন্ত্র নিষ্প্রয়োজন। এক থেকে বারো গুণতে পারলেই বুঝতে পারবেন তথ্যটি ভ্রান্ত। ভিত্তিমূলে আছে বারোটি কোণ ও বারোটি বাঁশ, একুনে চম্বিশ ভাগ। 'হিন্দু উদ্ভাবন বলে' চম্বিশকে সাতাশ বলে ধরা হয়েছে; যেমন পৌনে এক ডিগ্রিকে পাঁচ ডিগ্রি!

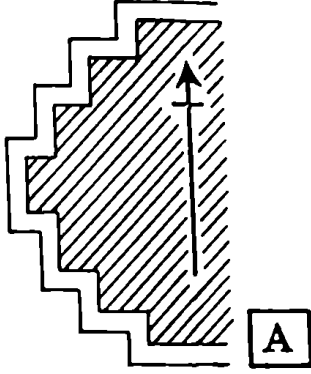
(ii) "মিনারে সাতটি তল".... (সপ্তাহের সাত-দিনের সূচক)—এবারেও গুণে দেখাছি পাঁচটি তলা, আদিতো ছিল চারটি!

হিন্দু-ঐতিহ্যের ধ্বংসাত্মক যত কুযুক্তির অবতারণাই করুন না কেন, যে তথ্যটি অরূপরতনাবাদ 'নিঃসংশয়ে' ঘোষণা করেছেন সেটিই অগ্রাহ্য; আর যেটিকে তিনি 'বিতর্কমূলক' বলেছেন সেটিই ধ্রুব সত্য : এ স্থাপত্য ইসলামী।

কুংব-প্ল্যানিং-এর যে মূল আকর্ষণ, তিনটি বর্গ-ক্ষেত্রে কেন্দ্রের বরাবরে ঘুরিয়ে 'কৌণিক-কোণ' উৎপন্ন করা—এটিকে কেউ কেউ বলেছেন নিছক ইসলামী রীতি। কারণ প্রাক-কুংব হিন্দু শৈলীতে 'কৌণিক-কোণ' ছিল না, ছিল—'সমান্তরাল কোণ'। আলোচনার প্রয়োজনে শব্দ দুটিকে পয়দা করলাম—ফলে একটু বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে।

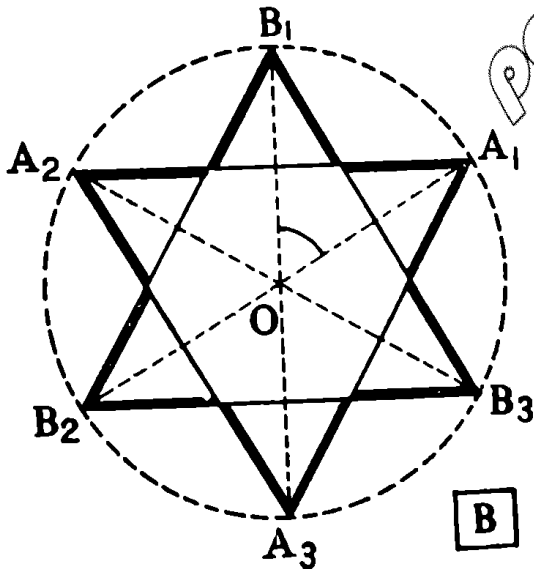
আহিওল, বাদামী, পাটাকদল, কলিঙ্গ, খাজুরাহো প্রভৃতির যে-কোনো মন্দিরে লক্ষ্য করে দেখুন—তাতে যে অসংখ্য কোণ বা খাঁজ আছে তাদের বাহু-গুণি হয় পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা, নয় উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। যেমন দেখা যাচ্ছে চিত্র—3.11 A-তে। অর্থাৎ, পাশা-পাশি দুটি কোণ-এর বাহু ভিতরের দিকে যে-কোণ উৎপন্ন করেছে, তার মাপ 90 ডিগ্রি বা এক সমকোণ। এসেই আমি 'সমান্তরাল কোণ' বলেছি। অপরপক্ষে, কুংবের বারোটি কোণ বাহিরদিকে সমকোণ রচনা

করলেও ভিতর দিকে সমকোণের চেয়ে বড় কোণ উৎপন্ন করছে—কারণ কোণগুলি কেন্দ্রবিন্দুর সঙ্গে যোগকারী রেখার দূ-পাশে সমানছন্দে বানানো। একেই আমি আলোচনার খাতিরে 'কৌণিক-কোণ' বলছি।



চিত্র—3.11 A নাগর স্থাপত্যে গন্দির-ভূমিনকশায় সমান্তরাল কোণের সাধারণ ছন্দ।

স্থাপত্যে এই 'কৌণিক-কোণ'-এর প্রাচীনতম নিদর্শন দেখতে পাচ্ছি মিশরের সম্রাট তৃতীয় রামেসিস-এর ঢালিকার মোহর-চিহ্নে। দুটি সমকোণী তিভুজ—একটি অপরটির উপর এমন সুষম ছন্দে বসানো, যাতে

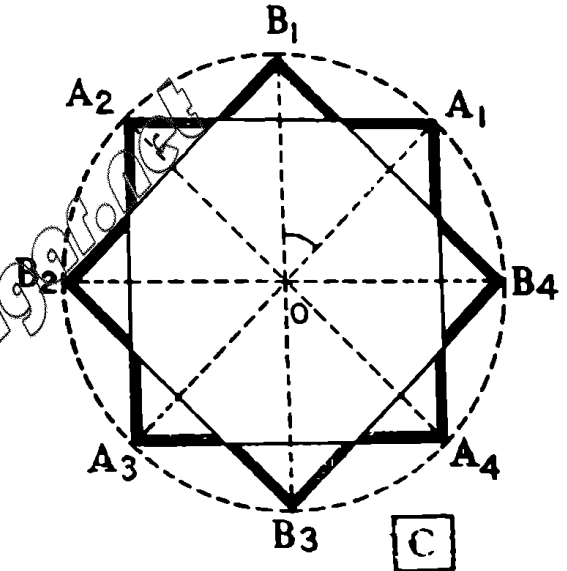


চিত্র—3.11 B মিশরীয় স্থাপত্যে সম্রাট তৃতীয় রামেসিস-এর ঢালিকার নকশা (খ্রিঃ পূঃ ১২ শতাব্দী)—দুটি সমকোণী তিভুজ; এখানে $\angle A: OB_1 = 60$ ডিগ্রি।

কেন্দ্রবিন্দুকে ঘিরে ছয়-পাপড়িওয়ালা একটি তারকার জন্ম হয়েছে (চিত্র—3.11 B)। এই ছয় কোণ বিখ্যাত নকশাটি ইসলামী স্থাপত্যে যুগে যুগে অনুরুত—ভারতে আমরা ফতেপুর-সিক্রি, ইত্যদ্য উদ্‌দৌলা, তাজ

প্রভৃতিতে বারে বারে দেখছি। সমকোণী তিভুজের ঐ ব-ভূমি যেমন ত্রিভুজ-ত্রিভুজের একটি পদার্থটি, তেমনি এই ষট্‌কোণও ইসলামী ভগ্নেত কিশর কিছুর ইঙ্গিতবাহী। গজনী-মিনারে (চিত্র—3.11 C) দেখুন দু-দুটি চতুর্ভুজ মিলে আটটি কোণ উৎপন্ন করেছে—পাশাপাশি দুটি বাঁজ কেন্দ্রবিন্দুতে 45 ডিগ্রি কোণ পয়দা করে। কুংব-স্থপতি ঐ ছন্দটিকেই জটিলতর করেছেন—তিন-তিনটি বর্গক্ষেত্রের সাহায্যে—যেখানে $\angle A_1 OB_1$ কেন্দ্রে 30 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করেছে (চিত্র—3.11 D)।

প্রাক-ইসলাম যুগে কৌণিক-কোণের সাহায্যে স্থাপত্য-নকশা রচিত হয়নি, একথা বলা যায় না।

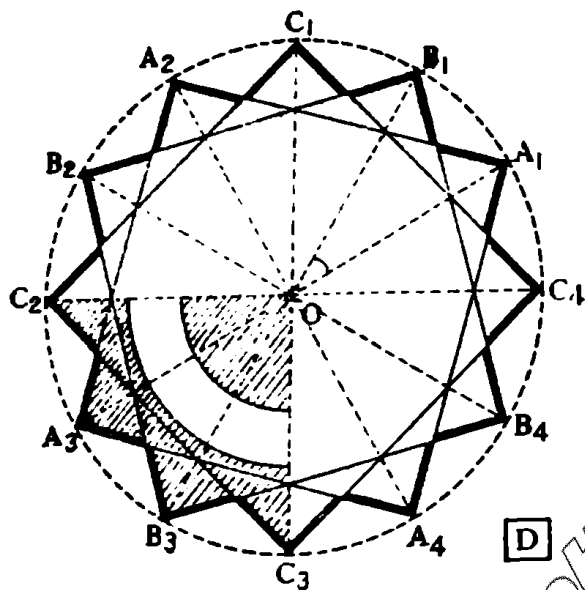


চিত্র—3.11 C ইসলামী স্থাপত্যে গজনী-মিনার (খোদাশ পতাব্দী) দুটি বর্গক্ষেত্র; এখানে $\angle A_1 OB_1 = 45$ ডিগ্রি।

নাগর-স্থাপত্যে—অর্থাৎ কলিঙ্গ-খাজুরাহো-বাদামী-আহিওল-নালন্দা-গৌড়-এ কৌণিক-কোণ আমায় নজরে পড়েন, কিন্তু বেশর-স্থাপত্যে এবং দ্রাকিড়-স্থাপত্যে জটিলতর কৌণিক-কোণের সাহায্যে নকশা তৈরী করা হয়েছে। অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায়। মধ্যপ্রদেশে সিরপুর্নে শ্রীরামচন্দ্র মন্দিরে¹⁸ (সপ্তম শতাব্দী, বেশর-স্থাপত্য) কৌণিক-কোণ পাচ্ছি। স্বাদশ-শতাব্দীতে নির্মিত দুটি মন্দিরের চিত্র এখানে যুক্ত হয়েছে¹⁹ (চিত্র—3.11 E ও F)। সেখানে পাঁচটি এবং আটটি বর্গক্ষেত্রের সাহায্যে কত জটিলতর মন্দির গঠিত হয়েছে তা দেখা যাচ্ছে। সবগুলি কুংব-এর প্রাম্বভী-যুগের ভারতীয় মন্দির যদিও নাগর-স্থাপত্যশৈলীর নয়।

সুতরাং, একথা বলা চলে না যে, ইসলাম এই 'কৌণিক-কোণ'-এর নয়নাভিরাম ছন্দটি ভারতবর্ষে আমদানী করেছে।

বঙ্গ কুংবের কোলাবারাঙ্গার নিচে ঐ স্ট্যালেক্টাইট (stalactite) পদ্ধতিটিকে (চিত্র—3.14) বলা যায় ইসলামের আঙ্গদানী। এ জিনিস হিন্দু-ভারতে ছিল না। এর আঙ্গদজনক—যদিও কিছুটা অন্য ধরনে—দেখা গেছে বোম্বাইয়ে রাজা সারঙ্গনের প্রাসাদে, আশিরীয়

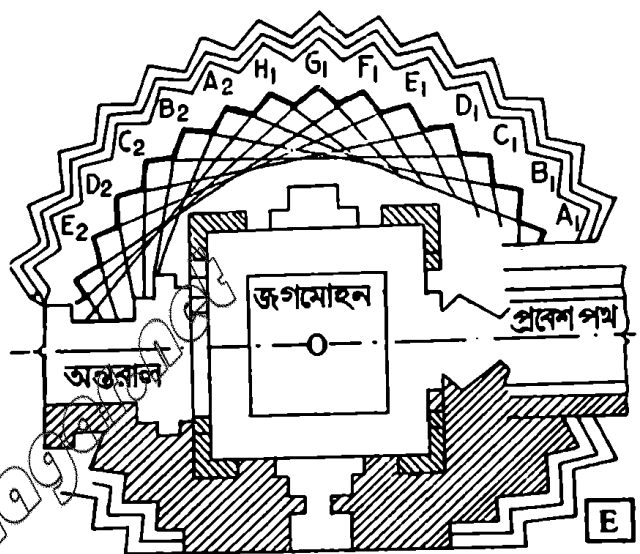


চিত্র—3.11 D ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যে কুংব স্থিতির (কোণের নকশা)—তিনটি কর্ণের ; এখানে দেখাছি $\angle A_1 OB_1 = 30^\circ$ ভিন্ন।

সম্রাট (722-705 B.C.)। এখানে তা রূপান্তরিত হয়েছে কতকগুলি পাশাপাশি সাজানো ছোট ছোট খিলানের আকারে। অনেকটা যেন পাশাপাশি কতকগুলি কুলাঙ্গি বানিয়ে বাইরের দিকে কুঁকে আসা হয়েছে। 'কৌণিক-কোণ' সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলেও বেশ কয়েক বছর স্থানীয় নিদ্রিতর এ কারুকারী জানতো না। কার্নার দ্বারা নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে—সেমন কর্তৃক কুংবের মসজিদে স্থাপিত। সাক্ষ্য-বিস্তৃত হয়েছিল সমগ্র নেই—কার্ন কুংবের ঐ স্ট্যালেক্টাইট কোলাবারাঙ্গা সাতশ বছরেও ভেঙে পড়েনি।

এই মূল্য আরও উল্লিখ করে কই, কুংবের পায়ের যে কণী খোদিত তার কিছুটা কুংব-এর XIX পরিচ্ছেদ থেকে সংকলিত যার শিরোনাম 'অঙ্গদ'। তাতে প্রাসাদ ও কুংবের নকশাগুলি করা হয়েছে এমন কি অনেকের অঙ্গদীসম্মত সন্তান লালিত করাও!

মুজতবা আলী বলছেন,²⁰ "মিনারের মুকুটরূপে সর্বশেষে (যেখানে এখন আলো জ্বালানো হয়) কী ছিল সে-সম্বন্ধে রসিকজনের কৌতূহলের অন্ত নেই (গত শতকের গোড়ার দিকে এক ইংরেজ মেজরের হাতে কুংবের মেরামতির ভার পড়ে। ব্যাল্কনির রেলিঙ-গুলো ছিল না বলে তিনি সেখানে চার-পাখির নিজস্ব নকশা দিয়ে রেলিঙ বানান—নীচের হানিকুম অর্থাৎ মোমাইর চাকের নকশা মূল স্থপতির—এবং মাথায় 'নিজস্ব' কল্পনাপ্রসূত একটা মুকুট পরান। সেইটি



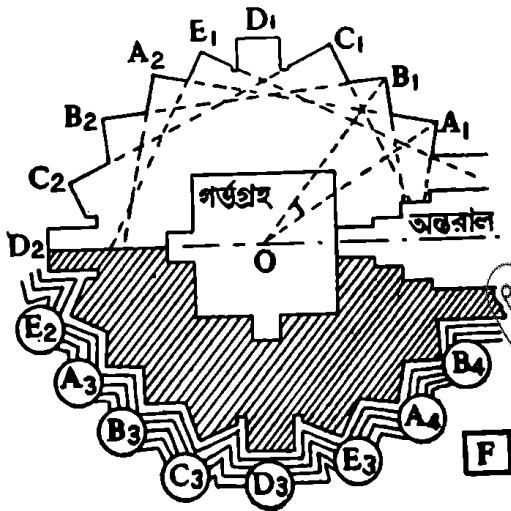
চিত্র—3.11 E বেশির স্থাপত্যে 'দোদবসনানা'-র দম্বল মন্দির (ষোড়শ শতাব্দী)—আটটি বর্গক্ষেত্র ; এখানে দেখাছি $\angle A_1 OB_1 = 11^\circ - 15^\circ$ ।

দেখে দিল্লী-ওয়ালারা সত্যসে তারম্বরে চিৎকার করেছিল। বহু বছর পরে লর্ড কার্জন সেই মুকুট কেটে নীচে নামিয়ে দূরে সরিয়ে রাখেন। দুনিয়ার সবচেয়ে সেরা মিনারকে স্থপতি কী রাজমুকুট পরিয়েছিলেন—সেখানেও তিনি তার রেখে শেষরক্ষা করতে পেরেছিলেন কিনা, তাঁর যে অম্লভূত কল্পনাশক্তি মিনারের সর্বাপেক্ষা স্বপ্রকাশ, সে কল্পনাশক্তি দিয়ে তিনি দর্শককে কোন্ দুলোকে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, কে জানে?"

যাযাবর তাঁর দৃষ্টিপাতে এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন,²¹ "দিল্লীর প্রথম মসজিদে স্থাপত্যের যে নিদর্শন রইল সেটা হিন্দু ও মুসলিম স্থাপত্যের সম্মেলন নয়, গোঁজা মিলন। কুংব মিনার সংলগ্ন মসজিদে অঙ্গ ও তার প্রমাণ আছে।"

মুজতবা আলী-সাহেব কিন্তু একেবারে ভিন্ন সুরে একথা বলেছেন, "মিনারকে কোমরবন্ধের মতো ঘিরে রয়েছে সারি-সারি লতা-পাতা, ফুলের মালা, চক্রে

নকশা। এগুলো জাতে হিন্দু এবং এর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে এক-সারি-অন্তর আরবী লেখার সার—সেগুলো জাতে মুসলমান। কিন্তু উভয় খোদাই-এর কাজই যে হিন্দু শিল্পী করেছেন সে-বিষয়ে কণামাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। গোটা মিনারটির পরিকল্পনা করেছে মুসলমান, যাবতীয় কারুশিল্প করেছে হিন্দু—ভারতবর্ষে মুসলমানদের সর্বপ্রথম সৃষ্টিকার্যে হিন্দু-মুসলমান মিলে-মিশে যে অশ্রুত সাফল্য দেখিয়েছিল সে মিলন পরবর্তী যুগে কখনও ভগ্ন হয়নি, কভুবা মুসলমানের প্রাধান্য বেশী, আবার কোনো ইমারে হিন্দুর প্রাধান্য বেশী। আটশত বৎসর একসঙ্গে থেকে হিন্দু-মুসলমান চিন্তার ক্ষেত্রে, রাজনীতির জগতে সম্পূর্ণ এক হয়ে যেতে পারেনি, কিন্তু কলার প্রাঙ্গণে (স্থাপত্য, সঙ্গীত এবং নৃত্য) প্রথম দিনেই তাদের যে মিলন হয়েছিল আজও সেটা অটুট আছে।”

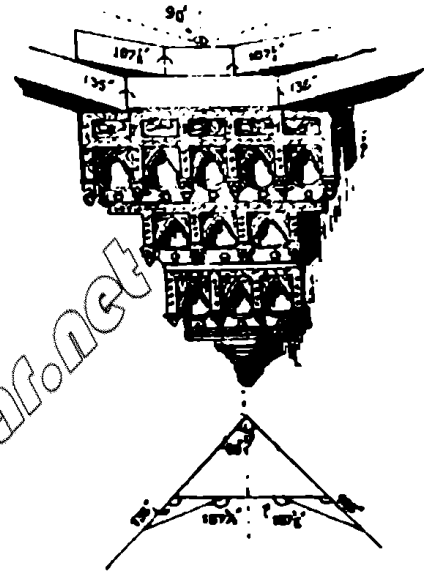


চিত্র-3.11 F বৈশ্ব-স্থাপত্য গুজরাটের মহেশ্বর মন্দির (স্বাদশ শতাব্দী)—পাঁচটি বর্গক্ষেত্র; এখানে দেখছি $\angle A_1 O B_1 = 18^\circ$ ডিগ্রি।

কুওতুল মসজিদের ধ্বংসস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হয় বিজয়ী-বিজিতের সে-স্বন্দর আজ ছায়ার চেয়েও ছায়া। বিস্মৃত ইতিহাসের দেহলিতে ঐ কুংব-চক্করের ডাঙা পাথরগুলোর উপর কান পেতে শুনতে চাই হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোর কথা—দিল্লীর ধুলোয় ধুলোয় মিশে আছে অতীতের যে হাসি-অশ্রুর ঐক্যতান সহযাত্রীর পোটে বুল্ ট্রানজিস্টরের ককশ নিনাদে ছিন্ন হয় ধ্যানমগ্নতা। ইচ্ছে করে গালিবের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে ওদের ডেকে বলি—

“দৈর্ নহী*, হরম্ নহী*, দর নহী*, আস্তা নহী*,
বৈঠে হে* রাহ-গুজর-পে হন, গৈর হসে* উঠারে
কির্দু?...”

না থাক! আট-শতাব্দীর এ-পারে দাঁড়িয়ে “কার জয় হল, কার পরাজয়, কাহার বৃষ্টি কার হল ক্ষয়, কেবা ভালো আর কেবা ভালো নয়” সে-কথা আজ আর মনে রাখব না—প্রত্যাধিনর্মাচিতে আলী-সাহেবের বৃষ্টিজই মেনে নিতে ইচ্ছে করে কুংব-চক্করে দাঁড়িয়ে।

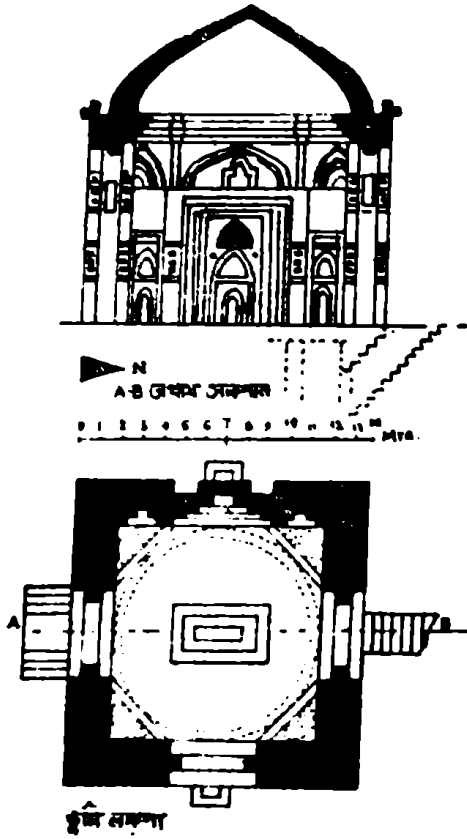


চিত্র-3.12 স্কুইক পর্বতের জর্জরিতক ছন্দ।

ইল্-তুংমিসের সমাধি : কুওতুল মসজিদের উত্তর-পশ্চিমে সুলতান ইল্-তুংমিসের সমাধিসৌধ (চিত্র-3.13) সম্রাট নিজেরই এটি নির্মাণ করে যান। 1235 খ্রীষ্টাব্দে, শাহ-জাদার সমাধি সুলতান দ্বারী—ইমারৎ নির্মাণের মাত্র পাঁচ বছর পরে। পুত্র ও পিতার সমাধিসৌধের প্ল্যানিং, আঙ্গিক এবং আবেদনে আস্-মান-জমিন ফারাক। পুত্রের সমাধিতে নেই গম্বুজ—সমস্তই জমিন-সামিল। পিতার সমাধিতে হয়েছে সেই আশ্চর্য পরীক্ষাটা—চতুষ্কোণ কক্ষের উপর গোলাকার গম্বুজ বসানোর প্রচেষ্টা। ইল্-তুংমিসী স্থাপত্য এতদিনে নিজের বৈশিষ্ট্যটা খুঁজে পেয়েছে। কেন্দ্রস্থ কামরাটি বর্গক্ষেত্র—দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ৭ মিটার। তিন দিকে তিনটি প্রবেশদ্বার ; পশ্চিম-

* “মালিক নয়, মসজিদ নয়, আস্তানা নয়, ধনী কেইনি সোরে
১৫ই শেহেজাদা পথের ধলায়, সেখানে কোকো উঠিয়ে দেবে
যোরে ?”

দিকে, কাষায় দিকে পাশাপাশি তিনটি মিহরাব, কেন্দ্রস্থটি উচ্চতর এবং মাঝে মাঝে মসজিদ। ইমারতের ছাদটি ভেঙে গেছে। ফিরোজশাহ তুঘলক (1351-88) এই গম্বুজটি মেরামত করিয়েছিলেন একবার—কিন্তু আবারও তা ভেঙে পড়েছে। বাহিরের দিক থেকে ইমারত সরল, অনাড়ম্বর—ভিতরে অলঙ্করণের প্রাচুর্য। কুফি ও নাশখ লিপিতে আরবী ভাষায় কুরআনের বাণীর সঙ্গে মিশে আছে নানান নকশার কাজ—তর কিছটা হিন্দু শৈলীর, চক্ৰ-ঘন্টা-শঙ্খল-পদ্ম-হীরক ইত্যাদি, আবার কিছটা ইসলামী জ্যামিতিক নকশা। আমার মনে হয়, এই নকশায় যেন কিছটা ঝড়বাড়ি করা হয়েছে। এত ঠাণ্ডাবন্দ



চিত্র-3.13 ইল্‌তুৎমিসের সমাধি কুংব চক্কর-দিল্লী।

অলঙ্কারের আশিষ্যে চোখ পীড়িত হয়। ফাগুদসন-সাহেব জব্বা এর উচ্চদৃষ্টি প্রশংসা করেছেন,— "One of the richest example of Hindu art applied to Muhammadan purposes." পড়ে মনে হয়েছিল richest মানেই best নয় কি?।

কিন্তু কি-জানি, হয়তো এটিটা শিল্পকল্পেতে অস্বাভাবিক নয়, হয়তো আছে বিংশ শতাব্দীর এই দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গিতে। এত ঠাণ্ডাবন্দ নকশা

হয়তো ভালোই লাগতো সেই চতুর্দশ শতাব্দীর দর্শকের চোখে। শিল্পীকে মোষারোপ না করে বরং গালিবেগের সঙ্গে সদর মিলিয়ে বলি :

"নহী গয় সর ও-বর্গ-এ আদ্রাক-এ মানে, তামাশা-এ নৈরংগ-এ সদরং সলামং ॥"*

এ ইমারতে বিশেষ করে লক্ষ্য করার বিষয় কী-ভাবে চতুষ্কোণ ঘরের উপর গোলাকৃতি গম্বুজটা বসানো হয়েছে। পশ্চাতিটাকে—আগেই বলেছি, বলে স্কুইঞ্চ (Squinch)। চিত্র-3.12-তে শেরশাহ-এর তৈরী মসজিদের একটি অপূর্ব স্কুইঞ্চ দেখা যাচ্ছে। নিচে দেখা যাচ্ছে সমকোণকে কী-ভাবে প্রথমে আট-কোণা ও পরে ষোলো-কোণায় বিভক্ত করা হয়েছে। ইল্‌তুৎমিসের সমাধিতে প্রতিটি কোণায় একটি করে খিলান বানানো হয়েছে, আর তার পিছনদিকটা হয় ট্রাবিয়েট অথবা আকুয়েট পশ্চাতিতে ভরাট করে কিছটা গেথে তোলা হয়েছে। তারপর ঐ আট-কোণা ঘরকে ষোলো-কোণায় পরিণত করা হয়। জ্যামিতিক স্বরূপটোর লিখিত বর্ণনা দিচ্ছি না, চিত্র-3.12 দেখে যদি বুঝতে পারেন, আমি কৃতার্থ ; না পারেন, আমি নাচার !

মেহেরোলীর বাওলী : ইল্‌তুৎমিসের জমানায় নির্মিত। যদিও ঠিক কুংব-চক্করে নয়, আধ কিলো-মিটার দক্ষিণে (চিত্র-3.2), মেহেরোলীতে ; তবু তা এই সপ্তেই উল্লিখিত হল। 'বাওলী' অর্থে জ্বালায়, কুপ জাতীয়। আথম খাঁর সমাধি দেখতে যদি মেহেরোলী যান, এটিও দেখতে পাবেন। পাঁচটি ধাপে নেমে গেছে সোপানশ্রেণী। কুপটি গোলাকার। এখানে জলে গন্ধকের গন্ধ পাওয়া যায় বলে এর নাম 'গন্ধক-কি-বাওলী'। কুপটি যথেষ্ট গভীর। স্থানীয় কোনো কোনো দঃসাহসী জওয়ান অপূর্ব দক্ষতায় উপর থেকে ঝাঁপ খেয়ে পড়ে কুপের ভিতর, দর্শকেরা কিছ মদ্রা কবুল করলেই। আশা করব, তা দেখতে আপনি দিল্লী যাননি।

সুলজান ঘারী : কুংব মিনারের আট কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে মেহেরোলী-পালাম রোডের ধারে হত-ভাগ্য শাহজাদা নাসিরউদ্‌দীনের অনাড়ম্বর কবর। সম্রাট ইল্‌তুৎমিস-নির্মিত। এর দক্ষিণে, একই চক্করে সমাধিস্থ আছেন সুলতান ইল্‌তুৎমিসের আরও

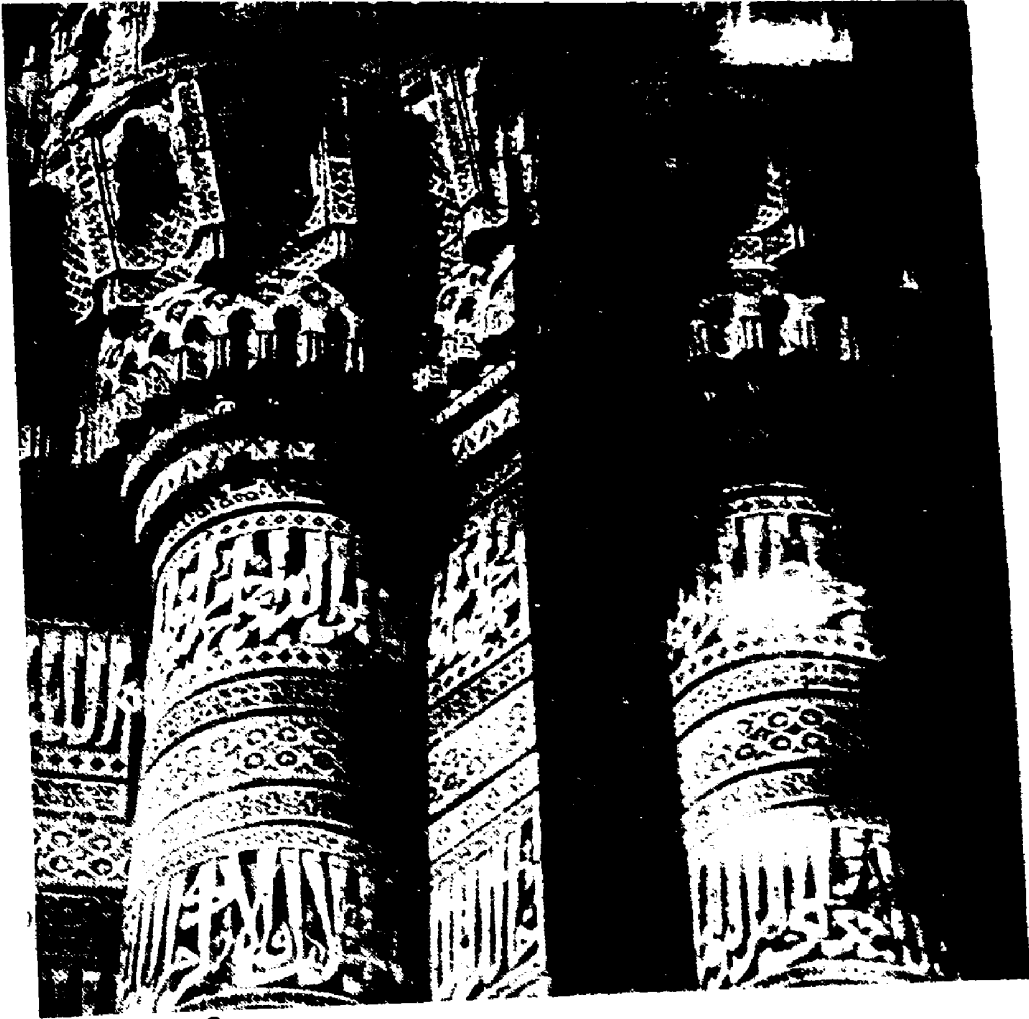
* "অর্থ বৃদ্ধির যোগ্যতা যদি না-ও হয় কোনাধন, তবু হুপের বদবৌচড়া দেখার লাভটুকু বেঁচে থাক ॥"

(আবু সরীদ আইয়ুবকৃত অনুবাদ।)

দুটি অযোগ্যপুত্র মুহম্মদ উদ্দীন ফিরোজশাহ এবং মুহম্মদ উদ্দীন বাহরামশাহ। সুলতান দ্বারা মক্কার নানান কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—ইতিহাস ও স্থপত্যের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। প্রথম কথা, কচ্ছ-অঞ্চলের দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে এইটিই ভারত-ভূখণ্ডে প্রাচীনতম মুসলিম কবর, রাজবংশীয় কোন মরদেহের উপর। পাকিস্তান হিসাবে কচ্ছ, মুলতান ও লাহোরের কথা বাদ দিলে বর্তমান ভারতে এটিই প্রাচীনতম (চিত্র—3.15)।

স্থলে গম্বুজ (G), বার পশ্চিমে ইকন (I); পূর্ব-প্রান্তেও একটি অলিন্দ। কেন্দ্রস্থলে অষ্টভূজাবিশিষ্ট মূল সমাধিকক্ষ। সেখানে যাবার পথ সিঁড়ি বেয়ে, ভূগর্ভে। আট-কোণা কেন্দ্রীয় কক্ষটির উপরে প্রত্যাবর্তিত গম্বুজটি কিন্তু অনুপস্থিত। বরং ঐ ভূগর্ভস্থ-কক্ষে চারটি প্তম্ভের উপর প্রায়-সমতল ছাদ বানানো হয়েছে।

এই রচনাশৈলী হিন্দুস্থানে অনন্য। এই বিচিত্র প্ল্যানিংটি ইল্-তুংমিস্ কী-করে কল্পনা করেছিলেন



চিত্র—3.14 কুংবের স্ট্যালেক্টাইট ও কুংবের কবর।

কুওওতুল-ইসলাম মসজিদের মতো এর উপাদানও ধ্বংসপ্রাপ্ত হিন্দু মন্দির থেকে সংগৃহীত। স্থপত্যিকার এর প্ল্যানিং-এ দেখিয়েছেন অশেষ কৃতিত্ব। সংলগ্ন ভূখণ্ড থেকে তিন মিটার উঁচু ভিত্তির উপর একটি বর্গক্ষেত্র, তার চারপ্রান্তে চারটি অনাড়ম্বর গম্বুজ সমাধিসৌধকে দৃঢ়তা দান করেছে। পশ্চিম-প্রান্তে এক সারি প্তম্ভসম্বন্ধিত জিলান (L); কেন্দ্রে-

সে ইল্লিত কাগু'সন, হাভেন বা পার্সি ব্রাউন দিয়ে বানানি। পার্সি ব্রাউন শব্দ কল্পনাময়। “অনুপম আরোহণ অনেক অনেক দেশের রাজ-পরিবারের সমাধি-চত্বরে করা হয়েছে সেই মিশরীয় কল্যাণ-মুখ থেকে।” অম্মার ধারণা এ পরিকল্পনাটি সম্রাট ইল্-তুংমিস্ আমদানী করেছিলেন তিরেরিরাস-এর বৃদ্ধিক মসজিদ থেকে। বাস্তব ভেদে দূর-অন্ত-সে মসজিদের

প্ল্যান-সেকশনও আমি দেখিনি, তবে নাসির-ই-খসরো ১০৪৭ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত একটি ইতিবৃত্তে^১ বলেছেন—
 'মুখিকা-মসজিদে এইরকম একটি বগফেস-আকারের চত্বরে আছে অষ্টভুজ-বিশিষ্ট, গম্বুজ-বিহীন এক সমাধিক্ষেত্র। যার গভীরে আছে সন্তরজন পরগম্বরের সমাধি।' হয়তো সেইটিই এই প্ল্যানিং-এর গণ্ডগোষ্ঠী!

সমাধিসৌধে—ইমরুদ-মক্‌বারা থেকে সেকেন্দ্রা, ইব্রাহিম উদ্‌দৌলা, তাজ পার হয়ে সফদরজুং-এর সমাধি-ইসতক সর্বত্রই একটা দার্টের ব্যঞ্জন। দেহাবশেষ জমিন-সামিল; অথচ ইমারুৎগুলি মাটি ছেড়ে আশ্মানের দিকে উৎক্লিষ্ট-বাহু। শাহ-এন-শাহ, বেগম-সাহেবা অথবা উজীরে-আজম তাদের জিন্দগিতে কী-পরিমাণ মহিমময় ছিলেন সেই জৌলুসের জিন্দুল্লা ইমারৎ যেন আজও সোচ্চারে ঘোষণা করতে চায়। জরাগ্রস্ত সুলতান সামস-উদ্‌দীন ইল্‌তুৎমিস্ নিজ জমানাতে নওজোয়ান

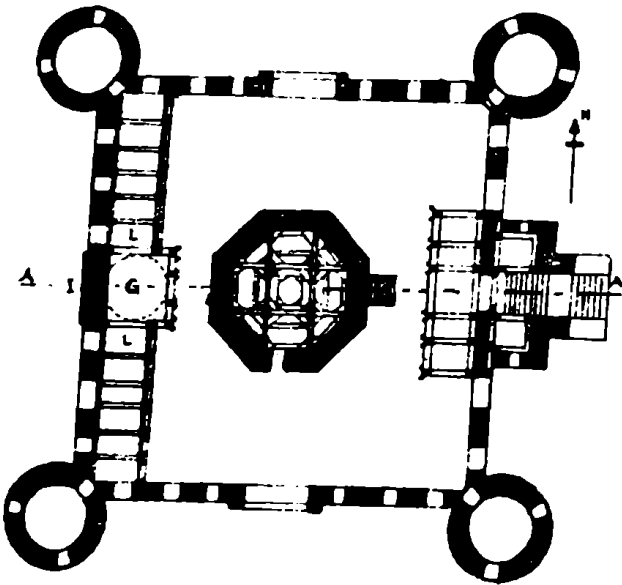
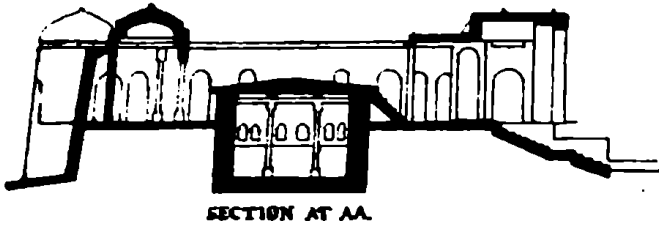


FIG--3.15 সুলতান ঘরী (দিল্লী)।

শাহজাদার মক্‌বারা গঠনের সময় সে-ভাবে ভাবতে পারেননি।

ঐ ইমরুৎ নেই কেনো! আকাশচুম্বী মিনার-মিনারিকা, ক্ষীণতাদর পূর্ণহস্তের গম্বুজ, নৃত্য-পটঙ্গীর মতো তব্বী ছত্রী, অলসসম্মাধাপনের

চত্বর অথবা সারবাণ্ডি প্রহরীর মতো সার সার গুলদস্তা। শোক-ভারাক্রান্ত বৃন্দ সুলতান তাঁর যুবক-পুত্রের অকালপ্রয়াণে যেন ক্ষোভে, লজ্জায়, অনুশোচনায় মাটিতে মিশে যেতে চান। মসন্নে বসার কথা যেন ওজোয়ানের, সে মিশে গেল মাটিতে, আর তস্বি-ছড়া হাতে নিয়ে মক্কার দিকে যার রওনা দেবার জমানা সে পড়ে রইল তক্ত-ই-সুলেমানে। যেদাহা-শাম শাহ-জাদার হিজরে শাহ-এন-শাহর কলিজা তওবা-বাহিতে দম্ব হতে থাকে। তাই এখানে দার্ট অপাংস্তেয়। সবই জমিন-সামিল।

সুলতান ঘরী মক্‌বারার সামনে দাঁড়িয়ে হয়তো আপনার মনে পড়ে যাবে আর একটি জমিন-সামিল মক্‌বারার কথা। অনুরূপ পরিকল্পনা—যদিও ভিন্ন দেশের, ভিন্ন কালের এবং ভিন্ন আবেদনের। আমি পারীতে অবস্থিত বিশ্ববিজয়ী নেপোলিয়ন সমাধি-সৌধের কথা বলছি। স্থপর্তিবিদকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—সম্রাটের সমাধি ভূগর্ভে কেন? জবাবে তিনি নাকি বলেছিলেন, 'জীবিতকালে যার সামনে কোনো মরমানুষ মাথা সোজা করে দাঁড়াতে সাহস পায়নি,—মৃত্যু তাঁর হৃদস্পন্দনটাই শব্দ বন্ধ করেছে, তাঁর মহিমায় কোনো মালিন্য লাগেনি। এখানে এলে সবাইকেই তাই মাথা নিচু করতে হয়!'

ইল্‌তুৎমিস্ বোধকারি সে-রকম কোনো কিছু বলতে চাননি।

চোখবুজে ঐ চুনবালিখসা ইমারতের দিকে তাকিয়ে দেখুন—স্পষ্ট দেখতে পাবেন, শাহজাদার খুন-রঞ্জিত হাত দুটি দিয়ে সুলতান তাঁর মৃথ ঢেকেছেন! ক্ষোভে, লজ্জায়, অনুশোচনায়! তাঁর সাদা-দাড়িতে লেগেছে রক্তের ছোপ—খুন আর আঁসু মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে! কান পাতলে আজও শুনতে পাবেন ইমান-ইনসাফের মালিকের সেই কলিজা-বিদীর্ণ করা আর্ত হাহাকার আজও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ঐ ভগ্ন ইমারতের আর্ক-বৃত্তবে :

দো লব্‌জৌ মে পুশিদা এক মেরি কহানী হয়,
 এক লব্‌জ্ মহস্বৎ হয়, এক লব্‌জ্ জওয়ানী হৈ—
 আঁসুকে মেরে লে-কর দামন্-পো জরা যাঁচ্‌চো
 জম্ যায় তো খুন হয়, বহ্ যায় তো পানি হৈ ॥*

* শব্দ দুটি কথায় বলে যার আমার কাহিনী। এক কথা : আমার পুত্রস্নেহ; আর কথা তার যৌবন। এই কলিজা-বিদীর্ণ করা নিষাসকে তোমার আঁচলে কষে দেখ—যদি জমে যায় তো বন্ধবে তার রক্ত, আর যদি বহে যায় তো বন্ধবে সেটা আমার চোখের জল ॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

খিলজী-বংশ

উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা	সময়কাল (খ্রিঃ) খ্রীষ্টাব্দ
জালালউদ্দীন খিলজী কর্তৃক দিল্লী অধিকার	1290
জালালের মৃত্যু ও আলাউদ্দীন খিলজীর অভিষেক	1296
কুওওতুল মসজিদ সম্প্রসারণ, কুৎব মিনারের মেরামতি ও নিজ সমাধিসৌধ নির্মাণান্তে আলাউদ্দীনের মৃত্যু	1316
দেবলাদেবী-খ্যাত শাহজাদা খিজির খাঁর হত্যা	1316
বংশের পঞ্চম ও শেষ সুলতান কুৎবউদ্দীন মুবারকের মৃত্যু	1320
অনধিকারী নাসিরউদ্দীন খস্রৌ-এর অভিষেক ও মৃত্যু	1320

খিলজী-বংশের শাসনকাল—ভারত-ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে অকিঞ্চিৎকর, মাত্র ত্রিশ বছর—1290 থেকে 1320; এই বংশের আধ-উজ্জ্বল সুলতানের মধ্যে একটি নামই ইতিহাসে প্রোজ্জ্বল : আলাউদ্দীন শিকান্দার সানী মুহম্মদ শাহ বা সংক্ষেপে আলাউদ্দীন খিলজী।

দাস-যুগে দিল্লী-সুলতানীর চৌহান্দ ছিল উত্তর-পশ্চিমের সীমিত ভূখণ্ডে; আলাউদ্দীন সেটাকে দক্ষিণ ও পূর্বভারতে বিস্তৃত করেন। নামমাত্র নয়, রীতিমতো দখলদারী শাসন-ব্যবস্থা। আলাউদ্দীনের দুর্বীর বিজয়-অভিযান, সাফল্য ও শাসন-ব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ ও পর্যালোচনা ঐতিহাসিকদের জন্য মূলতুর্বা থাক; আমরা শুধু তাঁর স্থাপত্য-কীর্তি-গুলির মূল্যায়ন-মানসে ঐ সুলতানের ব্যক্তি-চরিত্রটা বুঝে নেবার চেষ্টা করব। আলাউদ্দীন-নির্মিত যাবতীয় স্থাপত্য-নিদর্শনে, কুওওতুল মসজিদ সম্প্রসারণে, এবং বিশেষ করে, আলাই মিনারে একটা আকাশচুম্বী দাটের, গগনস্পর্শী আত্মভরিতার ব্যঞ্জনা আছে—সেটার মূল কোথায় এটুকু বুঝে নেবার চেষ্টা করব। কিন্তু আলাউদ্দীনের আগে তাঁর চাচার কথা বজতে হয়। জালালউদ্দীনের কথা।

দাস-বংশের শেষ সুলতানের অপদার্থতার সুযোগ নিয়ে আফগান-বংশীয় জালালউদ্দীন দিল্লী অধিকার করলেন 1290 খ্রীষ্টাব্দে। জালালের বয়স তখন সত্তর।

তাঁর দুই পুত্র; জ্যেষ্ঠ আরকালী খান কিছ্র উদাসীন, দার্শনিক প্রকৃতির, ধর্ম-ধর্ম ব্যতিক এবং কনিষ্ঠ রুকনউদ্দীন নেহাই নাবালক। তা হোক, সেজন্য সুলতানের কোনো দুশ্চিন্তা নেই। উত্তরাধিকারী হিসাবে তিনি নির্বাচন করে রেখেছেন ভ্রাতুষ্পুত্র আলালকে। ছোটভাই শিহাব-এর এন্তেকাল হয়েছে অনেকদিন, আলাল তখন শিশুমাত্র। তাই নিজ সন্তানদের সঙ্গে জালাল এই ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে মানুস করেছেন নিজের সংসারে। আলাউদ্দীন অত্যন্ত দক্ষ, কমঠ, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, সব দিক থেকেই সুলতান হবার উপযুক্ত। তাই উত্তরাধিকার-প্রসঙ্গে সুলতান নিশ্চিন্ত ছিলেন।

তক্ত-তাউসে আসীন হয়ে জালাল রাজ্যবিস্তারে মন দিতে পারেননি। প্রথমতঃ দরবারে ক্ষমতাজালী আমীর-মালিকের দল তখনও এই নবাগতকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি; দ্বিতীয়তঃ, উত্তরদিক থেকে হিজল ক্রমাগত মোগল আক্রমণ। জালাল মোগল-সর্দার হালাকুকে পরাস্ত করেন এবং বহু মোগল-সৈন্যকে গ্রেপ্তার করে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করেন। তারা দিল্লীতেই নতুন জীবন শুরু করল স্থায়ীভাবে। তাদের নাম হল : নয়া-মুসলমান। এদের সঙ্গে প্রাচীন মুসলমানদের লড়াই-কাজিয়াও লেগে থাকে নিত্য ত্রিশ-দিন!

জালালের প্রধানা বেগম মালিকা জাহান ছিলেন

এক জাহাঙ্গীর মহিলা। সুলতান যে তাঁর প্রাচুর্য্যকে নেকনজরে দেখেন এটা তাঁর বরদাস্ত হয় না। আর হবে নাই বা কেন? অমন ঈদের চাঁদের মতো রক্ত-উদ্দীন থাকতে—যড় ছেলে আরকালীকে তিনি ধর্তবোর মতো ধরেন না, ওটা বাওয়া—তাঁর দেবরপুত্র কর্তার গদীতে বসবে এটা সহ্য হয়? জাগাল বৃষ্টি-মান, এ সমস্যার সমাধান সহজেই করলেন—সাপও মরুস, লাঠিও ভাঙল না। কন্যাটিকে অশ্লিষ্ট করলেন প্রাচুর্য্যের হাতে। দেবরপুত্র নয়, আলাল হয়ে গেল জাগালের ঘরের দলাল : বেগমসাহেবার দামাদ।

সুলতান থাকেন দিল্লীতে, মেয়ে-জামাই 'কারাতে'। এলাহাবাদের কাছে বমুনাভীরে যুবরাজের কিল্লা। সেখান থেকে আলাল বদশাহের তরফে একে একে জয় করলেন মালোরা, ভিলসা, এবং সবশেষে দেবগিরি। শেষোক্ত রাজ্যের বাদশাহ রামচন্দ্রদেবের পরাজয়ে আলোউদ্দীন লাভ করলেন বিপুল সম্পদ। দেবগিরি লুণ্ঠন করে এবং সশস্ত্র সত্ৰ অনুযায়ী অতুল ঐশ্বর্য নিয়ে এলেন নিজ কিল্লার। রামচন্দ্রদেবকে দিতে হরেছিল পঞ্চাশ মণ সোনা, সাত মণ মুক্তা, চাব্বিশটি হাতী এবং সহস্রাধিক রণঅশ্ব! এই প্রথম দাক্ষিণাত্য-বিজয়!

দুস্তের মধ্যে বার্তা পেয়ে সুলতান উচ্ছ্বসিত! তখনই, ভাইপোকে অভিনন্দন জানাতে এলাহাবাদ-মুখো রওনা হতে চান আর কি। বারণ করেছিল সভাসদেরা, বিশেষ করে ওর ব্যক্তিগত পার্শ্বচর অধম চাপ। ফলোঁছিল, এমন কাজটি করবেন না, শাহ্-এন-শাহ্! কাফেরদের রক্তভাঙ্গর লুঠ করে শাহ্জাদার শির এখন বে-এজিয়ার! আপনি আগ-বাড়িয়ে গেলে সে ভাববে সুলতান বৃকি তাঁর হিসসা আদার করতে এসেছেন।

শুনে, অট্টোহাস্যে ফেটে পড়েন সুলতান : কী বে-দিল্, বে-ওকুফ, বাওয়ার মত কথা! আরে হিসসা নেব কেন? আমি সুলতান মোজা-আনাই তো কেড়ে নেব, সামিল করব তাহ খানায়। তারপর গোটা তন্তু-সঙ্গেমান-সঙ্গে সব কিছু ওয়াপস্ দেব এ আলাল-খেটাকেই! কেন, তোমরা জান না এ আলালই হচ্ছে এই বড়টার দিলকা-কিল্লা? হিন্দুস্থানের হব্দ-সুলতান? তোমরা না জানলেও সে জানে।

সম্পূর্ণ অস্বস্তি এমন কি দেহরক্ষী ব্যতীতকে সুলতান বজরার ঢেপে রওনা দিলেন বমুনা বেয়ে। এসে উপনীত হলেন ত্রিবেণীর ঘাটে। তারিখটা উল্লেখ জুলাই : 1296 খ্রিষ্টাব্দ। সেরায়েই আলোউদ্দীন খিলজী কি-জানি-কি-করে চলে গেল তারাম চৌধুরী-স্থানের মালিক।

ঐতিহাসিক জিয়া বারানি সংক্ষেপে করেছেন।

"স্নেহের ঋণ এভাবে রক্ত দিয়ে পরিশোধ করার নৃশংস ঘটনা এমন কি কাফেরদের ইতিহাসেও দুর্লভ।"

মালিকা জাহান অশ্রান্ত সাধনানী। কত'র বে-অকুফিতে আদৌ সামিল হননি। স্বামীর সঙ্গে এলাহাবাদ যাননি, যেতে দেননি শাহ্জাদাদেরও। কর্তামশায়ের এশ্রয়কাল হয়েছে সংবাদ প্রাপ্তিমাট বেগম-সাহেবা মস্নদে বসিয়ে দিলেন কোজপৌছা শাহ্জাদা রুক্ন-উদ্দীনকে। তন্তু-বিরক্ত যুবরাজ আরকালীখান্ এই কিল্লীশী রাজনীতির রুদ্ধ বাতাস থেকে মদ্রি পাওয়ার বাসনায় দিল্লী ত্যাগ করে চলে গেলেন মুলতানে। একান্তে সাধন-ভজন, কাব্যপাঠ করে কাটিয়ে দেবেন জীবনটা : ওমর-খৈয়াম, ফির-দৌসী, রুমী আর সূফী পণ্ডিতদের বাণী পাঠ করে।

প্রাণের অশ্রান্ত ধারাপাত অগ্রাহ্য করে উল্কার বেগে আলোউদ্দীন খেয়ে এল দিল্লীতে। সে প্রচণ্ড বেগে হতচকিত মালিকা জাহান পাঞ্জিয়ে বাঁচলেন। আধম চাপ-এর তত্ত্বাবধানে শিশুপুত্রকে নিয়ে চলে গেলেন মুলতানে। বেচারী আরকালী। তার কাব্যপাঠ মুলতবী রইল—রিস্তাদারদের খিদ্মতে ব্যস্ত হতে হল তাকে।

আলোউদ্দীনের অভিষেক হল দিল্লীর লাল-কিল্লায়। না, বর্তমানের ঐ লাল-কিল্লায় নয়, কল্বন-নির্মিত এ-প্রাসাদ বর্তমানে নিশ্চিহ্ন। তন্তু-তাউসে আসীন হয়েই সম্রাট আলোউদ্দীনের প্রথম হুকুমনামা হল : পলাতক আত্মীয়দের পাকড়াও করে নিয়ে এস।

আলোউদ্দীনের সহোদর উলুখ খান্-এর নেতৃত্বে বাদশাহী ফৌজ ছুটল মুলতানে। আরকালী নিতান্ত অপ্রস্তুত। জুড়াই-এর জন্য সে বিল্কুল তৈয়ার নয়। তার এক-নম্বর কসদুর—সে শাহ্জাদা, স্বর্গত সুলতানের জ্যেষ্ঠপুত্র, তন্তুর হক্-হিস্যাদার ; দ-নম্বর অপরাধ আশ্মা আর ভাইজানকে সে দরওয়াজার বাহির থেকে হাঁকিয়ে দেয়নি। আজীবন যে রাজনীতিকে পরিহার করতে চেয়েছে সেই জঘন্য রাজনীতিই নিমজ্জমানের পায়ে শৈবালদামের মতো তাকে আঁকড়ে ধরল। সুলতানী ফৌজ মুলতানে পৌঁছে বিনাবাধায় হাজির হল আরকালীর গরীবখানায়। উলুখ খান্ বোধকরি এতবড় যুদ্ধ জয় করে কী করবে ভেবে পায়নি। বিজয়ী সেনাপতির প্রথম কর্তব্য হিসাবে সে সবার আগে পাইকারীহারে অশ্ব করে দিল বন্দীদের। তারপর বীরবিধমে শিলাহু-সালার নিয়ে এল এক অশ্ব নর-নারীর মিছিল, দিল্লীতে নয়া সুলতানের শাহাদুদী, দ-ট শালক, সদা-প্রয়াত জাগালউদ্দীনের প্রিয় বন্দ

আধম চাপ।

শুধু হ'ল আলাউদ্দীনের সুবিখ্যাত সুলতানী।
পরের কাহিনীগুলি আমাদের অজানা নয়।
ভারতেতিহাসের পরীক্ষায় এই সুলতানের অপকীর্তি-
গুলি রাত জেগে মূখস্থ না করলে স্বাধীন-ভারতের
ছাত্রছাত্রী ক্লাস প্রমোশন পায় না। গুজরাট, রণথম্ভোর,
চিতোর, মালোয়া এবং দাক্ষিণাত্য বিজয়। সেনাপতি
মালিক কাফুরের অপ্রতিহত বিজয় অভিযান। বলতে
ভুলেছি, ঐ মালিক কাফুরই স্বহস্তে সুলতান জালাল-
উদ্দীনের বক্ষপঞ্জরে বসিয়ে দিয়েছিলেন তার বজ্র,
বজ্রার ভিতর—তারই পুরস্কার তার সেনাপতিপদ।

গুজরাটের হিন্দুরাজা রায়কর্ণদেবের মহিষী কমলা-
দেবী ছিলেন অসামান্য সুন্দরী। তাঁর কন্যা দেবলা-
দেবীও নাকি বেহেশত-এর হুরী। সংবাদ শ্রবণে নয়া-
সুলতান হুকুম দিলেন, গুজরাট শুধু জয় করলেই
চলবে না, জ্যান্ত ও অক্ষত অবস্থায় ধরে আনতে হবে
মা-মেয়েকে! দূটোকেই চাই! কমলাদেবীকে তিনি
হারেমজাত করোছিলেন, পারেননি দেবলাদেবীকে।
সে কাহিনী পাবেন আমীর খসরো-এর কাব্যগাথায়।

চিতোরও জয় করোছিলেন, লাভ করেনি পশ্চিমী
নারী। অবন ঠাকুর আর টডের কলমে জহর-রতের
অগ্নিকুণ্ড থেকে তিনি পুনর্জীবিতা হয়েছেন।
সেসব কীর্তিকাহিনী থাক। আমি বরং রমেশ
মজুমদার মশায়ের "একটা অনূচ্ছেদ নিজের ভাষায়
শোনাই—যা-থেকে আলাউদ্দীনের স্থাপত্য-মূল্যায়নে
কিছুটা সুবিধা হবে :

কৃত্রিম সাফল্যে আলাউদ্দীনের মাথা ঘুরে গেল।
সম্ভব-অসম্ভব নানান পরিকল্পনা তাঁর মাথায় দানা
বেঁধে উঠত। পার্শ্ববর্তী কোন হিন্দু রাজার পরমা-
সুন্দরী স্ত্রী-কন্যা আছে সংবাদ পেলেই সেরাজ্য জয়ের
কামনা উদগ্ৰ হয়ে উঠত সুলতানের। একদিন তিনি
তলব করলেন কাজী আলা-উল্-মুলককে। কাজী-
সাহেব পণ্ডিত ব্যক্তি—প্রখ্যাত ঐতিহাসিক জিয়া বারনির
চাচা। সুলতান যখন শাহজাদা হিসাবে কারা-তে
সুবেদারী করতেন, তখন এই কাজী-সাহেব ছিলেন
তাঁর দক্ষিণ হস্ত; বর্তমানে দিল্লীর কোতওয়াল। কাজী-
সাহেব হুকুরে হাজির হলে সুলতান তাঁকে জনান্তিকে
ডেকে বললেন, দুটি বাসনা আমার দিচ্—এ পয়দা
হয়েছে। কাজে হাত দেবার পূর্বে আপনার সায়
চাইছি।

কাজী কনিষ্ঠ করে বললেন, মহান শাহ-এন-
শাহের অসীম অনুগ্রহ। ফরমাইয়ে?

এক নম্বর : আমি রসুলের মতো একটি ধর্ম্মও

প্রচার করতে চাই। দুনিয়ার আমার পরিচয় হবে
দুনিয়ার রসুল। দুনিয়ার মালিক হয়েছি এবার
'দীন'-এর মালিক হব। দু-নম্বর : আমি ব্যক্তি-পরিধ্বী
জয় করে দ্বিতীয় সেকেন্দার শাহ খেতাব নেব।
আপনি কি বলেন?

কাজী-সাহেব নির্বাক। শুধু তাঁর শ্বেত শরুতে
হাত বুলাতে থাকেন। সুলতান বিরক্ত হয়ে বলেন,
আপনি তো কোন সলাহ দিলেন না?

কাজী বললেন, আপনি তো সলাহ চাননি
জাহাঁপনা, চেয়েছেন—সায়!

সুলতান শশবাস্তে বলেন, না, না, এ বিষয়ে যদি
আপনার কোন সলাহ থাকে তাহলে তাও অকুণ্ঠভাবে
আমাকে বলুন?

কাজী-সাহেব বলেন, অভয় বচন দিলেন তখন
বলি, দু-নম্বর পয়গম্বর বনা এমনকিহু কঠিন নয়,
তবে সে-ক্ষেত্রে আপনাকে ঐ তক্ত-তাউস থেকে নেমে
আসতে হবে। আমি বতটুকু পড়াশুনা করেছি, তাতে
দেখোছি, নয়া-ধর্ম্মের প্রবর্তকেরা মস্‌নেদে বসেন না।
বৃন্দদেব বসেননি, মুসা বসেননি, জরথুষ্ট্র-কর্মান
মহাবীর বসেননি, হে'দুদের মুনির্জাফরা বসেননি এবং
পয়গম্বর রসুলও বসেননি...

সুলতান বে-দিল! অনেকক্ষণ চিন্তা করে
সিম্বাস্তে এলেন—নাঃ! দু-নম্বরী পয়গম্বর বনা তাঁর
কিস্মতে নেই। তক্ত-তাউস থেকে নেমে দাঁড়ানোটা তাঁর
পোষাবে না। কিন্তু দু-নম্বর সেকেন্দার শাহ কনতে
বাধা কি?

—একটিই বাধা জাহাঁপনা। আপনার বে আরিস্তত্ব
নেই?

—আরিস্তত্ব! সেটা কোন-জাতের চিড়িয়া?
তামাম হিন্দুস্থানে নেই?

কাজী বুঝিয়ে বলেন, আরিস্তত্ব ছিলেন মর্যাসি-
ডোনীয় সেকেন্দার শাহর উজীর-এ-আজম! কড়
জবরদস্ত কিন্তু বিশ্বাসী আদমী! সেকেন্দার বতদিন
কাঁহা-কাঁহা দিক্ষিষ্কর করেছেন ততদিন শূন্য মস্‌নেদে
আর কাউকে চড়ে বসতে দেননি। বাধ্য শেষে প্রস্ন
করেন, জাহাঁপনার এমন কোন বিশ্বস্ত উজীর-এ-আজম
আছেন কি?

সুলতান ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন। না, নেই!
তিনি পিছন ফিরলেই সবকটা কমবস্ত, আমীর মালিকের
দল টিং-টিং লাফাতে থাকে, কে আগে সুলতান হবে!

ফলে সুলতান ঐ দু-নম্বর খোরাবটিকেও বজ্র
করলেন। শুধু হুকুম দিলেন, অতঃপর তাঁর মৃত্যুর
ছাপা হবে ঐ নুডন খেতাবটা : দ্বিতীয় সেকেন্দার

শাহ্।

এতে অবশ্য কাজী-সাহেব আপত্তির কোন কারণ খুঁজে পাননি।

সংলাপ আমার কল্পিত : কিন্তু কথোপকথন আদ্যন্ত ঐতিহাসিক। আর এই সংলাপ থেকেই বোঝা যায় আলাউদ্দীনের যাবতীয় স্থাপত্যকীর্তির মৌল স্বরূপ।

কুওতুল মসজিদের সম্প্রসারণ : কুওতুল-ই-ইবক নির্মিত আদিম মসজিদে এবং ইল্-তুংমিসের সম্প্রসারণে যে স্বয়ং হুন্দ ছিল তা ব্যাহত হল এবার। চিত্র-3.3-তে লক্ষ্য করে দেখুন, ইল্-তুংমিস্ মসজিদকে দু-পাশে সমছন্দে বর্ধিত করেছেন, যেন একদিকের সম্প্রসারণ অপরদিকে বৃদ্ধির 'জবাব'। দু-পাশে দুটি প্রবেশদ্বার : দু-দুটি অঙ্গুর জলাধার, এক-এক পাশে তিনটি করে খিলান। আদ্যন্ত 'সিমেট্রি'।

আলাউদ্দীন ঐ সমতারক্ষার কোন ধার ধারলেন না—প্রাঙ্গণকে বর্ধিত করলেন শুধু একদিকে, উত্তর প্রান্তে। দৈর্ঘ্য ইল্-তুংমিসের প্রাচীরের ডব্লু. প্রস্থে আদিম মসজিদের দৈর্ঘ্যে স্বেচ্ছাচারিত। প্রস্তাবিত আলাই মিনার বসল সম্প্রসারিত অংশের কেন্দ্রবিন্দুতে। কিন্তু যে-কোনো মসজিদের ঘা-নাকি মূল আকর্ষণ কিবলা-সম্মুখিত মিহরাব, সেটিকে স্থানান্তরিত করা মিসরীয় সেকেন্দার শাহ-র হিম্মতে কুলাবে না। বর্ধিত মসজিদের কেন্দ্রে—হাবিতে দেখুন, আগে থেকেই হাজির আছে ইল্-তুংমিস-নির্মিত লিয়ার। সেটাকে ভেঙে যে নতুন করে বনাবেন তারও উপায় নেই—করণ শরিরতী নির্দেশে মিহরাব ভাঙা চলবে না। ফলে হুন্দপতন হল। আলাউদ্দীন এটাও বেরাল করলেন না যে, তাঁর সুবিশাল পরিকল্পনা সমাপ্ত হলেও তা সার্থক স্থাপত্যকীর্তি হতে পারত না—অত কড় শেহান ও মিনারের পরিকল্পনিত মিহরাব হয়ে যেত নিঃশব্দ বৈশ্বানর। বিরাট কিছ, একটা গড়তে পারলেই তা সার্থক স্থাপত্য হয় না।

আলাই মিনার : একতলা-তক্ গাথা আলাই মিনার একটা সুলতানী খোয়সের কক্ষাল-রূপের অসমাপ্ত স্বপ্নের সর্পিভর মতো। শুধু ক্ষিপ্র দিলে মাপ দেখা যায়, তার কাস কুংব মিনারের কাসের স্বেচ্ছাচারিত। আলাউদ্দীন হয়তো আশা করেছিলেন যে, মিনারের স্তিত ও বনিয়াদ স্বেচ্ছাচারিত হলেই তাঁর মহিমা স্বেচ্ছাচারিত হবে। তা হত না। অর্থাৎ আলাউদ্দীন যদি শতাব্দে হতেন এবং তদানীন্তন প্রসিদ্ধি-বিদ্যার

ঐ আলাই মিনারটি যদি শেষ-তলা-তক্ গেথে তোলা সম্ভবপর হত, তা হলেও কুংব মিনারের 'আর্কিটেক্ট-নিকাল' মহিমাতে অতিক্রম করা যেত না। ঔরঙ্গজেবের বিবি-কা-মক্‌বারা গিয়াস্-উদ্দীন-সমাধির স্বেচ্ছাচারিত ; কিন্তু মিসরীয়টিই সার্থক স্থাপত্যকীর্তি, প্রথমোক্তটি নয়।

সুবহুৎ কোনো স্থাপত্যকীর্তি তখনই সার্থক যখন শিল্পী দর্শকে ন্যূনতম দূরত্বে দাঁড়বার সুযোগ দিতে পারেন। একথা প্রণয়ন করেছেন তাজমহল-পরিকল্পনাকার, হুমায়ূন-সমাধির স্থপতি থেকে হাল-আমলে মার্কিন মূল্যকে নর্থ-ডাকোটা চার-প্রেসি-ডেন্টের আবক্ষমূর্তির ভাস্কর। একথা জানতেন কুংব মিনারের মূল ডিজাইনার—নাহলে তিনি অত আদরের মিনারটিকে মসজিদ-চত্বরে ঢুকতে দিলেন না কেন ? আলাউদ্দীন-স্পর্ধিত আলাই মিনার যে-হেতু সম্প্র-সারিত মসজিদের ভিতর, তাই প্রয়োজনীয় ন্যূনতম দূরত্বে দাঁড়িয়ে ছোটো মিনারটিকে কোন দর্শক দেখতে পেত না—যেমন পারে না নর্থ-ডাকোটা পর্বতের পাদ-দেশের গ্রামবাসী, কারণ তাদের জন্য ও ভাস্কর্য নয় ;—যেমন পারে না আগ্রার দয়ালবাগের মন্দিরটি শেষ হলে একবিংশ-শতাব্দীর দর্শক। মার্বেলে নিখুঁত আতা-উল্লাহ-আগার গড়তে নিবন্ধদৃষ্টি মূল নিয়ামক খেরাল করে দেখছেন না যে, চারপাশে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে নানান ইমারৎ। মন্দির যদিও শেষ হবে সেদিন থাকবে না তাকে দেখবার মতো ন্যূনতম দূরত্বের অবকাশ।

আলাউদ্দীনের সমাধি : কুওতুল-ই-ইসলাম মসজিদের দক্ষিণ-পশ্চিমে সম্রাট আলাউদ্দীন খিলজীর সমাধি। তার মূল আকর্ষণ—সংযুক্ত দুটি মাদ্রাসা। তার হেতু এ নয় যে, আলাউদ্দীন জ্ঞান-মার্গের পথিক—যেমন ছিলেন নিরক্ষর আকবর বাদশাহ্—তার কারণ এই যে, এটি গড়ে তুলেছেন কিছ, সেলজুকী-তুর্ক স্থপতি ও শিল্পী। মিসরীয় পরি-চ্ছদেই বলেছি, এই অনভাবনাটি কী-ভাবে ইসলামী-স্থাপত্যে অনপ্রবেশ করেছে। তুর্কীস্থানে রাষ্ট্র-শিল্পে অনেক সেলজুকী স্থপতি ও মিস্রি খিলজী-অন্যলে হিন্দুস্থানে চলে এসেছিল, জীবিকার সন্ধানে। তাদেরই হস্তের কাজ দেখতে পাবেন মসজিদ-সংলগ্ন অর্থাৎ দরওয়াজা (চিত্র 3.1)।

মিসরীয় দিল্লী নগরী : দিল্লী : বর্তমানে 'গেটার-ফেসাশ'-এর পশ্চিমে চিরাগ-দিল্লী সড়কের উত্তরে

আলাউদ্দীন পরিকল্পিত দ্বিতীয় দিল্লী নগরীকে যদি দেখতে চান তাহলে চিত্র—3.2-তে খুঁজে দেখুন। বাস্তবে তা খুঁজতে যাওয়া বৃথা। সিরি-র ধ্বংসাবশেষ দেখে সে-আমলের রোশনাই সম্বন্ধে কোন ধারণাই হয় না। এই নগরীর পশ্চিমে আলাউদ্দীন বাদশাহ্ একটি জলাশয় খনন করান—যথারীতি নিজ নাম যুক্ত করে তার নামকরণ করেন 'হোস-ই-আলাই'। পরবর্তী-যুগে সুলতান ফিরোজশাহ্ ঐ জলাশয়টি আমূল সংস্কার করান। সেখানে নির্মিত হয় বহু ইমারৎ। বর্তমানে তার নাম 'হোস-ই-খানা'। এই সিরি-নগরীর প্রাচীরচূড়ায় সেলজুকী-তুর্ক স্থপতিবিদেরা আমদানি করে আর এক জাতের অলঙ্করণ—যার দর্শনধারী ভূমিকার চেয়ে বড় কথা প্রয়োজনের তাগিদ। অগ্নি-শিখার মতো প্যারাপেটের উপর সারি সারি গাঁথনি। ইংরাজীতে যাকে বলতে পারি 'merlon' সমন্বিত battlement parapet ; বাঙলায় তার উপযুক্ত প্রতিশব্দ খুঁজে পাচ্ছি না। ফার্সিতে একটি প্রতিশব্দ আছে : 'কঞ্জুর'। আপনারা অনুমতি করলে এর পর ঐ শব্দটাই ব্যবহার করব। এ-রীতি পরবর্তী যুগের ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যে বহুল ব্যবহৃত। গিয়াস-উদ্দীনের সমাধি-দুর্গে, ফিরোজশাহ্ কোটলায়, অথবা লাল কিল্লায় এই 'কঞ্জুর' অলঙ্করণটি দেখতে পাবেন। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে—এই অলঙ্করণের আড়ালে দাঁড়িয়ে দুর্গরক্ষীদল তীর বা বন্দুক ছুঁড়ে আক্রমণকারীদের প্রতিহত করতে পারে। মূল উদ্দেশ্য যাই হোক, পরবর্তীকালে এটি একটি 'ম্যানারিজম'-এ পরিণত হয়, অর্থাৎ নিছক অলঙ্করণ হিসাবেই ইমারতে স্থান পেয়েছে। যেমন ধরুন গিয়াস-এর সমাধিতে ঐ কঞ্জুরের উচ্চতা এত কম যে, প্রয়োজনেও কোনো দুর্গরক্ষী তার আড়ালে আত্মগোপন করতে পারবে না ; অথবা খিড়কি-মসজিদের মাথায় যে কঞ্জুর তাতে আদৌ কোন ছিদ্র নেই।

এইখানে স্থাপত্যের বিবর্তন-সংক্রান্ত একটি মৌল তত্ত্বের কথা প্রসঙ্গত উঠে পড়ছে। পার্সি ব্রাউন বলেছেন, "স্থাপত্যের ক্ষেত্রে এমন প্রায়ই দেখা যায় যে, পরবর্তী যুগের শিল্পী নিতান্ত অভ্যাসবশে পূর্ব-যুগের রীতির হুবহু অন্ধ অনুকরণ করে যায়। তার প্রয়োজনীয়তার কথা বিস্মৃত হয়ে।" উদাহরণস্বরূপ তিনি বরাবর-পর্বতে লোমশমর্দনি গৃহার কথা বলেছেন : সেখানে পর্ণকুটিরের অনুকরণে পাথরের গৃহায় 'ছঞ্জা' খোদাই করা হয়েছে ; কিম্বা অজস্তা উন-বিংশতি চৈত্রে কাঠের পালিন-রাফটার খোদাই করা হয়েছে নিরেট পাথরের গায়ে। আমার কাছে ঐ 'অন্ধ

অনুকরণ' বিশেষণটা আপাততঃ ঠেকেছে। এ রীতির পশ্চাতে সাধারণত তিনটি হেতু। প্রথমতঃ, অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা ; দ্বিতীয়তঃ, প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে ধারাবাহিকতা রক্ষা ; এবং তৃতীয়তঃ, উদ্দেশ্য যাই হোক, ঐ অলঙ্করণটি পরবর্তী শিল্পীদের তখনও ভালো লাগছিল। আমার এই বিরুদ্ধ বক্তির স্বপক্ষে আমি দাখিল করতে চাই একটি উদাহরণ : আগ্রা-কিল্লার জাহাঙ্গীরী-মহলে পাথরের স্ট্রাট-বীম-রাফটার-আর্কিট্রেভ'গুলি। আকবর বাদশাহ্-র আমল ঐ কাঠের যুগের দেড়-দু হাজার বছর পরে। ফলে এগুলি কেমন করে 'অন্ধ-অনুকরণ' হবে? জাহাঙ্গীরী-মহলের ঐ পাথরের বীম নিশ্চয়ই সম্ভ্রান প্রয়োগ, সৌন্দর্যের খাতিরে। 'কঞ্জুর' অলঙ্করণ সম্বন্ধেও আমার ঐ বক্তব্য।

আলাই দরওয়াজা : আলাউদ্দীন-জমানার শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি। তিন-তিনটি দরওয়াজা নির্মিত হয়েছিল, একটি মাত্র টিকে আছে। যাকে দেখতে পাচ্ছি কৃৎব মিনারের সামনে (চিত্র—3.2) সম্প্রসারিত কুণ্ডল মসজিদে। ভূমি-নকশা বা প্ল্যানে এ ইমারৎ বর্গক্ষেত্র, 17.2 মিটার বাহুর। চার প্রান্তে চারটি খিলান, উপরে অনুচ্চ গম্বুজ। তিন-দিকে তিনটি ম্ভার, যার খিলান সূচীমুখ অশ্বমুখাকৃতি ; শুধুমাত্র উত্তরদিকের বা ভিতর দিকের তোরণটি তিন-খাঁজ-ওয়ালা। এই তিন-খাঁজ-ওয়ালা খিলান পরবর্তী যুগে দিল্লীর আর কোন উল্লেখযোগ্য ইমারতে অনুকৃত হয়নি (যদিও শাহজাহাঁ সেটিকে তিনগুণ বাঁধিত করে নয়-পাণ্ডির খিলান বহু ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন) —অথচ কি-জানি কি-করে বহু দূর বঙ্গদেশের আদিনা মসজিদের মিহরাবে এই জাতের একটি খিলান গঠিত হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। আলাই দরওয়াজাতেও স্কুইণ্ড-পম্ভতিতে চতুষ্কোণ কক্ষকে গম্বুজ গ্রহণের উপযুক্ত করা হয়েছে, যদিও পম্ভতিটা ইল্ডুইমিস্-সমাধির অনুকরণে নয়। আরও লক্ষণীয়, এখানে ইসলামী-পম্ভতিতে অর্থাৎ আকুয়েট-প্রধায় 'প্রকৃত খিলান' (true arch) নির্মিত হয়েছে, রীতিমতো ভসৌর-এর মাধ্যমে, আইবকের মাখসুদরাহ্-র-জোড়াভালি দেওয়া খিলান (চিত্র—3.6) নয়। অর্থাৎ কলকনের সমাধিতে যে পরীক্ষাটি সর্বপ্রথমে করা হয়েছিল, যার ধ্বংসাত্মক মেহেরোলী-বাইপাসে এখনও গিয়ে দেখতে পাবেন (আগামী বছর পাবেন না, কারণ পুরাতত্ত্ব-বিভাগ এই অনবদ্য ঐতিহাসিক নিদর্শনটি ডেপে ফেলে তা আদ্যন্ত নুতন করে বানাচ্ছেন!) তার সন্দেহ ও সার্বক প্রয়োগ হয়েছে আলাই দরওয়াজায়।

ইমারৎটি লাল-পাথরের, যদিও কুলদাগ, জাফর-কাটা গবাক ও খিলানের দ্বার বরাবর সাদা-মাবেলের বড়ার বৈচিত্র্য এনেছে। খিলানের বাহিরঙ্গ-রেখায়, লক্ষ করে দেখুন, কী অপূর্ব পশ্মকুণ্ডির নকশা। এটি বহুদিন ধরে অনুকরণ করে গেছেন পরবর্তী যুগের শিল্পীরা। আলাই দরওয়াজার বৈশিষ্ট্য ঐ অলঙ্কৃত বতুল (huss), দেওয়াল-গাঠনিতে সরু হেডার (header) এবং চওড়া স্ট্রেচার (stretcher)-এর ক্রমান্বয় ব্যবহার, নানান জাতের জ্যামিতিক নকশা। এবং অলঙ্করণগুলি ইল্‌তুৎমিস্-সম্মাধির মতো অতি-অলঙ্করণ দোষে দুষ্ট নয়। বোধকরি আলাই দরওয়াজা সাম্ব'ক সৃষ্টি হতে পেরেছে এজন্য যে, 'এগোসেন্ট্রিক' সম্মুখ তাঁর আলাই মিনার ও মসজিদ-সম্প্রসারণের তুলনায় একে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে করেছিলেন। ফলে শিল্পীদল স্বাধীনতা পেয়েছিল।

কুৎব মিনারের মেরামতি : আমীর খসরৌ-এর রক্তনায়^৩ কলা হয়েছে, আলাউদ্দীনের হুকুমে পূর্বযুগের কুৎব মিনারে কিছু মেরামতি করা হয়। উপরে একটি ছত্রীও বসানো হয়। দূর্ভাগ্য আমাদের, ছত্রীটি টিকে নেই। তা হোক, তবু এজন্য আলাউদ্দীন ধন্যবাদার্থ। কারণ ফিরোজশাহ তুগলক ব্যতীত আর কোন দিল্লীস্বরকে পুরাতন স্থাপত্যকীর্তি মেরামতির জন্য বিশেষ ব্যয় হতে দেখি না। তবু আলাউদ্দীনকে 'সূত্রিয়া' জানাতে পারছি না—কারণ ফিরোজশাহ-র মতো শৃঙ্খল স্থাপত্য-প্রেমের তাগিদে তিনি নিঃস্বার্থভাবে এ-কাজ করেননি। এই সূবাদে তিনি গোটা কুৎব মিনারটিকেই তাঁর জেবের পকেটে পুরতে চাইলেন! মেরামতি যখন করেছেন তখন কেরামতির শতকরা শতভাগ তাঁতে বর্তাবে না কেন? হাজার হক তিনি যে 'আলেকজান্ডার দ্য সেকেন্ড'! তাই মেরামতি শেষ করে তার গায়ে একটি ফলক সেঁটে দিলেন : আলাউদ্দীনের বিজয়চন্ড !

এ বিজয়চন্ড ঠিক ক্রিকেট নয়। এ-যেন ইংরাজ স্পর্শিত পরিকল্পিত, ইংরাজের পয়সায় বানানো অষ্টারল্যান্ড মনুস্ট্রেক্টের গায়ে এক পোঁচ চুনকাম করিয়ে তার গায়ে একটি মার্বেল ফলক সেঁটে দিয়ে স্বাধীনতা-শহীদদের উদ্দেশ্যে কলা : তাম্রার শব্দ !

জান্নাতের খানা মসজিদ : আরেক না, আলাউদ্দীনের গড়া নয়। এটি তৈরী করিয়েছিলেন শাহজাদা খিজির খান। তিনি তত্ত্ব-তাউসে কোর্নাদিন বসেননি। হজরৎ নিজামউদ্দীন আউলিয়ার সম্মাধির

আশে পাশে অনেকগুলি স্থাপত্যকীর্তি পরবর্তী যুগে গড়ে উঠেছে। এটি তার মধ্যে বয়ঃজ্যেষ্ঠ (1325)। মসজিদে তিনটি প্রবেশপথ, প্রত্যেকটির উপর একটি করে গম্বুজ। মাঝেরটা কিছু বড়, আর প্রত্যেকটি খিলানে সেই পশ্মকুণ্ডির বদলে নকশা, যা ইতিপূর্বে দেখেছি আলাই দরওয়াজায়।

শাহজাদা খিজির খান দিল্লীর তত্ত্ব-তাউসে বসবার সুযোগ পাননি। যুবক বয়সেই তাঁর দেহান্তর ঘটে। তাঁর বৃদ্ধ পিতৃদেব আলাউদ্দীন গুজরাটের রাজা রায়কর্ণদেবের মহিষী কমলাদেবীকে হারেমজাত করলেন ; কিন্তু জীবন্ত ধরতে পারেননি কমলার আত্মজা দেবলাদেবীকে। রায়কর্ণ তাঁর কন্যাকে নিয়ে আশ্রয় নিলেন দেবগিরির রাজা রামচন্দ্র যাদবের দরগে। সংবাদ পেয়ে আলাউদ্দীনের সেই অপ্রতিরোধ্য সেনাপতি মালিক কাফুর—সেই যিনি জালালকে হত্যা করার পুরস্কারস্বরূপ আলাউদ্দীনের প্রিয়পাত ও সেনাপতি হয়েছেন—তিনি আক্রমণ করলেন দেবগিরি। রাজা রামচন্দ্রকে দূত পাঠালেন, জানালেন, আশ্রিতা দেবলাদেবীকে হস্তান্তরিত করলে তাঁকে রেহাই দেওয়া হবে। রাজা রাম স্বীকৃত তো হলেনই না, পরিবর্তে তৎক্ষণাৎ তাঁর যুবকপুত্র শংকরদেবের সঙ্গে দেবলাদেবীর বিবাহের আয়োজন করলেন। নহবৎখানায় বিবাহের সানাই বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল কামান। বিবাহ-উৎসব বন্ধ রেখে রামচন্দ্রকে যেতে হল বাদশাহী ফৌজকে রুখতে। এ অসমযুদ্ধে জয়ী হওয়া অসম্ভব। শেষ পর্যন্ত সুলতানী ফৌজকে সমর্পণ করতে হল দরগের চাঁব। মালিক কাফুর আর শিপাহ-সালার আলপ খান বন্দিদ্বীপে উঠিয়ে নিয়ে গেল তাদের ছাউনিতে।

দেবলাদেবীকে কিন্তু ঐ বৃদ্ধ সুলতান আলাউদ্দীনের পাশববৃত্তির শিকার হতে হয়নি। শাহজাদা খিজির খান বন্দিদ্বীপে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। পিতার রোষবাহিকে উপেক্ষা করে বিবাহ করলেন সেই পশ্মিনী নারীকে। এই রোমান্টিক গাথাটি পাবেন কবি আমীর খসরৌ-এর 'কিরান-উস-সদাই' কাব্যগ্রন্থে।

খিজির ও দেবলাদেবীর বিবাহিত জীবন কিন্তু সুখের হয়নি। আলাউদ্দীনের মৃত্যু সময়ে খিজির ছিলেন গোয়ালিয়র দরগে। সেখানেই তিনি বন্দী হন।

আলাউদ্দীন খিজির ইতিহাসের 'ইম্পর্টেণ্ট কোন্সেন'। জানের চেয়ে মানকে যিনি বড় করেছিলেন সেই চিতোরমহিষী পশ্মিনী নন, সর্বনাশের চেয়ে আত্মধর্মকে যিনি বড় করেছিলেন সেই রাজা রামচন্দ্রদেব যাদব নন, ইতিহাস প্রশ্নপত্রে ফিরে ফিরে

আসেন সেই ভদ্রলোক, যিনি নিজেকে দ্বিতীয় আলেকজান্ডার ভাবতেন। অথচ তাঁর সম্বন্ধে ইতিহাস মাত্র একটি শিক্ষাই দিয়েছে—সে শিক্ষা তাঁর নির্বংশ হওয়া!

পিতৃপ্রতিম খুল্লতাতকে নির্বংশ করে যে মালিক কাফুর আলাউদ্দীনের প্রিয়পাত্র হয়েছিল সেই এ নারকীয় কাণ্ডের নিয়ামক! বিষপ্রয়োগে সে হত্যা করে আলাউদ্দীনকে; তারই নির্দেশে তার এক অনুচর মালিক সাম্বল অরক্ষিত যুবরাজ খিজিরকে অন্ধ করে দেয়। আলাউদ্দীনের অপর পুত্র শাহজাদা সাদীখান-এর ভাগ্যও হল অনুদূরপ। এত হত্যা ও পাপের মাশুল দিয়েও কিন্তু মালিক কাফুর তত্ত্ব-তাউসে বসবার অধিকার পেল না। তারই অনুচরদল মালিক মদশীর-এর নেতৃত্বে একদিন খুন করে বসল মালিক কাফুরকে! মস্‌নে বসল সুলতান কুৎবউদ্দীন মদবারক শাহ্। তার মতো ইন্দিয়াসক্ত, অপদার্থ, এবং যৌন ব্যাভিচারী নরাধম খুব অল্পই বসেছে দিল্লীর সিংহাসনে। তাকে হত্যা করে অনধিকারী নাসির-উদ্দীন খসরৌ শাহ্ দখল করল তত্ত্ব-তাউস (1320)। শেষ হল খিজ্জী-বংশ।

আমীর খসরৌ পাঠে মনে হয়, শাহজাদা খিজির ছিলেন দিলদরাজ পদুর্দুসিংহ। পিতার বিকৃতকামের হাত থেকে দেবলাদেবীকে তিনি উদ্ধার করেছিলেন। স্বীকার্য, তিনি নিজেকে মোহিত হয়েছিলেন সেই পশ্চিমী নারীর অনিন্দ্য-সৌন্দর্যে।

জানি না, দেবলাদেবী ভালবাসতে পেরেছিলেন কিনা সেই উদ্ধারকারীকে। হয়তো হিন্দু-সংস্কারের কৈশিকর্ষে; শঙ্করদেবের প্রতি অনুরাগে—যে দুলহনের বহুমুখিত্তে তিনি তাঁর নেহাদি-রঞ্জিত হাতখানি রাখতে গিয়ে বিবাহরাত্রে শূন্যেছিলেন কামানের গর্জন এবং মায়ের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে তিনি খিজিরকে ক্ষমা করতে পারেননি আদৌ। কিম্বা কে কলতে পারে, শাহজাদা খিজির অন্ধ হয়ে বাবার পর অনুক্ষপার উৎসমুখে সঞ্জীবিত হয়েছিল সেই দুর্লভ বস্তুটি, বার নাম : মহম্মৎ।

শোনা যায়, ঐ হজরৎ নিজামউদ্দীন আউলিয়ায় অবস্থিত জামায়েৎ-খানায় পাশাপাশি দুটি কবরে শূন্যে আছেন কবি আমীর খসরৌ-র নায়ক-নায়িকা। কোন দুটি তা জানি না। কোন স্মারক চিহ্ন নাই। কবর দুটি খুঁজে পেলে হয়তো দেখবেন অদৃশ্য-আখরে লেখা আছে ব্যর্থপ্রেমিক শাহজাদার অন্তর-নিষ্করানো আর্তি :

“দুনিয়ামে হুঁ দুনিয়াকা তলব্দার নেহী হুঁ
বাজারমে গুজরা হুঁ খরিদ্দার নেহী হুঁ।
মায় ও গুল হুঁ খিজ্জা যিসে বরবাদ কিয়া হয়
উল্‌বুঁ কিসি দামন্‌সে, মায় ও আর নেহী হুঁ ॥”

□

* দুনিয়াদারীর ফুলের বাজারে বরবাদই শব্দ; হলাম, সুবাস বিলায়ে বিকাইনি হাতে, কেউই দিল না দাম; ফুলের বদলে চোরকাটা হয়ে জন্ম নিলেও বুঝি চরণে-জুড়ানো ষাগ্‌রায় ছিঁপে রহিত এ-গোলাম ॥

গিয়াস্ উদ্দীন

উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা
গিয়াস্ উদ্দীনের রাজত্বকাল
গিয়াস্ উদ্দীনের অপমৃত্যু
মুহম্মদ বিন-এর রাজত্বকাল
খিজরাজশাহ-র রাজত্বকাল
হরজন অখ্যাত সুলতানের শাসন
তৈমুরলঙের ভারত আক্রমণ

সময়কাল

1320-1325
ফেব্রু' 1325
1325-1351
1351-1388
1388-1413
1398

তুগলক-বংশের নরাজন সুলতান ; তার বিস্তৃতি 93 বছর—1320 থেকে 1413 ; তার ভিতর তিনজনের কথা শুধু বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে—প্রথম তিনজনের। বাদশাহিক কী ইতিহাসে, কী স্থাপত্যে বিশেষ রেখাপাত করতে পারেননি।

খিজরাজ-বংশের শেষাংশে যে নৃপতি কাম্বুজ-কারখানা হয়েছিল সে-বিষয়ে আমরা অবহিত হয়েছি। দিল্লী-বংশের আলোউদ্দীনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মুব-রাজ খিজর খাঁকে স্বাধীন করা হল, নিতান্ত নাবালক শিহাবউদ্দীন ওমরকে করা হল হত্যা। মালিক কাম্বুরের মৃত্যুর পর নিতান্ত অযোগ্য কুৎবউদ্দীন মুবারক উলঙ্গ ব্যভিচারের দ্বারা গা ভাসালো। বছর-চারেকের মধ্যেই সুযোগসন্ধানী এক বহিরাগত—নাসিরউদ্দীন কসরো উঠে কসল দিল্লীর মসন্দে। কসরো মাত্র কয়েক মাস তত্ত্ব-তাউসে কসবার সুযোগ পায়। আমীর মালিকদের দুই হাতে মণিঝুজা বিলিয়ে সন্তুষ্ট রাখবার চেষ্টা করে। তবু অসন্তোষ চাপা থাকে না। অবশেষে একজন বৃদ্ধ তুর্কী সেনাপতি—গাজী মালিক, ঐ অধিকারী সুলতানের বিরুদ্ধে ক্রোধ জোষণ করেন, তাকে পরাজিত ও হত্যা করে খিজরাজ-বংশের প্রতি বিদ্রোহের প্রমাণ দেন। প্রশ্ন উঠল—অধিকারী তো হত। এখন মসন্দে বসে কে? খিজরাজ-বংশের উপমুখ্য উত্তরাধিকারী পেট নেই, শিবতীর সেকেন্দার শাহ্ নিবশে! সবাই গাজী

মালিককেই অনুমোদন করল দায়িত্বটা নিতে। ইতিহাস সম্প্রদায়ের কাছে, গাজী মালিক প্রথমে অস্বীকৃত হন। বলেন, ওজনা তিনি দিল্লী অভিযানে আসেননি ; কিন্তু সন্তোষের নির্বন্ধাতিশয্যে বৃদ্ধ বয়সে তাঁকেই নিতে হল মালিক-দায়িত্ব।

এই নবাগত গাজী মালিকই হচ্ছেন তুগলক-বংশের প্রতিষ্ঠাতা : গিয়াস্ উদ্দীন।

ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তি!

গিয়াস্ উদ্দীনও সম্পূর্ণ নিজের প্রচেষ্টায় সামান্য সৈনিক থেকে ক্ষমতার তুঙ্গ শিখরে উঠেছেন—কুৎব-উদ্দীন আইবক, ইল্-তুংমিস্ এবং জালালউদ্দীন খিজরাজের মতো। তাঁর আশ্বাজান বলবনের সময়ে তুর্কীস্থান থেকে হিন্দুস্থানে আসেন এবং পঞ্জাবের এক জাঠ রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁদেরই সন্তান গিয়াস্ বাল্যে ও কৈশোরে নিতান্ত দারিদ্র্যের মধ্যে মান্য। নিজের ভাগ্য তিনি নিজে গড়েছেন, অসম-সাহসিকতায়, নিপুণতায়, চারিত্রিক দৃঢ়তায়।

গিয়াস্ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করেছেন। তাঁর হৃদয়ের প্রসার ছিল, রাজকীয় নানান গুণে তিনি বিভূষিত—ধর্মাত্মা, দৃঢ়চেতা, ন্যায়নিষ্ঠ এবং জ্ঞানী। আমীর কসরো তাঁর রাজত্বকালেও জীবিত—লিখেছেন, 'গিয়াস্-এর তাজের নিচে যে মগজ তাতে সে পরিমাণ জ্ঞান সঞ্চিত তা শতজন মোল্লাকে লজ্জা দেবে।'

গিয়াসউদ্দীনের রাজ্যবিস্তার, সুশাসন-ব্যবস্থা ইত্যাদি আমাদের এতিয়ারের বাহিরে ; তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যুর কথাটা বাঙালী পাঠকের অজানা নয়। যাযাবরের ‘দৃষ্টিপাত’-এর সেই অনবদ্য কাহিনীটি—‘দিল্লী দূর অস্ত’, নিশ্চয় মনে আছে আপনাদের। পুনরুজ্জ্বল হাওয়া হলেও একটি বিশেষ কারণে কাহিনীটি আবার বলতে হচ্ছে ; কারণ পর পর দুটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা—খিলজীর ‘জালাল’ এবং তুগলকের ‘গিয়াস’ যে ইতিহাসের ঐ সূত্রটির উপর দাগা বুলিয়ে গেছেন—‘History repeats itself’ (ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তি) সে-কথাটা যাযাবর বলে যাননি।

“সেকালে মুঘলদের আক্রমণ এবং আনুর্ভাবিক হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন ছিল উত্তর ভারতের এক নিরন্তর বিভীষিকা। গিয়াসউদ্দীন তাদের আক্রমণ ব্যর্থ করতে পুস্তন করলেন নতুন নগর, তৈরি করলেন নগর-ঘিরে দুর্ভেদ্য-প্রাচীর এবং প্রাচীর দ্বারে দুর্জয়-দুর্গ। একদিকে ক্ষুদ্র পর্বত এবং আর একদিকে প্রাচীর-বেষ্টিত নগরী, মাঝখানে খনিত হল বিশাল জলাশয়। বর্ষার দিনে শৈলশিখর থেকে ধারালোতে জল সঞ্চিত হত এই জলাশয়ে ; সংবৎসরের পানীয় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত আশ্বাস থাকতো প্রজাপুঞ্জের।”

নবনির্মিত নগরীটি তুগলকাবাদ, জলাশয় বেষ্টিত দুর্গ (চিত্র—5.1) এবং সেইসঙ্গে সুলতানের নিজস্ব সমাধিসৌধ (চিত্র—2.5), যা তিনি নিজের জীবদ্দশায় গড়েছিলেন ; সে-প্রসঙ্গে এখনি আসব। আপাতত কাহিনীর সূত্র ধরে এগিয়ে যাই। কী-ভাবে সুলতানের সঙ্গে এক সর্বত্যাগী ফকিরের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল :

হজরৎ শেখ নিজামউদ্দীন আউলিয়ার জন্ম বাদাউনে (1236)। মাত্র পাঁচবছর বয়সে তাঁর পিতৃ-বিয়োগ হয়—আম্মাজানের হাত ধরে নিজামউদ্দীন চলে এলেন দিল্লীতে। পরে বিখ্যাত ফকির শেখ ফরিদ শকর-গঞ্জের শিষ্য গ্রহণ করে তিনি নিজেই প্রখ্যাত দরবেশ হয়ে পড়েন। আলাউদ্দীন খিলজী, এবং মুহম্মদ তুগলক, দু-জনেই তাঁর পরম ভক্ত। হজরৎ নিজামউদ্দীনের দেহান্ত ঘটে 1325 খ্রীষ্টাব্দে, ঊননব্বই বছর বয়সে। এই পুণ্যস্থান কবরটি ভূমিদশায় দেখে ফিরোজশাহ তুগলক সেটিকে পুনর্নির্মাণ করান। কি জানি কার পাপে আবার তা ভেঙে পড়ে। সে কবরের চিহ্নমাত্র বর্তমানে নেই ! তবে এই ফকিরের খনন করা একটি জলাশয় আজও বর্তমান। ঐ জলাশয় খনন করা নিয়েই সুলতান গিয়াস আর ফকিরের বিরোধ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। সেই কাহিনীই লিপিবদ্ধ করেছেন যাযাবর :

“ফকির-সুলতানে সংঘর্ষ ঘটলো এই নগর নির্মাণ, কিম্বা আরও সঠিকভাবে বর্ণনা করতে হয় নগরপ্রাচীর নির্মাণ উপলক্ষ্য করেই। নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দীর্ঘ কাটতে মজুর চাই প্রচুর। গিয়াসুদ্দিনের নগর তৈরী করতেও মজুর আবশ্যক সহস্র সহস্র। অথচ দিল্লীতে মজুরের সংখ্যা অত্যন্ত পরিমিত। দু-জায়গায় প্রয়োজন মিটানো অসম্ভব। অত্যন্ত ম্বাজবিক যে, বাদশাহ চাইলেন মজুরেরা আগে শেষ করবে তাঁর কাজ, ততক্ষণে অপেক্ষা করুক ফকিরের খরগাট খনন। কিন্তু রাজার জোর অর্থের, সেটা পরিমাপ করা যায়। ফকিরের জোর হৃদয়ের, তার সীমা শেষ নেই। মজুরেরা বিনা মজুরিতে দলে দলে কাটতে লাগলো নিজামুদ্দিনের তালো। সুলতান হৃৎকান ছেড়ে কললেন, ‘তবে রে—’

“কিন্তু তার ধ্বনি আকাশে মিলাবার আগেই এস্তালা এল আশ্রু কতবোর। বাঙলাদেশে কিদ্রোহ দমন করতে ছুটেতে হল সৈন্য সামন্ত নিয়ে।

“শাহজাদা মহম্মদ তোগলক রইলেন রাজধানীতে রাজ-প্রতিভূরূপে। তিনি নিজামুদ্দিনের অনুরাগীদের অন্যতম। তাঁর আনুকূল্যে দিব্যরাগি খননের ফলে পরহিতব্রতী সম্মাসীর জলাশয় জলে পূর্ণ হল অনতি-বিলম্বে। তোগলকাবাদের নগরপ্রাচীর রইলো অসম্পন্ন।

“অবশেষে সুলতানের ফিরবার সময় হল নিকট-বতী। প্রমাদ গণনা করল নিজামুদ্দিনের অনু-রাগীরা। তারা ফকিরকে অবিলম্বে নগর ত্যাগ করে পলায়নের পরামর্শ দিল। ফকির মৃদু হাস্যে তাদের নিরস্ত করলেন—‘দিল্লী দূর অস্ত’। দিল্লী অনেক দূর।

“প্রত্যহ যোজন পথ অতিক্রম করছেন সুলতান। নিকট হতে নিকটতর হচ্ছেন রাজধানীর পথে। প্রত্যহ ভক্তেরা অনুন্নয় করে ফকিরকে। প্রত্যহ একই উত্তর দেন নিজামুদ্দিন—‘দিল্লী দূর অস্ত’!

“সুলতানের নগর প্রবেশ হলো অসম্পন্ন, আর মাত্র একদিনের পথ অতিক্রমের অপেক্ষা। ব্যাকুল হয়ে শিষ্য-প্রশিষ্যরা অনুন্নয় করল সম্মাসীকে, এখনও সময় আছে, এই বেলা পালান। গিয়াসুদ্দিনের ক্রোধ এবং নিষ্ঠুরতা অবিদিত ছিল না কারো কাছে, ফকিরকে হাতে পেলে কী দশা হবে সে-কথা কল্পনা করে তারা ভয়ে শিউরে উঠল বারংবার। শ্মিত হাস্যে সেদিনও উত্তর করলেন বিগতভয় সর্বত্যাগী সম্মাসী—‘দিল্লী হনুজ দূর অস্ত’। দিল্লী এখনও অনেক দূর ! বলে, হাতের জপমালা ঘোরাতে লাগলেন নিশ্চিন্ত ঔদাসীনে।

“নগরপ্রান্তে পিতার অভ্যর্থনার জন্য মহম্মদ তৈরী করেছেন মহাশয় মন্ডপ। কিংখাবেগ সামিয়ানা। জরীতে, জ্বরতে, ঝলমল। বাদাডাড। লোকলস্কর, অমীর ওমরাহ্ মিলে সমারোহের চরমতম আয়োজন। বিশাল ভোজের ব্যবস্থা, ভোজের পরে হাঙ্গামার প্রদর্শনী প্যারেড।

“মন্ডপের কেন্দ্রস্থলে ঈশ্বর উন্নত ভূমিতে বাদশাহের আসন, তার পাশেই তার উত্তরাধিকারীর। পরদিন গোম্বুলি বেলায় সুলতান প্রবেশ করলেন অভ্যর্থনা মন্ডপ। প্রবল হাস্যোচ্ছ্বাসের মধ্যে আসন গ্রহণ করলেন। সিংহাসনের পাশে বসালেন নিজ প্রিয়তম পুত্রকে। কিন্তু সে মহম্মদ নয়, তার অনুজ।

“ভোজনান্তে অতি বিনয়বনত কণ্ঠে মহম্মদ প্রার্থনা করলেন সম্রাটের। জাহাঁপনার হুকুম হলে এবার হাতীর কুচকাওয়াজ শুরু হয়, হাঙ্গামা নিয়ন্ত্রণ করবেন তিনি নিজে। গিয়াসদ্দিন অনুমোদন করলেন স্মিতহাস্যে।

“মহম্মদ মন্ডপ থেকে নিষ্কান্ত হলো ধীর শান্ত পদক্ষেপে।

“কড়্ কড়্ কড়্ কড়াং!

“একটি হাতীর শিরসস্থলনে স্থানচ্যুত হল একটি স্তম্ভ। মুহূর্ত মধ্যে সমস্ত ভূপতিত হলো সমগ্র মন্ডপ। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল অসংখ্য কাঠের খাম, চাপা পড়া মানুষের আত্মকণ্ঠে বিদীর্ণ হলো অধিকার রাত্রির আকাশ। ধূলার আচ্ছন্ন হলো দৃষ্টি। ভীত সচকিত ইতস্ততঃ ধাবমান হাঙ্গামার গুরুভার পদতলে নিষ্পিষ্ট হলো অগণিত হতভাগ্যের দল। এবং সে-বিভ্রান্তকারী বিশৃঙ্খলার মধ্যে উদ্ধারকারীরা ব্যর্থ অনুসন্ধান করল বাদশাহের।

“পরদিন প্রাতে মন্ডপের ভগ্নস্তূপ সন্নিবেশিত আবিষ্কৃত হলো বৃদ্ধ সুলতানের মৃতদেহ। যে প্রিয়তম পুত্রকে তিনি উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন মনে মনে, তার প্রাণহীন দেহের উপরে সুলতানের দুই বাহু প্রসারিত। বোধকরি আপন দেহের বর্ম রক্ষা করতে চেরেছিলেন তাঁর স্নেহাস্পদকে।

“সমস্ত ঐহিক ঐশ্বর্য প্রতাপ ও মহিমা নিয়ে সপত্র গিয়াসদ্দিনের শোচনীয় জীবনান্ত ঘটল নগর-প্রান্তে। দিল্লী রইল চিরকালের জন্য তার জীবিত পদক্ষেপের স্তবীত।

“দিল্লী দূর অস্ত। দিল্লী অনেক দূর।”

অনবদ্য কাহিনী। অতুলনীয় রচনাশৈলী। বেশ মনে আছে, প্রথম বৌবনে যখন এই কটা পৃষ্ঠা পড়ে-

ছিলাম তখন বার বার চোখ অশ্রুসঞ্জল হয়ে উঠেছিল। প্রিকালঙ্ক ফকিরের অলৌকিক ক্ষমতায় বারংবার রোমাঞ্চিত হতে হয়েছিলাম।

এ-গ্রন্থ রচনাকালে পুনরায় ‘দৃষ্টিপাত’ পড়তে বসে দেখি, সেই যুবক-পাঠকের মৃত্যু ঘটেছে। বোধকরি “কাটা-সিরিজের” গোয়েন্দা কাহিনী রচনার অপরাধেই সেই সরলবুদ্ধি পাঠকের এই অপমৃত্যু। এবার মনে জাগল একাধিক প্রশ্ন : (১) সুলতান যখন দিল্লীর পাদদেশে পৌঁছেছেন তখন শাহজাদা কেন একটি অস্থায়ী মন্ডপ বানালেন? অদূরেই তো ছিল রাজধানীর দেওয়ান-ই-আমের পাকা ইমারৎ? (২) হাতীর প্যারেড শুরু হবার পূর্বেই কেন শাহজাদা “মন্ডপ থেকে নিষ্কান্ত হলেন ধীর পদক্ষেপে”? (৩) রাতে গম্বুলি জেদলে সুলতানকে উদ্ধার করার আয়োজন করলেন না কেন শাহজাদা? (৪) মহম্মদের কণ্ঠস্বর কেন “অতি বিনয়বনত”?

ঘটিতে শুরু করলাম প্রামাণিক ইতিহাস। দেখলাম, যাবাবর স্বজ্ঞানে ঐতিহাসিক সত্যটা সঙ্গোপন রেখেছেন। খিলজী-বংশের প্রতিষ্ঠাতা ‘জালাল’ এবং তুগলক-বংশের প্রতিষ্ঠাতা ‘গিয়াস’-এর ইতিহাস জড়িয়ে। ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তি মাত্র।

সব ঐতিহাসিক এ-বিষয়ে আজ একমত : মহম্মদ বিন তুগলক সুপরিচালিতভাবে তাঁর পিতাকে হত্যা করেছিলেন। ঈশ্বরীপ্রসাদ, রমেশচন্দ্র, কালীকঙ্কর প্রভৃতি। এটা যে দুর্ঘটনা এমন একটা ভ্রান্ত ধারণা প্রথম যুগে করা হয় সমকালীন ঐতিহাসিক জিয়া বারনীর একটি পংক্তি থেকে। তিনি বলেছেন, “A thunderbolt of calamity from heaven fell upon the Sultan and he was, with five or six others crushed under the debris.” (চরম দুর্ভাগ্যের এক বজ্রপাত হল সুলতানের মাথায়, এবং আরও পাঁচ-ছয়জনের সঙ্গে তিনি ধ্বংসস্তূপে পিষ্ট হয়ে মারা যান।) ঈশ্বরীপ্রসাদ^৩ বলেছেন, ইলিয়ট-সাহেব ঐ পংক্তিটির অনুবাদে কিছু ভুল করেন। তাঁর অনুবাদ পড়ে মনে হয়, বাস্তবেই বৃষ্টি একটি বজ্র সেই মন্ডপের উপর পড়েছিল। বারনি-বার্ণিত ‘বজ্রপাত’ যে তীর্থক অর্থে অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহৃত সেটা অনুবাদক বুদ্ধিতে পরেননি। যাহিদা বিন আহমেদ, ফেরিস্তা প্রভৃতি বলেন, এই দুর্ঘটনার পিছনে একটি গভীর ষড়যন্ত্র ছিল, যদিও মহম্মদের নামোল্লেখ তাঁরা করেননি।^৪ অপর-পক্ষে, বিদেশী পর্যটক ইব্ন বতুতা ম্বার্থহীন ভাষায় বলে গেছেন, এটি শাহজাদা মহম্মদের একটি চরম অপকীর্তি। ইব্ন ভারতে আসেন ১৩৩৩ খ্রীষ্টাব্দে,

ঘটনার আট বছর পরে এবং এ-কাহিনীটি লিপিবদ্ধ করেন প্রত্যাদেশী শেখ নূরুদ্দীন মুলতানীর জবানী থেকে। তাঁর প্রমণ কাহিনীতে ইব্ন বতুতা শূধু মুহম্মদকে দৃঢ়ভাবে অভিযুক্ত করেই ক্ষান্ত হননি, বলেছেন, “When the workmen were called upon to dig up the body of the Sultan with their shovels, the Prince deliberately delayed their arrival.” (সেরাফে মজদুরদের ডেকে এনে যখন ধ্বংসস্থল সরিয়ে সুলতানের আহত দেহকে উদ্ধার করার আয়োজন হচ্ছিল, তখন শাহজাদা ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের দেরি করিয়ে দেন।)

ইব্ন বতুতা ন'ছোড়বান্দা ঐতিহাসিক—সব কিছুর শেষ পর্যন্ত তলিয়ে দেখতে চান। তিনি খুঁজে খুঁজে বার করেছিলেন সেই অশুভ মণ্ডপটি—যা নাকি একটি-মাত্র কেন্দ্রীয় স্তম্ভের উপর ভারসাম্য রক্ষা করে নির্মিত, সেটি কোন্ স্থপতিবাদের এলম-এর স্বাক্ষর! খুঁজে পেয়েছিলেন। লোকটার নাম আম্জান আজাজ! “Whom Muhammad afterwards, probably to signify his gratitude, made his Chief Minister.” (যাঁকে পরে মুহম্মদ—সম্ভবত প্রতিদান হিসাবে পুরস্কৃত করতেই—নিজের উজীরে-আজম করে দেন।)।

আম্জাদ বোধকারী তুলনামূলক আলোচনায় যোলো-কলার ষোড়শ কলা! জালালউদ্দীনের হত্যাকারী মালিক কাফুরকেও আলাউদ্দীন প্রধান সিপাহ-সালার করে দিয়েছিলেন না?

ইব্ন বতুতা বিদেশী, নিরপেক্ষ বিচারক। তাই তাঁকে অবিশ্বাস করা কঠিন। তা-ছাড়া মুহম্মদের স্বপক্ষে তো কোনো যুক্তিই নেই—ইলিয়টকৃত বারণির ঐ ভুল অনুবাদ ছাড়া?

তাহলে ‘যাযাবর’ সে-কথা বলে গেলেন না কেন? মিথ্যা তিনি লেখেননি, কিন্তু সত্য গোপন করেছেন। এবং সজ্ঞানে—না হলে ঐ বর্ণনাটা তাঁর কলম দিয়ে কিছতেই বেরতো না—ঐ “প্রিয়তম পুত্রের প্রাণহীন দেহের উপর সুলতানের দুই বাহু প্রসারিত।” ওটা ইব্ন বতুতার ভ্রমণকাহিনী থেকে সংগৃহীত।

একটাই হেতু। সে-কথা লিখলে সন্দেহবাতিক পাঠকের কু-চিন্তা আবার কোঁদিকে মোড় নেয় কে জানে! তারা হয়তো ভাবতে বসবে “বিগতভয় সর্ব-ত্যাগী সম্মাসী” নিজামউদ্দীনের ঐ বহু উদ্ভূত ভবিষ্যৎবাণী ‘দিল্লী দূর অস্ত’-এর গভীরে কোনো ঐশ্বরিক ক্ষমতা নেই, আছে কটকৌশলী ষড়যন্ত্রীর অভিজ্ঞান! ‘দিল্লী হনুজ দূর অস্ত’ বলে সম্মাসী তস্বি ঘোরাচ্ছেন শুনে পাঠকের বৃষ্টি মনে পড়ে যাবে

‘শাহজাহান’ নাটকে আলমগীরের কৃমিদায় শিশির ভাদুড়ীর মাপা উপস্থানো। এতলে এ কাহিনীর মূল আবেদনটাই মাঠে মারা যায়। লেখক নিজেই সে ইতিপূর্বে বলেছেন, শাহজাদা মুহম্মদ ফিরের ‘অনুগামীদের অন্যতম, তাঁর ‘আনুঙ্গো’.....ইত্যাদি।

ঐতিহাসিক নিজামউদ্দীন আহমেদ কিন্তু সেই কান্ডটাই করে বসে আছেন। যা ছিল সাদৃশ্য পাঠকের আশঙ্কা তাই স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ করে গেছেন তিনি : “He charges Barni with intentionally suppressing the truth out of regard for his patron Firuz Shah Tughluq. He thinks that the death of the Sultan was due to a conspiracy formed by Shaik Nizam Uddin Aulia and the Crown Prince [তাঁর (ঐতিহাসিক আহমেদ) অভিযোগ, বারনি সজ্ঞানে সত্য গোপন করেছিলেন, ফিরোজ-শাহ তুগলকের কথা মনে করে (ফিরোজ মুহম্মদকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং বারনি ফিরোজ-এর কাছ থেকে মাসোয়ারা পেতেন)। তিনি আরও মনে করেন, সুলতানের মৃত্যু একটি ষড়যন্ত্রের পরিণতি—যার মূল নিয়ামক ষোড়শাব্দে শাহজাদা মুহম্মদ এবং হজরৎ শেখ নিজামউদ্দীন আউলিয়া]।”

শূধু দিল্লী নয়, দিল্লীর প্রকৃত ইতিহাসও সাধারণ পাঠকের কাছে আজও : ‘হনুজ দূর অস্ত’!

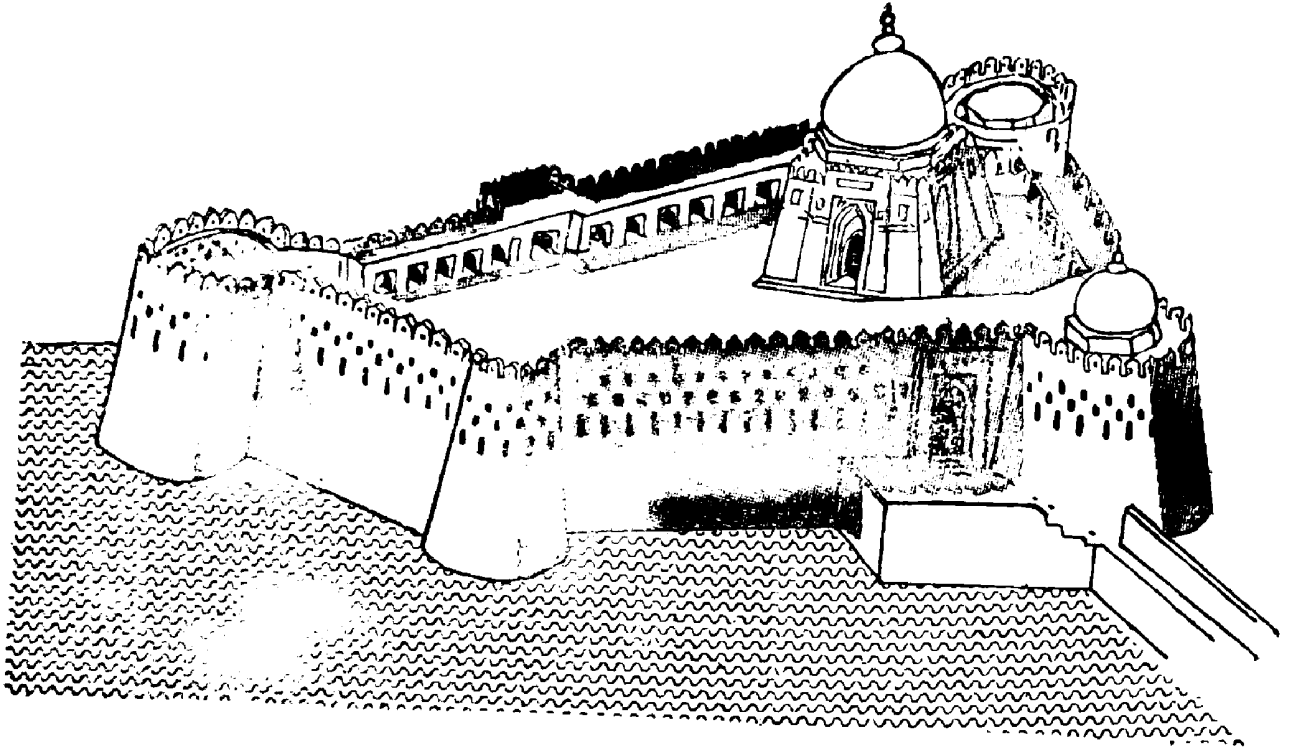
তুগলকাবাদ ও গিয়াস্-এর সম্মিষ : গিয়াস্-নির্মিত দিল্লীর তৃতীয় নগরীর একদিকে অনুচ্চ পাহাড় এবং বাকি তিনদিকে জল। জলটা সঞ্চিত কৃত্রিম জলাধারে, সূর্যকৌশলে বৃষ্টির জমি-ধোওয়া জলও তহতে এনে ফেলা। কুংব-বদরপুর রোডে কুংব-চকর থেকে আট কিলোমিটার দূরে এই শহরের ধ্বংসাবশেষ দেখে আন্দাজ করা শক্ত—তদানীন্তন তুগলকাবাদের স্মিষ নয়নাভিরাম রূপ। জলাশয় বর্তমানে বিশৃঙ্খল, রুদ্ধ-ধ্বংস প্রস্তরস্তূপের মধ্যে কঙ্কালসার গিয়াস্-এর দুর্গ। নগরীর দক্ষিণপ্রান্তে নিজর্ন প্রান্তরে গিয়াস্-উদ্দীনের অনাড়ম্বর কবর। কিন্তু সম্মিষসৌধের প্রসঙ্গে আসার আগে বলতে হয় তুগলকাবাদের কথা :

তুগলকাবাদ নগরীকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমভাগ, কুংব-বদরপুর সড়কের উত্তরে, প্রবেশপথের পূর্বদিকে, সূউচ্চ প্রাচীর-বোঁকিত মূল দুর্গ। তার দক্ষিণে অনুচ্চ প্রাচীর-বোঁকিত অংশে ছিল আমীর মালিকদের প্রাসাদশ্রেণী এবং উত্তরদিকে সাধারণ নগর-বাসীর ইমারৎ। তিনটি অংশকে সংযুক্ত করে নানান রাজপথ যে নির্মিত হয়েছিল তার সামান্য চিহ্ন আজও

বর্তমান। মূল দুর্গে একটি মিনারও ছিল—বিজয়-মন্ডল। আটকোণা রাষ্ট্র-ম্যানের গাথনি, তুগলক-বৈশিষ্ট্য। তার ঢালু প্রাচীর এবং চারদিকে চারটি প্রবেশদ্বার। বিজয়মন্ডলের পূর্বদিকে একটি প্রাসাদের ধ্বংসাক্ষেপ। সেটাকে একটি মসজিদ বলে ধরে নিতে পারলে বিজয়মন্ডলকে মুসলিম-মিনার হিসেবে কল্পনা করা চলত; কিন্তু বিদ্যমান প্রাসাদটি মসজিদ নয়। তাই অনুমান করছি, 'বিজয়মন্ডল' কথ্য ছিল একটি প্রহরী-মিনার, observation tower.

গিয়াস বখশ মসনদে আসেন তখন তিনি বৃদ্ধ। মাত্র পাঁচবছর তিনি ছিলেন দিল্লীশ্বর। বিলাস-বাসন, রাজসম্ভোগ তার ললট-লীপ নয়, স্বভাবতও তিনি মুশকিল-পসন্দ, আদ্যন্ত বোম্বা, স্পার্টান জঙ্গীমানুষ। তাই তার পরিকল্পিত নিজের সমাধিসৌধটিরও যেন

মুখী হয়। পঞ্চভূজের প্রতিটি কোণে স্ফীতোদর বাস্টিয়ান (bastion)। তাতে এবং প্রাচীরে যে সুসম-ছন্দে দাগগুলি দেখছেন তা অলঙ্করণ আদৌ নয়, ছিদ্রপথ। দুর্গ আক্রান্ত হলে ঐ ছিদ্রপথে বোম্বায়ে আসত সারি সারি ধানুকীর সুচীমুখ শায়ক! সমাধিসৌধ চতুষ্পাশ, ঢালু-উপাদান রক্তিম চুনা পাথর, শব্দ গম্বুজটা সাদা। জালি কাজকরা জানালা এবং খিলানের উপর সাদা বর্ডার। অশ্বখরাকৃতি সুচালো খিলানের কিনার-বরাবর শ্বেতবর্ণের পল্লুকুণ্ডি-যা দেখেছিলাম আলাই দরওয়াজায়। প্যারাপেটে একসার অগ্নিশিখা-নকশার কঙ্কর। গম্বুজের উপর হিন্দু-স্থাপত্যের আমলক ও কলস এই প্রথম ইসলামী স্থাপত্যে প্রবেশ করল। এ-দৃষ্টি হিন্দু অলঙ্করণ কুশীলব পরের কয়েকশ বছর ধরে ইসলামী স্থাপত্যের



চিত্র-5.1 তুগলকাবাদ দুর্গ ও গিয়াসের কবর (দিল্লী)।

বোম্বার বেশ। তাতে কারুকার্য নেই, সৌখিনতা নেই—ভর নিত্যন্ত কেজা ভূমিকা। সমাধিসৌধ কথ্য দুর্গের ভিতর আর এক দুর্গ! রাষ্ট্রবিন্দবে শেষ অস্ত্রস্থল হিসাবে উপযুক্ত।

ভূমি-নকশার মক্কা-চক্কর বা দুর্গটি একটি অসমবাহুর পঞ্চভূজ (চিত্র-5.1)। মূল মক্কাবাটি তার কেন্দ্রে নয়, এক পাশে কিন্তু শাস্ত্র-মতে ঠিকমতো কসনো, যাতে কিল্লা সমন্বিত মিহরাব ঠিক পশ্চিম-

নাটকে বারে বারে প্রবেশ ও প্রস্থান করেছে এবং তার চরম পরিণতি তাজমহলের চড়ায়—যেখানে আমলক ও কলস মিতালী করেছে ঈদের চাঁদের সঙ্গে।

সৌধের তিনদিকে প্রবেশদ্বার, শব্দ পশ্চিমদিকে মিহরাব। এই অনাড়ম্বর মক্কাবায় সবার আগে যেটা নজরে পড়ে তা হচ্ছে বহিঃপ্রাচীরে একটা অশ্লীল ঢাল, যা আগে কখনও দেখিনি। জমির সঙ্গে প্রায় 75 ডিগ্রি। অথচ এই নয়া-আমদানী ঢালটা পরবর্তী যুগেও

অনুদ্রুত। তুগলকী যুগ অতিক্রম করে সৈয়দ, সোদী এমন কি শেরশাহ শুরের কবরে। তফাৎ এই—গিয়াস্-এর মক্‌বারায় যা ছিল ‘স্টাইল’, অন্যান্য ক্ষেত্রে তা শুধুমাত্র ‘ফ্যাশন’।

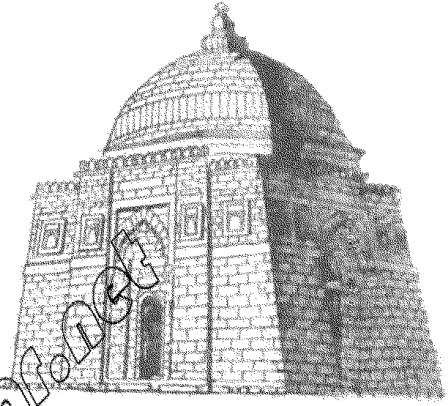
মনে প্রশ্ন জাগে, এই বিচিত্র ঢালটা এল কোথা থেকে? কেন? এই প্রশ্নের একটি সুন্দর জবাব দিয়ে গেছেন পার্সি ব্রাউন-সাহেব।^১ বলছেন, এই বাইরের দিকে ঢাল সমন্বিত দেওয়াল গেথে তোলার কায়দাটা পারস্যে বহু পূর্বযুগ থেকেই প্রচলিত। সেখানে পাথরের বদলে ইট, কখনও বা কাঁচা-ইটের গাঁথনি ছিল স্থাপত্যের উপাদান। গিয়াস্ তুগলকাবাদের নির্মাণ-কার্যে আত্মনিয়োগের পূর্বে মূলতানে একটি মক্‌বারা নির্মাণ করান—দরবেশ শাহ্ রুক্ন-ই-আলম-এর সমাধি (1320)। আটকোণা অতি উচ্চ কুঁসুর (plinth) উপর অষ্টভুজ সমাধিসৌধ। তুর্কী স্থপতিবিদেরা সেখানে পাথরের বদলে ইটের ব্যবহার করেছিল এবং পারস্যরীতি অনুযায়ী বাহির দিকে ঢাল দিয়েছিল। গিয়াস্ মূলতানী মিনারদের দিল্লীতে নিয়ে এসেছিলেন কিনা ইতিহাসে লেখা নেই, কিন্তু মূলতানী রীতিটা তিনি আনতে ভোলেননি।

হুবহু অনুদ্রুত করলেন না তা বলে। অষ্টভুজ ইমারৎ হয়ে গেল চতুর্ভুজ। আর সব চেয়ে বড় কথা মূলতানী মক্‌বারার সুক্ষ্ম কারিগরী—ফুল-লতা-পাতা জ্যামিতিক নকশা অতি সযত্নে পরিহার করলেন। দরবেশের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলির অর্ঘ্য যে পুষ্পসম্ভার ছিল শোভন, তা আজন্ম-যৌস্কার সমাধিতে বর্জন করা হল। গিয়াসের সমাধির উপরস্থ সন্দোখ্-এর ঠিক নিচে—ভূগর্ভে যে কবরখানায় তিনি শায়িত সেখানে মূলতানের জীবিতকালে সঞ্চিত ছিল তাঁর আজীবনের সঞ্চয়। ইব্ন বতুতার ভাষার আক্ষরিক অনুবাদ, “সেখানে, ঐ ভূগর্ভে একটি চৌবাচ্চা তৈরী করে সম্রাট তাতে গলিত স্বর্ণ ঢেলে দেন; প্রকাণ্ড চৌবাচ্চাটা পরিণত হয়ে যায় নিরেট সোনার তালে।”

‘দুর্ঘটিনায় মৃত’ মূলতানের মরদেহ পরদিন প্রভাতে আবিষ্কৃত হলে তাঁর পুত্র মুহম্মদ তুগলক—বোধকার শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে—প্রথমেই ঐ সোনার তালটিকে অপসারিত করতে বাধ্য হন—না হলে আত্মজ্ঞানকে শোয়াবেন কোথায়?

মক্‌বারা-চত্বরে প্রবেশের দ্বারটি কিল্লার দরওয়াজার মতো। কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করে সেখানে বেতে হয়—সংকীর্ণ সে পথ, একের-পিছে এক প্রবেশ করতে হয়, সদলবলে নয়। আন্দাজ করছি, তুগলকাবাদের রাজপ্রাসাদ থেকে প্রতিদিন গভীর রাত্রে বোরখা-

পরিহিতা এক হতভাগ্য কিংবা চিরসংহত ঐ মক্‌বারায় আসতেন, যখন রাতের তৃতীয় বায়ে উৎসবমুখরিত রঙমহাল ক্রান্ত ধূমে ঢলে পড়ত। সেই হতভাগিনী হচ্ছেন সম্রাটজননী—মুহম্মদ তুগলকের গর্ভধারিণী! হারেমের ভিতর নিহতে কাদবার অবকাশ তাঁর ছিল না—চারিদিকে মূলতান আর তাঁর উজীরে আজর প্রাঙ্কন-স্বর্পিত আমজাদ-অয়াদ নিবৃত্ত খোজা প্রহরী। কি জানি কেন হতভাগিনী হজরৎ নিজামউদ্দীন



চিত্র-5.2 গিয়াস্-উদ্দীনের মক্‌বারা।

আউলিয়ার দরগাতে গিয়েও শান্তি পেতেন না! সাত দিনের রুদ্ধ অশ্রুকে মূর্তি দিতে গভীররাত্রে ঐ সোপান বেয়ে মক্‌বারায় উঠে আসতেন। বিশ্বস্ত প্রহরী পাহারা দিত বাহির-দ্বারে, আর ঐ পাথরের কবরটা আলিঙ্গন করে বুকফাটা-কাশায় ভেঙে পড়তেন বিগতভর্তা রাজমহিষী। সার্থক হত জীবিত গিয়াস্-এর স্বপ্ন :

“বাল বিখারকে টুটি কয়রোপো
জব কোই মেহেজবীন রোতি হয়,
মুঝকো অফসর থমাল আতা হয় :
মোং কিংনি হাসিন হোতি হয় ॥”*

মুহম্মদ তুগলক : মুহম্মদ তুগলকের কিছ্র অপকীর্তির কথা বলছি, তিনি ইতিহাসকে অস্বীকার করতে চেরেছিলেন, ইতিহাসের কণ্ঠরোধ করে। দিল্লীশ্বর বিদ্রুদগর্ভ কালবেশাখী মেঘের মতো ক্ষমতাস্বর—কিন্তু ইতিহাস যে তার চেরেও শক্তিশালী : সূর্যের মতো জ্যোতির্ময়! ইতিহাসও তাই প্রত্যাবৃত্ত

* মক্‌বারা-অভিসারিকা দেখেছি। কিন্তু হতভাগিনী :
বিকীর্তিমুখরিত বিলাপ : বস, ধালিল্পন ধনী?
আমি তা দেখেছি! তাই সানন্দে রচনা প্রতিষ্ঠা
করে এ পাঠ্য-কলকের বৃকে লুটবে হৃৎকণ্ঠনী ॥

করেছে। প্রতিশোধ নিয়েছে মুহম্মদ তুগলুকের ললাটে
লেপ দিয়েছে প্রাপ্ত পরিচয়ের শাস্বত তিসিক। আমরা
আজও কথায় কথায় বলি, 'যেন পাগলা মুহম্মদ বিন্
তুগলুক !'

মুহম্মদ বিন্ তুগলুক পাগল ছিলেন না আদৌ—
অত্যন্ত মেধাবী। পণ্ডিত, বস্তুত তিনি প্রতিভাধর
ছিলেন।

'পাগল' আর 'প্রতিভা'র ফারাক সামান্যই—
লক্ষ্যের গন্ডির এ-পাশ ও-পাশ! পাগল কে? যার
চিন্তার পারম্পর্য নেই। কিন্তু কে সেটা বিচার করে
রায় দিচ্ছে? কেন, সমসাময়িক সাধারণ-বুদ্ধির মানু্য,
বাদের চিন্তায় পারম্পর্য আছে। আর প্রতিভাধর?
তাকে চিহ্নিত করছে ভবিষ্যৎ কালের মানু্য, সমকালীন
নয়। সমকালের কৃষ্টিপাথরে তাই সফ্রেটিস্ পাগল,
ষীশু পাপল, গ্যালিলেও পাগল, ভল্টেরার পাগল,
ভ্যানগাথ্ পাগল, মায় 1919-এর পূর্ণ-সূর্য-গ্রহণ-
ইন্সটক্ আলফার্ট আইনস্টাইনও পাগল! প্রতিভাধরের
সংজ্ঞাটাই তাই। সে সমকালের চেয়ে কয়েক কদম
এগিয়ে আছে। মুহম্মদ বিন্ তুগলুকের পাগলামীটা
ধরা পড়় গেল এজন্য যে, তিনি শূদ্ৰ আবিষ্কারকই
নন, তাঁর খিয়োরির স্বয়ং প্রয়োগকর্তা। যেহেতু তিনি
সফ্রেটিস্-ষীশু-গ্যালিলেও-ভল্টেরার-ভ্যানগাথ্ - আইন-
স্টাইনের মতো বিস্তারিত নন, তিনি দিল্লীশ্বর।
আইনস্টাইন যদি জেনারেল প্রোভিস্-এর মতো সং-
গঠকের ভূমিকায় নিজ তত্ত্বাবধানে 'এ্যাটম-বোমা' বানাতে
চাইতেন তাহলে তিনিও মুহম্মদ বিন্ তুগলুকে পরিণত
হতেন। রাদার ফোর্ড, অটো হান, এনরিকো ফার্মি,
নীলস্ বোহর, আইনস্টাইন, সত্যেন বোস এক জাতের
মানু্য—জেনারেল প্রোভিস্, ওপেনহাইমার, যুদ্ধ-
সচিব স্টিমসন অন্যজাতের। সূর ও অসূর অজগরের
দুই প্রান্ত চেপ না ধরলে বিজ্ঞান-সমুদ্রে প্রয়োগ-
বিদ্যাকে বন্দার পর্বত করে মল্লন সম্ভবপর হত না!
পরমাপুর অন্তর বিদীর্ণ করে পারমাণবিক শক্তি এক
হাতে অমৃত আর হাতে হস্তাঙ্গ ভাঙ নিয়ে আবির্ভূত
হত না!

মুহম্মদ বিন্ তুগলুক দিল্লী থেকে রাজধানী
স্থানান্তরিত করতে চেয়েছিলেন দক্ষিণাভ্যে, দৌলতা-
বাদে। অত্যন্ত সুবুদ্ধিপূর্ণ প্রস্তাব। কয়েক শতাব্দী
ধরে উত্তরদিক থেকে উপদ্রুপিত মঙ্গোল আক্রমণ
হচ্ছে তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার এ এক
চমৎকার সমাধান। মঙ্গোলিয়া থেকে পারস্য যাবার
সড়ক ছেড়ে, তথাকথিত রেশম সড়ক ছেড়ে, বেশ কিছু
দূরে সরে যাওয়াই তো স্বপ্ন। মাক্খান থাক না কেন

রাজপুতানার পার্বত্য মরু অঞ্চল, থাক না প্রথম মহড়া
নিতে দুর্ধর্ষ রাজপুত জাতি! চীনের প্রাচীরের মতো।
ভৌগোলিক বিচারেও তদানীন্তন সাম্রাজ্যের কেন্দ্র-
বিন্দুর নিকটতর দৌলতাবাদ। সেখানে রাজধানী
স্থানান্তর করার প্রস্তাবে পাগলামী নেই কিছু,
পাগলামীটা ধরা পড়়ল ঐ নীতিটোর প্রয়োগ কৌশলে!

মুহম্মদ বিন্ তুগলুক রূপার বদলে তামার
মুদ্রায় ছাপ দিয়ে অর্থনীতির এক নয়া-বিস্ফলব আনতে
চাইলেন—যা আজ সারা দুনিয়ায় চলছে মুদ্রাবাজারে :
কাগজের নোট। চীন ও পারস্য দেশে এ জাতীয় ছাপ
সম্বল কারেন্সি মুহম্মদের পূর্বযুগেই সাফল্যমণ্ডিত-
ভাবে প্রচলিত হয়েছিল। সম্ভবতঃ পণ্ডিত সুলতান সে
সম্বন্ধে অবহিতও ছিলেন। এ প্রস্তাবটাতেও বাতুলতা
নেই, তাঁর ব্যর্থতা শূদ্ৰ প্রয়োগ-কৌশলে, যথাযোগ্য
সাবধানতার ব্যবস্থা না করায়। যুগান্তকারী আবি-
ষ্কারটাকে তিনি বাস্তবায়িত করতে চাইলেন কয়েক
শতাব্দী আগে। তখনও ভারতবর্ষ সেজন্য প্রস্তুত নয়।
ঠিক যেমন নিজের দুই বাহুদুলে কৃত্রিম ডানা বেঁধে
উড়বার চেষ্টা করে উপহাস্যাম্পদ হয়েছেন মানব-ইতি-
হাসের আর এক বিশ্ব-বিপ্রুত 'পাগল' : লেওনার্দো দ্য
ভিঞ্চি!

আদিলাবাদ : তুগলুকাবাদের দক্ষিণে অবস্থিত
আদিলাবাদকে কেউ কেউ বলেছেন মুহম্মদ বিন্
তুগলুকের পত্তন করা নগরী। সেটা মেনে নিতে মন
চায় না। দুটি কারণে। প্রথমতঃ, মুহম্মদ তো আর
একটি নগরীর পত্তন করেছিলেন—কুৎব-চম্বরের দক্ষিণ-
পূর্বে, জহান্পনাহ্ (চিত্র—3.1); তাহলে এত
কাছাকাছি আর একটা নগরী তিনি পত্তন করবেন কেন?
স্বিতীয়তঃ, দেখতে পাচ্ছি—তুগলুকাবাদের দুর্গ, অর্থাৎ
গিয়াস্-এর কবর থেকে ঐ আদিলাবাদে যাবার একটি
সড়ক তো গিয়াস্-এর আমল থেকেই ছিল। তাই মনে
হয়, আদিলাবাদ গিয়াসের যুগ থেকেই ছিল, যদিও
মুহম্মদ তুগলুক সেখানে 'নাই-কা-কোট' নামে একটি
ইমারৎ এবং 'মুহম্মদাবাদ' নামে একটি দুর্গ তৈরী
করান।

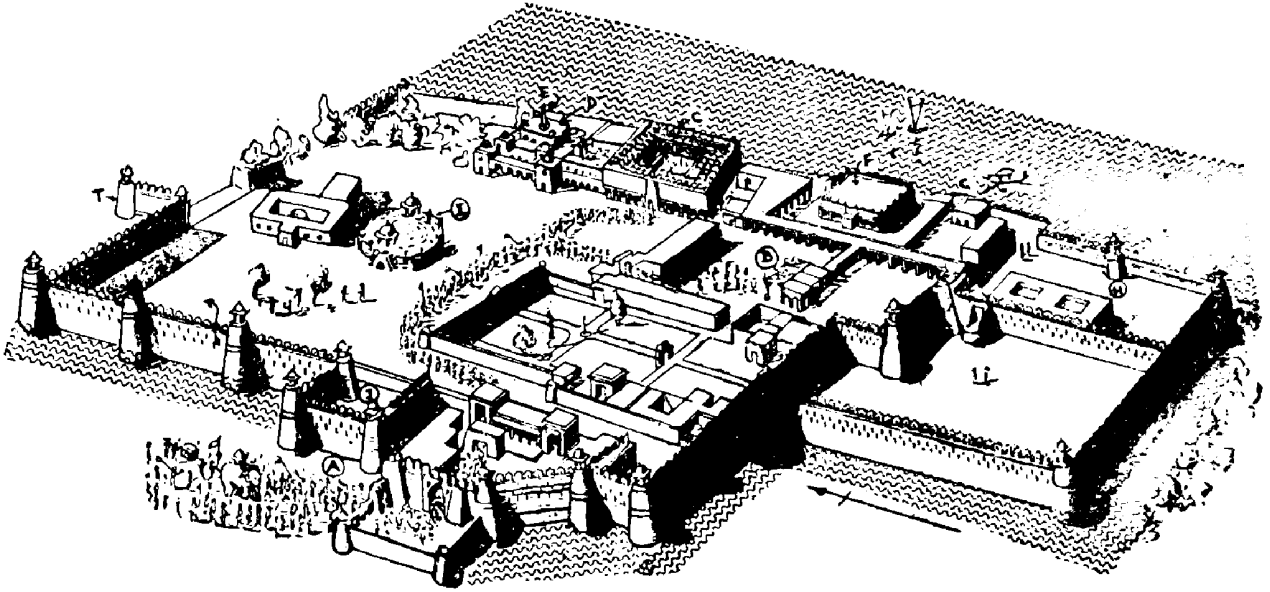
জহান্পনাহ্ : দিল্লীর চতুর্থ নগরী, মুহম্মদ
তুগলুক পরিকল্পিত। তিনি সেখানে স্বয়ং বাস
করতেন (চিত্র 3.2)। কিন্তু প্রাচীর-বেষ্টিত সেই অংশে
সাধারণ প্রজার স্থানান্তার হওয়ায় মুহম্মদ রায়-পিথোরা
কিল্লা এবং সিরিকে সংযুক্ত করে এই জহান্পনাহ্
গড়ে তোলেন। এ শহরের বস্তুত চিহ্নমাত্র নেই।

ধ্বংসস্তূপ থেকে শতাব্দীর পর শতাব্দী সাধারণ মানুষ উঠিয়ে নিয়ে গেছে প্রস্তরখণ্ড। তবু নজর করলে কিছ, কিছ, প্রাচীন চিহ্ন এখনও দেখা যায়—আই. আই. টি.-র উত্তরে, খিড়কি মসজিদের দক্ষিণে অথবা চিরাগ-দিল্লীর পথের ধারে ধারে।

ফিরোজশাহ্ তুগলক : এবার তুগলক বংশের তৃতীয় সুলতান ফিরোজশাহ্-এর প্রসঙ্গে আসি। দিল্লী-আগ্রা অঞ্চলে ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যের গোটা নৈশ আকাশটা দূর থেকে যদি দেখি তাহলে মাঠ পাঁচটি তারকা ঝুঞ্জুলে। আর সবাইকে শ্লান করে দেয় :—কুৎব-নির্মাতা ইল্-তুংমিস্, ফিরোজশাহ্ তুগলক, শেরশাহ্ শূর, আকবর এবং শাহজাহাঁ। তার ভিতর একটি বিষয়ে ফিরোজ অস্বীকার্য—মেরামতির কেরা-

ছিল দার্চের নামান্তর ; আকবরের কাছে স্থাপত্য ছিল তাঁর জীবন-দর্শনের ধর্ম ও রাজ্যশাসনের রূপক ; শাহজাহাঁর কাছে স্থাপত্য ছিল ‘প্যাশান’ ; শেরশাহ্ শূরের কাছে তা নির্দিধ্যাসন এবং ফিরোজের কাছে তাঁর জীবন !

নিজের সম্বন্ধে ফিরোজ বলছেন, “Among the gifts God bestowed on me, His humble servant, was a desire to erect public buildings.”¹⁰ (পরমকারুণিক আল্লাহ্ তাঁর এই কৃত্যকে যে কয়টি গুণ দিয়েছেন তার অন্যতম জনসাধারণের জন্য ইমারৎ বানানোর বাসনা।) তাই তিনি ক্রমাগত ইমারৎ গড়ে গেছেন, ভগ্নপ্রায় মোকাম মেরামত করে গেছেন—নামের মোহে নয়, কাজের নেশায়, ভালো কাজের আন্তরিক তাগিদে।



চিত্র-5.3 ফিরোজশাহ্ কোটলার প্ল্যানিং।

মর্তিতে। স্থাপত্যের সঙ্গে অহমিকা প্রায় অগাঙ্গীভাবে সংযুক্ত। স্থাপত্যকীর্তিতে নিজের নাম যুক্ত করা ফলক বসানোর বাসনা, রায় পিথোরার পরবর্তী যুগের ভারতবর্ষে—পাঠান, মুগল, ইংরেজ এবং স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে একটা ম্যানিয়া। আজকের দিনেও সংবাদপত্রে দেখতে পাই—অধিকাংশ পূর্তমন্তীর এক-মাঠ কাজ শব্দ, ভিত্তিস্থাপন, পুরস্কার-বিতরণ, পটো-শুলন, মালাদান, প্ল্যানিং। ফিরোজ ছিলেন অন্য-জাতের মানুষ—নৈর্ব্যক্তিক উদাসীনতায় তিনি শব্দ গড়েই যাননি, ভাঙাকে ঠেকিয়েছেন ; প্রাচীন যুগের স্থাপত্য-কীর্তিকে একের পর এক মেরামত করে গেছেন। তাই বলা চলে, আইবক্-ইল্-তুংমিসের কাছে স্থাপত্য

তাঁর স্থাপত্যরীতির একটা বৈশিষ্ট্য হল—‘রায়ডাম-রাবল-ম্যাসনরি’। ইতিপূর্বে স্বস্থানে প্রস্তরখণ্ডটিকে বসানোর পূর্বে তাকে নিপুণভাবে এবং সমান মাপে ছোট্টে নেওয়া হত। যাতে প্রতিটি জোড়াই সমান দূরত্বে, সমান বেধ-এ হতে পারে। যাকে বলে ‘গ্যাম্‌লার গার্ডিন’। রায়ডাম-রাবল গার্ডিনে তা নয় ; অসম মাপের ছোট-বড়ো পাথর এলো-মেলো সাজিয়ে যাওয়া হয়, যাতে দেওয়ালের শব্দ মোট প্রস্থটা সর্বত্র সমান থাকে। তাই এ দেওয়ালের ভারবাহী ক্ষমতাটা কম, ফলে একটু বেশি চওড়া করে গাঁথতে হয়।

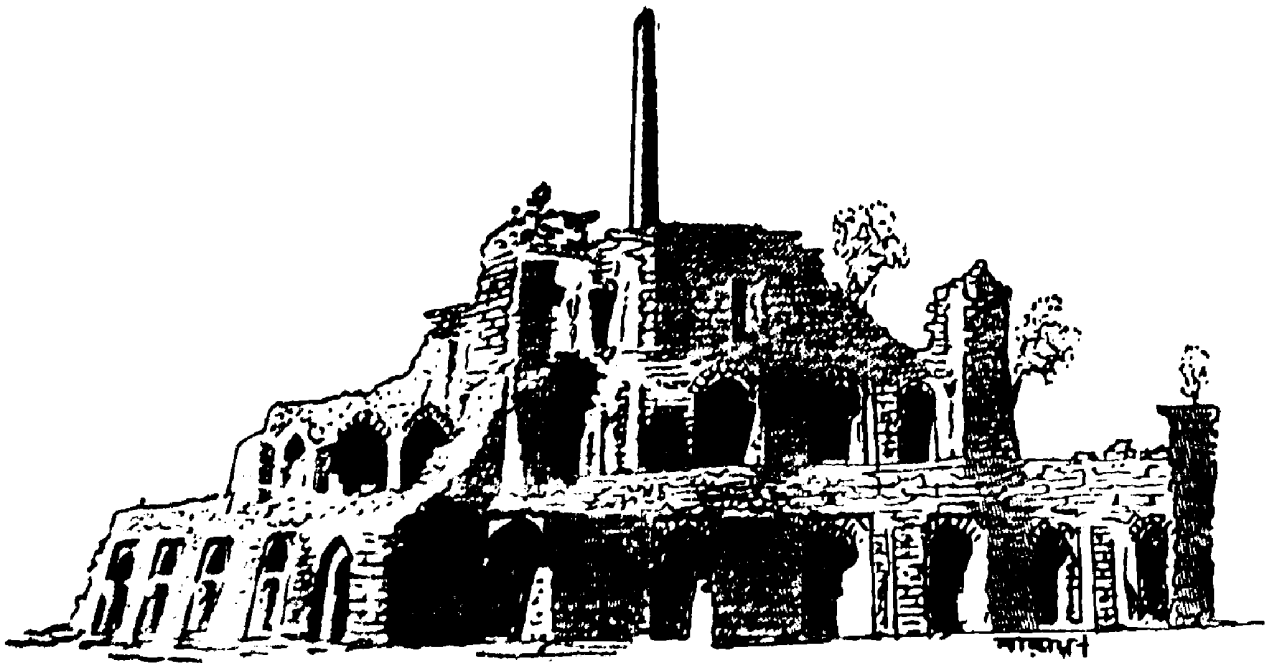
ফিরোজশাহ্ অভিনবত্বের তাগিদে এই নতুন রীতির আবিষ্কার করেননি, সেটা আগেও ছিল। তিনি এ

পশ্চাতির ব্যাপক ব্যবহার করেছেন শব্দ; নিত্যন্ত প্রয়োজনের তাগিদে; একটি বাস্তব সমস্যার সমাধান করতে। তাঁর পূর্ববর্তী সুলতান মুহম্মদ যখন দিল্লী থেকে সৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন, তখন দক্ষ মিস্ত্রির দল ডেরা-ডাঙ্গর গদুটিয়ে নিয়ে বিভিন্ন প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের স্মারক দর, যহলোক যারাও যার, বা অন্য ব্যবসারে চলে যার। ফিরোজ যহু অনুসন্ধানেনও যথেষ্ট সংখ্যক দক্ষ মিস্ত্রি জোগাড় করে উঠতে পারেননি, অথচ পূর্তকর্মে তাঁর অদম্য উৎসাহ। তারই ফল এই রান্ডাষ-রাবুল্ গাধানি, যাতে দক্ষতার প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত কম।

ফিরোজ দিল্লীতে আবার একটি নতুন রাজধানী

দিক রক্ষা করবে নদী, দ্বিতীয়তঃ, জলাভাবের আশঙ্কা নেই, তৃতীয়তঃ, পরিখা শুকিয়ে যাবে না, চতুর্থতঃ, গ্রীষ্মপ্রধান দিল্লীতে নদীর শীতল বাতাস পাওয়া যাবে। তাই ফিরোজ নিজের কিল্লা বানালেন যমুনা যাবে। তাই ফিরোজ নিজের কিল্লা বানালেন যমুনা যাবে। তাই ফিরোজ নিজের কিল্লা বানালেন যমুনা যাবে।

যমুনা-কিনারের এই 'ফিরোজশাহ্ কোটলা' দুর্গ 'মিলিটারী এঞ্জিনিয়ারিং'-এ এক যুগান্তরে উত্তরণ। ফিরোজশাহ্-কোটলার নগর-বিন্যাস ও কিল্লা নির্মাণের ছন্দটি মধ্যযুগ পার হয়ে বর্তমান শতাব্দীর



চিত্র-5.4 ফিরোজশাহ্-র প্রাসাদ, বর্তমান অবস্থা।

স্থাপন করেন, বা প্রায় সেঞ্চুর বছর (1354-1490 ?) দিল্লীশ্বরের আশ্রয়স্থল ছিল। স্থান নির্বাচনে ফিরোজ একটি বাস্তব এবং আধুনিক চিন্তাধারার পরিচয় দিলেন। পূর্ববর্তী সুলতানদেরা—রায়-প্রধোরা, সিরি, তুসল্কাবাদ, জহান্সনাহ্, আদিলাবাদ যারা পত্তন করেছিলেন তারা একটা সত্যকে স্বীকার করেননি—দিল্লীর অনতিদূর দিয়ে যমুনা নদী প্রবাহিত। মানব-সভ্যতার আদিযুগ থেকে হোমারও রো, নীল, ইউফ্রেটিস, টাইগ্রিস, সিন্ধু নদের ধরে ধরে গড়ে উঠেছিল সভ্যমানবী জনপদ। যমুনা যখন অদূরে তখন তার কিনার-ঘেঁষে কেন রাজধানী স্থাপন করা যাবে না? এতে অনেকগুলি লাভ। প্রথমতঃ, কিল্লার এক-

প্রাক-উড়োজাহাজ-যুগ পর্যন্ত ছিল জঙ্গী প্রয়োগ-বিদ্যার 'মাস্টার-প্ল্যান'। সেকেন্দার লোদীর বাদলগড়, আকবরের আগ্রা কিল্লা, এলাহাবাদ কিল্লা, শাহ-জাহাঁর লাল-কিল্লা, এমন কি ইংরাজের গড়া কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম—সর্বত্র তার প্রভাব পড়েছে। প্রত্যেকটি প্লানেই নদী আছে দুর্গের এক প্রান্ত দিয়ে লম্বালম্বভাবে; বাকি তিন দিকে নদীর জল টেনে আনা হয়েছে কৃত্রিম পরিখার মাধ্যমে। মূল প্রাসাদগুলি নদীর কিনার বরাবর বিন্যস্ত, যাতে নদী-দৃশ্য ঘরে বসেই বা ছাদে উঠে দেখা যায়, নদীর শীতল বাতাসে গ্রীষ্মপ্রধান শহরে ইমারৎগুলিতে স্নিগ্ধতা আনে, এবং আল্লাহ্-না-করুন, তেমন তেমন অবস্থায় পড়লে দুর্গ-

রক্ষীদের হাতে দায়িত্ব দিয়ে নদীপথে গান ছেড়ে অস্তিত্ব জ্ঞান নিয়ে পালিয়ে যাওয়া যায়।

ফিরোজশাহ্ কোটলা (চিত্র-5.3) উত্তর-দক্ষিণে প্রায় পোনে এক কিলোমিটার লম্বা, প্রস্থে তার অর্ধেক। প্রধান ও একমাত্র প্রবেশদ্বার বর্তমান শহরের দিকে, পশ্চিমে। তাতে পর পর দুটি সুরক্ষিত আগমনদ্বার (A)। প্রাচীরে প্রায় সমদ্রুত ব্যাস্টিয়ান।

আগ্রা, এলাহাবাদ ও লাল-কিল্লার সঙ্গে ফিরোজশাহ্ কোটলার সাদৃশ্য এবং বৈপরীত্য দুটোই লক্ষ্য করবার মতো। সাদৃশ্যটা মূল প্রাসাদগুলির বিন্যাসছন্দে। দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, মসজিদ, খাস-মহল ও জেনানামহালের পারস্পরিক অবস্থানে। ফিরোজশাহ্-র আদি প্ল্যানিং সর্বত্রই অনদৃষ্ট—সর্বত্রই প্রথমে দেওয়ান-ই-আম পিছনে দেওয়ান-ই-খাস, রাজপ্রাসাদের উত্তরে মসজিদ এবং দক্ষিণে জেনানামহাল। ফিরোজশাহ্-র দুর্গের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে প্রধান প্রবেশদ্বার থেকে সাধারণ দর্শনাথীদের আসতে হবে একটা বিসর্পিত পথে, প্রাচীরবেষ্টিত আঙ্গুরবাগকে প্রদক্ষিণ করে। সেটা বোঝানোর উদ্দেশ্যে চিত্র-5.3-তে আমি একসারি দর্শনাথীদের একে দিয়েছি—ওদের একদল চলেছে রাজসন্দর্শনে দেওয়ান-ই-আম-এ, অপর দল চলেছে জাম-ই-মসজিদে। দেওয়ান-ই-আমের পিছনে উত্তর-দক্ষিণ-লম্বা আবার একসারি অলিঙ্গ সমন্বিত ইমারৎ—তার পূর্বে, নদী-কিনারে, সুলতানের খাসমহল ও জেনানা। কোটলার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ইমারৎ—যার চিহ্ন এখনো বর্তমান, তা হচ্ছে অশোক-স্তম্ভ (E) শোভিত সৌধটি। এটি চার তলা। ছাদের উপরে কেন্দ্রস্থলে অশোক-স্তম্ভটি প্রোথিত। সুলতান ফিরোজশাহ্ এই বিচিত্র-দর্শন প্রস্তরখণ্ডটি দেখেছিলেন আম্বালায়। তার বহিরঙ্গের মসৃণতা বিস্ময় জাগায়, তার গায়ে বিচিত্র বর্ণলিপিতে কী-যেন লেখা। সুলতান সেটিকে সযত্নে নিয়ে এলেন রাজধানীতে। ঘোষণা করলেন, কোন পণ্ডিত যদি তার পাঠোদ্ধার করতে পারেন তবে তাঁকে যথোপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হবে। কেউই পাঠোদ্ধার করতে পারেননি। সমকালীন ঐতিহাসিক¹¹ বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন, কী-ভাবে ঐ বিশালায়তন স্তম্ভটি আম্বালা থেকে দিল্লীতে নিয়ে আসা হল, কী-কায়দায় চার-তলা বাড়ির ছাদে তাকে বসানো হল! দেড়শ বছর আগে কুংবউদ্দীন আইবক যেমনভাবে গদুস্তব্দগের লৌহস্তম্ভটি কুওতুল্ মসজিদে ব্যবহার করেন, তেমনি ফিরোজও মোঘলগের একটি কীর্তি সংস্থাপন করলেন নিজের প্রাসাদশীর্ষে। তফাৎ এই -

কুংব অতীতের প্রতি প্রাণাশীল নন, নির্বিশ্বাস তিনি গরুড় মূর্তির গর্দানা নিয়েছিলেন, নিজের ধর্মবিশ্বাস ও জীবনদর্শনের সঙ্গে অতীত ঐতিহ্য না মিললে তাকে ছেঁটে নিতে কুংব পরাম্ভ নন; অপরপক্ষে, ফিরোজ অতীতের প্রতি প্রাণাশীল। যেখানে অতীত ধরা দেয় না, সেখানে তিনি অতীতকে ভবিষ্যতের হাতে সমর্পণ করেন। বস্তুত মোঘল-সম্রাট অশোকের সে বাণীর পাঠোদ্ধার করা হয়েছে একেবারে হাল আমলে, এই শতাব্দীতে, পণ্ডিতপ্রবর প্রিন্সিপের কৃতিত্বে।

ফিরোজশাহ্ নির্মিত এই কিল্লার পূর্বদিক দিয়ে অবশ্য যমুনা নদী বর্তমানে প্রবাহিত নয়—নদী সরে গেছে অনেকটা পূর্বে। চিত্র-5.3-তে যেখানে আমি যমুনা নদীকে একেঁছি, সেখান দিয়ে বর্তমানে আছে প্রকাণ্ড রাজপথ। ছবিতে ঠিক যে বিস্মৃতে 'D'-অক্ষরটা লিখেছি, এখানেই দাঁড়াতে টুরিস্ট বাসটা—যদি আপনি দিল্লী টুরিজম্ বিভাগের বাসে একদিনের জন্য দিল্লী দেখতে বেরিয়ে থাকেন। গাইড আপনাদের বাস থেকে নামতে দেবে না; বলবে, 'এখানে দেখার কিছুই নেই, সবই ভাঙা ধ্বংসস্তুপ। একমাত্র দর্শনীয় হচ্ছে অশোক-স্তম্ভ—ঐ দেখুন', বলে বাঁ-হাতটা তুলে দেখিয়ে দেবে : অশোকজাট!

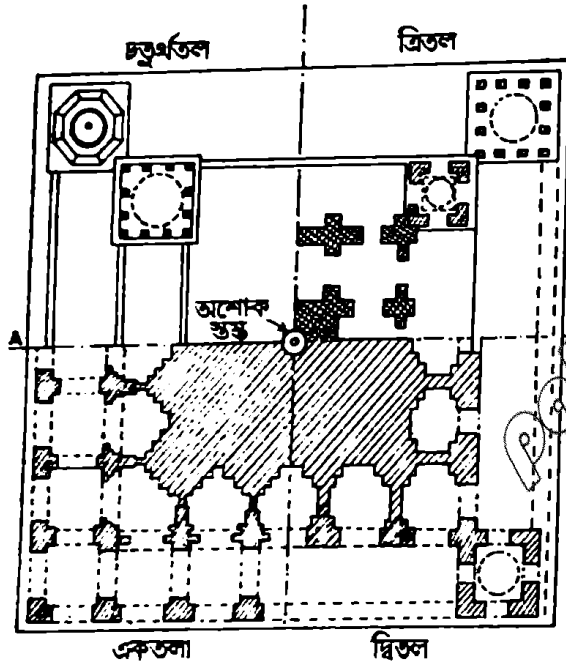
বেচারির দোষ নেই, কর্মকর্তাদের নির্দেশ সেই মোতাবেক!

হয়তো আপনি আমার মতোই 'মুশকিল-পসন্দ', ও-কথায় সন্তুষ্ট না হয়ে পরদিন নিজেই দেখতে যাবেন ফিরোজশাহ্ কোটলার ঐ একটিমাত্র জীবপ্রায় ধ্বংস-স্তুপ। এলেনই যখন, তখন চলুন খুঁটিয়ে সেটা দেখা যাক।

যা দেখছি (চিত্র-5.4) তাতে ধারণা করা কঠিন সে আমলে এ প্রাসাদ কেমন দেখতে ছিল। সেকুনা, আদিমরূপটা বোঝানোর উদ্দেশ্যে একটি প্ল্যান (চিত্র-5.5) এবং A B রেখায় কাটা একটা সেক্ষানাল এলিভেশান এই সঙ্গে একে দিলাম। প্রাসাদটি চতুর্দিক থেকে একই রকম দেখতে। চারতলা বাড়ি। একতলার সাতটি খিলান, দ্বিতলে পাঁচটি ও ত্রিতলে তিনটি। চতুর্থ বা সর্বোচ্চতলে খিলান নেই, শুধু অশোকস্তম্ভ। মাঝখানের অংশটি নিরেট পাথরের গাঁথনি। প্রতি তলার তা থেকে পঞ্চপ্রদীপের মতো অলিঙ্গ-বাহু প্রসারিত। মাঝখানের ঐ বিরাট নিরেট অংশটা অনায়াসে অশোক-স্তম্ভের ভারবহনে সমর্থ।

হিন্দু শৈলীর নবরঙ্গ-মন্দিরের ছকে ছত্রীগুলি বসানো। ত্রিতলে চারপ্রান্তে চারটি ছত্রী শ্বাদশস্তম্ভ শোভিত, চার তলার উপরেও চারটি ছত্রী, শ্বাদশস্তম্ভ

শোভিত। কিন্তু হিন্দু নবময় মন্দিরে নয়টি চুড়া যেমন ঘেঁষাঘেঁষি, ঠাশাঠাশি হয়ে থাকে, এখানে তা নেই; আর তাতেই বোঝা যায় ফিরোজ ছিলেন জাত-আর্কিটেক্ট। অশোকলিপির পাঠোন্মার তিনি করতে পারেননি, কিন্তু বুঝেছিলেন—সেটি ইতিহাসের এক দিকটি। তাই তাকে দিয়েছেন অপরিসীম মর্যাদা—কিল্লার একপ্রান্তে, অথবা কেন্দ্রস্থলেও জমিন সই-সই করে তাকে বসাননি। বসিয়েছেন সর্বোচ্চ স্থানে—চার দুরুনে-আর্টটি ছত্রী ঘেরা রাজসিংহাসনে। এবং তৃতীয় ও চতুর্থ তলের ছত্রী গায়ে গায়ে থাকলেও মধ্যমণি অশোকস্তম্ভের কাছাকাছি তারা কেউ ঘেঁষে আসেনি। সসম্মুখে সরে দাঁড়িয়েছে!

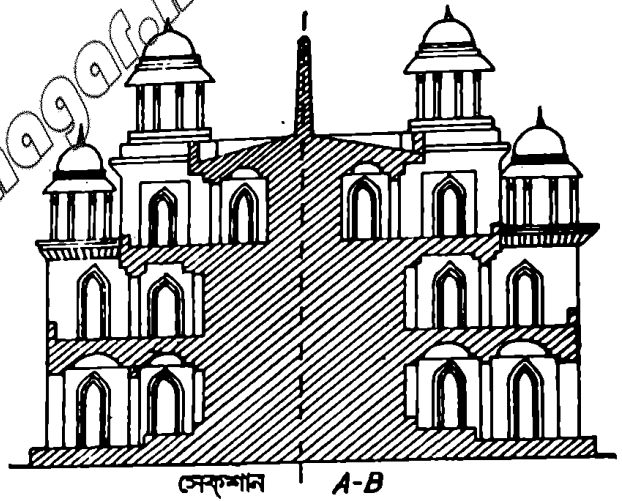


চিত্র-5.5 A ফিরোজশাহ প্রাসাদের প্ল্যান।

দর্ভাগ্য আমাদের—ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যের এই অনবদ্য উদাহরণটি টিকে নেই। তার চেয়েও বড় দর্ভাগ্য—এটি খুব অল্প লোকেই দেখতে যান। তার আদিম নকশাভিত্তিক রূপের একটি মডেল ওখানে না থাকার বৃক্কত পড়েন না এটি একটি অনন্যসাধারণ স্থাপত্যকীর্তি। এবং সবচেয়ে বড় দর্ভাগ্য—যে ফিরোজশাহ কোটলা মির্জাটারী প্ল্যানিং-এ অর্ধসহস্রক-কাল ছিল মাস্টার-প্লানের মর্যাদা নিয়ে তাকে আমরা মনে রেখেছি অন্য কারণে। ইন্টারন্যাশনাল-বোর্ডে যদি পেশ করেন প্রশ্নটা : 'ফিরোজশাহ কোটলা কি জন্য বিখ্যাত?' শুনবেন হব্দ আই. এ. এস. মেধাবী

ছাত্রের চট্জলদি জবাব : 'সেখানে 1972 সালে চন্দ্রশেখর উনআশি রানে আর্টটি ইংলিশ-উইকেট দখল করেছিল বলে।'

সম্রাট ফিরোজের আমলে নির্মিত মসজিদগুলির মধ্যে যে-গুলি দিল্লীতে অবস্থিত তার ভিতর উল্লেখ-যোগ্য : কালি মসজিদ (আঃ 1370), জহান-পনাহ-তে বেগমপুরী মসজিদ (আঃ 1370), এবং খিড়কি মসজিদ (আঃ 1375), তিমুরপুরীতে শাহ আলম দরগার কাছে একটি (আঃ 1375) আর শাহ-জানাবাদে কালান মসজিদ (আঃ 1375)। এর ভিতর অন্তত দুটি খুঁটিয়ে দেখার মতো—কালান ও খিড়কি মসজিদ। তাদের মধ্যে সামান্য প্রভেদ থাকলেও তারা মোটামুটি একরকম। দুটিতেই সড়ুচ্চ বেদী বা ভিত্তি আছে, এক-তলায় বা প্লিন্থে সারি-সারি খিলান, ছাদে সারি-সারি গম্বুজ ও আংশিকভাবে ছাদ আকাশে উন্মুক্ত। পার্সি ব্রাউন অনুসরণে তাদের একটির—খিড়কি মসজিদের, একটি চিত্র এখানে যুক্ত করে দিলাম (চিত্র-5.6)।



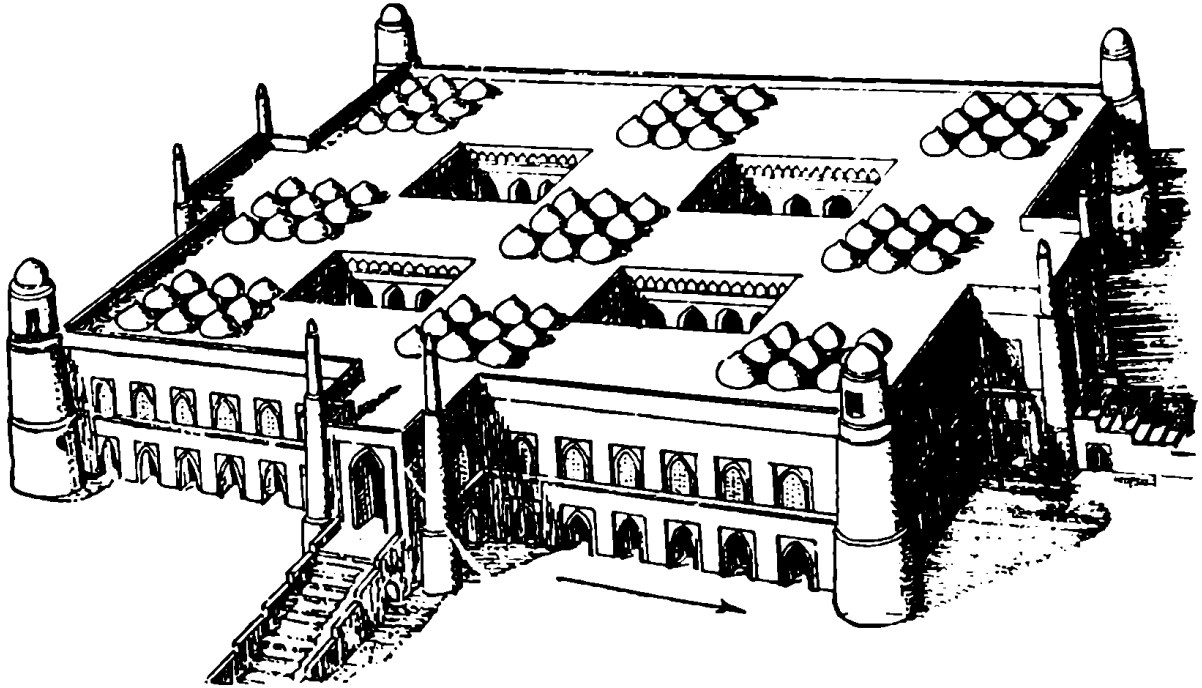
চিত্র-5.5 B ফিরোজশাহ প্রাসাদের সেকশন।

খিড়কি মসজিদ : আয়তক্ষেত্রের চারকোণায় চারটি ব্যাস্টিয়ান, তিন দিকে তিনটি প্রবেশদ্বার—চতুর্থ দিকে, পশ্চিমদিকে কিব্লা-সম্মুখিত মিহরাব। মিবতলে জানালাগুলিতে মোচাকের মধুকোষের মত ছোট ছোট খুঁপরি, যা-থেকে এ মসজিদের নামকরণ। ছাদের কিছুটা অংশ সমতল, কিছুটা গম্বুজায়িত, কিছুটা বা আলো-আসার জন্য আকাশে উন্মুক্ত। কী-ভাবে ঐ গ্রন্থীর বিন্যাস সুসম ছন্দে রূপায়িত তা চিত্র-5.6 থেকে বোঝা যাচ্ছে। তিনদিকের তিনটি প্রবেশদ্বারে, লক্ষ্য করে দেখুন, এক জোড়া করে সরু 'পাইলন'। মিনারিকা এদের বলা যাবে না, কারণ এরা বিচ্ছিন্ন

নয়, ইমারতের গায়ে, হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে ; এ অলঙ্করণ পরবর্তী যুগে ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যে বারে-বারে ফিরে-ফিরে এসেছে, গায় তাজমহলে। স্পষ্টতই ফিরোজ পরিকল্পিত এ মসজিদে চিত্রাচারিত প্ল্যানিং-এর ছন্দটা বদলানো হয়েছে। মাঝখানে আকাশে-উন্মুক্ত শেহান-ঘরে তিনদিকে লিয়ান বানানো হয়নি। এমন কি পৃথক ময়াল্জিন মিনারও গঠিত হয়নি। চার কোণার চারটি ব্যাস্টিয়ানের একটি থেকেই নামাজের আহবান দেওয়া হত।

ফিরোজ-জমানায় নির্মিত মক্কার ভিতরে অন্তত তিনটির উল্লেখ করতে হয় : ফিরোজের

ছিলেন-ফিরোজ তাও পরিহার করেছেন। তাঁর গম্বুজে হিন্দু-স্থাপত্য থেকে সংকলিত আমলক ও কলস বর্তমানে নেই, আদি যুগে ছিল কিনা জান না। কিন্তু প্রবেশপথে খিলানের নিচে লক্ষ্য করে দেখুন, দরজার মাথায় হিন্দু ট্যাকিয়েট-পর্শাতিত কর্বেলিঙ করা। মক্কার সম্মুখে রেলিং-ঘেরা অংশটা একটা স্নিগ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এখানে পাথরের জোড়াই সাঁচী স্তূপের কয়দায়। সাঁচী স্তূপে 'খন্ড'-র সঙ্গে যে-ভাবে সূতধরী-কোশলে 'সূচিকা'গুলি যুক্ত হয়েছিল এখানেও ঠিক একই কায়দায় খাড়া পোস্টগুলির সঙ্গে জমির সমান্তরাল



চিত্র-5.6 খিড়কি মসজিদ।

নিজের সমাধি, তাঁর উজীরে-আজম খান-ই-জাহান তিলাপানীর মক্কারা এবং ফিরোজের উত্তরাধিকারী কর্তৃক সমাপ্ত কবীরউদ্দীন আউলিয়ার সমাধিসৌধ।

ফিরোজশাহ্‌র সমাধি : হোস্-ই-খাস্‌এ অসংখ্য ইমারতের মধ্যে মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে ফিরোজশাহ্‌ তুগলক্‌র সমাধিসৌধ। আগিকের দিক থেকে এটি গিয়াস্‌উদ্দীনের মক্কারা উত্তরসূরী-পার্শ্বকোর মধ্যে এর বহিরাবরণ আরও সরল, আরও অনাড়ম্বর। গিয়াস্‌ গম্বুজটা সাদা মাৰ্বেলে গড়েছিলেন, জাফ্রিকাটা মর্মর মণ্ডিত গবাক্‌, এবং জমির সমান্তরালে কয়েকটি শূন্য মাৰ্বেল-ব্যান্ড ব্যবহার করে-

রেলিং-এ পাথরের জোড়াই করা হয়েছে। সূত্রাং বলা যায়, ফিরোজ ইসলামী স্থাপত্যে হিন্দু-শৈলী গ্রহণে আপত্তির কিছু দেখেননি, আর তা থেকেই অনুমান করি, তাঁর গম্বুজের উপরেও এককালে আমলক-কলস ছিল, গিয়াসী মক্কারা অনুকরণে।

এ মক্কারা অনবদ্য বৈশিষ্ট্য হল সংযুক্ত চক্রে ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত ছত্রীগুলি-ছত্রী না বলে চবুতরাই বলা উচিত, ইংরেজিতে যাকে বলে Kiosk। এগুলি মাদ্রাসা-সংলগ্ন মোকাম। বীরভূমের এক মাস্টার মশাই যেমন বর্তমান শতাব্দীতে বকুল গাছের ছায়ায় পড়াশুনার আয়োজন করেছিলেন তাঁর শান্তিনিকেতনে, প্রায় সেই একই রকম প্রেরণায় ফিরোজশাহ্‌ তুগলক্‌

মুজাক্কাদের নিচে বানিয়েছিলেন এই চব্বতরাগদুলি—
খোলা-প্রকৃতির মাঝখানে শিশুরা জীবনের প্রথম পাঠ
নিক।

কেন্দ্রীয় কক্ষটি বর্গক্ষেত্র। তার চারকোণায়
প্রত্যাপিত স্কুইণ্ড আটকোণা বীমটিকে ধরে রেখেছে,
যায় উপর বস্তাকার গম্বুজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা গগন-
অভিসারী। এ মক্‌বারার ভিতরে ও বাহিরে ষেটুকু
অলংকরণ দেখছেন তাও ফিরোজ পরিকল্পিত নয়,
পরবর্তী মোদী-যুগের সংযোজন। যে-ফিরোজ তাঁর
দীর্ঘ জীবনে অগণিত ইমারতে অলংকরণের প্লাবন
বইয়ে দিয়েছেন, নিজের সমাধিসৌধে তাঁর এই আশ্চর্য
সংযম দেখে মনে পড়ে যার কবি গালিব-এর শেষ
শের :

“গালিব-এ শস্তা কে বৈগের কওন-সে কাম বন্দ হৈ”।

রোইয়ে জার-জার ক্যা, কীজিয়ে হায় হায় কিউ?”

জবানবন্দরে, যার প্রায়-অনুবাদ : “বাহার লাগি
চক্‌ মদে কইরে দিলেম অশ্রুসাগর/তাহারে বাদ দিয়েও
দেখি কিবকুবন মস্ত ভাগর।”

বান্-ই-জাহান তিলাপানার মক্‌বারা : নাম—
মক্‌বুল বান্। সাকিন : দাক্ষিণাত্য, তিলাপানা।
ধর্মাস্তিত্ত মসলমান। উঠেছিলেন বুরোক্তেসির
সর্বোচ্চ শিকরে-ফিরোজ-এর উজীরে-আজম, প্রধান-
মন্ত্রী বা বান্-ই-জাহান। এই ইমারৎ মক্‌বারা-নির্মাণে
এক ক্রান্তিকারী সংযোজন। স্থাপত্য-ইতিহাসে এক
চিহ্নিত সম্পদ। দুর্ভাগ্যবশতঃ এটি ভূসদস্যায়। তা
হোক, কল্কনের সমাধি কেন্দ্র ধ্বংসস্তূপ হওয়া সত্ত্বেও
স্থাপত্য-ইতিহাসের এক দিক্‌চিহ্ন, এ ইমারৎ-ও তাই।

এতদিন সমাধিসৌধ ছিল অনিবার্যভাবে চতুষ্কোণ।
স্কুইণ্ড পদ্ধতিতে তার চারটি কোণা কী-ভাবে অষ্টভুজ,
এক ক্ষেত্রিকশ্রেণে ষোড়শভুজ রূপান্তরিত হয়ে
গম্বুজ-ধারণে উপবৃত্ত হত তা আমরা চিত্র-3.13-তে
পর্যালোচনা করছি। এখানে কল্প হল একটি নতুন
পরীক্ষা। কল্পটা শূন্যই কল্প হল অষ্টভুজ ইমারৎ-
রূপে। ফলে স্কুইণ্ড পরিচাল্য হল-নির্মাণ পদ্ধতি
হল সঙ্কল, বৈচিত্র্যময় এবং নমনীয়তার। এই নির্মাণ-
কৌশল পরবর্তী যুগে ব্যারে ব্যারে অনুকৃত হয়েছে।
সৈয়দ ও মোদী যুগে, শেরশাহ শূন্যের সাসারাম-
মক্‌বারার, এমন কি আকবরী-জহানার অধম খাঁর
সমাধিতে। অষ্টভুজ পদ্ধতিটির মাধ্যমে কেণ্ডা
কেবল এল, অলংকার সে কথা কল্প নিম্নসংযোজন করে
আশ্চর্য লাগে ভাব্যত-কেন এতদিন কেউ সেই জেরু-
সালেমের ওপর কল্কিসের (চিত্র-2.3) অনুকরণে

অষ্টভুজ মক্‌বারা বানাবার চেষ্টা না করে ক্রমাগত স্কুইণ্ড
ঠেঁরি করে গেছেন।

তিলাপানার মক্‌বারায় অষ্টভুজ-কক্ষের বাহির
দিয়ে একটি অলিন্দ মূল সৌধকে পরিক্রমা করেছে।
তার আটকোণায় আটটি মূল স্তম্ভ এবং দুই স্তম্ভের
মাঝের ফোকরে তিনটি করে খিলান। খিলানগুলি
অশ্বখুরাকৃতি নয়, টিউডরী খিলান।

লক্ষণীয়, তিলাপানার মক্‌বারার স্থপতি ‘ডোম
অব দ্য রক’ থেকে স্থাপত্যের বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ বিদ্যা-
টুকুই শৃঙ্খল গ্রহণ করেছেন, ‘আর্কিটেকটোনিকাল’
মহিমা আরোপ করার সময় তাঁর স্বকীয়তা স্বয়ং-
প্রকাশ। জেরুসালেম মসজিদে বাহিরের দিকে ছিল
আটকোণা প্রাচীর, ভিতরদিকে স্তম্ভ-সমন্বিত অলিন্দ।
এখানে সেটা উল্টে দেওয়া হয়েছে। আট কোণা কক্ষটা
এসেছে ভিতরে, স্তম্ভ-সমন্বিত অলিন্দ বাহির দিকে।
আর সেই জন্যই বৃদ্ধ হয়েছে আর একটি নতুন জাতের
অঙ্গ : প্রসারিত-বাহু ছুজ্জা (chujja)। তার সঙ্গে
আমদানী করা হয়েছে আটকোণায় আটটি ছত্রী।

খান-ই-জাহান তিলাপানার মক্‌বারাটি সুরক্ষিত
নয়, তাই তার ছবি দিলাম না। কিন্তু স্থাপত্য-বিষয়ে
এখানে যা আলোচনা করা হল তা পরবর্তী যুগে
নির্মিত এই প্ল্যানিং সমন্বিত যে-কোনো মক্‌বারা
(চিত্র-6.1 থেকে 6.5) দেখে বুঝে নিতে অসুবিধা
হবে না।

ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যে ফিরোজ একজন দিক-
পাল। তাই তাঁর সম্বন্ধে অনেক প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ
করেছি। তা পড়ে ইতিহাসের ছাত্র যেন মনে না করেন,
ফিরোজশাহ তুগলক ছিলেন একজন আদর্শ সুলতান।
না, রাজ্যসীমা তিনি বর্ধিত করেননি নব নব রাজ্য
জয় করে, সূশাসনও প্রবর্তিত করতে পারেননি। তিনি
ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া সুন্নি-মসলমান। বোধকারি
ঔরঙ্গজেব ভিন্ন এমন ধর্মাত্ম আর কেউ বসেননি
দিল্লীর তক্ত-তাউসে। কিন্তু আমরা তো ফিরোজের
সার্বিক বিচার করতে বসিনি। আমরা যে দেখেছি,
তিনি বৃহত্তম দিল্লী শহরে 1200টি নতুন উদ্যান
ঠেঁরি করেন।¹² ফিরিস্তার হিসাবে তিনি 845টি নতুন
ইমারৎ নির্মাণ করেন, তার অনেকগুলির বর্ণনা
সুলতান স্বয়ং লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এছাড়া,
আগেই বলেছি, অনেক অনেক প্রাচীন পুরাকীর্তি
তিনি সেরামত করিয়েছিলেন—কুৎব মিনার, সুলতান
খারী, সূর্য কুন্ড বা আলাই-তালো। শিকারের নেশা
ছিল তাঁর। অনেকগুলি শিকার-ভবনও ঠেঁরি করান—
মালচা মজল, ভুলি-ভাটিয়ারি-কা-মহল, অথবা পীর

গালিব।

আর একটি কারণে সালাম জানাবো ফিরোজকে—
দিনপঞ্জিকায় সুলতান উল্লেখ করে গেছেন তাঁর প্রধান
স্বপ্নার্থবিদদের নাম : মালিক গাজী শাহানা এবং তাঁর
শিষ্য আবদুল হক (ওরফে জাহিরসুন্দর)^{১৩}। ইতিহাসে
স্বপ্নার্থবিদেয়া স্বতই উপেক্ষিত, কিন্তু এঁদেরই
উদ্ভাবনী শক্তিতে আমরা পেয়েছি খান-ই-জাহান
মক্কার অষ্টভুজ প্ল্যানিং, ফিরোজশাহ-কোটলার
অপূর্ব বিন্যাসছন্দ, অথবা অশোকস্তম্ভ শোভিত এ
বিচিত্রদর্শন স্থাপত্যকীর্তি।

ফিরোজ দীর্ঘ আশি বছর বেঁচেছিলেন। সে
যুগের হিসাবে খুবই বেশি। তাঁর শেষ জীবনও
চিরাচরিত প্রথায় বেদনাক্লান্ত। হেতুও সেই একই :
উত্তরাধিকারীদের অযোগ্যতা।

খান-ই-জাহান তিলাপানী তর্তাদিন মার্ট নিয়ে-
ছেন। তাঁর পুত্র জুনাহ-শাহ হয়েছে নতুন খান-ই-
জাহান, আজকের পরিভাষায় স্বরাষ্ট্র-তথা-অর্থমন্ত্রী।
লোকটি সুবিধের নয়। জুনাহ-শাহ মনে করল, পিতা-
পুত্রে যদি বিরোধ বাধিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে হয়তো
সে নিজেই মস্‌নে উঠে বসবার সুযোগ পেরে যাবে।
তাই নেপোর ভূমিকায় দখিভক্ষণমানসে সে একদিন
সুলতানের কানে কানে নিবেদন করল—শাহজাদা
মুহম্মদ সুলতানকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে! শেষ বয়সে
সব সুলতানই এই জুজুর ভয়ে কাবু! ফিরোজ
তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন—শাহজাদাকে বন্দী করে নিয়ে
এস।

শাহজাদা কিন্তু অতি ঘড়ল! তাঁর গুস্তচর
ওয়াকিব্‌হাল। খবরটা তাঁর কানে পৌঁছালো তৎক্ষণাৎ।
তিনি তখন দুর্গের বাহিরে। বেমালুম আত্মগোপন
করলেন তিনি। শাহজাদা জানেন, জুনাহ-শাহ-র
গুস্তচরেরা তাঁকে আঁতর্পাতি করে খুজছে—প্রকাশ্যে
কিল্লায় প্রবেশ করতে গেলে ওরা তাঁকে হত্যা করে
বসবে। তিনি তো রাজদ্রোহীরূপে চিহ্নিত! শাহজাদা
একটি বিচিত্র কৌশল করলেন। স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে,
সর্বাঙ্গ বোরখায় ঢেকে পাল্কি-চেপে এলেন কিল্লার
ভিতর। সোজা বেগম মহালে। সুলতান তখন হারে-
মের রঙমহালে পাঁচ হুরী পরিবৃত হয়ে সুখের সন্তম
বেহেশত-এ। খোজা প্রহরী এসে সুলতানকে তিন-
কুনিশ করে নিবেদন করল—একজন সম্ভ্রান্ত আমীরের
ওরফে সম্রাটের সঙ্গী গোপন-সাক্ষাতের আভিলাষ
জানিয়েছেন। অশীতিপর সুলতান তাঁর মোম দিয়ে
পাকানো মোচ্‌ ম্‌চড়ে বললেন :

“মেরে তসবিফে দানে হয় এ সারে হাসিন চেহরে,
নিগাহে ফিরাঁত যার্তি হয়, এবাদৎ হোতি যার্তি
হয় ॥”

সুলতানের হুকুমে তসবি-ছড়ার নতুন মদ্যাদানা-
টিকে আনা হল। দানা নয়, দানো! ওরই তনয়—শাহ-
জাদা মুহম্মদ! বোরখা থেকে গুম্‌ফবতী হুরীর আবি-
র্ভাবমাত্র অর্ধবিস্ত্রা হারেন-হুরীর দল ছুটে পালাবার
পথ পায় না! শাহজাদা সটান লুটিয়ে পড়লেন সুল-
তানের টেংরিব গদায়! কলসেন, তিনি নির্দোষ, কোনও
ষড়যন্ত্রের ভিতর নেই, কখনও ছিলেন না।

ফিরোজ ঠুকে বিশ্বাস করলেন। কিন্তু মুহম্মদ
ছিলেন অপদার্থ। তাই শেষ পর্বস্ত তাঁকে বঞ্চিত
করে ফিরোজ উত্তরাধিকারী নির্বাচন করে গেলেন
পৌত্রকে। দুর্ভাগ্য একেই বলে—সেটা আরও
অপদার্থ।

তাছাড়া ফিরোজের দেহান্তের বছর দশেকের
ভিতরেই মাহমুদ শাহ-র আমলে ভারত-ইতিহাসে ফটল
একটি যুগান্তকারী ঘটনা। উত্তর-পশ্চিম থেকে অশ্ব-
খুরে ধুম্রজাল সৃষ্টি করে আবির্ভূত হল এক নিষ্ঠুর
দুর্ধর্ষ তাতার : তৈমুর লঙ!

লুণ্ঠিত হল দিল্লী নগরী (1398)। ফিরোজশাহ
কোটলা শ্মশান হয়ে গেল। আবালবৃদ্ধবনিতার শব
পড়ে রইল রক্তস্নাত দিল্লীর রাজপথে। শূন্য প্রাণে
বাঁচল যৌবনবতী কিছু নারী, মরণান্তিক বস্ত্রা সইতে।
প্রাণে বাঁচল আর এক জাতের মানুষ, যাদের পরিচয় :
কারিগর! রাজমিস্ত্রি, সূত্রধর, কর্মকার, প্রস্তর-শিল্পী,
স্বপ্নার্থবিদ। বিচিত্র কারণে! প্রত্যক্ষদর্শীর জবান-
বন্দিতে^{১৪} জানতে পারি—সোনা-রূপা-হীরা-জহর
বাদে শূন্যমাত্র কারিগর, তাদের যন্ত্রপাতি আর গৃহ-
নির্মাণের মালমশলা নিয়ে নশ্বইটি হাতীর ক্যার-
ভান চলে দিল্লী ত্যাগ করে, খাইবার গিরিবর্ষের পথে,
সমরকন্দের দিকে। দিল্লীকে উদ্দেশ্য করে তৈমুর-
বলেছিল—“আমার সিংহাস্ত—আমার রাজধানী সমর-
কন্দে এমন একটি জাম-ই-মস্‌জিদ বানাবো যা পৃথিবী
কোনদিন দেখেনি! সুতরাং হে দিল্লী-নগরী! প্রাচীন-
কালের ব্যাবিলনের মতো ‘no craftsman, of whatever
craft he be, shall be found any more in thee’
(তোমার ছত্রছায়ায় থাকবে না একটিও কারিগর—তার
এলেম যে-কোনো প্রযুক্তিবিদ্যাতেই থাকুক না কেন)।

* সারি সারি সূন্দরীদের মূখ
ওরই তো মোর তসবি-ছড়ার দানা।
চোখ আঙ্গুলে জপ করে পাই সুখ,
নতুন দানায় ফিরায়ে দেওরাই মানা ॥

রাবণরাজার স্বর্গের সিঁড়ি আর আলাউদ্দীনের মিনার শেষ না হলেও শূর্য হয়েছিল। তৈমুরের সে জাম-ই-মসজিদ শূর্যই হয়নি। আম্বালনেই তার শূর্য ও সমাপ্তি।

ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যের সেটা দ্বিতীয় শত-বাৰ্ষিকী বৎসর। ঠিক দশ বছর আগে কুৎবউদ্দীন

আইবক ভিস্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন কুৎব মিনার-এর। ইতিমধ্যে পাঁচ পাঁচবার দিল্লীর রাজধানী ঠাই বদলেছে—শূন্য হয়নি। এবার তাই হল! তৈমুরের বিশাল মঙ্গোলীয় বাহিনীর অশ্বখরের ধূলিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল দিল্লী। সে আঁধা যখন খিতিয়ে গেল তখন দেখা গেল পড়ে আছে এক মহাশ্মশান। □

pathagor.net

সৈয়দ ও লোদী

উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা

খিজির খাঁ প্রতিষ্ঠিত সৈয়দ বংশের শাসনকাল

লোদী বংশের শাসনকাল

পানিপথের প্রথম যুদ্ধে সুলতানী জমানার শেষ ..

সময়কাল

1413-1450

1450-1526

1526

“খিজা কি জিকর না খাঁরো কি বাৎ করতে হায়,
হাম আনেওয়ালা বাহারৌকি বাৎ করতে হায়॥”
খয়াল কানপদুরী বলছেন, “কন্টক-সমাকীর্ণ
ধ্বংসস্থাপে রিক্ততার গান গাইতে আমি আঁসিনি,
আমি এসেছি শোনাতে আগামী বসন্তের গান।”

তৈমুরের বিধ্বংসী নিষ্ঠুরতা মহাকালের নিরিখে
একটি যতিচিহ্ন মাত্র, বর্নানকাপাত নয়। স্বয়ং ভিসু-
ভিয়াসই পারেনি পম্পাই ও হারকিউলেনিয়াম গ্রাস করে
গ্রীক সভ্যতাকে সমাধিস্থ করতে ; তৈমুরও পারল না
দিল্লী নগরী ধ্বংস করে হিন্দুস্থানের শিল্পমানসকে
মুছে ফেলতে। অজ্ঞাত ভ্রূণের অন্তরে বংশানুক্রমিক
সেই প্রকাশের ব্যাকুলতার বীজ নতুন করে অঙ্কুরিত
হল ; ঐ মহাশ্মশানেই, লাঞ্চার দেহলিতেই,—
মহীরুদেহে পরিণত হতে,—বাহারৌকি বাৎ শোনাতে
তার কিছুটা সময় লাগল, এই যা।

সৈয়দ ও লোদী বংশের ইতিহাস একশ' বছরের
সামান্য কিছু বেশি। সৈয়দ বংশে চারজন সুলতান 1414
থেকে ইতিহাসকে টেনে নিয়ে গেলেন 1451 পর্যন্ত, মোট
37 বৎসর মাত্র। লোদী বংশের তিনজন 1451 থেকে
1526, অর্থাৎ 76 বৎসর। এই সাতজন সুলতানের
ব্যক্তিগত ইতিহাস আমাদের পক্ষে নিম্প্রয়োজন। এ
যুগের স্থাপত্য-স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠেছে মৃত্যুকে
ঘিরে। ইমারৎ যা মাথা তুলে উঠেছে তাও জীবনের
দ্যোতক নয়, শব্দ মক্‌বারা আর মক্‌বারা।

ইংরেজীতে একটি শব্দ আছে—‘macabre’
(মাকাব্র) যার অর্থ ‘মৃত্যুশীতল’। শব্দটি শব্দটো
এসেছে ল্যাটিন শব্দ ‘maccabec’ থেকে—রোমানদের
সঙ্গে সিরিয়াবাসীদের দ্রিশবর্ষব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের
সূত্র ধরে। জানিনা, ফার্সী ও উর্দুতে ‘মক্‌বারা’ শব্দ-

টাও ঐ একই সূত্র থেকে উদ্ভূত কিনা। তবে এই সৈয়দ
ও লোদী যুগকে বোঝাতে ঐ ইংরাজী বিশেষণপদটিই
সবচেয়ে ভালো মানায়।

কিন্তু মৃত্যুও তো জীবনেরই একটি পর্ব।
অনিবার্য পর্ব। সুতরাং চিত্রশিল্প, কাব্য, সাহিত্য,
সঙ্গীতে যেমন মৃত্যুর একটি আবশ্যিক ভূমিকা আছে,
স্থাপত্যেই বা তা থাকবে না কেন ? আসুন, সৈয়দ ও
লোদী যুগের মক্‌বারাগর্ভকেই বিচার করে দেখা
যাক :

এ আমলে যে সমাধিসৌধ নির্মিত হয়েছে তা
স্পষ্টতঃ শ্বিধারায় বিভক্ত। হয় তারা চতুষ্কোণ, নয়
আটকোণ। আরও লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, আটকোণ
মক্‌বারাগর্ভ সুলতান এবং তাঁর পরিবারবর্গের জন্য
চিহ্নিত—আমীর মালিকেরা বরং চতুষ্কোণ সমাধিসৌধেই
চিরশয়ান। এ যেন এ যুগের এক অলিখিত আইন।
এ-ছাড়া আছে কিছু মিশ্র শৈলীর মক্‌বারা—অষ্ট-
ভুজাকৃতি থেকে চতুর্ভুজে সংক্রমণের মধ্যবর্তী স্থানে।
আশ্চর্যের কথা, এই সংক্রামণধর্মী মক্‌বারার কথা
পার্সি ব্রাউন-সাহেব তাঁর প্রামাণিক গ্রন্থে উল্লেখ
করেননি ; বরং বলেছেন—সৈয়দ ও লোদী যুগের
সমাধিমন্দির শ্বিধারায় বিভক্ত, চতুষ্কোণ ও অষ্টভুজ।

অষ্টভুজ-বিশিষ্ট সমাধিসৌধ : আলোচ্য যুগে
অন্তত তিনটি মক্‌বারার নাম উল্লেখ করতে হয়—
মুবারকশাহ সৈয়দ (মৃত্যু : 1434) ; মুহাম্মদশাহ সৈয়দ
(মৃত্যু : 1444) ; এবং সিকান্দার লোদী (মৃত্যু : 1517)।
প্রথম দুটি প্রায়-সমকালীন একক-সৌধ ; অর্থাৎ তাদের
ঘিরে সে-আমলে যদি কোনো প্রাচীর, তোরণ ইত্যাদি
নির্মিত হয়ে থাকে তবে তা কালের কবলে অবলুপ্ত।

অপরপক্ষে, অষ্টশতাব্দী পরে দেখছি, সিকান্দার লোদীর সমাধিতে সুপরিকল্পিত ব্যাপক প্ল্যানিং-এর স্বাক্ষর। তার চারিদিকে উঁচু পার্চিল, দক্ষিণদিকে অলঙ্কৃত ভোরণ, পশ্চিমে একটি মসজিদ এবং প্রাচীরের কোণায় কোণায় অষ্টভুজ টারেট (বাঙলা প্রতিশব্দ খুঁজে পাচ্ছি না। আরবীতে 'বাহুরাহ' বলে একটা শব্দ আছে, তার অর্থ ঠিক turret নয়, barbican; তা ছাড়া 'বাহুরাহ'-র চেয়ে turret-কে বাঙালী পাঠকের বেশি চেনা-চেনা লাগবে।—তাই আপাতত টারেটই চলুক)। সিকান্দার লোদীর উদ্যান শোভিত মক্‌বরা সে-হিসাবে একটি সংক্ৰমণের দ্যোতক। দুটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, চিন্তারাজ্যে ও কর্ম জগতে। প্রথমতঃ, তৈমুর-লঙের বিধ্বংসী আঘাতের পর দিল্লীর শ্মশানে যে নতুন বীজ অঙ্কুরিত হচ্ছিল, এবার তাতে দেখা গেল কিশলয়। ইন্দো-ইসলামী স্থপতি যেন এতদিনে আবার নতুন করে অনুভব করলেন—মানবজীবনের আনন্দের বর্নিকা শুধু ভয়ঙ্করই নয়, সে মহান, সে সুন্দর, সে শ্যামসমান : 'মোত কৈসিন হাসিন হ্য'য়!' দ্বিতীয়তঃ, মক্‌বরা-প্ল্যানিং-এর দৃষ্টিভঙ্গিটাও কলাক্ষে—প্রাসবর্তী গিয়াসুদ্দীন অথবা ফিরোজ-শাহ-র দূরপ্রতিম, প্রাকার বেষ্টিত, টারেট-সমন্বিত আশ্চর্যকামূলক বহিরাবরণ থেকে পরবর্তী মৃগল-যুগের কাবুরী বাগান-ঘেরা নয়নাভিরাম শান্তির নীড়ে উদ্ভরণের এ-যেন এক অন্তর্বর্তী অবস্থা।

অষ্টভুজাকৃতি এই জাতীয় ইমারতের আদি জনক হচ্ছে—আগেই বলেছি, জেরুসালেমের ওমরের মসজিদ বা 'জেম অব দ্য রক' (চিত্র—2.3)। দিল্লীতে তার সার্থক প্রথম প্রয়োগ খান-ই-জাহান তিলাঙ্গানীর মক্‌বরায়, ফিরোজী-জমানে। এই অষ্টভুজাকৃতি ইমারতের ক্রম-বিকর্তনের ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে এ-প্রশ্নের প্রচলিত পদ্ধতিকে পরিহার করে বিভিন্ন যুগের ইমারতকে পাশাপাশি রেখে আলোচনা করতে হয়।

নাম	চিত্র	অবস্থান	যুগ	নির্মাণকাল (আঃ)
ওমরের মসজিদ	2.3	.. জেরুসালেম	.. ওমানিয়দ	670
খান-ই-জাহান তিলাঙ্গানী দিল্লী	.. তুগলক	1370
মক্‌বরাকান্ট, সৈয়দ	6.1, 6.2	.. এ	.. সৈয়দ	1434
মক্‌বরাকান্ট, সৈয়দ এ	.. এ	1444
সিকান্দার লোদী	6.3	.. এ	.. লোদী	1517
গেমন গর	8.1	.. সাগরাম	.. গর	1530
গেমন গর	8.2	.. এ	.. এ	1534
প্রাচীণ	6.4	.. দিল্লী	.. গর	1547
আখর খাঁ	6.5	.. এ	.. আকবর	1561

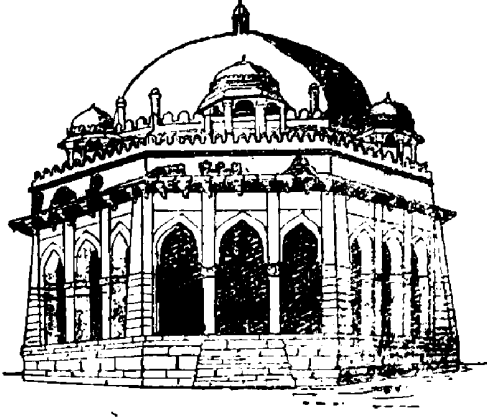
ইতিহাসের ক্রমানুসারে সাজালে তাদের যা পরিচয় তা এই পৃষ্ঠার নিচে দেওয়া হয়েছে।

ওমর-মসজিদের যে পরিবর্তন খান-ই-জাহান তিলাঙ্গানী মক্‌বরায় করা হয়েছিল—অর্থাৎ কক্ষ ও অলিঙ্গের স্থান পরিবর্তন—সেটা পরবর্তী প্রত্যেকটি ইমারতে অনুসরণ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ভিতরে আটকোণা মূল সমাধিকক্ষ, তার বাহির দিয়ে অষ্টভুজাকৃতি অলিঙ্গের আটকোণায় আটটি প্রায়স্তম্ভ বা 'পায়ার' (pier) এবং দুটি পায়ারের মাঝখানে তিনটি করে খিলান। প্রতিটি ক্ষেত্রেই গিয়াসুদ্দীন প্রবর্তিত 'বাহিরের দিকে ঢাল' দেওয়া হয়েছে ঐ পায়ারে, যদিও তার অন্তর্বর্তী স্তম্ভগুলি আলম্ব। ঐ ঢালটা প্রথম যুগে খুব বেশি, শেরশাহী আমলে সেটা কমেছে, আকবরী জমানে তা সম্পূর্ণ বিজ্ঞিত। এই বাঁধা-ধরা ছকের ভিতরেই ক্রমবিবর্তনের পথে কীভাবে সৌন্দর্য পরিষ্কৃষ্ট হয়েছে দেখুন—

মুব্বারকশাহ সৈয়দের পরিকল্পনাকার ছাদের আট প্রান্তে আটটি ছত্রী বাসিয়েছেন (চিত্র—6.1)। কুর্সি (ভিত, plinth) যথেষ্ট উঁচু। তবু বিস্তারের আপেক্ষিকে উচ্চতা যথেষ্ট না হওয়ায় গোটা ইমারত নয়নাভিরাম হয়নি। গম্বুজটির কোনো ভিত্তিমূল বা 'গম্বুজ-কুর্সি' না থাকায় তা যেন চাপা পড়ে গেছে। বাস্তব-নকশায় (প্ল্যানে) জ্যামিতিক বিন্যাস-ছন্দটা ভালোই লাগে; 'মডেল' তৈরি করে যদি গরুড়া-বলোকনে দেখা যায় (চিত্র—6.2) তাহলেও মন্দ লাগে না; কিন্তু বাস্তবে ভূতলে দণ্ডায়মান দর্শকের দৃষ্টিতে মনে হয় ছত্রীগুলি গম্বুজের ঘাড়ে চড়েছে। ইমারত গম্বুজের অনেকটা অংশ ঢেকে রেখেছে। প্রাকৃতভাষায় যাকে বলে 'ঘাড়-গর্দানে' চেহারা, অনেকটা সেই অবস্থা হয়েছে গোটা ইমারতের। এই অবকাশে চট করে একবার তাজমহলের ছবিটা দেখে নিতে পারেন, তাহলেই মালুম হবে তাজ-পরিকল্পনাকারের কৃতিত্ব—ছত্রীর ঘেঁষে আসা, গম্বুজের চাপা-পড়া সৌন্দর্যহানী,

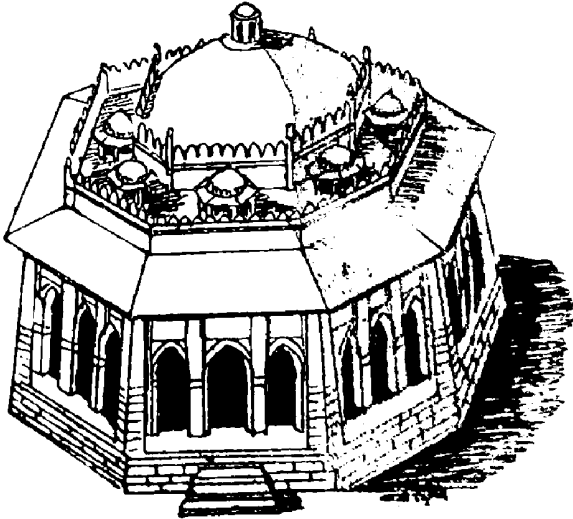
সৌধের বিস্তার-উচ্চতার অসমত্ব, ইত্যাদি প্রত্যেকটি চুটি পরিহার করতে পেরেছেন বলেই তাজমহল হয়েছে : তিলোত্তমা।

প্রায় দশবছর পরে মুহম্মদশাহ সৈয়দের সমাধি রচনার সময় স্থপতিবিদ ঐ চুটিগুলির বিষয়ে নিশ্চয়ই অবহিত হতে পেরেছিলেন। তাই তিনি তাঁর গম্বুজকে



চিত্র-6.1 মুবারকশাহ সৈয়দ-এর সমাধি (সম্মুখ দৃশ্য)।

বসালেন একটি পিচের ড্রামের মতো (barrel-shaped) গোলাকার গাঠনির উপর—যাকে আমরা এর পর ‘গম্বুজ-কুঁসি’ বলব। ফলে ভূতলে দৃশ্যমান দর্শক এবার গম্বুজটার স্বরূপ অনুধাবনে সক্ষম হল।

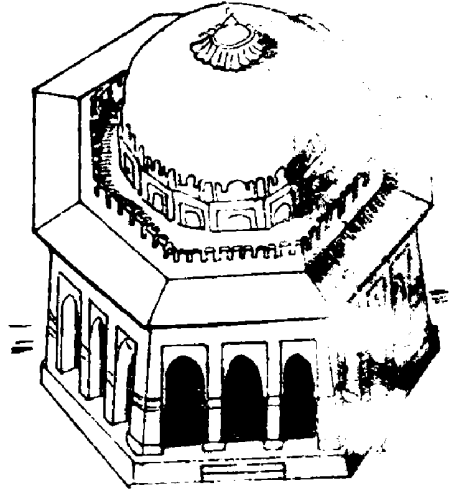


চিত্র-6.2 মুবারকশাহ সৈয়দ-এর সমাধি (পারদালোকনে)।

গোটা ইমারতে দৈর্ঘ্য ও উচ্চতার সামঞ্জস্য-বিধান করে ঐ ‘খাড়ে-গদানে’ ভাষাটী দূরীভূত করা গেল। বৈচিত্র্য আনতে দুই খাম্বার-মধ্যবর্তী ভিতটি খিলানের মাঝেরাটিকে উচ্চতায় কিছু বেশি করা হল। নিম্নলিখিত কলা ধার, প্রান্তবর্তী-ধূগের পরিকল্পনায় অনেক উন্নতি-

বিধান করা গেছে।

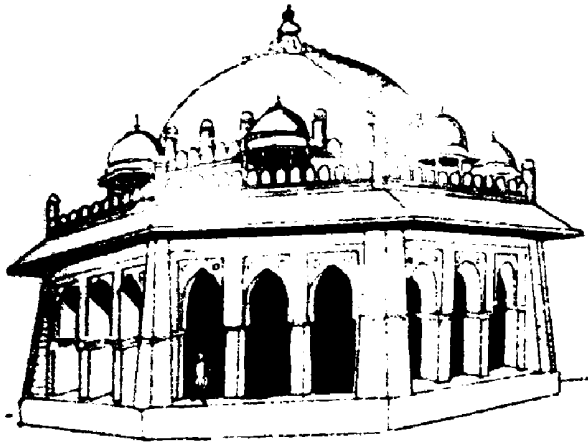
তবু দেখাছি, আরও পঞ্চাশ বছর পরে সিকান্দার লোদীর মক্বারা বানাবার সময় স্থপতিবিদ আত্মসন্তুষ্ট নন। তিনি ছত্রীগুলিকে সম্পূর্ণ বর্জন করলেন (চিত্র-6.3)। ইমারতের ভিতরটাকেও কমিয়ে আনলেন। গম্বুজটাকে এবারও কসানো হয়েছে গম্বুজ-কুঁসির উপর। শুধু তাই নয়, সেই গোলাকৃতি গম্বুজ-কুঁসির ধার ঘেঁষে ঘোলো-কোণা বিশিষ্ট একটি অলঙ্কৃত প্রাচীর গেঁথে তোলা হল। যেন মসজিদের সম্মুখে মাখসূরাহ। অথবা কলা বার, সাঁচী স্তম্ভের চারিদিক ঘিরে যেমন প্রদীক্ষণ-পথ প্রাচীর ছিল, সেই ধরনের। আরও লক্ষ্য করে দেখুন, এককাল গম্বুজের উপর যে ছত্রীটি ছিল সেটি অপসারিত। তার স্থান



চিত্র-6.3 সিকান্দার লোদীর মক্বারা।

নিরেছে হিন্দু-মন্দিরের পশ্চকলস। সিকান্দার লোদী মক্বারার সবচেয়ে বড় যে বৈশিষ্ট্য তা চিত্র-6.3-তে দেখানো যায়নি। তা দেখতে হলে সেক্ষানাল এলিভেশান আঁকতে হয়। সেটি অকুণ্ঠলে মিলেও স্বচক্ষে দেখতে পাবেন না। অথচ তা প্রযুক্তি-বিদ্যার এক যুগান্তর : ডব্লু-ডোম। কারণটা প্রকৃত, ইরাক, ইরানে বহু পূর্ববর্তী থেকেই সাক্ষ্যস্বীকৃত-ভাবে প্রযুক্ত হচ্ছিল। দিল্লী-স্থাপত্যে এইবার প্রথম সেটা দেখা মেল। তার কারণ—দিন-দিনই গম্বুজ ব্যাস ও উচ্চতার বৃদ্ধিমান হচ্ছে। না হলে স্থপতি-বিদের তৃপ্তি নেই। বাহিরের দিক থেকে বৃহত্তর ইমারতে বৃহত্তর গম্বুজ তো প্রয়োজন হবেই : কিন্তু ভিতরে দাঁড়িয়ে তাতে অনুভূতিটা জমারক্স হয়। বন্ধ পরিবেশে, ছোট্ট করে সমাধিকঙ্কের ভিতর থেকে মনে হয় চোঙার মত চারদিকের দেওয়াল অথকমরে

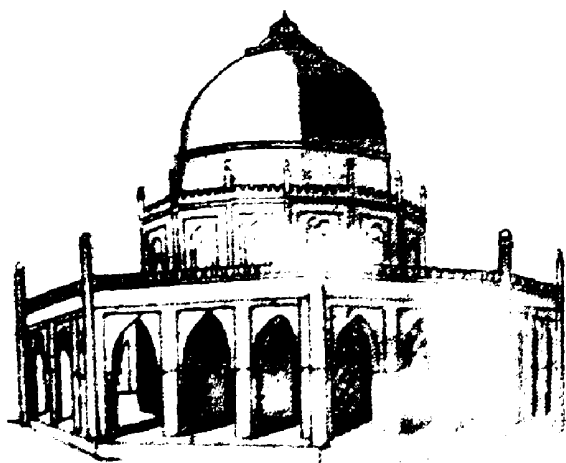
মিশে গেছে। ছাদটা বেন অনেক উঁচুতে! এই সমসার হাত থেকে মুক্তি পেতেই ডব্লু-ডোমের আয়োজন। ডব্লু-ডোম বা দু-পদার গম্বুজ কাকে বলছি বুঝে নিতে হুমায়ূন মক্কার সেকশানটা দেখে নিন।



চিত্র-6.4 ইশা খাঁর সমাধিসৌধ।

ডব্লু-ডোম বানাতে পারলে, কী-ভিতরে, কী-বাহিরে ছাদের উচ্চতা ইমারতের অন্যান্য অঙ্গের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে। বলা বাহুল্য, এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, ঘরটা ঠান্ডাও থাকে। যে-হেতু দুটি পদার মধ্যে একটা 'ওয়ার-কুশন' বা বাতাসের প্রতিরোধক কক্ষকে গ্রীষ্মে শীতল এবং শীতে উষ্ণ রাখে।

শেরশাহ শূর সাসারামে বসেন তাঁর আব্বাজান হাসান শূর, অথবা নিজের মক্কার বানান তখন এই



চিত্র-6.5 আদম খাঁর সমাধিসৌধ।

পরিদর্শন সোটা-মুঠ পরিগ্রহ করলেও স্বকীয় স্থাপত্য-চিন্তার একটি সুন্দর পরিচয় রাখেন। উল্লেখ করা স্মৃতিতে পড়ে, শেরশাহ শূর এই দুটি মক্কারা নির্মাণের পূর্বে

কখনও দিল্লীতে পদার্পণ করেননি—তার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। ফলে, তিনি নিজে প্রাসবতী যুগের তিলাঙ্গানী-মুবারক শাহ-মুহম্মদ সৈয়দ অথবা সিকান্দার লোদীর সমাধিসৌধ প্রত্যক্ষ করেননি। তাঁর স্থপতিবিদ করেছিলেন হয়তো। শেরশাহ নিজের অতিপ্রকাণ্ড মক্কারায় কিন্তু সিকান্দার লোদীর অনুকরণে ডব্লু-ডোম বানাননি। গম্বুজে সূর্যালোকে প্রবেশের বিচিত্র ব্যবস্থা থাকায় কক্ষের ভিতর থেকে অনুভূতিটা অন্য জ্বালের হয়। চার দেওয়াল সেখানে অন্ধকারে নিঃশেষিত নয়, গম্বুজ-চন্দ্রাতপে বিলীন। সে আলোচনা যথাস্থানে করব।

শেরশাহ-র পুত্র সালিমশাহ শূরের আমলে নির্মিত ইশা খাঁর মক্কারায় আবার পূর্ববতী যুগের বিভিন্ন কায়দার বিচিত্র 'পারমুটেশন' করা হল। গম্বুজকে উঁচু কুর্সির উপর বসানো হল, ডব্লু-ডোমও বানানো হল। কিন্তু স্থপতিবিদের মনে হল, সিকান্দার লোদীর ঐ ছত্রীবর্জিত ঠিক হয়নি। তাই তিনি সেই মুবারকশাহ সৈয়দের ছত্রীগুলিকে স্বস্থানে ফিরিয়ে আনলেন। অর্থাৎ ইশা-খাঁ-স্থপতির মতে মুবারকশাহ-এর মক্কারাতে যে অলঙ্করণ, ছত্রীর ঘননিবন্ধ পুষ্পগুচ্ছ সেটা খোলতাই হয়নি, ফুল-দানীটা খর্বকায় হওয়ার জন্য। তাই তিনি দুটির মিলিতরীতিতে এক সিন্ধেসিস বানাতে চাইলেন।

পরবর্তী উদাহরণ আদম খাঁর মক্কারা (চিত্র-6.5) মাত্র চৌদ্দ বছর পরে নির্মিত। ইতিমধ্যে কিন্তু ভারত ইতিহাসে যুগান্তর ঘটে গেছে। সুদতানী-জমানা শেষে আমরা পৌঁচোঁছি 'মুগল-এ-আজমে'। শেরশাহ, বাবুর, হুমায়ূন অতিক্রম করে আকবরী আমলে। নতুন যুগের মুগল স্থপতি পূর্বযুগের সব কয়টি কীর্তি খুঁটিয়ে দেখে শোনালেন নতুন কথা। বললেন, না, ছত্রী চলবে না। ওরা বড় ভীড় করে! তার চেয়ে গম্বুজ-কুর্সির সই-সই ঐ প্রাচীরের আট প্রান্তে বসে আটটি গুলদস্তা। 'গুলদস্তা' কাকে বলে জানো না? ছোট আকারের মিনারিকা, যার অনেকটাই ইমারতের গা-সই-সই, আর উপরে আধফোটা কুর্সির পাপাড়। কবর ঘিরে যেগন মোমবাতি সাজানো হয়, অনেকটা সেই কায়দায় গুলদস্তাগুলোকে সাজিয়ে দাও। তাছাড়া গম্বুজ-কুর্সির সই-সই পাঁচিলটাকে খাড়াইয়ে আরও বড় কর, তাতে কসো এক-এক দিকে তিন-তিনটে কৃত্রিম খিলান, কুলপি আর কি! তাতেই ছত্রীর অভাবজনিত শূন্যতা পূরণ হবে। গম্বুজ-কুর্সিটাকে আরও অনেক উঁচু কর এখানেই এতদিন ভুল হজিঁল হোমাদের। তাছাড়া

ঐ যে চারিদিক ঘিরে এতদিন ছজ্জাটা বানাচ্ছিলে ওটাকে বার্তল কর। তার বদলে গম্বুজকে বেণ্টন করে একটা বর্ডার দাও। খিলানের মাথায়-মাথায় একটা চওড়া ফেটি বাঁধো দেখি—এবার দেখ কেমন খোলতাই হয়েছে !

অষ্টভুজাকৃতি মক্কারার বিবর্তন বোঝাতে এখানে কিছু ছবি এঁকে দিয়েছি। কোনো কোনো ছবি গরুড়া-বলোকনে—অর্থাৎ শিল্পী তাঁর মানসচক্ষে অথবা কাঠের মডেলে কী-রূপ দেখেছিলেন। কোনটি বা সম্মুখ দৃশ্য—‘ফ্রন্ট এলিভেশান’ নয়, স্মৃতিতে দাঁড়িয়ে দর্শক যা দেখে। আপনাদের রুচি কী বলছে? প্রস্থে ও উচ্চতায়, বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রূপায়ণ ও অনু-পাতে এ বিবর্তন কি ক্রমশঃ সুন্দরতর সার্থকতার দিকে অভিযাত্রী নয়? আলী-সাহেব যাকে ‘আর্কিটেকটনিক’ গুণ (পৃঃ ৩) বলেছিলেন, সেটা কি চরমসিঁখি লাভ করেনি আদম খাঁর মক্কারায় উপনীত হয়ে? আকবরী জমানায়?

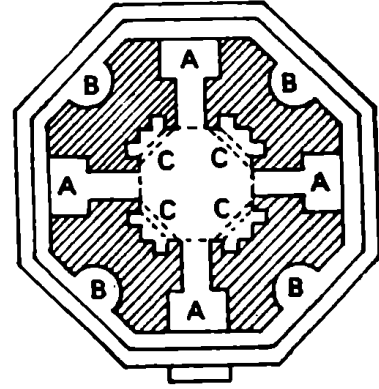
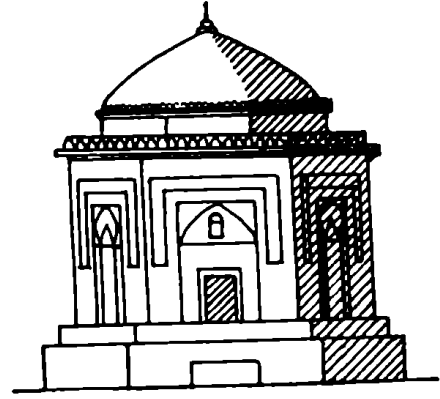
প্রসঙ্গত বলি, এই আদম খাঁর মৃত্যু গোচরীয়। স্থিতধি সম্রাট আকবর জীবনে খুব কম বারই সংশয় হারিয়েছেন। আদম খাঁর মর্যাদান্তিক মৃত্যু তারই একটি উদাহরণ! সে গল্প যথাস্থানে।

আরও বলি, এই অষ্টভুজাকৃতি মক্কারার পরিকল্পনা রাজধানীর বাহিরেও ভারত-ভূখণ্ডে দূর-দেশে ও দূর কালে প্রসারিত হয়েছিল। তার প্রভাব অনুধাবন করতে হলে আপনাকে ট্রেনে চেপে দিল্লী-আগ্রা যেতে হবে না। আপনি যদি কলকাতাবাসী হন, তাহলে ট্রেনে চেপে বি. বা. দী. বাগে গিয়ে এই শৈলীর একটি মৃগলয়গের অনবদ্য নমুনা দেখে আসতে পারেন—এই কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জোব চার্ণকের সমাধিতে।

সংক্রামণ-ধর্মী মক্কারা :^১ সৈয়দ ও লোদী আমলে দুই জাতের মক্কারার—অর্থাৎ অষ্টভুজ ও চতুষ্কোণের সংক্রামণের যুগচিন্তায় আছে আর এক জাতের সমাধিসৌধ, যা বাহিরপে অষ্টভুজ এবং অন্তরপে চতুষ্কোণ (চিত্র—৬.৬)। অষ্টভুজাকৃতি মক্কারার যে আর্বাণিক অনুসঙ্গ—খাম্বরা-সমন্বিত অলিন্দ, সেটি এখানে বিজ্ঞিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছত্রী বা গুলদস্তাও বানানো হয়নি। সম্মুখ-পশ্চাৎ ও দুই পাশে প্রবেশ পথটি স্ল্যানে আয়তক্ষেত্র (A); অথচ চারকোণায় চারটি গোলাকৃতি কুলুঙ্গির মতো, যা শ্চুইণ্ড-পদ্ধতিতে খিলানে গিয়ে মিশেছে (B)। ভিতর-দিকে চতুষ্কোণ কক্ষকে কোণায় কোণায় কড়ি (hexam) (C) পেতে অষ্টভুজে পরিণত করা হয়েছে। তার উপরে গেঁথে তোলা হয়েছে গম্বুজ-কুর্সি।

সৈয়দ ও লোদী যুগ

এই ডিজাইনটি বেশি প্রসার লাভ করেনি। কেন করেনি, তা সহজেই অনুমেয়। চতুষ্কোণ কক্ষের উপর গোলাকার গম্বুজ-কুর্সি নির্মাণের সময় ভাকসাম্যের ঝামেলা এড়াতেই বিবর্তনের পথে এসেছিল অষ্টভুজাকৃতি মক্কারা। এখানে তার আদলটাই শৃঙ্খলা নেওয়া হয়েছে, প্রযুক্তি বিদ্যার সুযোগটুকুকে পরিহার করে। অর্থাৎ অষ্টভুজাকৃতি বাহিরপে বানানো সত্ত্বেও ভিতরে সেই আদিম সমস্যাটা থেকেই যাচ্ছে। তাই এই



চিত্র—৬.৬ সংক্রামণধর্মী মক্কারা (সৈয়দ লোদী যুগ)।

সংক্রামণ-ধর্মী মক্কারা একটা বৈচিত্র্য হিসাবেই গ্রহণ করেছিল ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্য-অনুকরণযোগ্য পরিকল্পনা হিসাবে নয়।

চতুষ্কোণ মক্কারা : সৈয়দ ও লোদী আমলে চতুষ্কোণ মক্কারাগুলি সুলতান বা তাঁর পরিবারস্থ লোকজনের জন্য সচরাচর নির্মিত হত না। দিল্লী-অঞ্চলে এজাতের উল্লেখযোগ্য অন্তত সাতটি ইমারৎ (i) কড়া খান কি গম্বুজ, (ii) ছোটো খান কি গম্বুজ, (iii) বড়া গম্বুজ, (iv) শীখ গম্বুজ, (v) শিহাবউদ্দীন-তাজ খাঁর মক্কারা (প্রথম আপাত-শ্বিডল মক্কারা), (vi) দাদী-কা গম্বুজ, (vii) পোলি-কা-গম্বুজ। অধি-

কব্ধই একক লৌহ—অর্থাৎ কোনো প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যান বা প্রবেশ ভোরণ নেই। আকারে চতুষ্কোণ বর্কবারাঙ্গুলি সাধারণত অষ্টভূজাকৃতি সমাধিসৌধের চেয়ে কম উচ্চতায় বেশি। এগুলির মধ্যে বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্য আনতে স্থপতিবিদ এমন কায়দা করেছেন যাতে বাহিরের দিক থেকে মনে হয় ইমারৎ বৃদ্ধি শ্বিতল অথবা প্রিতল। বাস্তবে সবই কিন্তু একতলা।

ঐতিহাসিক টেন্নেবি বলেছেন, 'সমস্যা' হচ্ছে মানবসভ্যতার অগ্রগতির অন্যতম উপজীব্য। সমসাময়িক সমাজ সমস্যার উদ্বেগ ওঠার প্রচেষ্টায় যদি নিতা-

নিম্নন থাকে তবে সামূহিক অগ্রগতি অনিবার্ণ। কিন্তু কখনো কখনো সমাজ 'মন্ডবিষা ভবিষ্যতি'-নীতিতে গন্তলিকা-স্রোত গা ভাসায়—তখন তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় : অথবা ঘটনাচক্রে ঐ সময়ে যদি কোনো বহিরাগত-চিন্তাধারায় নূতন সমিধ্ সংগৃহীত হয় তখন অবক্ষয়ী মানবসমাজে আবার নবজীবনের অঙ্কুরোদ্গম হয়। সৈয়দ ও লোদী যুগের অবক্ষয়ী চিন্তাধারায় ভারত-ঐতিহ্য ডুবতে বসেছিল, এবং তখনই এক বহিরাগতের উৎসাহ-সমিধে তার রূপান্তর ঘটে। ভারতেতিহাসের সেই ক্রান্তিকারী ঘটনাটি হচ্ছে বাবরের ভারতগমন।

□



গায়ত-মূল্য-এর তিন পুরুষ

সিংহাসনে	..	সম্রাট আকবর
সম্মুখে নতজানু অবস্থানে	..	শাহ জাদা সেলিম
সেলিমের পিছনে নতজানু	..	শিপাহী সালার মানসিহে (?)
দুটি হরিণের মাঝখানে		খসরৌ
আকবরের নিচে		খুসরু
খুসরুর পিছনে		আবুল ফজল (?)

[মেট্রোপোলিটান মিউজিয়াম অফ আর্টস, নিউ ইয়র্ক-এ রচিত মূলচিত্রের অনুকরণে।]

راجہ - جگموج لالہ بی بی



বাবুর ও হুমায়ুন

উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা

	সময়কাল
বাবুরের জন্ম	1483
ভাস্কা-দা-গামার ভারতে পদার্পণ	1498
বাবুর কর্তৃক কাবুল জয়	1504
হুমায়ুনের জন্ম	1507
চিভোরের রাণা সপোর আমল	1509-27
পতুগীজদের গোয়া অধিকার	1510
সিকান্দার লোদীর মৃত্যুতে ইব্রাহিমের অভিষেক	1517
পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবুরের জয়লাভ	1526
বাবুরের মৃত্যু ও হুমায়ুনের অভিষেক	1530
সুবেদার শের খাঁ কর্তৃক বঙ্গ বিজয়	1538
চৌসী যুদ্ধে হুমায়ুন পরাজিত, শেরশাহ সুলতান	1539
হুমায়ুনের হতরাজ্য পুনরুদ্ধার ও মৃত্যু	1555-56

“বদল যায়ে অগর মালি,
চমন হোতা নেহি খালি,
বাহারে ফিরিভি আতি হায়
বাহারে ফিরিভি আয়েগে ॥”*

তৈমুরের মারাত্মক আঘাতে ভূতলশায়ী ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্য তিল তিল করে শক্তি সঞ্চয় করে আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। সৈয়দ বংশীয়রা শব্দ মক্কারাই বানিয়ে গেছেন, লোদী বংশীয়রা সবে বানাতে শুরু করেছিলেন অন্যান্য জাতের ইমারৎ—মসজিদ, প্রাসাদ, দুর্গ। সিকান্দার লোদী তো আগ্রার অনতিদূরে সেকেন্দ্রাবাদে নতুন বসতিও স্থাপন করলেন, বাদলগড়ে দুর্গ বানালেন; কিন্তু সিকান্দার-তনয় আবার রাজ্য খোয়ালেন সেই তৈমুর-বংশীয় বাবুরের হাতে। ফুলবাগিচার মালির পদ শূন্য হল। সৌভাগ্যক্রমে তৈমুর বংশীয় হলেও বাবুর-বাদশাহ ছিলেন অন্য জাতের মানুষ। তাই তাঁর পথরেখা ধরে ভারতে এল নতুন জমানা : মঙ্গল-এ-আজম।

* বদলে যখন ঘাম বাগানের মালি,
ফুল-বাগিচা হয় না তবু খালি,
ফাগুন ফিরে অঘাট হানে শ্বারে
ফাগুন ফিরে আসবে বায়ে বায়ে ॥

মুঘল যুগের দুটি পর্বায়। প্রথমার্ধের স্থায়িত্ব মাত্র 13 বৎসর—পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবুরের জয়লাভ (1526) থেকে শের খাঁ হাতে হুমায়ুনের পরাজয় (1539)। দ্বিতীয়ার্ধ অতি দীর্ঘস্থায়ী—তিনশত বৎসর। ঐ তিনশ বছরও ঠিক সমান দুভাগে বিভক্ত। প্রথম দেড়শ বছর হচ্ছে মুঘল জমানার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস : পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে (1556) কিশোর আকবরের তরফে বৈরাম খাঁর জয়লাভ থেকে আলমগীরের দেহাবসান (1707)। পরবর্তী দেড়শ বছর—আলমগীরের মৃত্যু (1707) থেকে তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহ-তক (1857) হচ্ছে মুঘলযুগের অবক্ষয়ী পরিচিতি। দুই মুঘল যুগের মাক্থানে রয়েছে শেরশাহ শূর এবং তাঁর বংশধরদের স্বল্পস্থায়ী 16 বছরের শাসনকাল। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাই বাবুর ও হুমায়ুনের রাজত্বকালকে একত্রে গ্রথিত করে একটি পৃথক পরিচ্ছেদ রচনা অনিবার্য হয়ে পড়ছে। দুই যুগের মধ্যবর্তী ঐ ষোল বছরটাকে যদি সংক্ৰমণের যুগ বলে উপেক্ষা করা যেত—অর্থাৎ সুলতানী জমানা থেকে মঙ্গল-এ-আজমে পদার্পণের প্রয়োজনে শেরশাহ শূরকে যদি একটা পাঠান পাটোন বলে ধরে নেওয়া যেত, তাহলে শেরের নামে একটি পৃথক পরিচ্ছেদ রচনার প্রয়োজন থাকত না। কিন্তু তা বাস্তব-সত্য

নয়। শেরশাহ শূরের ক্ষণিক আবির্ভাব নিশ্চয়ই সংক্রামণ-ধর্মী, কালের মাপে অতি-দীর্ঘস্থায়ী পাঠান ও মঙ্গল যুগের মাঝখানে তা অকিঞ্চিৎকর ; কিন্তু হিমামা রাত্রি এবং দীর্ঘস্থায়ী দিবাভাগের মাঝখানে ক্ষণস্থায়ী সূর্যোদয়টাকে কি ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া যায় ? শেরশাহ শূর ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যের ইতিহাসে সূর্যোদয়ের মতই ক্ষণস্থায়ী অথচ আশ্চর্য বর্ণাঢ্য পর্যায়।

সে যাই হোক, ঐতিহাসিক প্রয়োজনে বাবুর-হুমায়ূনের জন্য একটি পৃথক পরিচ্ছেদ আবশ্যিক হলেও তাঁদের সামগ্রিক স্থাপত্যকীর্তি লিপিবদ্ধ করতে দেখছি একটি অনুচ্ছেদই যথেষ্ট। তাই এই অবকাশে আমরা প্রবেশ্য মঙ্গল-যুগের একটা সার্বিক মূল্যায়নের চেষ্টা করব। স্কুলপাঠ্য ইতিহাস সচরাচর সাল-তারিখ সমন্বিত মঙ্গল-বাদশাহদের লড়াই-কাজিয়া, রাজ্যবিস্তার, শাসন-ব্যবস্থা, রাজস্ব-আদায়-পদ্ধতির বিষয়ে ঠাসা। স্থাপত্যের মাধ্যমে ইতিহাস—যা নাকি আমাদের 'বুল্‌স্-আই' তার দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টি হতে হলে ঐ মৌল-লক্ষ্য বেষ্টনকারী নানা-রঙের টাগেট-রিঙগুলোকে লক্ষ্য করতে হবে। অর্থাৎ, স্থাপত্যের পরিপূরক ললিতকলা—চিত্রশিল্প, সঙ্গীত এবং সর্বোপরি জ্ঞান-বিজ্ঞান-ইতিহাসের চর্চা।

জাহিরউদ্দীন বাবুর বিশ্ব-ইতিহাসে এক বিচিتر চরিত্র। তাঁর ধমনীতে যে রক্ত প্রবাহিত তা উভয় তরফেই মশীকুক্ষ-পিতৃকুলে তৈমুরলঙ এবং মাতৃকুলে চৌঙ্গস খান! অথচ আশ্চর্য আল্লাতালার আজব কান্ড-কার-খানা—অঙ্গার-কুক্ষ স্লেটে মশীকুক্ষ পেন্সিলের স্পর্শে যে হরফ ফুটে উঠল তা ধবধবে সাদা! বাবুর-বাদ-শাহ'র চরিত্রে নৃশংসতার কোনো নীজর নেই। বিজয়ী রণনেতাকে অহৈতুকী হত্যার উৎসবে মেতে উঠতে দাঁখ না। উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি শূদ্ধ লাভ করে-ছিলেন তাতার ও মঙ্গোলীয় বিভীষিকার গুণগুণিলি-মাত্র : দুর্জয় সাহস, অসামান্য রণকুশলতা, অপারিসমীম চারিত্রিক দার্ঢ্য। আর তার চেয়েও অবাক করা খবর—ঐ সঙ্গে তার চরিত্রে এসে মিশেছে দীপ্তবজ্রীয় বিপরীত-স্বেরূর কয়েকটি অনুজবনা : পারসিক কবি-দার্শনিকের পেলব দৃষ্টিভঙ্গি, কাব্য-প্রতিভা, লিপিকুশলতা এবং প্রকৃতি-প্রসিক্ততা। সে দীপ্তবজ্রীয় পত্র-পুষ্পের অহম্মাদগো রক্তক্ষত দেখা গেছে কিয়োহের বাপী, স্পর্ধিত অতিসম্পাত, তাকেই রক্তাক্ত সন্ধ্যার "ফুৎকার" পরিচয়ে আজ ওকে দেখছি যেন গম্বুর্ষ চিত্রণ, যে ছিল অজুর্ন-কিষ্করী মহারথী, গানের সাধন করছে সে আপনমনে একা নন্দনবনের ছায়ার অন্তরে গুণ গুণ

সুরে।"

বাবুর ছিলেন চুগতাই তুর্কী। চুগতাই হচ্ছেন গ্র্যান্ড মোঙ্গল চৌঙ্গস খানের শ্বিতীয় পুত্র—তাঁরই বংশধর হিসাবে বাবুর মাত্র এগারো বছর বয়সে পিতার দেহান্তে 'ফরগনা'-র সুবেদার হয়ে পড়েন। ফরগনা হচ্ছে চীনা-তুর্কীস্থানের একটি ক্ষুদ্র জনপদ ; কিন্তু ঐ নাবালকের পক্ষে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পিতৃখন রক্ষা করা সম্ভবপর হল না। আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা বিতাড়িত বাবুর ভাগ্যান্বেষণে পথে নামলেন। আত্ম-জীবনীতে বাবুর বলছেন, ঐ সময়—তখন তাঁর বয়স মাত্র সতের—একবার তিনি পথপ্রান্তে এক বৃক্ষা গ্রাম-বাসিনীর পর্ণকুটীরে আশ্রয় নেন। বাবুরের আন্দাজ-মতো তখন সেই অতিবৃদ্ধার বয়স ছিল একশ এগারো বছর। কিশোরটির বংশপরিচয় পেয়ে বৃদ্ধি নানি বললে, 'তুই যতদিন ইচ্ছে আমার ছাপ্রায় ছাঁপিয়ে থাকতে পারিস—কাকপক্ষীতে টের পাবে না। তুই তৈমুর-বংশের ছাওয়াল! তুই মেরি লাল! মেরি দিল-কালিজা!'

ঐ বৃদ্ধাই কিশোরের নির্বাপিতপ্রায় উচ্চাশা-বহিকে নিত্য-ফুৎকারে উজ্জীবিত করে তোলে। মধ্য-এশিয়ার অগ্নিবর্ষী সূর্য অস্তাচলে গেলে লোলচর্মী বৃদ্ধা ঐ কিশোরকে শোনাতে তার শৈশবের কিস্সা—তৈমুরলঙের হিন্দুস্থান-লুণ্ঠনের কাহিনী। বৃদ্ধি তখন নিতান্তই শিশু—সব কথা তার ভালো মনে পড়ে না—তবে অনেক অনেক কাহিনী সে প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবীতে শুনছে তার বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে। উঃ! সে কী ভয়ঙ্করী দৃশ্য! হাজার হাজার অশ্বারোহী উল্কার বেগে ছুটে চলেছে, তাদের হাতে রক্তরাঙা নাগা তলোয়ার ; তাদের অশ্বের খুঁরে খুঁরে আশ্মানতক্ ধ্বজজালের আঁধারী, রণহস্তীর কলিজা-বিদীর্ণ করা বংশিত, মৃত্যুর মদুখোমুখি মরণহত সৈনিকের অন্তিম আত্ননাদ। আর সেই ভয়ঙ্করী অমরাগিরি অন্ধকারে বিদ্যুৎচমকে মাঝে মাঝে দেখা যায় শোণিতাসক্ত আলা-ই-মুহলিখ হস্তে অশ্বারূঢ় তৈমুর রণক্ষেত্রের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছুটে চলেছেন কিয়ামতের রাতে মূর্তিমান মহামৃত্যুর মতো!

চিরাগ-দীপিত আধো-অন্ধকারে সেই পর্ণকুটীরে অতিবৃদ্ধা কথাকোবিদ তার বলিরেখাঙ্কিত হাতটা কিশোরের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলত : দ্যাখ্, মেরে লাল! আজও সে-কথা ম্যাদ করলে আমার তামাম বদনে কাটা দিয়ে ওঠে!

কাটা বিন্দুতো কিশোর শ্রোতাটির কলিজাতেও। সেই দীপ্তবজ্রী তৈমুরের বংশধর, সেই সসাগরা ধরণীর

অধীশ্বর চৌগাস্ খান-এর অধঃস্তন পদ্বন্দ্ব আজ নাঙ্গা ফকির!

ভাগ্যান্বেষী কিছু নওজোয়ানদের নিয়ে বাবুর ছোটখাটো একটি দল গড়লেন। এক উজ্জ্বলগী বিদ্রোহের সুযোগ তিনি একদিন আফগান-অধিপত্যকে পরাস্ত করে কাবুল অধিকার করলেন (1504)। বৈশিদিন সিংহাসনে টিকতে পারলেন না কিন্তু। বছর আশ্টেকের ভিতরেই মৃত সুলতানের পুত্র তাঁকে পরাস্ত করে কাবুল পুনরুদ্ধার করল। বাবুর আবার নামলেন পথে।

এই সময়ে খুদার কুদতে নিয়তি যেন বাবুরকে হিন্দুস্থানের দিকে আকৃষ্ট করল। দিল্লীতে তখন সুলতান ইব্রাহিম লোদী তক্ত-আসীন। ইব্রাহিমের দুই ওমরাহ—দৌলত খাঁ আর আলম খাঁ বাবুরকে গোপনে আক্রমণ করল ভারতে অভিযান নিয়ে আসতে। দৌলত খাঁর উদ্দেশ্য—প্রতিহিংসা; তার পুত্রকে ইব্রাহিম কঠিন শাস্তি দিয়েছিলেন। আর আলম খাঁর অন্তরে ছিল উচ্চাশা। কোনো ডাইনী বোধকারি তার কানে মন্ত দিয়ে গিয়েছিল : Thou shalt be King hereafter! (তুমি রাজা হবে!) তার আশা—বাবুর ইব্রাহিমকে হত্যা করে তাকেই মসনদে বসিয়ে কাবুলে ফিরে যাবেন! মোটকথা, এই দুই বিশ্বাসঘাতকের আমন্ত্রণে বাবুর হিন্দুস্থান জয় করার একটা সুযোগ দেখতে পেলেন। সেই অতিবৃদ্ধার খোয়াবকে বাস্তবায়িত করতেই যেন—বাবুর দুর্বীর বেগে প্রবেশ করলেন পঞ্জাবে, দখল করলেন লাহোর (1524)। এতদিনে দৌলত ও আলমের হৃদয় হয়েছে, তারা সম্মুখে নিয়েছে বাবুর যদি ইব্রাহিমকে সিংহাসনচ্যুত করতে পারেন তাহলে নিজেই উঠে বসবেন দিল্লীর তক্ত-তাউসে! তাই এবার ওরা দুজন বাবুরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করল। বাধ্য হয়ে বাবুর ফিরে গেলেন কাবুলে।

কিন্তু ইতিমধ্যে মধ্য-এশিয়ার ব্যাঘ্র 'ম্যান-ঈটারে' রূপান্তরিত! বাবুর বৃদ্ধেছেন—হিন্দুস্থান দখল করা অসম্ভব নয়! সৈন্যসামন্ত সাজিয়ে পরের বছরই তিনি ফিরে এলেন সেই খাইবার গিরিবর্ষ দিয়ে। পঞ্জাব পুনরায় দখল করলেন দৌলত ও আলমকে পর্যদস্ত করে। এর পরেই তাঁকে চরম সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে হল। দিল্লী অধিকার করতে হলে, পঞ্জাবের শাসনকর্তাকে নয়, পরাজিত করতে হবে দিল্লীশ্বর সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে।

লোদী বংশের গৌরবরাশি যে অস্তমিত সেটা মালুম হয়নি ইব্রাহিমের। তিনি আগন্তুকের বিরুদ্ধে বিশাল বাদশাহী ফৌজ একত্র করলেন ভারত-

ইতিহাসের সেই পীঠস্থানে পানিপথের রণক্ষেত্রে। একুশে জুলাই (1526) তারিখে সংঘটিত হল সেই ঐতিহাসিক ঘটনা : 'দ্য ফার্স্ট বাটল অব পানিপথ'!

আগন্তুকের অস্ত্রজীবনীতে দেখছি, তাঁর হিসাব-মতো—বাবুরের সৈন্যসংখ্যা ছিল 12,000; অপরপক্ষে, দিল্লীশ্বর রণক্ষেত্রে সামিল করেছিলেন এক লক্ষ সোম্মা। কী-ভাবে এই অসম্বন্ধে জয়লাভ করেছিলেন তার বিস্তারিত বর্ণনা বাবুর তাঁর আত্মজীবনীতে দিয়েছেন। হয়তো অতিরঞ্জন আছে, কিন্তু তা-সবুও এ বৃদ্ধের বাবুরের এক অসামান্য কীর্তি। ডক্টর কালীচন্দ্র দত্তের ভাষায়,² "এইভাবে উন্নততর রণকৌশলতা, এবং সৈন্যপতা, তদুপরি বন্দুকের ব্যবহারে বাবুর চূড়ান্ত-ভাবে জয়লাভ করলেন। লোদী সুলতান বৃদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ দিলেন। ঐ সঙ্গে তাঁর সৈন্যবাহিনীর শ্রেষ্ঠ বীর-বৃন্দও আত্মদান করল।"

বাবুর বিদ্রোহপতিতে অধিকার করলেন দিল্লী, আগ্রা।

আমরা সম্মারগত ধরে নিই পানিপথের প্রথম বৃদ্ধ-জয়েই মগলযুগের প্রতিষ্ঠা। সেটা সর্বৈব সত্য নয়—পানিপথের প্রথম বৃদ্ধ সূচনা, সমাপ্ত নয়। কারণ ইব্রাহিম লোদী তখন এক অবক্ষয়ী সুলতানীয়ুগের নবদন্তহীন শেষ বংশধর। হিন্দুস্থানের উত্তর ও মধ্য অংশে তখন প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী বিভিন্ন রাজপুত্র নৃপতি। মেবারের রাণা সঙ্গের নেতৃত্বে মাড়বার, অম্বর, গোয়ালিয়র, আজমীর ও চান্দেরীর রাজন্যবর্গ এবার বাবুরের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে রুদ্ধে দাঁড়ালেন। কানুয়া বৃদ্ধক্ষেত্রে এই সম্মিলিত রাজপুত্র বাহিনীকে পরাস্ত করেই, বাবুর হিন্দুস্থান বিজয় সম্পূর্ণ করলেন।

এত পরিপ্রায়ে এত রক্তক্ষয়ে অর্জিত হিন্দুস্থানের তক্ত-তাউসে বাবুর কিন্তু বৈশিদিন আসীন থাকতে পারেননি। মাত্র সাতচল্লিশ বছর বয়সে তিনি দেহ রাখলেন (1530)। ঠুর মৃত্যু নিয়ে একটি কিংবদন্তী আছে—নিশ্চয় শুনছেন আপনারা, যার মূল উৎস পর-বর্তী যুগের পণ্ডিত আবুল ফজলের শ্রুতিনির্ভর রচনা। বাবুরের জ্যেষ্ঠপুত্র শাহজাদা হুমায়ুন—তখন তিনি তেইশ বছরের নওজোয়ান, দুরারোগ্য ব্যাধির আক্রমণে শয্যালীন হয়ে পড়েন। বাবুর চিকিৎসার কোনো চুটি করেননি—বালুঘাড়ি হাতে রোগীর শিয়রে বসে আছেন তবীব-ই-হাজিক, চিকিৎসা হাকিম, দণ্ডে দণ্ডে ঔষধ পান করাচ্ছেন; আর অদূরে বসে আছেন নিশ্চুপ তামাম হিন্দুস্থানের মালিক জাহিরউদ্দীন বাবুর। ক্রমে রোগীর অবস্থা সঙ্গীনতর হয়ে পড়ে।

একদিন সম্মার হেঁকিম-উল-মূলক মাথা নেড়ে উঠে চলে গেলেন : বলে গেলেন যোগীর উপর ঐশ্বর্য আর কোনো কাজ করছে না—এখন আল্লাতালার নির্দেশ শাওর চিন্তে মেনে নেওয়া ছাড়া গতান্বিত নেই!

বাবুর উঠে দাঁড়ালেন। অস্তাচলগাম্ভীর্য সূর্যের শেষ রশ্মির দিকে তাকিয়ে রইলেন। ঠিক তখনই জাম-ই-মসজিদে মিনারচড়া থেকে ভেসে এল শাম-ওয়েবের নামাজের মুরাজ্জিন। বাবুর হাঁটু পেড়ে বসলেন মূর্খ পুত্রের শিরের। অক্ষুণ্ণ মস্তোজরগণের মতো কললেন, হে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ! তুমি তো সর্বজ্ঞ, তুমি সকলের পাপ ক্ষমা কর, তওবা কবুল কর! তবু যদি আমার কোন অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ একটি মৃত্যু অপরিহার্য হয়, তাহলে আমার প্রাণাধিক প্রিয় শাহজাদার পরিবর্তে আমাকে গ্রহণ কর! হুমায়ুনকে রোগমুক্ত করে আমাকে দাও এই রোগমন্তব্যর মূব্বারকী!

আবুল ফজল বলছেন, আল্লাহ-র কী অপূর্ব মহিমা। এর পর থেকেই ক্রমশঃ ভালো হয়ে উঠলেন হুমায়ুন। এবং মাত্র তিনমাসের মধ্যে একই ব্যাধিতে জ্বিন-সামিন হলেন বাবুর-বাদশাহ। পরিপূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গে তিনি কিদার নিলেন দুনিয়া থেকে। যাবার আগে হুমায়ুনের হাত দুটি ধরে দিয়ে গেলেন আখির-ই-মুব্বারকী : ‘বাপজান! চারুকিরোখই কড় কড় সাম্রাজ্যের সব চেয়ে কড় শব্দ। তাই শেষ নির্দেশ দিয়ে যাই—তোমার ছোট ভাই কামরান, হিন্দাজ, আশ্কারী এবং বহিন গুলবদনের শত অপরাধ ক্ষমা কর।’

বাবুরের মরদেহ প্রথমে আগ্রার আরামবাগে রক্ষিত হয়। তারই শেষ ইচ্ছানুসারে পরে তা কাবুলে নীত হয়। বাবুরের সমাধি হিন্দুস্থানে নেই। কাবুলে তার সমাধি অনাক্ষর্য—কিন্তু এক অপূর্ব ঝগড়া ঘেরা।

সাম্প্রতিককালের কোনো কোনো ঐতিহাসিক বাবুরের মৃত্যু-সংক্রান্ত এই অলৌকিক ঘটনাটি অস্বীকার করতে চান। এর মধ্য অলৌকিক কোনটা, তা তো আমাদের বল্য হল না। ঘটনার অলৌকিকতা কিছু নেই, ব্যাক্সর থাকতে পারে। বাবুরের পক্ষে এই ধরনের প্রাণনা স্বাভাবিক, অনেক পিতাই সম্রাটের মৃত্যু-শিরের দাঁড়িয়ে এ-জগতের স্বগতোক্তি করে থাকেন; সেসে কৃপে তার তিনমাসের মধ্যে মৃত্যুও ঐতিহাসিক নয়। ঘটনা দৃষ্টিক কাকতালীয় বলে প্রমাণ করার মধ্য না আছে কোনো বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা, না বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অবকাশ!

বাবুর সম্পর্কিত অর্দিষ্ঠিত ছিলেন দিল্লীশ্বররূপে। তার স্থাপত্যকীর্তি বঙ্গসন্মান। পল্লার বিমানবাঁটির

কাছে তিন-খিলানওয়াল্লা একটি ইটের মসজিদ নাকি তারই আদেশে গড়া। এছাড়া আরও তিনটি মসজিদ তিনি নির্মাণ করিয়েছিলেন, সম্বলে, অবোধ্যার এবং আগ্রার তদানীন্তন লোদী-কিল্লার ভিতর। আগ্রার ‘চিনি-কা-রোজার’ কিছু উত্তরে ‘রামবাগে’ বাবুর নির্মিত ‘বাগ-ই-আফসান’-এর ধ্বংসস্থাপ এখনও দেখতে পাবেন। তার আর একটি—কী কলব?—‘স্থাপত্য-কীর্তি’-ই আছে পানিপথে। কিন্তু সেকথা বলার আগে লিপিবদ্ধ করে যাই বাবুর বিশ্ব-ঐতিহাসে চিরজীবী হয়ে আছেন শব্দ, হিন্দুস্থানে মৃগল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবেই নয়, তার আত্মজীবনীর জন্য। চুগতাই-তুর্কী-ভাষায় লেখা তার আত্মজীবনী নাকি এক অনবদ্য গ্রন্থ। আকবরের সভাসদ এবং বৈরাম খাঁর পুত্র আবদুর রহিম খান-ই-খানান সেটির ফার্সী অনুবাদ করেন (1590)। পরে তার ইংরেজি অনুবাদ হয় (1826) এবং ফরাসী ভাষাতেও (1871)। এসব দৃষ্টান্ত গ্রন্থ জোগাড় করাই মৃগুকিল; তবে মিসেস্ বিভারিজের অনুবাদটি প্রামাণিক গ্রন্থালয়ে পাবেন। সম্প্রতি নাকি একটি বাঙলা অনুবাদও হয়েছে। বাবুরের এই আত্মজীবনীতে তদানীন্তন ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক তথ্যই শব্দ, নয়, গাছ-পাখী-ফুল ইত্যাদির বিষয়ে তথ্যনিষ্ঠ নানান সংবাদও সেখানে সন্নিবিষ্ট। রচনার ভিতরে আমরা কোথাও একজন দার্শনিক, কোথাও কবি, কোথাও প্রকৃতি-প্রেমিক এবং সর্বত্র এক সন্দরের পূজারীকে দেখতে পাই—অনুভব করি কেমন করে আকবর হয়ে পড়েছিলেন মানবপ্রেমী, শাহজাহাঁ সৌন্দর্য-দেবীর বেদীমূলে কেন রাজকোষ নিঃশেষিত করতেও পিছপাও হননি।

বাবুর প্রকৃতি-প্রেমিকের নিষ্ঠায় তার দেখা নদ-নদী, পাহাড়-গিরিবন্ধ, গাছ-ফুল-ফল, কীট-পতঙ্গ-পশু-পক্ষীর নিখুঁত বর্ণনাই শব্দ, দেননি, উপযুক্ত চিত্রকরকে দিয়ে ছবি আঁকিয়ে তার পাণ্ডুলিপিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করেছেন। ক্রমেতে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রাখা বোড়শ শতাব্দীর একটি পুঁথি থেকে একখানি পুঁথি ‘বদন্ত’ মতে এখানে এঁকে দিয়েছি (চিত্র—7.1)। মূল চিত্রে যে অপূর্ব বর্ণসম্ভার তা সাদাকালো লাইন ব্লকে কিছুই খোলতাই হয়নি। চিত্রকর হিসাবে আমার এসেমও দারী। ফলে কোনো পক্ষী বিশারদ হয়তো আমার এ ছবি দেখে পাখীগুণিকে চিন্তে পারবেন না। ভরসা এইটুকু যে, আমার বাঙালী পাঠককুলের মধ্যে চুগতাই-তুর্কী ভাষা জানেন কোটিকে গুটিক—স্বয়ং মজতবা আলীসাহেবও স্বীকার করেছিলেন, ভাষাটা তার অজানা। তাই আশা করে আছি—আমার

ছবি দেখে কেউ হাস্য করে বলতে পারবেন না—ব্রিটিশ মিউজিয়ামে-রাখা মূল পাণ্ডুলিপির ঐ দূর্বোধ্য পৃষ্ঠাটি একটি বাস্তব মস্তিষ্কার মক্কারা কিনা!

পানিপথের যুদ্ধ, বিশেষ করে কান্দহার চূড়ান্ত যুদ্ধে সম্মিলিত রাজপুত বাহিনীকে পরাস্ত করার পর বাবরের সেনাপতি—আমীর মালিকেরা তাঁকে অনুরোধ করেছিল একটি কীর্তিস্তম্ভ স্থাপনা করতে। ঠিক যেভাবে কুংবউদ্দীন আইবক গড়েছিলেন কুংব মিনার। বাবুর নাকি প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, ঠিক আছে, তাই করব—কিন্তু পাথর আর চুন-সুঁর্য্যকি দিয়ে মহাকালকে জয় করা যায় না, মোতকে (মৃত্যুকে) ফোৎ করার হিম্মৎ শুধু জিন্দেগীর—জীবনই একমাত্র পারে মৃত্যুকে উপেক্ষা করতে। তাই স্থাপত্যকীর্তি সজীব হওয়া চাই!

আমীর মালিকেরা বিহ্বল হয়ে মুখ তাকাতাকি করে।

বাবুর কলেন, পানিপথ যুদ্ধক্ষেত্রে ঠিক যেখানে ইব্রাহিম লোদী অন্তিম শয়ানে শূর্য্যোছল তাকে কেন্দ্র-বিন্দু করে এক 'চাহর বাগ' বানাও। আরতক্ষেত্রে চতুঃখণ্ড কর চারটি সদস্য বর্গক্ষেত্রে, আর তার ধারে ধারে বুনে দাও গাছের চারা। পাথরের ইমারৎ জল-ঝড়ে ফেটে যায়, ভূমিকম্পে ভূতলশায়ী হয়, কিন্তু গাছের চারা মৃত্যুঞ্জয়ী। ওরা মৃত্যুর আগে ফুল ফোটাবে, ফল ধরাবে, বীজ ছড়াবে! তারপর মহাকালের নাকের সামনে নাকাড়া বাজিয়ে দলে দলে মরতে যাবে! সাথে সাথে দেখা দেবে অশ্রুর! গাছ মরে, বাগিচা মরে না। 'বদল যায়ে অ'গর মালি, চমন হোতা নেহি খালি; বাহারে' ফিরিভি আতি হ'য়, বাহারে' ফিরিভি আয়েগে ॥'

তাই আসে। পানিপথের সেই মৃত্যুঞ্জয়ী বাগিচা আজও সজীব, যদিও সাড়ে চারশ বছরে অনেক-অনেক মালি পুরুষানুক্রমে বিদায় নিয়েছে। তুগলকাবাদ, জহানপনাহ, ফিরোজশাহ কোটেলা তিল তিল করে ধূলায় মিশিয়ে যাচ্ছে, আর বছর বছর বাবুর-বাদশাহর 'স্থাপত্যকীর্তি' নববর্ষের অশ্রুরোদ্গমে মহাকালের নাকের নজ্জদিকে নাকাড়া বাজিয়ে যায়! প্রতি বছর শীতের হাওয়ায় সে ফুলবাগিচার শাখায় শাখায় নাচন লাগে, পাতাগুলি শিরিশিরিয়ে-শিরিশিরিয়ে করে পড়ে; কিন্তু তার 'শূন্য করে ভরে দেওয়ার' খেলা সাঙ্গ হয় না। প্রতি বসন্তে দেখা যায় তার ফলের বাহার বেরিয়ে এসেছে অন্তরল ছেড়ে!

দার্শনিক বাদশাহর সেই আদিম 'চাহরবাগ' শুধু পানিপথেই থেমে থাকেনি; সে ছুটে গেছে এ মহান

উপস্বীপের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। হুমায়ুন, জংঘর, মনচাওর মক্কারা থেকে শুরু করে দীন



চিত্র--7.1 বাবরের আত্মজীবনীৰ একটি পৃষ্ঠা।

হতে-দীনের কুটির ঘিরে সে বেঁচে আছে। সেজেছে নতুন সাজে কাম্বোজের শালিমারে, নিশাদবাগে, চম্ভা-

শাহীতে, এমন কি বাংলায়ও অথবা নয়। দিল্লীর পিকনিকস্পটে, গোল্ডেনসিটীর-মুখের বন্দাবন অথবা মৃদল গার্ভেসে।

হুমায়ূনের চরিত্র মোটে-গুণে মেশানো। দোষের চেয়ে গুণই বেশি। তিনি অহিংসেন্দ্রবীর এবং আয়োদ-প্রিয় : কিন্তু বই পড়তে ভালোবাসতেন। তাঁর বাদ-শাহীর দুটি বৃগ। প্রথমার্ধে তিনি শব্দ লড়াই-কাজিরতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। তারপর শেরশাহ শূরের হস্তে পরাজিত হয়ে কাবুল অঞ্চলে কাটিয়ে আসেন জীবনের পনেরটি বছর। দুর্ঘটনায় শেরশাহর অকল-মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরদের হাত থেকে হতরাজ্য পুনরায় উদ্ধার করে মাত্র ছয় মাস বেঁচে ছিলেন। ফলে, স্বাধীনতা-কীর্তি কিছু গড়ে বাবার মতো সমর ও সুযোগ তিনি পাননি। তবু দীনপন্য-তে তিনি একটি নতুন নঙ্গরী পত্তন করেন, এখন যার চিহ্নমাত্র নেই। শ্বিতীর-বার দিল্লীশ্বর হয়ে তিনি শেরশাহর অসমাপ্ত পুরানা-কিন্ধা কিছু ভাঙচুর করে গড়ে তোলেন। মেহেরোলী এলাকায় জামালি-কামালী মসজিদ—যা বাবুরের আমলে শব্দ হইছিল, সেটি সমাপ্ত করেন। জামালি হচ্ছে কাসী কবি শেখ ফজলুল্লাহ-র ছদ্মনাম। এ মসজিদে একটি মাত্র সুউচ্চ গম্বুজ, পশ্চিম প্রাচীরে পাঁচটি কুঙ্গলি-কিন্ধা। পিছনদিকে অরিয়ল-গবাক্ষ এবং কোণায় কোণায় অষ্টভূজ মিনার। ‘অরিয়ল-গবাক্ষ’ জিনিসটি কী, একটু ব্যক্তিগত কলা বোধহয় প্রয়োজন। দেওয়াল থেকে বাহিরে বেরিয়ে থাকে কোলা বারান্দার মতো অংশের উপর তৈরী করা গবাক্ষকে বলে অরিয়ল-গবাক্ষ। জয়পুরের হাওয়ারমহলের পাশাপাশি জানালা-পুলি হয়তো প্রতিপটে ভেসে উঠবে আপনাদের। সে যাই হোক, বঙ্গলম্বাপ্রভে জামালি-কামালী মসজিদ একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। প্রাসঙ্গিক বঙ্গের বঙ্গ-মসজিদ এবং কঙ্গ-গম্বুজের অনেক কিছু উপাদান ও অনুভাবনা গ্রহণ করেও এ ইমারত নিঃস্বয় বহিঃস্থ স্ফুটিল।

শেরশাহ শূর পুরানা-কিন্ধা নির্মাণে রতী হবার কিছুদিনের মধ্যেই মৃত্যু বন। হুমায়ূন ক্ষমতা দখলের পরে এই কিন্ধাকে নিজে রচি অনুযায়ী ভেঙে সাজান। শেরশাহ-র প্রথমদিকের তিনি প্রথমেই রূপান্তর করেন। হুমায়ূনের একটি নিঃস্বয় গাইবেরী ছিল প্রতিদিন অপরাহ্নে তিনি সেখানে গিয়ে কিছু পাঠ করতেন : ধর্মগ্রন্থ, দর্শন কাব্য অথবা পিতৃদেবের অনেক আকর্ষণীয়। এই প্রথাগার থেকে একদিন সম্ভবত বন্ধন তিনি সোপান করে নিচ দেয় আসছেন

তখন হঠাৎ শুনতে পেলেন অদ্রবর্তী কিন্ধা-ই-খুদাহ মসজিদ মিনারে শাম-ওয়ার মুরাশ্বিনের আজান। ধর্মনিষ্ঠ হুমায়ূন তৎক্ষণাৎ সিঁড়ির উপরেই হাট, গেড়ে নামাজ পড়তে থাকেন। নামাজান্তে উঠে দাঁড়াবার সময় তাঁর পা ফস্কে যায়। ভূতলে গড়িয়ে পড়েন হতভাগ্য সুলতান। এই পতনের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়। হুমায়ূনের মৃত্যুর নয় বৎসর পরে তাঁর মহিষী হাজী বেগম হুমায়ূনের মক্বারাটি নির্মাণ শব্দ করেন। কিন্তু তার কথা আকবরী জমানাতে, এখানে নয়।

হুমায়ূনের দুর্দশার মূলে তাঁর অহিংসেন্দ্র প্রতি আসক্তি, এবং লঘুচিন্তিতা ছাড়াও ছিল আর একটি হেতু : তাঁর আশ্বাজানের আশ্রয়ী আদেশ ! তিন ভাইকে তিনি কিছুতেই সন্তুষ্ট করতে পারেননি। তাদের প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিবৃত্ত করে ধন-দৌলত-ফৌজ সবই দিয়েছেন, আর তারা বারে বারে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে তন্তু-তাউস দখল করতে চেয়েছে। মজা হচ্ছে এই যে, প্রতিটি ক্ষেত্রে হুমায়ূন বিদ্রোহ দমন করেছেন, ভাইদের বন্দী করেছেন, এবং শেষ পর্যন্ত ক্ষমা করেছেন। আর প্রতিবারই মৃত্ত ভাইয়েরা দূরে সরে গিয়েই হেঁকেছে—‘ও কুমারী তোর জল্কে কোমোছি !’ এই মারাত্মক খেলার শেষ পরিণতি—যখন ঐ তিন ভাই মৃদল-পাঠান শেষ সংগ্রামে উদাসীন রইল ! শেরশাহ-র হাতে পরাজিত হুমায়ূন একটি ভিস্তি-ওয়ারার বদান্যতায় কোনক্রমে গঙ্গা পার হয়ে প্রাণ নিয়ে পালালেন, তাঁর হারেমের সবাই আফগান-দের হাতে বন্দী হল, আর হুমায়ূনের তিন ভাই তিন প্রাদেশিক শাসনকর্তা দূরে দাঁড়িয়ে দেখল ! হুমায়ূনের ভগ্ন গুলবদন বেগমের স্মৃতিচারণ পাঠে তাই মনে হয়—অহিংসেন্দ্র সেবন নয়, প্রমোদপ্রিয়তা নয়, এমন কি সোপানশীর্ষ থেকে অতর্কিত পদস্থলনও নয়, হতভাগ্য হুমায়ূনের ভাগ্যবিড়ম্বনার মূলে তাঁর পিতার সেই শেষ অনুজ্ঞা, আশ্রয়-ই-মুবারকী—‘ভাই-দের সব অপরাধ ক্ষমা কর।’

বাবুর-বাদশাহ-র যে সাহিত্যপ্রীতি, প্রকৃতি-প্রেমিকতা, দার্শনিক-কবিসুলভ দৃষ্টি, হুমায়ূনের যে গ্রন্থা-গার-প্রীতি তাই পরবর্তী মৃদল-জমানাতে নানাভাবে শব্দ-প্রশংসা বিস্তার করে নবযুগের সূচনা করেছিল। বাবুরের এক আমীরের রচনায় জানতে পারা যায়, ঐ স্বল্পকালের মধ্যেই বাবুর-বাদশাহ তাঁর ‘শূরা-ই-জামাল-ক’ (মুখাবাস্তুরকার, পূর্ত বিভাগ বা চীফ এজিনারার পি. ডাব্লু. ডি) নির্দেশ দিচ্ছেন দিল্লী ও আশ্রিতে রাজকোষের অর্ধে কিছু মত্তব নির্মাণ

মুগলযুগে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। পাঠান আমলে হাঙ্গেরের ভিতর বিদ্যা-চর্চার বিশেষ রেওয়াজ ছিল না ; বিখ্যাতা কোনো মহিলা লেখকের সম্বান পাওয়াই ছিল দুস্কর। তুজনায় মুগলযুগে হাঙ্গেরের ভিতর রীতিমতে পড়া-শুনার চর্চা ছিল। বাবরের কন্যা গুলবদন বেগমের 'হুমায়ুন-জীবনীতে' তার সূচনা, হুমায়ুনের ভাগ্য-নেয়ী সালিম গুলতানাতে তার বিকাশ এবং নুরজাহা, সম্রাজ্ঞমহল, জাহানআরা, জেব-উন্নিহার লেখনীতে তার চরম উৎকর্ষ। এরা আরবী ফার্সী দুটি ভাষাতেই রচনা করেছেন। জেব-উন্নিসা বেগমের গ্রন্থাগারের সঞ্চয় নাকি ছিল বিস্ময়কর। এই মুগল-যুগেই হিন্দুদের ভিতর প্রচলিত নিষ্ঠুর সত্যদাহ-প্রথা রদ করার প্রথম প্রচেষ্টা করা হয়। এদিক থেকে

তারপর চিত্রাঙ্কন। আবদুর-বাদশাহ্ ছাঁচ ভাঙ-
বাসতেন, তিনি হীরাট ও সমরকন্দ থেকে বহু চিত্র
এদেশে নিয়ে এসেছিলেন। রোগশস্যার আশ্রিত
হুমায়ূনের যে সুন্দর ছাঁচখানি আছে, তা নাকি
আবদুরের নির্দেশে কোনো পারস্যান্ধার আঁকা।
হুমায়ূন তাঁর নির্বাসনকালে পারস্যে ঘন্টার পর ঘন্টা
চিত্রাঙ্কন বিষয়ে ঝেঁতে থাকতেন। তখন পারস্যের
দরবারে হাজির ছিলেন মীর সৈয়দ আলী, যাকে ক্যা
হয় পূর্ব-স্বস্তর ব্রাহ্মণের। হুমায়ূন নিজের কাছে
ছাঁচ আঁকা শিখতেন। শব্দে তাই নয়, দিল্লী পুন-
স্থাপনের পরে তিনি তাঁর শিল্পদ্রু আবদুস্
সামাদকে হিন্দুস্থানে নিয়ে আসেন। যে পত্রটির
অক্ষর পরিচয়ের আগ্রহজন্য করে উঠতে পারেন
তাকে ঐ শব্দের কাছে শিকানবীশ করে দেন। এ-
শিক্ষা আবদুরের পরবর্তী জীবনে প্রচণ্ড প্রভাব ফেলে।
কতেপূর-সিঁড়ির বিভিন্ন মহলে আবদুর ক্রমশঃ
মন্দির আঁকিয়েছেন। এখন পারস্যদেশ থেকে অনেক
বিশ্বাস্য চিত্রকরকে তিনি আনিতেছিলেন। মীর সৈয়দ
আলী ও আবদুস্ সামাদ ছাড়াও—কসরুদ্দীন বেগ,
কসরো কুলী, জামসেদ প্রভৃতি। তাঁরা পারস্যারীভিতে
ফ্রেস্কো আঁকতেন। আর এদের পাশাপাশি আবদুর
নিয়োগ করেছিলেন হিন্দুস্থানের সেরা চিত্রাঙ্কণী-
দের—কসওয়াল, লাল, কোন্দ, হুকুমদ, হরিকেশী, কাম-
কণ্ড প্রভৃতিদের। এই দুই শিল্পজগৎ থেকে জন্ম
লিলা ঐ মিশ্ররীতি : মুসলিম শৈলীতে হিন্দু-
দের। এদের প্রাচীর চিত্রগুলি অধিকাংশই আবদুস্
কিহ, কিহ, নাকি নষ্ট করেছিলেন যখন আলফাংগার
স্বরাজ 'Under his orders the figures in Akbar's
mausoleum of Sikandra were whitewashed

(তার আদেশে আকবরের সমাধিসৌধের প্রাচীরচিত্র-
গুলি চুনকাম করে ঢেকে দেওয়া হয়)" অথচ আশ্চর্য!
এই আলমগীরের প্রপিতামহ আকবর বলেছিলেন,
"আমার তো মনে হয়, কোনো চিত্রশিল্পীর পক্ষে
পরমেশ্বরের মহিমা উপলব্ধি করার একটা বিশেষ
সুযোগ আছে। কারণ সে যখন জীবন্ত কোনকিছুর
আঁকে, আর তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি আশ্রয় চেষ্টায়
নিখুঁতভাবে রূপায়িত করেও তাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে
পারে না, তখন সে উপলব্ধি করে, সেই মহান সর্বব্যাপী
সত্ত্বার অস্তিত্ব—একমাত্র যিনি 'জীবনকাঠি'-র অধি-
কারী। এভাবেই শিল্পী পরমজ্ঞানের শেষতীরে
উপনীত হয়।"

সম্রাট আকবর মীর সৈয়দ আলীকে দিয়ে বহু ছবি
আঁকিয়ে, শ্বাদশখণ্ডে আমীর হামজার জীবনী রচনা
করান। এই গ্রন্থের নাম 'হামজানামা'। এ-ছাড়া
চৌগিসনামা, জায়ফরনামা, আকবরনামা, মহাভারত,



চিত্র-7.2 মৃগল-শৈলীতে ভীষ্মের শরশয্যা।

কল-দময়ন্তী কথা, প্রভৃতি বহু গ্রন্থে বিখ্যাত চিত্রকর-
দের দিয়ে ছবি আঁকান। মৃগল-স্টাইলে আঁকা এই-
সব চিত্রে "সেকালের বৃদ্ধের উপকরণ, বৃদ্ধাস্ত, কামান-
কাহী উট, পদুর গাড়ী, হাতী, ঘোড়া, বাদশাহী শিবিরের
সাজসজ্জা, দুর্গের ভিতরের ও বাহিরের চিত্র, সৈন্য,
শিবির—সর্বোপরি বৃদ্ধের বীভৎসতা অতি নিপুণ-
ভাবে আমাদের কাছে উপস্থাপিত করা হয়েছে। কী
অমানুষিক ধৈর্য নিয়ে তারা পাহাড়ের প্রতিটি পাথর,
গাছের প্রতিটি পাতা, দুর্গের ভিতরে উৎকীর্ণতা
মহিমান্বিত এঁকেছেন তা লিখে বন্ধুবার নয়। কিন্তু
ছবিগুলিতে পারিপ্ৰেক্ষিকতার অভাব সকলেরই নজরে
পড়ে। যিনি ছবির সামনের দিকে দাঁড়িয়ে আছেন
এবং যারা বহুদূরে দুর্গের মাঝে নিহতকক্ষে বসে
মণ্ডল করছেন তাঁদের সকলকেই আঁকা হয়েছে সমান
মাপে।"^{১০}

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় পশ্চিমখণ্ডে পারিপ্ৰেক্ষিকতার

সূত্রগুলি যিনি আবিষ্কার করেন সেই ফিলিপ্পো
(Filippo Brunelleschi) মৃত্যু হয়েছে আকবরের
জন্মের বিরানন্দই বছর পূর্বে এবং ফিলিপ্পোর সূত্র-
গুলি যিনি নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ করেন সেই লেঅ-
নার্দো-দা-ভিঞ্চির মৃত্যু হয়েছে আকবরের জন্মের তেইশ
বছর পূর্বে। অর্থাৎ আকবরের সমসময়ে যুরোপীয়
রেনেসাঁ শিল্পীরা নিখুঁত পরিপ্ৰেক্ষিকতে ছবি আঁকতেন।
মৃগলযুগের চিত্রশিল্পে তার প্রভাব দেখতে পাই না,
যদিও পারস্য, সিরিয়ার পথে যুরোপের সঙ্গে বাণিজ্য
তখন অব্যাহত ছিল। অপরপক্ষে, মৃগল-শৈলীতে হিন্দু
ও পারসিক চিন্তা-ভাবনা সুন্দরভাবে মিশে গেছে। যেমন
উল্লেখ করা চলে, 'হামজানামায়' 'ভীষ্মের শরশয্যা' চিত্র-
খানি। এখানে পিতামহ ভীষ্মকে দেখলে মনে হয়
তিনি বৃদ্ধি এক মৃগল সেনাপতি। তাঁর পোষাক পরি-
চ্ছদ, বর্ম-শিরস্ত্রাণ সবই মৃগলযুগের।

বাদশাহ্দের ছবি আঁকাও এক বাদশাহী বিড়ম্বনা
ছিল। বাদশাহ্দের দরবারে বসলে, শিল্পীকে দরবারের
কায়দাকানুন মেনে বহু দূরে বসে ছবি আঁকতে হত।
পোর্ট্রেট আঁকতে হলে যেভাবে 'সিটিং' দিতে হয়, তা
বাদশাহ্দের কখনই দিতেন না। স্পেনের রাজা ফিলিপ
যেভাবে শিল্পী ভেলাসকেৎকে (Velasquez. D)
অথবা ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরী যেভাবে শিল্পী
হলবেনকে (Holbein. H) সিটিং দিয়েছেন, সেভাবে
কোনও গ্র্যান্ড-মৃগল নিজ প্রতিকৃতি আঁকাননি। তা
সত্ত্বেও আমরা অনবদ্য সব পোর্ট্রেট পেয়েছি—বাবুর
থেকে আলমগীর, প্রত্যেকের। তার চেয়েও অবাক করা
খবর বেগম-সাহেবাদের আবক্ষ চিত্রগুলি। অধিকাংশ
ক্ষেত্রে দর্পণে ক্ষণকালের জন্য প্রতিবিম্ব দেখার সুযোগ
শিল্পীকে দেওয়া হত। তাই সন্দেহ হয়—মমতাজ,
নূরজাহাঁ, জাহানারা বা জেব-উন্-নিসার যে-সব মিনিয়-
চার দেখতে পাই তার সঙ্গে ঐ-সব বাস্তব মহিলাদের
কতদূর সাদৃশ্য আছে। হয়তো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই
শিল্পী নিজ কল্পনায় সৌন্দর্য আরোপ করেছেন।
সম্ভবতঃ একমাত্র ব্যতিক্রম সম্রাজ্ঞী নূরজাহাঁ, কারণ
তিনি মাঝে মাঝে প্রকাশ্য দরবারে উপস্থিত হতেন।

জাহাঙ্গীর ছিলেন চিত্রশিল্প বিষয়ে এক 'কনো-
শার'—পরম সমর্থদার—দিদাবর! তিনি পারস্য থেকে
তাঁর আমলের শ্রেষ্ঠ চিত্রকরদের সসম্মানে ভারত
ভূখণ্ডে নিয়ে আসেন : হীরাতের আগা রেজা ও তাঁর
পুত্র আবদুল হাসান, সমরকন্দের মুহম্মদ নাজীর ও
মুরাদ এবং উস্তাদ মনশূর। ওঁদের সমসাময়িক হিন্দু
চিত্রশিল্পীরা হচ্ছেন : বিশেন দাস, মনোহর, গোবর্ধন
প্রভৃতি। এঁরা অধিকাংশই হিন্দুদন্ডের উপর মিনিয়-

লা-জগাব দেহলি—অপরূপা আত্মা

চার কাজ করেছেন। প্রতিকৃতি চিত্র, প্রাকৃতিক দৃশ্য, হাতী, ঘোড়া, উট ও হরিণ এবং নানান জাতের পাখী। পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী বলছেন, মৃগল-শৈলীর চিত্রে “পাখী-গুলির আকৃতি ও তাদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে প্রতিটি পালকের সূক্ষ্মতম অংশগুলিও আঁকা হয়েছে নিখুঁতভাবে, কিন্তু তাতে পাখীর দেহের নরম তুলতুলে ভাবটির হানি হয়নি মোটেও।”^{১১}

জাহাঙ্গীরের সময়ে স্যার টমাস রো এদেশে আসেন। সম্রাট চিত্রশিল্পের বিষয়ে উৎসাহী জেনে কিছু কিছু ভালো জাতের পাশ্চাত্যচিত্র তাঁকে উপহার দেন। সম্ভবত এই সূত্রেই ভারতীয় চিত্রকরেরা নিখুঁত পরিপ্রেক্ষিতের হিসাবটি ধরতে পারলেন, কারণ পরবর্তী মৃগল-চিত্রে পরিপ্রেক্ষিতের চূড়ান্ত অনেক কম নজরে পড়ে।

অপরপক্ষে, এই যুগ থেকে পশ্চিমখন্ডও ভারতীয়, বিশেষ করে মৃগল শৈলীর সঙ্গে পরিচিত হয়। নানা দেশের বণিকের মাধ্যমে মৃগল-চিত্রকলা তদানীন্তন সভ্যপৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহাঁর সমসাময়িক বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী ‘রেমব্রান্ট’ মৃগল-চিত্রের একজন বিশেষ অনুপ্রাণিত ছিলেন। লন্ডন ও ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রেমব্রান্টের যে ছবিগুলি আছে তার অনেকগুলিতেই মৃগল-শৈলীর প্রভাব পড়েছে। এমন-কি তিনি আকবরের একটি ছবিও আঁকেন—সেটি বর্তমানে বার্লিন মিউজিয়ামে আছে। পরবর্তীকালের অস্ট্রিয়ার রানী মারিয়া থেরেসার চিত্রসংগ্রহে অন্তত দুইশতখানি মৃগল মিনিয়চার ছিল।

স্থাপত্যও যেমন চিত্রশিল্পেও তেমন—শাহজাহাঁর যুগে সূর্য পশ্চিমে ঢলেছে। শিল্পী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর ভাষায়—“সম্রাট শাহজাহান স্থাপত্য-শিল্প প্রকৃতি হিসাবে পৃথিবীময় খ্যাতির অধিকারী; সেজন্যই বোধহয় চিত্রশিল্পের উপর তেমন নজর দিতে না পারায় মোগল চিত্রকলা তাঁর সময় থেকেই প্রাণময়তা হারাতে থাকে। আকবরের সময়ে চিত্রের যে সজীবতা ছিল, ধীরে ধীরে তা নষ্ট হতে থাকে। শাহজাহান খুবই জাঁকজমক পছন্দ

করতেন, এজন্য তাঁর সময়ের ছবিগুলিতেও একটা জাঁকজমকের ভাব সর্বত্র বর্তমান। ছবিতে সোনালী রঙের এত ছড়াছড়ি দেখা যায় যে, ছবির ছাঁকি ঘুচে গিয়ে শুধুমাত্র কারুকার্যই সার হয়ে ওঠে।”^{১২}

এই বংশানুক্রমিক ঐতিহ্যে যাবানকাপাত ঘটল শেষ গ্র্যান্ড-মৃগল আলমগীরের জমানার। তাঁর যে কয়টি প্রতিকৃতি পাওয়া যায় তার অধিকাংশই সম্রাটকে না জানিয়ে আঁকা! অথচ এই আলমগীরই নাকি—জানি, আপনাদের বিশ্বাস করা কঠিন হবে—একজন চিত্রকরকে নিয়োগ করেছিলেন কারাগারে বন্দী শাহজাদা মুহম্মদের চিত্র প্রতি মাসে একে এনে বাদশাহকে দেখাতে। সম্রাট স্বয়ং কারাগার পরিদর্শনে অনিচ্ছুক, অথচ কোতুহলী মানুষ্টা জানতে চান—তার কিস্তোহী পুত্র কেমন করে ক্ষান্ত হচ্ছে কারাক্ষের নিকৃতে ভিল ভিল করে।

আলমগীরের পরবর্তী মৃগল বাদশাহের দল ইতিহাসকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে আরও দেড়শ বছর—ক্রমাগত প্রাত্যহিক, পিতৃহত্যা, স্বজনহত্যা, ষড়যন্ত্র আর বিলাসের স্রোতে। স্যার যদুনাথের অনুসরণে সেই ‘লেটার মৃগলস্’-দের বিষয়ে আলোচনার কোনো অবকাশ এখানে নেই। এমন কি শেষ গ্র্যান্ড-মৃগলও এ আলোচনার উপেক্ষিত হবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। তাই মৃগলযুগের ইতিহাসে ঔরঙ্গজেব বিশিষ্টস্থান অধিকার করলেও—ভৌগোলিক বিচ্যবে আলমগীরের সাম্রাজ্যসীমা স্ফীতদের কেন্দ্রনের মতো বিক্ষোভোন্মুখ বিস্তার লাভ করা সত্ত্বেও এ-গ্রন্থে ঔরঙ্গজেব উপেক্ষিত।

ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যের নিরিখে মহিউদ্দীন মহম্মদ ঔরঙ্গজেব আলমগীর হচ্ছেন গালিবের ভাষায় :

চিরাগ-এ মূর্দাহ হুঁ মৈ বেজবান্ গোয়-এ পুরীবাঁকা।*

□

* নৈশল-ঘেরা গোরস্থানে আমি এক নিভে যাওয়া উপেক্ষিত প্রদীপ।

শেখ মুহাম্মদ

উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা

সময়কাল (খ্রিঃ)

ফরিদের জন্ম^১
বিমাতার অত্যাচারে গৃহত্যাগ
বাহর খাঁ শোহানী কর্তৃক শের খাঁ খেতাব
লাদ-মালিককে বিবাহ ও চুনায় দগ্ধগাভ
পিতার জন্য মক্কারা নির্মাণ (সাসারাম)
নিজের জন্য মক্কারা নির্মাণ (সাসারাম)
শের খাঁ কর্তৃক বঙ্গবিজয়
বঙ্গের মধ্যে হুমায়ুন পরাজিত ; শের দিল্লীস্বর
গ্র্যান্ড-ট্রান্স-রোড, পুরানা কিল্লা নির্মাণ
কলিঙ্গ-দুর্গে দুর্ঘটনার নিহত

1472
1514
1522
1530
1535
1536-38
1536
1539
1539-44
1545

সামনেই খাইবার গিরিবৃক্সের উপলব্ধির বিসর্পিল
বিপদসঙ্কুল পথ। এ-পথে দলে ভারী হয়ে যাতায়াত
করাই বাছনীয়। তাই সরাইখানার ও-প্রান্তে ঐ যে প্রোট
লোকটা বসে আগুন পোহাচ্ছে তার সঙ্গে যেচে আলাপ
করল ইব্রাহিম, আপনিও হিন্দুস্থানে চলেছেন নাকি ?

লোকটা উঠে দাঁড়ায়। মাজা বড়কিয়ে সামান্য
করে বলে, জী হাঁ, মেহেরবান ! এ সড়ক বহুৎ খতর-
নাখ্ হুজুর ; আপনি যদি এংরাজ না হন, তাহলে
কাল সকালে আমরা এককাটা বাঠা করব।

সেটাই ইব্রাহিমের মনোগত বাসনা। মূখে স্বীকার
করল না যদিও। বরং জিজ্ঞাসা করল, হিন্দুস্থানে
ব্রিটানার রাহ্ জান-পহ্চান কেউ আছে ? না-হুসে
সুলতানী কোজে নোকরি মেলা মশ্ফিক-কি-বাং।

লোকটা হেসে কলসে, না হুজুর, বাল্-কি বাপ-
দাদা আমাকে সমসের ঘোরাতে শেখারানি, আমার
হাতিয়ার শ্রিফ্ ছেনি-হাতুড়ি।

ওহ্ ! রাজমিস্ত্রি ! ইব্রাহিম আপসে একধাপ
নেমে আসে- 'আপ'-সে 'তুমি'-এ। জানতে চায়, তোমার
সঙ্গে ওটি কে ? কেটা ?

লোকটা তার পার্শ্ববর্তী সতের বছরের জোয়ান
ছাওয়ালের পাজিরে বেমজা একটা খোঁচা মেয়ে বসে,
সেলাম কর ! বে-অকুফ্ !

ছেলেটা উবু হয়ে বসে আগুন পোহাচ্ছিল।
আফগানিস্থানের হাড়-কাঁপানো জাড়া। বাপজানের
দিকে একনজর হিরণ-দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখে।
অজানা-অচেনা ইনসান্টাকে খাম্কা সেলাম করতে
হবে কেন সেটা ঠাহর হয় না। বে-তিরবৎও হয় না
তা বলে। দায়সারা একটা সেলাম ঠুকে গৌজ হয়ে বসে
থাকে।

ইব্রাহিম ওর কাঁচ দেওদার চারার মতো ঝজ্জু মজবুৎ
দেহটা একনজরে দেখে নিয়ে জানতে চায়, তুমিও বর্দিখ
রাজমিস্ত্রি ?

বাপই জবাব দেয় তার হয়ে, জী হাঁ, খোদাব-দ্।
এই বয়সেই ওর দারুণ এলেম।

--তাই নাকি ? কী নাম হে তোমার ? --ছেলে-
টাকেই প্রশ্ন করে ইব্রাহিম।

--আলিওয়াল খান।

--মক্কারা বানাতে জান ? --ইব্রাহিমের অহৈতুকী
কৌতূহল।

কি-জানি কেন হঠাৎ অপমানিত বোধ করল
ছেলেটা। প্রাণপ্রশ্ন করে বসে, কেন ? বানাবেন ? এই
খাইবার-এ ?

ইব্রাহিম রাগ করল না। হেসে বলল, হ্যাঁ। এখন
নয়, খাইবারেও নয়, বেশ কয়েক বছর পরে। আমার

নাম ইব্রাহিম শরী, আমি সেরাখেন্ কুঞ্জার আফ-
গান—এ আমার ছেলে মিঞা হাসান শরী। মনে
থাকবে? আমিও ঐ আজীব-দেশ হিন্দুস্থানে চলেছি
তগ্দিরের খেল্ দেখতে, যেমন তোমার বাপজান চলেছে
তোমাকে নিয়ে। যদি কোনদিন শুনতে পাও আমি
জায়গীরদার বা তার চেয়ে বড় কিছ্ হয়েছি, তখন
আমার সঙ্গে মূল্যাকাং করবে, কেমন? দেখব। তুমি
কেমন মক্‌বারা বানাতে শিখেছ।

আলিওয়াল এবার যে সেলামটা করল সেটা
অকৃত্রিম। বললে, যাদ্ থাকবে খোদাবন্দ।

তারপর বহু জল বহে গেছে সিঁধু দিয়ে। এবং
যমুনা দিয়ে। আলিওয়ালের আত্মজ্ঞান ঐতিহাসিক
দিল্লী নগরীতে উপনীত হয়ে আদৌ কোনো ইমারৎ
বানিয়েছিল কিনা ইতিহাস সে-কথা লিখে রাখতে
ভুলেছে—সেটা ইতিহাসের ধাতও নয়—ঐ আলিওয়াল-
দের কান্ড-কারখানা স্মরণে রাখা। কিন্তু ইব্রাহিম
জায়গীরদার হয়েছিল। তার কবরের উপর অবশ্য
মক্‌বারা বানানো হয়নি। তার সেদিনকার সেই নাবা-
লক পুত্র মিঞা হাসানও উত্তরাধিকার সূত্রে জায়গীর-
দার হয়েছে—বিহারে; সাহাবাদ পরগণায়, সাসারামে।
এখন মিঞা হাসান নিজেই প্রোঢ়। তার তিন বেগম,
কনিষ্ঠাটি অবশ্য ক্রীতদাসী। তার গর্ভে জন্মগ্রহণ
করেছে দু'টি পুত্র : সুলেমান ও নিজাম। এবং বাড়ি-
বেগমের পুত্র এ পরিচ্ছেদের নায়ক : ফরিদ। জন্ম :
1472 খ্রীষ্টাব্দ^১।

ফরিদের জীবনের সঙ্গে বেশ কিছুটা মিল আছে
বাবুর-বাদশাহ-র। দুজনেই নিতান্ত বাউন্ডুলের বেশে
রংগমণ্ডে আবির্ভূত হয়েছিলেন 'ইনসানিয়াৎ' নাটকের
প্রথম দৃশ্যে এবং শব্দমাত্র নিজ হিম্মতের পিঠে সওয়ার
হয়ে পঞ্চমাস্কের শেষদৃশ্যে দেখা গেল নায়ক তামাম্
হিন্দুস্থানের তক্ত-ই-সুলেমানে আসীন! বাবুরের
জীব-এ তবু একজোড়া অচল আখুঁতি ছিল—তার
খানদানী বংশ পরিচয়, পিতৃকুলে তৈমুর ও মাতৃকুলে
চৌগস্—ফরিদের তাও ছিল না। বিলকুল নাগ্যা
ফকির! বরং বলব, ফরিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সাদৃশ্য
পরবর্তী জমানার মহারাজ কুর্জাতলক শিবাজীর।
দু-জনেই বাল্যে, কৈশোরে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন মায়ের
কাছে—যে মা তাদের বাপের কাছে উপেক্ষিত। অব-
হেলিতা, প্রায়-পরিভ্রাণ্ডা!

ফরিদের মায়ের অপরাধটা অবশ্য গুরুতর : তার
যৌবন চলে গেছে। সাসারামের জায়গীরদার তার
প্রধানা বেগম সিরিফার* পরিবর্তে যৌবনবতী দাসীপত্নী
কানিজার আচলধরা। বড়চাসা-জওয়ানী-জরু!

সংসারে নিত্য ত্রিশ দিন ঝাট-ঝাটেরা লেগেই
আছে। জায়গীরদারের দৌলৎনার একান্তে এক
অল্প কুটুর্নিষ্ঠ দিন গুজরান করে ফরিদ-জননী বড়ি-
বেগম; আর পাঁচ-বাঁদী-পরিব্রতা যৌবনবতী কানিজার
বিলাস-বাসনের আদি-অন্ত নেই। শেষমেশ মনের ক্ষেদে
ফরিদ একদিন গৃহত্যাগ করল। হাসান পুত্রকে ছেঁকে
বললে, সেই যাচ্ছই যখন, তখন তোমার ঐ আত্মজ্ঞান-
টাকেও সঙ্গে নিয়ে যাও না বাপু!

অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি বাপের মূখের উপর ফেলে উনিশ
বছরের ছাওয়াল বললে, তাই যাব। ঠুঁ মাথা গুজবার
মতো একটা গরীবখানার এন্তেজাম করতে পারলেই
এ দোজখ থেকে আত্মজ্ঞানকে উঠিয়ে নিয়ে যাব।

শুনে হাসান ভূঁড়ি-দুলিয়ে হাসল। ব্যাপস্বরে যে
ফাসী* বয়েগটা ঝড়ল তার বিশুদ্ধ কপালবাদ :
'থাকল পরান সয়ে/ভাস্করমাসে ভাত দেব তোর কিলের
ঝোল দিয়ে।'

ফরিদ নিরঙ্কর ছিল না জালালউদ্দীন আকবরের
মতো। আরবী জানতো, ফাসীতে তো সে আলিম।
গদলিম্তা, বদস্তা এবং সিকান্দার-নামাহ্ তার আদ্যস্ত
কণ্ঠস্থ^২। তবু প্রথম কিছুদিন তাকে রীতিমতো
মাথা খুঁড়ে মরতে হয়েছে রোজগারের ধান্দায়। কারিক
শ্রম করেছে, মাটি কুপিয়েছে, এমন কি মাঝে কিছুদিন
দস্যবস্তি^৩। শেষ পর্যন্ত বিহারের সুলতান বাহার
খাঁ লোহানীর কিল্লায় নোক্‌রি জুটল। বাহার খাঁ
তার নাবালক পুত্র জালাল খাঁর জন্য ওকে 'আতালিখ্'
নিযুক্ত করলেন। এই গৃহশিক্ষকতার কালেই ফরিদকে
একবার একটি 'নাহর' আক্রমণ করে এবং ফরিদ তলো-
য়ারের এক কোপে ব্যাঘ্রপ্রবর্তিকে বধ করেন। বিহার
অধিপতি লোহানী তার পুত্রের গৃহশিক্ষককে ঐ
খেতাবটি দিয়েছিলেন : শের খান্।

কিন্তু বৌশিদিন এ নোক্‌রি শের খাঁর কিস্মতে
বরদাস্ত্ হল না। কে কান-ভাস্তানি দিল এ-নিয়ে
ঐতিহাসিকেরা একমত নন—হাসানও হতে পারে।
মোটেকথা, নোক্‌রিতে ইস্তাফা দিয়ে শের খাঁ আবার
নামল পথে। এই সময় সে কিছুদিন বাবুর-বাদশাহ-র
ফৌজেও চাকরি করে।

এর পরেই আশ্চর্য ফুড়ে কিস্মতী-হরী নেমে
এল শেরের হাতে ধরা দিতে। কাশীর কাছে চুনায়
কিল্লার অধিপতি তাজ খাঁকে তারই বদকপুত্র ইত্যা

* ইতিহাস হাডড়ে ফরিদের গর্ভধারিণীর নাম খুঁজে পাইনি।
কাহিনীর খাঁজের 'সিরিকা' ও 'কানিজা' নাম দু'টি চরন
করেছি। 'সিরিকা' মানে সংবৎসরাতা, 'কানিজা' তার বিপরী-
ভাষ্যবোধক।

করে বসল। সন্ধ্যাবেলা লাদ-মালিকা তার এক বিশ্বস্ত অনুচরকে পাঠিয়ে দিল শের খাঁর কাছে সপত্নীপুত্রের হাত থেকে তাকে রক্ষা করার আর্জি সমেত। শের সৈন্য চুনারে উপস্থিত হয়ে উদ্ধার করলেন লাদ-মালিকাকে। কৃতজ্ঞ মেয়েটি উদ্ধারকারীর হাতে কিল্লাসমেত তুলে দিলেন কিল্লাদারগণকে!

নিকা সেয়ে মধুবামিনী-অন্তে শের ফিরে এসে আসারামে। এতদিনে মায়ের জন্য সে একটা মাথা গোঁজার আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে পেরেছে। আসারামের সেই সৈন্য জায়গীরদারের চোখে-চোখ-রেখে সমান মেকদারে বাৎসরিক করার হুকুম হইয়াছে চুনার কিল্লার কিল্লাদার।

পত্রকে দেখে তাম্জব বনে গেল আসারামের জায়গীরদার মিঞা হাসান। বললে, ক্যা-বাং? এ্যাশ্বিন পরে কী মনে করে?

ফরিদ চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। এ দরবার কক্ষের প্রতিটি প্রস্তরখণ্ড তার বালাস্মৃতি বিজরিত। আশ্বাজান রীতিমতো বড়ো বনে গেছেন এই ক-বছরে। মেজাজ কিন্তু ঠিক সেই রকমই বে-সরিক। ফরিদ বললে, আশ্বাজানকে নিয়ে যেতে এসেছি; তাঁকে ডেকে দিন।

ছিলে-খোলা ধনুকের মতো হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে পড়ে হাসান। বললে, আশ্বা! তোর আশ্বা! তাকে এ্যাশ্বিনে মনে পড়েছে বাকি? নিয়ে যাবি? আর!

এগিয়ে এসে খপ্পু করে চেপে ধরল জোয়ান ছেলের হাত। হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেল অন্দরে—হাফেজের দিকে। সিঁড়ির নিচে সেই অতি পরিচিত মায়ের অশ্রুচুর্ণিত নয় কিন্তু—হারামসারার একান্তে এনে একটা শিউলি গাছের দিকে তর্জনী তুলে বললে, ঐ তোর আশ্বাজান! যা, নিয়ে যা এবার!

এতক্ষণে নজর হল—শিউলি গাছটার নিচে একটা চৌকো পাথর। তার উপর একরাশ শিউলিফুল করে পড়েছে।

অন্তরের অন্তঃস্থলে তার-সানাইয়ের একটা কক্ষার! কাহিরে তার কোনো বহিঃপ্রকাশ হল না কিন্তু। দীর্ঘ দিনে নিচেকার ঠোঁটটা কামড়ে বজ্র-হাতের মতো দাঁড়িয়ে রইল ফরিদ। এতক্ষণ অন্তঃ-পুঙ্খকার দল ভাড় করে এসেছে রঙ্গ দেখতে। ওড়নার ফাঁক দিয়ে দেখছে ওদের বাপ-বেটাকে। ওদের অনেকেই ফরিদ চেনে না—সে পুহত্যাগ করার পরে ওরা এ-হাফেজের নয়া-আমদানী। বৃদ্ধ হাসানের নয়া-পুড়িয়া! তা সে-সব দিকে ফরিদের নজরই পড়ল

না...সে শব্দ তাম্জব বনে ভাবছিল: কী বে-সরম কী বাং! জায়গীরদারের বাড়ি-বেগমের কবরের উপর একটা আচ্ছাদনও দেওয়া যায়নি! রোদে জলে সমানে পুড়ছে, ডিঙছে...

—কই? উঠিয়ে নিয়ে যা!—বাগ্য করলে বাপ।

ছেলে মূখ তুলে তাকালো। বাপের চোখে-চোখ রেখে একই কথার পুনরাবৃত্তি করল: তাই যাব! ঠুর মাথা গুঁজবার মতো একটা মক্‌বারা বানিয়ে এ দোজখ থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাব।

এরপর রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে ফরিদ আকণ্ঠ নির্মল্জিত হয়ে পড়ে। তিল তিল করে সে সপ্তয় করতে থাকে ক্ষমতা ও ধনসম্পদ। মায়ের জন্য মক্‌বারা বানানোর কথা যে তার মনে ছিল না তা নয়, কিন্তু সময় ও সুযোগ হয়নি। সেটা হয়ে গেল নিতান্ত ঘটনাচক্রে। একজন স্বংবাদবহ চুনার কিল্লার একদিন শের খাঁকে শুনিয়ে গেল এক বিচিত্র কিস্সা—আসা-রামের জায়গীরদারের দরবারের একটি ঘটনা:

একদিন মিঞা হাসানের দরবারে এক বৃদ্ধ আফ-গান এসে হাজির। এক মাথা সফেদ চুল, এক বুক সফেদ দাড়ি। জায়গীরদারের মীর-মুনশী তাকে হুজুরে সান্নিধ্য করে বললে, ইনিই আসারামের জায়গীরদার: তোমার আর্জি হুজুরে পেশ কর, ভয় নেই।

লোকটা আত্মমি নত হয়ে এক খান্দানী সালাম ঝাড়ল। বিনয়ে বিগলিত হয়ে বললে, আদাব অর্জ, মেহেরবান! আমার একটি প্রশ্ন আছে খোদাবন্দ!

হাসান মোঁচে চাড়া দিয়ে বললে, বেশক! অভয় দিলাম। পেশ কর তোমার প্রশ্ন?

—সে আজ প্রায় দ-কুড়ি বছর আগেকার কথা। আপনি, হুজুর, তখন আপনার আশ্বাজান—তার শও সাল বেহেশত-বাস মঞ্জুর হোক—ইব্রাহিম মিঞার হাত ধরে আফগান রাজ্য থেকে হিন্দুস্থানে আসছিলেন। খাইবার পাস ঘেঁদিন আপনারা অতিক্রম করেন, তার পূর্বদিনের শাম-ওরস্ত-এর কথা আপনার মাদ্ হয় গরীবপরবর?

হাসান তাম্জব। বৃদ্ধকে একবার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললে, কেন বলতো হে?

—সেদিন আপনার সরিফ আশ্বাজান—তাঁর হাজার বরিষ বেহেশত-বাস মঞ্জুর হোক—এই বাগ্দাকে ফরমায়েশ করেছিলেন, হুকুমজারী করেছিলেন—তিনি যদি কোনোদিন হিন্দুস্থানে জায়গীরদার হতে পারেন, তাহলে আমি তাঁর দরবারে এস্তালা দেব। তিনি আমাকে দিয়ে তাঁর মক্‌বারা বানাবেন। আপ-

নার টেংরির গদা, বাগদা-কী-বাগদা এ নফরের নাম, আলিওয়াল খান।

হাসান দীর্ঘসময় নিমীলিত নেড়ে তার কর্ণকুহরে একটি পাখির পালক প্রবিষ্ট করাতে ব্যাপ্ত রইল। আলিওয়াল খৈয় হারালো না—দু-কুড়ি বছরের তুলনায় হাসানের নীরবতা দীর্ঘস্থায়ী নয়, সে অপেক্ষা করল। অবশেষে সোজা হয়ে বসে হাসান বসল, আমার আশ্বাজান কোথায় ফৌত হয়েছেন তা আমি জানি না। আর তা-ছাড়া আমার অত পরসোও নেই যে, সখ করে তাঁর জন্য মক্কারা বানাবো। তুমি এখন আসতে পার।

এবার লোকটাই দীর্ঘসময় একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল হাসানের দিকে। বেচারী বোধকরি অনেক আশা নিয়ে দিল্লী থেকে এতটা পথ হাঁটিতে হাঁটিতে এসেছে। তাই হঠাৎ একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসল : মাফ করবেন, আপনি পাঠান তো?

সরল প্রশ্ন। হয়তো সরল নয়। কিন্তু সেজন্য সাসারামের জায়গীরদারের দরবারে তার যে শাস্তির বিধান হয়েছিল, সেটাও লঘুপাপে গুরুদণ্ড!

—এই কিস্‌সাই চুনার দুর্গে এসে সবিম্বতাবে শোনালো সংবাদবহ, হাসান পদক্ষেপে। কথাটা শুনে ল্যাফিয়ে উঠল শের। কললে, উস্তাদ আলিওয়াল খান? সেই যে রাজমিস্ত্রি দিল্লীর নিজামউদ্দীন আউলিয়া চক্রে—

হ্যাঁ, সেই লোকই বটে। তখনই পাইক ছুটল লোকটাকে পাকড়াও করতে। চুনার থেকে সাসারাম অশ্বারোহীর কাছে একদিনের পথ। পাইককে বলা হয়েছিল মিস্ত্রিকে ধরে আনতে, সে বেঁধে নিয়ে এল বৃদ্ধ রাজমিস্ত্রিকে। নিজের বৃদ্ধিমতো! শের খাঁর আশ্বাজানকে কমবস্তো জিজ্ঞাসা করেছে, তিনি পাঠান কিনা! এবার জেনে যাক তার জবাব!

এল মান্দুঘটা। বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে। শের খাঁকে কুর্নিশ করে কললে, হুজুর তলব করেছেন?

কিল্লাদার আসন ত্যাগ করে এগিয়ে এল। বৃদ্ধের বলিরেখাঙ্কিত হাতদুটি ধরে কললে, তুমিই উস্তাদ আলিওয়াল খান? হজরৎ নিজামউদ্দীন আউলিয়ার দরগায়—

লোকটা আবার আভূমি নত হয়ে আদাব জানানো। কললে, হুজুর তাহলে দেখেছেন আমার হাতের কাজ?

—না উস্তাদ, দেখিনি। এ জিম্মেসীতে আমি কখনও দিল্লী ঘাইনি। বাবার ইচ্ছে আছে। গেলে, তোমার হাতের কাজ নিশ্চয়ই খুঁটিয়ে দেখব। কিন্তু তোমার নাম আমি শুনেছি। আমার বড়-আশ্বা

তোমাকে যে ফরমায়েশ করেছিলেন সেই কাজটা মূল-তুর্বি আছে। সৌকিন, মূল-কিল-ক-বাং এই যে, তিনি যে নিজেকে কোথায় কুরবানি করেছেন তা আমার কেউ জানি না। বল-কি, আমার আশ্বাজান কোথায় শূয়ে আছেন তা আমি জানি। তুমি আমার মনের জন্যে একটা উপবৃত্ত মক্কারা বানিয়ে দেবে? ঐ সাসারামেই? তৎকার জন্য পরোয়া নেই।

ভৃতীয়বার কুর্নিশ করে আলিওয়াল সজেক্ষে শূদ্ধ কললে, বে-ফিকর রাহিরে জনাব!

আলিওয়াল শূদ্ধ করল শের খাঁর মায়ের মক্কারা। শের তখন ছুটেছে সোড় জয় করতে। তালিয়ারগাড়ির (আধুনিক সাহেবসজ্জা) প্রচলিত পথে নয়; শের জানে—সে-পথে শূদ্ধপক ওর অস্ত্রশস্ত্রের জন্য প্রস্তুত। বরং এক ঘুর পথে। সেই অতর্কিত অস্ত্র-মণে বিশ্বস্ত হয়ে গেল সোড়খিগতি মাহমুদশাহ-র বাহিনী। বহু উপটোকন দিয়ে মাহমুদ শেরের বশ্যতা স্বীকার করে নিল।

গোড়-বিজয় ক্ষত করে বহু ধন-দৌলত হাতীর পিঠে চাপিয়ে শের সগোব্ব ফিরে এল সাসারামে। এসে সংবাদ পেল, ইতোমধ্যে আলিওয়াল সমান্ত করেছে তার মায়ের মক্কারা। ঐ সঙ্গে পেল আর একটি দুঃসংবাদ—সাসারামের জায়গীরদার, মিস্ত্রি হাসান, নাকি এ-কয়মাস ক্রমাগত তড়পাচ্ছে—দেখব সে চুহাকা-বাচ্চা কত বড় শের খাঁ! আমার ফিজলার ভিতর থেকে আমার বিবির কফিন সে উঠিয়ে নিয়ে যাবে! জান্ থাকতে নয়!

দুঃসংবাদে বে-দিল হল না শের। কললে—হাসান-হুসেনের সে লড়াই-কাজিয়ার কথা পরে হবে। আপাতত চল আলিওয়াল—দেখি, তুমি কেমন মক্কারা বানিয়েছ।

দেখে মুগ্ধ হল শের। লোদী-সৈয়দী শৈলীতে বানানো অষ্টভুজাকৃতি ইমারৎ। অগ্ৰ-ওস্তাদের হাতে এলেমদারী কাজ। কললে, একটা কক্ষ আলি-ওয়াল, ছাড়াটা একটু বেশি বড় হয়ে গেছে না?

সজেক্ষ দাড়িতে হাত বুলিয়ে বৃদ্ধ স্থপতি কললে, জী হাঁ হুজুর। বে-হুসিয়ারী পলং নয়, ওটা ইচ্ছে করেই বড় করেছি। বেগম-সাহেবা আজ ক'বছর সাসারামের রোদে কলসেছেন! কেনো ছাউনি ছিল না তো! তাই রোশনাই আর ঠাণ্ড বরদাস্ত হবে না।

—বেশক! কথাটা আমার মনে ছিল না। হ্যাঁ ঠিক কথা! মক্কারা বানতে বড় দেবী করে ফেলেছি। কিন্তু সন্দোখ তুমি একটা বানিয়েছ কেন? পাশ্চ-

পাশি দুটো হবার কথা যে!

তৎক্ষণাৎ সম্মুখে নিল উদ্গাদ। কললে, সরিফ
স্বাং, খোদাবন্দ! ওটা এ বান্দারই গল্প! ও-কথাটা
আবার আমার হাদ ছিল না। খায়ের, বাস্তব হবেন
না, এখনই শব্দে দিচ্ছি।

শের এদিকে খলিফা। যাপের কাছ সে আদৌ
গেল না দরবার করতে। বরং ধরে পড়ল সাসারাম
জাম-ই-মসজিদের বড়া-ইমাম সা'কে। অশীতিপর
বংশ বড়া-ইমাম নিজেই পাকড়াও করে নিয়ে এলেন
মিঞা হাসানকে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাসানকে আসতে
হল—কব্র সাসারাম শহরের চৌহদ্দীতে সে নবাব,
কিন্তু শরিরতী শাসনে বড়া-ইমাম সাব-এর প্রজা। এল,
অবে স্নেহ এক কড়ারে—বিজ্ঞানের কফিন সে ঠাই-
কল হতে দেবে না কিছতেই।

বড়া-ইমাম মিঞা হাসানকে সঙ্গে নিয়ে মক্কারাটা
ঘুরে ঘুরে দেখালেন। মোটা সাসারামে এমন ইমারৎ
একখানাও নেই! শের খাঁ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল স্মার-
প্রান্তে। মূখে তার রা নেই। সব দেখে ভাল খতম
করে মিঞা হাসান একটা জবর প্রশ্ন পেশ করল বড়া-
ইমামকে : একটা কথা মালুম হল না। সন্দোখ দুটো
কেন?

বড়া-ইমাম ঠা ঠা করে হাসল। বাড়ি চুমড়ালো,
ডসবি স্কোরালো, চোখ গির্টাপট করল, কিন্তু জবাব
দিল না।

হাসান বিরক্ত হয়ে কললে, কি হল? জবাব
দিচ্ছেন না যে বড়? সন্দোখ দু-দুটো কেন? ও
চুহা-ক-সাজটার একটাই তো আশ্মা?

বড়া-ইমাম এতক্ষণে জবাব দিল—এটা নেহাৎ
বে-অকুফের মতো কথা কলছ মিঞা হাসান! কী জবাব
দেব? উপবৃত্ত ছাওয়ার কখনো শব্দ মায়ের মক্কারা
কনর? বাপকে কাদ দিয়ে? তুমি দেখে নিও জায়-
গিরদার, তোমার এই ফরিস একদিন তোমার হিন্দু-
স্বানের তত্ত্ব-তোসে করবে। তখন কাঁহা-কাঁহা
হলুক থেকে সন্দেহজন ভীড় করে দেখতে আসবে—
শাহ-রেন-শাহ শেরশাহ শরের আশ্মাজানের মক্-
কর! কিছ বজল?

হাসান তখন না-সান; কিলকুল—হাঁ!

হঠাৎ পড়ের দিকে ফিরে হৃৎকর দিয়ে ওঠে, এ্যাই
বে-অকুফ! বড়া-ইমাম সাব বা কলছেন তা হক-স্বং?
ঐ বাঁদিকের সন্দোখটা তোমার কপের?

শের আশ্মাজানের দিকে ফিরে স্বপ্নভঙ্গি করে,
বড়া-ইমাম সাব তোমার জিন্দগীতে বে-হক স্বং কখনও
কলছেন? তবে বাঁদিকেরটা নয়, ওটা মায়ের। জন-

দিকেরটা আমার আশ্মাজানের।

হাসান এক গাল হেসে বলে, বাস! তা হলে
হাসান-হুসেনের কাজিয়া খতম! তুইই ফতে করে-
ছিস। আর বাবদর! বাপ-বেটায় ধরাধরি করে তোর
আশ্মাজানের কফিনটা বহে নিয়ে আসি।

শের তার বাপের হাটু দুটো ছুয়ে কললে,
গোস্তাকি যদি কিছ করে থাকি, তওবা মকুব করে
দাও। আশ্মাজান! কাঁধ দিতে হবে না তোমাকে,
তুমি স্নেহ হুকুম দাও! মায়ের কফিন একাই বহে
নিয়ে আসার হিম্মৎ রাখে তোমার এই অযোগ্য বাবদা।
হাসান ওর পিঠে একটা বিরশি-সিজ্জা থাম্পাড়
মেরে কললে, তা তুই পারিস! চুহা-কা-বাচ্চা হলে কি
হয়, তুই নিজে যে শের।

শের খাঁ যে কালবৈশাখী মেঘের মতো ঈশান-
কোণে দিন দিন স্তম্ভীত হচ্ছে এটা মালুম হতে দেবী
হল না হিন্দুস্থানের তদানীন্তন মালিক বাবদর-তনয়
হুমায়ূনের। নিটে-গাছটি মূড়িয়ে দেওয়া চাই।
হুমায়ূন মিল্লী থেকে বাদশাহী ফোজ নিয়ে এসে
অকরোখ করল চুনার কিল্লা। কিন্তু শের আঁত
খলিফা—এ আশঙ্কা তার ছিলই। তাই স্ত্রী-পুত্রদের
আগেই স্থানান্তরিত করেছে, অনেক দিনের রসদ
মজুত রেখেছে। আর কিল্লা-রক্ষার দায়-দায়িত্ব
একজন বিশ্বস্ত সিপাহসালারকে সমঝিরে দিয়ে নিজে
থেকেছে দুর্গের বাইরে। ঐতিহাসিকেরা কলছেন,
এখানেই হুমায়ূনের দাবার চাল এড়িয়ে গিয়েছিল
শের—ঘোড়ার আড়াই-পায়ের ডিঙি-মারা চালে। চুনার
কিল্লা অবরোধ করে যে কয় মাস হুমায়ূন শক্তি-
কর করলেন, সেই কয় মাস দুর্গের বাহিরে অবস্থিত
শের খাঁ ক্রমাগত শক্তি বৃদ্ধি করে গেল।

সেই বছরই সাহাবাদ পরগণায় অনাবৃষ্টিজনিত
দারুণ দর্ভিক হয়। বিচক্ষণ প্রশাসক শের খাঁ সেই
বংশ স্বপ্নাতিবদকে ডেকে কললেন, আলিওয়াল, এবার
আমার নিজের জন্য একটা মক্কারা বানাও। শব্দ
ইমারৎ নয়, তৈরী করতে হবে প্রকাণ্ড এক তালাও—
তার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে ঐ মক্কারা, স্বাীপের
মতো। দেখলে মনে হবে—নিজ প্রতিবিশ্বের দিকে
তাকিয়ে নিশ্চুপ ধ্যান করছে : নার্গিস্!

—নার্গিস্, হুজুর?

হ্যাঁ, নার্গিস্। তুমি দেখেছ সে ফুল?

মাথা চুলকে আলিওয়াল কললে, হয় তো দেখেছি
খোদাবন্দ। ওয়ার্না কেউ পহঁচানিয়ে দেয়নি।

শের কললেন, ম্যাসিডোনিয়ার দিশ্বজয়ী শাহ-

শেরশাহ্ সেকেন্দারশাহ্-র নাম শুনেন?

আলিওয়াল এবার স্পষ্টই মাথা নাড়ে। নামটা তার অজানা।

—তাদের দেশে একটি সুন্দর উপকথা আছে—
নাগিস ফুল নিজের মহিম্বতে বাওরা! দরিয়া-কিনারে
ফোটে সেই ফুল—নারিস্‌শাস্, দুনিয়াকে সে চেনে না,
তার পার শব্দ প্রতিবিশ্বের প্রতি। পারবে?

আলিওয়াল তাক্সব বনল জঙ্গী জওয়ানের এ
জাতীয় কাব্যোচ্ছ্বাসে। শব্দ বলল, পারব হুজুরালী।

ফিরে যাবার জন্য পা বাড়াতেই শের তাকে ফিরে
ডাকলেন। বললেন, শোন আলিওয়াল, ভিতরের
কথাটা খুলে বলি! কাব্য নয়, নিতান্ত কেজো ভূমিকা
এই মক্কারার পরিকল্পনায়। প্রকাণ্ড তালো যদি
বানাও তাহলে একসঙ্গে দু-পাঁচ হাজার মেহনতি
মানুষ ওখানে কাজ করতে পারবে, ঘেঁষাঘেঁষি হবে
না। দিঘীর চারপাশ ঘিরে বানাও অস্থায়ী ছাপবা।
ওখানেই এসে আশ্রয় নেবে পাঁচ-গায়ের ভূখা-মানুষ—
জরু, গরু, বালবাচ্চা নিয়ে। কাটিয়ে দেবে গোটা
বছরটা—সেই পরের বছর ইস্তক, ষতদিন-না গোদা-
তালো এদের দুঃখে আশমান ভেঙে অকোথারার
কাঁদবেন! দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ইনসানিয়াদের জন্য আমি
রাজ-শাসাভান্ডার খুলে দেব—লোকিন, হুদুশ্বাস
ভূখ্ যেন মানুষকে ভিখ্ মাঙতে না শেখায়! পাসিনার
বিনিময়ে মেহনতি মানুষকে ক্ষুধার আগ্নেয় জ্বালি।
বুঝলে?

সম্রাট আলিওয়ালের চোখ দুটি সজল হয়ে উঠে-
ছিল। আভূমি নত হয়ে সে কুনিশ করেছিল শব্দ।

এর পরই বস্তার শব্দ। মৃগল-পাঠানের বৈরধ-
সময়। এ-শব্দে চূড়ান্ত হার হল হুজুরালের। তিনি
শেষবারের মতো ভাইদের কাছে দূত পাঠালেন সাহায্য
চেষ্টে। তিন প্রাদেশিক শাসনকর্তা যথারীতি শব্দ ফিরিয়ে
রইলেন। মৃগেরের কাছাকাছি শেরের হাতে বিশ্বস্ত
হয়ে গেল তাঁর বাহিনী। অধিকাংশ সৈন্যের সজিল
সমাধি হল গঙ্গা পার হতে গিয়ে। হুজুরাল এক
অখ্যাত ভিস্তিওয়ালার অনুগ্রহে তার ভিস্তি আঁকড়ে
গঙ্গা পার হয়ে পালালেন। এই প্রসঙ্গে প্রামাণিক
ইতিহাসের একটি অনুচ্ছেদ অনুবাদ করে শোনাই।
তাতে শেরশাহ্-র চরিত্রে কিছুটা আলোকপাত হবে।*

“ঐতিহাসিক এম্বিকনের অনুমান হুজুরালের
আট হাজার সৈন্য হত হয় : অর্ধেক প্রত্যক্ষ শব্দে,
অর্ধেক গঙ্গা গর্ভে। হুজুরালের হারেমের প্রতি শের
খাঁর ব্যবহার এই পর্যায়ে শেখোস্তের চরিত্রে একটি
অপূর্ব আলোকপাত করে। শব্দে হার হয়েছে কেনে

যখন হুজুরালের বাহিনী* অন্যান্য বাহিন্যদের নিয়ে
পদার বাহিরে বোয়রে এলেন, তখন শের খাঁ সম্মুখের
অবস্থাপ্ত থেকে অবরোধ করে তাঁদের সম্রাট অভি-
বাদন করেন। তৎক্ষণে তাঁর নকীবকে ছেকে ফেলা
করতে আদেশ করলেন—কোনো অকপান কেন হুজুরাল
মহিলাবৃন্দের প্রতি কোনরকম অসম্মানসূচক আচরণ
না করে। করলে, তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে।
শের খাঁর এমনই দাপট ছিল যে, বিজিতের হারেম
বিজয়ীদের লুণ্ঠের সম্পদরূপে চিহ্নিত হওয়ার চিন্তা-
চরিত প্রথা সবুও এক্ষেত্রে কোনো অকপান সহ্য
করেনি বান্দনীদের গাঠস্পর্শ করতে। সম্রাট পূর্বেই
ঐ হতভাগ্য মহিলাবৃন্দকে শের খাঁর হারমে পেঁপেই
দেওয়া হল, এবং যথোপযুক্ত পান-হারের আয়োজন
করা হল।”

এই প্রসঙ্গে আরও স্মরণ : এই ঘটনার কঠিন
বছর পরে আকবর-মদশাহ্ একটি বৃন্দমহী করছেন
জারী করেন। পরাজিত শব্দদের স্ত্রী-কন্যাদের উপর
কোনো মৃগলসৈন্য কোনো রকম অত্যাচার করলে তার
কঠিন শাস্তি হবে। যেকোনো ইতিহাসের হস্তক্ষেপ করে
লাগতে পারে—শের ও আকবরের চরিত্রের তুলনামূলক
সমালোচনার সময়। শব্দদের হারেরও কয়েক
লাগতে পারে—শের ও আকবরের শব্দদের একটা
আম্ভর্ষ পোরুষের ব্যঙ্গনা আছে : সেই ইমরুদ্দুলি
যেন সোজায়ে ঘোষণা করতে চান, তাদের জন্য ঐ
জাতের কপদবস্ত্র-পরাজিত সৈন্যদের স্ত্রী-
কন্যাদের উপর পার্শ্বিক অত্যাচারে সাক্ষি হতে
পারে না।

বৃন্দমহীতে বিজয়ী শের ফিরে এলেন মাসারামে।
দেখলেন, সম্রাটসম্মত নিজের সম্মতিসোধ। স্তম্ভিত
হয়ে গেলেন। বললেন, আলিওয়াল! তুমি কাম্বল
করছে! যে মক্কারা তুমি ফিরিয়ে আ তামম হিন্দু-
স্থানে অভূতপূর্ব! বল, কী ইনাম চাও?

আলিওয়াল ডিনম্বর কুনিশ করে বললে, শেখ-
বন্দ যে শব্দ হয়েছেন, এই তো আমার ইনাম!

—শোন আলিওয়াল! আমি কিয়ী চলেছি;
হরতো তামাম হিন্দুস্থানের ওস্ত-ই-মুলুমমেন অসম্মান
হব। তাহলে কিয়ীতে অনেক, অনেক, অনেক ইমরু
বানাবো আমি! যে কাজে কেউ কেনাফিন হাত দিতে
সাহস পায়নি, আলিউদ্দীন খিলজির সেই অবস্থাপ্ত

* আবুল ফজলের মতে (আকবরনামা Part I, P. 343)
এই বাহিনী হুজুরাল হাজার বোয়র; অকবর-মদশাহ্ মতে
তিনি বোয়র বোয়র। স্মরণ, হুজুরাল তখনও আকবর-
জননীকে বিবাহ করেননি।

‘আল্লাই মিনার’ গে’থে শেষ করব! আসবে তুমি আমার সঙ্গে?

আলিওয়াল নির্বাক।

—কী? কুব্ব মিনারকে ছাপিয়ে যাবার হিম্মৎ আছে তোমার?

যেন পোপ প্রশ্ন করছেন মিক্সেজেলোকে—
অসমাপ্ত সেন্ট পীটার গীর্জা শেষ করার হিম্মৎ আছে তোমার?

অশ্রুজলিত আলিওয়াল শূন্য বললে। পঁচাশ-
বরষ পহিলে এ পদ্যকার কেন দিলেন না শাহ-য়েন-
শাহ!

শাহ-য়েন-শাহ! এ সম্বোধন এখনও কেউ
করেনি বজ্রবৃষ্টি-বিজয়ী নগণ্য শের খাঁকে। আলি-
ওয়াল শিল্পী—শিল্পীরা না সমকালের চেয়ে দু-কদম
এগিয়ে গিয়ে ভবিষ্যৎকে দেখতে পার? বিচলিত
হলেন শের।

আলিওয়াল তখনও বলে চলেছে, আমার জমানা
খতম হয়েছে গরীবপরিবর! সাড়ে তিন কুড়ি বরষ
উন্নত হল আমার! এই সাসারামেই জিন্দেগির বাকি
কষ্ট দিন গুজরান করতে চাই!

শের বললেন, বেশ, তবে তাই হোক। তাহলে
এই সাসারামেই বানাও আর একটা মক্কারা—তোমার
পসন্দ মোতাবেক।

আলিওয়াল একটু অবাক হল। ইতস্তত করে
কললে, পিতামাতার মক্কারা বানিয়েছেন, জওয়ানী না
খোরাতেই নিজেরটা বানিয়েছেন ভূখা-মানুষদের মত-
চেয়ে। কিন্তু একর কার মক্কারা বানাবেন খোদা-
কদ্? শাহজাদারা যে নিতান্ত নাবালক।

শের হেসে কললেন, সে যে কে, তা তোমাকে
এখনই করতে পারছি না উস্তাদ। মক্কারা খতম কর,
তারপর কলব—তার মালিকানা কর।

কল্প হল আলিওয়াল। পনেরায় ইতস্তত করে
কলল, গোলটাকি মাফ করবেন জাহাপনা! আপনার
আত্মজানের মক্কারা বানিয়েছি; —দুর্ভাগ্য, উন্নত-
শির, জায়গীরদারের চরিত্র সে ইমারতে প্রতিফলিত।
আপনার মক্কারা আপনারই মতো ধরা-ছোঁয়ার
বাইরে—আত্মনিশ্চয়! আপনি নিজেই বলেছেন, সে
‘নার্গিস’। লোকিন অব...

হক বাং! শের খাঁর মালদাম হল শিল্পীর
সমস্যাটা। মক্কারা তার স্থাপত্য-বৈচিত্র্যের ভিতর
দিগে উৎসর্গীত-প্রদর্শনের স্বাক্ষর রাখতে চায়। কার
সম্মানসোধ বানতে হবে না জানসে ওর ধ্যানের
দৃষ্টিতে কেমন করে ধরা দেবে সে ইমারৎ? শের

বললেন. কাছে এস আলিওয়াল—তোমার কানে কানে
কলব।

সভয়ে এগিয়ে এল বৃষ্টি শিল্পী। শের অনুচ্চ-
কণ্ঠে বললেন, হুঁশিয়ার! তার কথা কেউ জানে না।
মায় বেগম সাহেবা পর্যন্ত নন! তার নামটা তোমাকে
এখনই বলতে পারছি না, তবে এইটুকু জেনে রাখ :
সে আমার দিল্কা কলিজা! যার জন্য বলতে পারি :

অগ্নি আন তুর্ক-ই সিরাজী

বদস্ত আদ দিল-ই-মারা।

ব-খাল-ই হিন্দো ওশ বখশম

সমরখন্দ-ওরা-বুখারারা ॥*

বজ্রাহত হয়ে গেল বৃষ্টি ওস্তাদ। একী কথা!
শের খাঁর জীবনে যে এমন একটি অনদ্ঘাটিত অধ্যায়
আছে—তিনি যে এমন এক সুন্দরী সাকীর মহিম্বতে
দিওয়ানা তা তো কাক-পক্ষীতেও কখনও আন্দাজ
করেনি।

ইতিহাস এগিয়ে চলেছে।

হুমায়ুন তখন গাঙ্গেয় উপত্যকা পার হয়ে, সিন্ধু
পার হয়ে, খাইবার পাস দিয়ে কাবুলের পথে পালা-
চ্ছেন, যেন তাঁকে বাঘে তাড়া করেছে! তাঁর হারেম
পড়ে আছে শের খাঁর হেপাজতে। আর সাহাবাদ
জেলার সেই নগণ্য জায়গীরদার চলেছেন দিল্লীর পথে।
এলাহাবাদ, জোনপুর, অপরূপা আগ্রা, লা-জবাব
দেহলি! অবশেষে তামাম হিন্দুস্থানের তক্ত-তোস!
অপ্রতিরোধ্য শের খাঁর শেষ সাফল্য!

না, ভুল বললাম! শেরের শেষ সাফল্য সেটাই নয়,
সেই তো সবে শূর! দিল্লীর তক্ত-ই-সুন্নেমানে তো
বসেছেন কত শত বাদশাহ—যুগে যুগে, শতাব্দীর পর
শতাব্দী ধরে। শের তো সে শতনরীর অন্যতম মনুজা-
দানাটি নন—তিনি তার মধ্যমাণ : কৌন্তুভ!

মাত্র পাঁচ বছর দিল্লীশ্বর ছিলেন এই আশ্চর্য
সুলতান : শেরশাহ শূর। তুলনায় আকবর ছিলেন
49 বছর, শাহজাহা 31 বছর, আলমগীর 49 বছর।
অথচ এই পাঁচ বছরে শেরশাহ যে স্থাপত্যকীর্তি
ও পুরাকীর্তি রেখে গেছেন তা শূর বিন্ময়কর নয়,
তা ঐশ্বর্যজালিক! পুরানা কিল্লার অসংখ্য ইমারৎ,
বিশেষ করে তার অভ্যন্তরস্থ কিল্লা-ই-খুন্হা
মসজিদ। পঞ্জাবে ঝিলাম নদীর তীরে রোহতাস

* তুর্কী-সেরের সুন্দরী সে আমার সাকী সিরাজী

যাতার লাগি বাঙরা হল হাজার দাগী কাজী,

যার কপোলের প্রমর-কালো তিল-এর তরে বান্দা

সমরখন্দ আর বুখারারাও বিকিরে দিতে খুব রাজী ॥

(হাফিজ)

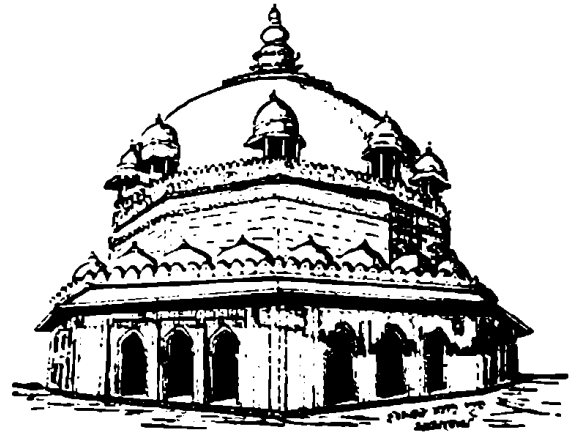
দুর্গ। আর সবার উপরে—না, অসমাপ্ত আলাই মিনার শেষ করেননি, তবে তার চেয়েও বড় কীর্তি গড়ে গেছেন। তিন পুরুষ ধরে গড়া কুৎব মিনারের চেয়েও বড় মিনার বানাবার স্পর্ধায় ঐ একই চত্রে বৃহত্তর মিনার বানাবার স্বপ্ন দেখেছিলেন সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী। একতলার বেশি তা গাঁথা যায়নি। রাবণের অসমাপ্ত সিঁড়ির মতো হাড়-পাঁজরা বার করে সে পড়ে আছে কয়েক শতাব্দী। প্রথম যৌবনের দারোঁ সেটাকেই গেঁথে তুলবার স্বপ্ন দেখেছিলেন শের খাঁ। কিন্তু তত্ত্ব-তোসে আসীন হয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিটাই গেল বদলে। তাই গড়ে তুললেন অপর একটি স্থাপত্যকীর্তি, যা কুৎব কেন, আলাই মিনারের দৃঃস্বপ্নকেও পিছনে ফেলে গেছে : সোনার গাঁও থেকে লাহোর পর্যন্ত বিস্তৃত বাদশাহী সড়ক—গ্র্যান্ড-ট্রাঙ্ক-রোড। প্রতি পাঁচ-দশ কিলোমিটার অন্তর তৈরী করালেন আশ্রয়ের জন্য সরাইখানা, পানীয়ের জন্য কূপ-তলাও-বাওলী, উপাসনার জন্য মসজিদ। মাঝে মাঝে নিঃসঙ্গ মিনার—‘অবজারভেশন টাওয়ার’। আর দ্রুতগামী অশ্বারোহীর মারফতে ঘোড়ার ‘ডাক’। তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবধানে আস্তাবল, অশ্বের আহাৰ্য, বদলী ডাকবাহী, ডাকঘর। সব কিছুর শুরুর ও শেষ মাত্র পাঁচ বছরে!

শেরশাহের স্থাপত্যকীর্তি ত্রিধারায়। ভৌগোলিক বিচারে। প্রথমতঃ, সাসারামে গড়টিতনেক মক্‌বারা, যার প্রধানতম হচ্ছে তাঁর নিজের সমাধিসৌধ। দ্বিতীয়তঃ, রাজধানী দিল্লীতে পুরানা কিল্লার অভ্যন্তরে অনেকগুণি ইমারৎ, যার সামান্যই আজও টিকে আছে। তৃতীয়তঃ, বঙ্গাল-মূলক থেকে পঞ্জাব-তক্‌ শাহী-সড়ক-এর ধারে ধারে গণনাতে স্থাপত্য-কীর্তি—যেখানে স্থাপত্যকে ছাপিয়ে উঠেছে প্রয়োজনের তাগিদ।

সাসারাম পর্যায়ে যাবতীয় কীর্তির মূল নিয়ামক সেই বিশ্রুতকীর্তি স্থপতি : আলিওয়াল খান। সে তিনটি ইমারতের মূল ছন্দ একটি সমবাহুর অষ্টভুজ। ইতিপূর্বেই আমরা দেখেছি—এই প্ল্যানিং একটি দীর্ঘ-ঘরানার বিবর্তনধারায় পুষ্ট। জেরুসালেমের ‘কুবৎ-এস সাক্‌কারাই’ (ডোম-অব-দ্য রক) আছে তার উৎসমূলে। হিন্দুস্থানে সেই প্ল্যানিং-এর প্রথম প্রয়োগ খান-ই-জাহান ডিলাগানীর মক্‌বারায় (1370)। তারপর মুবারকশাহ সৈয়দ (1434), মুহম্মদশাহ সৈয়দ (1444), এবং সিকান্দার লোদী (1517) অতিক্রম করে আমরা উপনীত হই সাসারাম পর্যায়ে।

অষ্টভুজাকৃতি ইমারতের এই ধারাবাহিকতার ইতিহাসে আলিওয়াল খান একটি সোপান মাত্র। আমরা দেখেছি, সেই সোপান অতিক্রম করে এ চিন্তা কীভাবে উপনীত হয়েছে দশা খাঁ, আধম খাঁ, এমন কি জোব চার্ণকের সমাধিসৌধে। আলিওয়ালের প্রথম কীর্তি—হাসান মিনার কবর হয় তো একটি কড় জাতের সোপান : ল্যান্ডিং। কিন্তু তাঁর পরবর্তী কীর্তিটি ‘ল্যান্ডিং’ নয়, ‘ল্যান্ডমার্ক’। শেরশাহের সমাধি।

সাসারাম পর্যায়ের প্রথম মক্‌বারার মনে হয় আলিওয়াল যেন তখনো নিজেকে ঝুঁজে পাননি। তবু তাঁর স্বকীয়তার অভাব নেই কোনো। আলিওয়াল ছদ্মজাতকে সম্প্রসারিত করেছেন, ছত্রীগুলিকে বসিয়েছেন ছদ্মজা থেকে অনেকটা উচুতে, একটা আটকোণা পাঁচিল তুলে (চিত্র—8.1)। ইমারৎ বিস্তার ও



চিত্র—8.1 হাসানশাহ শ্বের সমাধি (সাসারাম)।

উচ্চতার সূক্ষ্ম ছন্দের অনুপাতে সূদৃশ্য। ছদ্মজা ও প্রাচীরের মধ্যে ভূমি-নকশায় যে প্রশস্ত স্থানটা রাখা হয়েছে, সেখানে চার-আটে বহিঃশতা ছোট-ছোট গম্বুজ বানিয়ে একটা নয়নাভিরাম স্নিগ্ধতা আনা হয়েছে। খিলানগুলি দৃঃপদ্য গাঁথার জন্য নিম্নলিঙ্গ একটা বাড়তি অলঙ্করণ পাওয়া গেছে, যা উর্দুগঙ্গর ঐ গম্বুজ অলঙ্করণকে ব্যালেন্স করেছে। ইমারৎ-কুর্সি বা স্নিগ্ধ অনেক কামিয়ে আনা হয়েছে।

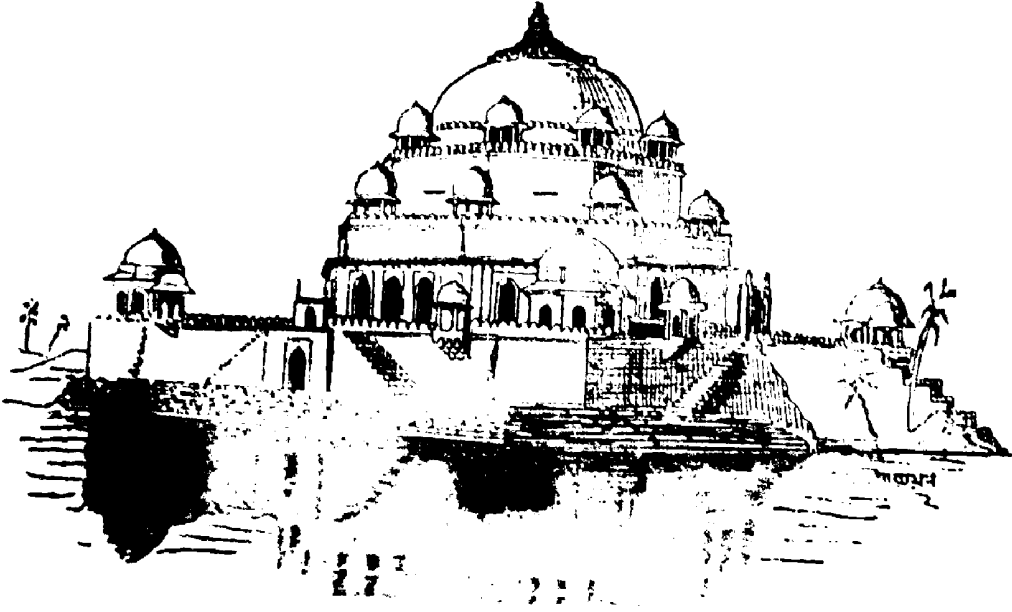
মাত্র চার বছর পরে আলিওয়ালের হাতের কাজ দেখে মনে পড়ে যেন ‘স্টিল-লাইক’-আঁকা স্বপ্নিত স্নেখে পিকাসো বসেছেন ‘গুয়েনিক’ আঁকতে! আলিওয়ালের এ কীর্তি শব্দ লিখিত। আর কামালই নয়, তা লা-জবাব! প্যারিস ব্রাউন বলছেন, “It is a class by itself, for it is one of the grandest and most imaginative architectural conceptions

in the whole of India." (এ একটি অননুক্রমণীয় শৈলী, সমগ্র ভারতের অন্যতম প্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি—কী পরিকল্পনায়, কী তার মহিমায় রূপায়ণে)। শব্দ তাই নয়, দেখছি তার কালজয়ী গ্রন্থের প্রচ্ছদপটে কুব্ব মিনার, বুলন্দ-শরওয়ারা, বিজাপুরের গোল-গম্বুজ, এমন কি স্বয়ং তাজমহলকে উপেক্ষা করে পার্সি হাউস ঠাই দিয়েছেন এ আলিওয়ালার স্বাক্ষর—হুদের জলে প্রতিফলিত শেরশাহ শূরের মক্কার আলোকচিত্র প্রচ্ছদপটে আসন পেড়েছে।

ইমারতটি একটি বর্গক্ষেত্র-আকারের দীর্ঘাকার কেন্দ্রস্থলে স্থাপনের মতো নির্মিত। অমৃতসরের পর-বর্তীকালের স্বর্ণমন্দির ব্যতীত এ পরিকল্পনা অন্য কোনো উল্লেখযোগ্য ভারতীয় স্থাপত্যকীর্তিতে দেখেছি বলে মনে করতে পারছি না। পুঙ্করিণী অতি

শোভিত ছাদ-পাচিল (parapet)। এবং আটটি ছতী। এর পরের ওলায় আবার একটি খাড়া প্রাচীর ইমারতকে বেষ্টিত করেছে, যাতে হাসান মক্কার ছাপ। তার উপর পুনরায় আটটি ছতী। লক্ষণীয়, মুব্বারকশাহ সৈয়দের সমাধিসৌধে (চিত্র-6.1) ছতীগুলি মনে হয় মূল গম্বুজের উপরে হুর্মাড়ি খেয়ে পড়েছে। এখানে সে দোষ হয়নি, যদিচ শেরশাহর ক্ষেত্রে ছতী-সংখ্যা স্মরণীয়। তার হেতু : ঘোলাটি ছতী মূল গম্বুজকে বেষ্টিত করেছে দুটি আনুভূমিক তলে এবং গম্বুজের আকার এত কড়ি যে, ছতীরা ভীড় করে তার মহিমা ক্লম করতে পারেনি।

গম্বুজটি প্রকাণ্ড। নির্মাণকালে ছিল তামাম হিন্দুস্থানে বৃহত্তম—বাসে ও উচ্চতায়। ব্যাস 20 মিটার, উচ্চতা 27.5 মিটার। সেকেন্দারশাহর মক্কার



চিত্র-8.2 শেরশাহ শূরের মক্কার (সাসারাম)।

কিলাস—এক এক দিকে 427 মিটার। পায় বরাবর ঘুরে এলে প্রায় পৌনে দুই কিলোমিটার হাটা হয়ে যায়। কেন্দ্রস্থ ইমারতের কিলার 76 মিটার, উচ্চতা 46 মিটার। ইমারতে পাঁচটি তল—সর্বনিম্নে দিঘীর বুক থেকে স্থাপনের মতো জেগে উঠেছে এক বর্গক্ষেত্র-আকারের ভিত্তিহীন বা সোকার-কুর্সি। তারে ঘিরে একটি চতুষ্কোণ সুউচ্চ প্রাচীর, যার চার কোণায় অষ্ট-ভুজ ছতী। ভূতীর তল হচ্ছে—মূল সৌধের অষ্টভুজ অলিন্দ, যার প্রতিটি দিকে দুই-খাম্বার মাকথানে লোদী শৈলীতে নির্মিত তিস-তিনটি খিলান। উপরে অপ্রাপ্ত হুজা। তার উপর কুজর (battlement)-

থেকে হুমায়ুন টুঙ্গ। তাজমহল পার হয়ে সফদরজঙ মক্কার পর্বন্ত প্রতিটি বৃহদাকার গম্বুজের সপো এর পার্থক্য এই যে, এটি 'ডবল ডোম' নয়। এখানে আলিওয়াল এক মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। একটি নির্দিষ্ট সীমারেখার চেয়ে বড় জাতের গম্বুজের ক্ষেত্রে দু-পদায় বানানোর কারদা প্রায় সর্বজনস্বীকৃত। স্বপতি মনে করেন, না হলে ভিতরে দাঁড়ানো দর্শকের পক্ষে রসভাস ঘটে। সমাধিকক্ষের ভিতরে দণ্ডায়মান দর্শকের মনে হয় গম্বুজ অন্ধকারে মিশে গেছে। আলিওয়াল সব জেনে বড়ো তবুও 'সিঙ্গল-ডোম' বানালেন। ঐ অনুভূতির হাত থেকে দর্শকে ঘুরি

দিতে গম্বুজের ভিতরে আলো আসার এক বিচিত্র ব্যবস্থা করলেন। যা অভূতপূর্ব এবং ভবিষ্যতেও অনূকরণ করা হয়নি। প্রয়োগবিদ্যায় তার পরিচয়- 'ট্রিফোরিয়াম আর্কেড-জালিকায় মস্কিকোষ নির্মাণ করে। সেটা যে কী, তা একে দেখাতে গেলে বিস্তর আঁক-জোক করতে হবে। কখনো সাসারাম গেলে সেটা বরং স্বচক্ষেই দেখবেন।

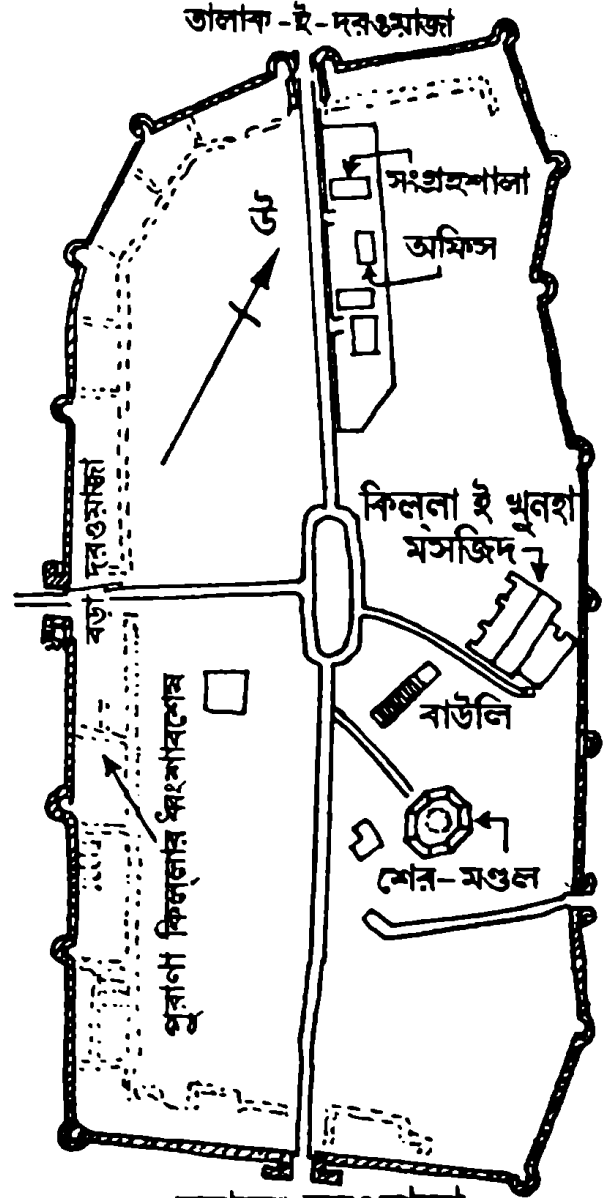
অনুমান হয় নির্মাণ সময়ে গম্বুজটা নীলরঙের আস্তরে ঢাকা ছিল—সে আস্তর ধুয়ে-মুছে নিঃশেষ হয়ে গেছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রাথমিক পর্যায়ে ভূমি-নকশায় পশ্চিমদিক নির্পণে কিছ্ ভুল হয়েছিল। বনিয়াদের কাজ শেষ করার পর এ চূড়ি আলি-ওয়ালের নজরে পড়ে। ইসলামী ঐতিহ্যে কিব্বা-চিহ্নিত মিহ্রাব নিখুঁত পশ্চিমে থাকা চাই। আলি-ওয়াল এই আট ডিগ্রির গল্টি উপরাংশে চমৎকার-ভাবে শূন্যে নিয়েছেন। এমন কি ভূমি-নকশা বা প্লানে চূড়িটাকে মনে হয় স্থপতিবাদের একটি সজ্ঞান-কৃত প্যাটার্ন বদ্বি।

দিল্লী মহানগরীতে শেরশাহের স্থাপত্যকীর্তি : পুরানা কিল্লা (চিত্র-৪.৩) বা ষষ্ঠ দিল্লী নগরী। সে স্থাপত্যকীর্তি দেখতে আজকের দিনের টারিস্ট যান-কি-না-যান। নেহাৎ একজিবিশন গ্রাউন্ডে কোনো আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হলে, অথবা চিড়িয়াখানা দেখার ইচ্ছা হলে যাত্রীরা ও-পাড়ায় পা মাড়ায়। যদি যান : দেখবেন, কলকাতার কিছ্ ধ্বংসস্থাপ। হুমায়ূন পরবর্তী জমানাতে, শেরশাহের মৃত্যুর পর সিংহাসন দখল করে এই কিল্লার অনেকগুলি শের-শাহী ইমারৎ ধ্বংস করে নতুন মোকাম বানান। আশ্চর্যের কথা, তার একখানিও অক্ষত নেই। অথচ শেরশাহের যে দুটি ইমারৎ তিনি আদান্ত ভেঙে ফেলেননি সে দুটিই টিকে আছে—কিল্লা-ই-খুন্হা মসজিদ ও শেরমণ্ডল।

পুরানা কিল্লা প্রায় উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। তিন-দিকে তিনটি প্রবেশদ্বার। কেন্দ্রস্থ বড়া-দরওয়াজা ওয়ফে শেরশাহী দরওয়াজাই বর্তমানে প্রবেশ পথ, দিল্লী-চিড়িয়াখানার প্রায় সই-সই। সুউচ্চ প্রাচীরের ভিতর দিকে যে ইমারতজী ছিল তা অধিকাংশই ভেঙে পড়েছে।

'পুরানা কিল্লা' নামটা কি-করে এসেছে জানি না ; বোধকরি তার উদ্দেশ্য জানানো যে, এটি 'লাল-কিল্লা'র অপেক্ষা পুরাতন। কিন্তু আসলে এই কিল্লাটি অতি প্রাচীন যুগের স্মৃতিবাহী ভূখণ্ডের উপর নির্মিত। এখানে খননকালে শূন্য ত্রীকট-

পূর্বাস্থের নয়, প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন যুগে পেয়ে-ছেন পুরাতত্ত্ব বিভাগ। দিল্লী নগরীর এই অংশেই ছিল মহাতারতীয় যুগের ইন্দ্রপ্রস্থ, এমন অনুমান করা হয়। সেই পৌরাণিক যুগের, প্রাগৈতিহাসিক



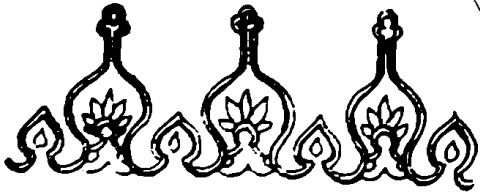
চিত্র-৪.৩ পুরানা কিল্লার ভূমি-নকশা (দিল্লী)।

যুগের পুরাতত্ত্ব বিষয়ে যদি আপনার কোতূহল থাকে তবে চিত্র-৪.৩-তে চিহ্নিত সংগ্রহশালাটি খুঁটিয়ে দেখতে পারেন। খনন-কালে সংগৃহীত অনেক কিছ্

নির্দর্শন ওখানে সংরক্ষিত, আলোক চিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শিত।

শেরমন্ডল নামে মোকামটি শেরশাহী আমলের। অষ্টভুজাকৃতি স্বিতল ইমারৎ। দুটি সোপান শ্রেণী আছে। শেরশাহর আমলে এটি সম্ভবত সম্রাটের অবসরবাগানের জন্য ব্যবহৃত হত। হুমায়ুন সেটিকে তার গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করেন। এখানেই সোপান থেকে অবতরণকালে হুমায়ুনের দেহান্ত হয়।

পূর্বপ্রান্তে শের নির্মিত কিল্লা-ই-খুনহা মসজিদ। সম্রাটের প্রার্থনামন্ডল—এক যুগের অবসান ও নতুন যুগের সূচনার দ্যোতক। ভূমি-নকশায় আয়তক্ষেত্র—48 মিটার × 13.7 মিটার। উচ্চতা 33.33 মিটার। মসজিদের প্রবেশদ্বারটি লক্ষ্য করে দেখুন—খিলানগুলি দূ-পর্দার নির্মিত। বাহিরে ইমারতের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতার অনুপাতে বিশালকায় খিলান। তার কিনার-বরাবর সেই তুগলকী পদ্ম-কুন্ডির নকশা, আর ভিতরে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় প্রবেশদ্বার। বিষয়টি নিয়ে বুলন্দ দরওয়াজা পর্য-বেক্ষণের সময় আলোচনা করা যাবে। আপাতত শব্দ বলব। এখানকার এই কারদাটি পরবর্তী যুগের অনেক অনেক দূ-পর্দার খিলানে অনুকৃত—সেকেন্দ্রা, বুলন্দ দরওয়াজা, জাম-ই-মসজিদ ও তাজমহল। আরও দেখুন, এখানে কিছু হিন্দু ‘মোটিভ’ অনুপ্রবেশ করেছে। প্রাক-আকবরী ইসলামী স্থাপত্যে যা দেখতে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম না আদৌ। প্রবেশ-খিলানের



চিত্র-8.4 কিল্লা-ই-খুনহা মসজিদের নকশা।

উপর ঐ অরিয়ল-গবাক্ষটি হিন্দু-শৈলীর কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। পরবর্তী যুগে আকবরের পদাঙ্ক অনু-সরণ করে অনেকেই এ-জাতীয় গবাক্ষ বানিয়েছেন। আগ্রার জাহাঙ্গীরী মহলে, ফতেপুর-সিক্রির অনেক-অনেক মোকামে একে দেখতে পাবেন—জয়পুর, যোধ-পুরে হো বধেট। হুজুর হিন্দু-পটাইলার। স্তম্ভ-গুলির পাদদেশে যে আলিম্পন-নকশা তরত পারসিক ডিজাইনের সঙ্গে অজস্র-আলিম্পন মিশ্রণী হয়েছে (চিত্র-8.4)। সম্ভবতঃ খিলানের স্প্যান্ডেল (Spandrel) জোড়া-পদ্মের নকশা; মিহরাবের উপরেও অনুরূপ জোড়াপদ্ম। মিহরাবের সম্ভবতঃ

চার-দুকুনে আর্চিট প্রায়স্‌তশ্চে (pilaster) যে অলংকরণ তাও আমরা সচরাচর কোনো মসজিদে দেখিনি—কুওওতুল মসজিদ বাদে (যেখানে হিন্দু স্তম্ভই ব্যবহৃত)। সেগুলি জৈন-মন্দিরের প্রায়-স্তম্ভের সঙ্গে বেশ মিল খায়। অথচ ঠিক তার পাশ-ঘেষেই খাড়াভাবে রয়েছে কুরাণ-সরিফের ক্যালিগ্রাফী। বাহিরের দিক থেকে প্রবেশ পথের দূ-পাশে দেওয়াল সহ-সহি ছাঁচি মিনারিকাকে লক্ষ্য করেছেন? যা উপরে গিয়ে গুলদস্তায় রূপান্তরিত। একটু নজর করে দেখুন দিকি—ওর গায়ে ঐ খাঁজ-কাটা নকশাটা যেন চেনা-চেনা, নয়? ঠিকই ধরেছেন। ওটা দেখেছেন কুংব মিনার-এ। যাকে আলী-সাহেব বলেছিলেন ‘বাঁশী’। অরিয়ল গবাক্ষকে ঘিরে যে জালিকাজ তা-ও পরবর্তীকালে নানান নতুন ছন্দে বিবর্তিত হয়েছে—ইতমদ্ উদ্দৌলায়, সেলিম চিস্তির দরগায়, এমন কি তাজ-এ। দিল্লী পরিক্রমাকালে এই ক্ষুদ্র ইমারৎটি স্বতই উপেক্ষিত থেকে যায়—কিন্তু আপনি যদি স্থাপত্যের ছাত্র হন, তাহলে বলব—ও-তীর্থে একবার হাজিরা দিয়ে যাবেন। হোক ছোট, এই উপেক্ষিত স্থাপত্যকীর্তি দুটি কারণে স্মরণীয়। এক : এখানে শেরশাহ শূর এমন কতকগুলি বীজ বপন করেছিলেন যা অন্যতর মহীরুহে বিকশিত হয়েছে। দুই : আকবর-বাদশাহর যে অতি অদ্ভুত পরীক্ষা—হিন্দু ও ইস-লামী স্থাপত্যের সহাবস্থান, তা কি সর্বপ্রথম রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করেছিল শেরশাহ শূরের ধ্যানে? আরও কিছুটা সময় পেলে তিনি কি একটা ফতে-পুর-সিক্রি বানাতেন?

মাত্র পাঁচ বছরের ভিতর কেমন করে এত এত কাণ্ড করে ফেললেন? কেমন করে বদ্বালেন—কুংব মিনারকে অতিক্রম-করা-কীর্তি আলাই মিনার নয়, গ্র্যান্ড-ট্রাঙ্ক-রোড! উচ্চতায় শব্দ দাটের বাজনা, বিস্তারের মহাব্বতের। দূ-আড়াই হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ সোনারগাঁও-পঞ্জাব শাহী সড়ক কুংব-এর 273 ফুট উচ্চতাকে অনেক অনেক পিছনে ফেলে গেছে। আজ পাঁচশ’ মানুষ যদি দৈনিক কুংব দেখতে যায়, তাহলে পাঁচ লাখ লোক ব্যবহার করে গ্র্যান্ড-ট্রাঙ্ক-রোড। কুংব একটা দিগ্বিজয়ীর আশমান-ছোঁওয়া দম্ভ, শাহী সড়ক এক পিতৃপ্রতিম রাষ্ট্রনায়কের দরদের দান।

সাসারামের সেই নগণ্য যুবক ফরিদ কোন মন্ত্র-কল দিল্লীর তত্ত্ব-ই-সুসমানে আসীন হয়ে এই ইস্ত-জাল সফল করল? জবাব মিলবে সুফী পণ্ডিত জালালের জাযায় ;

আন্ নিশান্ এ-দীদ্ এ হিন্দুস্থানী-বদব্দ।
কি জহদ অজ্ খার ও দিওয়ানা শব্দ ॥*

কলিঞ্জর দূর্গ আক্রমণের সময় এক দূর্ঘটনায় এই অনন্যসাধারণ সুলতানের মৃত্যু হয়। বারুদের স্তূপে হঠাৎ আগুন ধরে যাওয়ায় এই দূর্ঘটনা। বিস্ফোরণ-মাত্র মৃত্যু হয়নি শের-এর। অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় জীবিত ছিলেন তিনটি দিন। দূর্গের পতন হয়েছে জানবার পরে তৃপ্তির সঙ্গে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। পাঁচ দিনের দিন কলিঞ্জর কিল্লায় এসে উপনীত হলেন শাহজাদা—যিনি ইসলাম খাঁ নামে দিল্লীর পরবর্তী সুলতান। সদা-বিজিত কলিঞ্জর দূর্গে অনাড়ম্বর অভিষেক সেরে ইসলাম খাঁ প্রাক্তন দিল্লীশ্বরের মরদেহ নিয়ে রওনা দিলেন সাসারামের দিকে।

ইতোমধ্যে উস্তাদ আলিওয়াল খাঁ নির্দেশ মতো শেষ করেছে সেই তৃতীয় মক্কারাটি। অথচ সেটি শূন্যগর্ভ। এ পাঁচ-বছরে দিল্লীশ্বরের সাক্ষাৎ পায়নি শিল্পী। তাই জেনে নেওয়া হয়নি—কে সেই শাহ-য়েন-শাহর গোপন প্রেমের পাঠী।

বিরাট শোকযাত্রার মিছিল এসে সামিল হল সাসারামে। সারা সাহাবাদের মানুস ছুটে এল তাদের অতি-আপনজনকে শেষ-দেখা দেখতে। সেই জন-সমুদ্রের একান্তে অন্তেবাসীর মতো দাঁড়িয়েছিল আলিওয়াল। এ কয় বছরে সে আরও বড়িয়ে গেছে। মনে মনে কঁাছিল—প্রভু, এ কী বিড়ম্বনার মধ্যে তুমি ফেলে গেলে আমাকে! মক্কারা বানিয়েছি, অথচ তার মালিকানা কার তা জানি না।

এই শেষ বয়সে অকৃতদার আলিওয়াল কি আল্লা-তালার নাম ভুলে গিয়ে চিরাগ হাতে পথে পথে ফিরবে খুঁজতে—কে হতে পারে সেই অসামান্য সুন্দরী, যার কপোলের ভ্রমরকালো তিলের বিনিময়ে তামাম হিন্দু-স্থার শাহ-য়েন-শাহ্ সমরখন্দ-বুখারারাও বিলিয়ে দিতে পেছপাও নন।

সুলতানী সেপাই এসে ওর হাত চেপে ধরল, বললে, ওস্তাদজী, স্বয়ং সুলতান তোমাকে তলব করেছেন। তুরন্ত্ চলে এস।

বিহ্বল আলিওয়াল এসে দাঁড়ালো নয়া-সুলতান ইসলামশাহ্ শূরের সম্মুখে। আড়ম্ব নত হয়ে তিন বার কুর্নিশ করল। ইসলামশাহ্ বললেন, উস্তাদজী!

সমস্ত দার-দায়িত্ব তোমার। আশ্বাজানের ককিন সমাধিস্থ কর।

বৃন্দ ওস্তাদ হুকুম তামিল করল। শোকযাত্রার পুরোভাগে নির্দেশ দিতে দিতে সে নিরে গেল সন্নাটের মরদেহ মক্কারার ভূগর্ভে। সেই আকস্মিক আশ্রয় ইমারতের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল না। নতুনত্রে নিজ প্রতিবিশ্বের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ঠান্ন। নব্বই ছুই-ছুই বড়া-ইমাম সাহেব মিম্বারের উপর উঠে খুৎবা পাঠ করলেন। হাজার হাজার মানুস নত-জানু হল।

অনুষ্ঠান শেষে ইসলামশাহ্ বখন আলিওয়ালকে পারিশ্রমিক দিতে গেলেন তখন তিন পা পিছিয়ে গেল লোকটা। হাত দুটি জোড় করে বললে, ইমান-ইনসাফের মালিক! আপনাদের নিমক খেয়েই বেঁচে আছি। কিন্তু আজকের এ-কাজের জন্য আত্মকে কোনো খিলাং দেবেন না খোদাবন্দ। এ কন্দার এটাই ছিল শেষ কর্তব্য।

ইসলাম বললেন, তুমি এখনেই থাকবে উস্তাদজী! আশ্বাজান নির্দেশ দিয়ে গেছেন, একজন-কার মক্কারাগুলির দেখভাল, মেরামতির সব দার-দায়িত্ব তোমার। সেজন্য তামাম-জিন্দোগি তুমি একই হারে মাসোয়ারা পেয়ে বাবে।

অশ্রুসজ্জল চোখে বৃন্দ কেনরুমে সাহস সঞ্চয় করে বললে, গোস্তাকি মাফ করবেন জাহাঁপনা, আপ-নার আশ্বাজান—তার লাখ-লাখ বরিষ্ বেহিস্ত-বাস মঞ্জুর হোক—হুকুম দিয়েছিলেন, আরও একটি মক্-বারা এই সাসারামেই কনাতে। সেটি শেষ হয়েছে, কিন্তু তার মালিকানা কার সেটা এ বান্দাকে তিনি বলে যাননি।

ইসলাম অতি দঃখেও হেসে ফেলল। বলে, সে কি হে? তুমি জান না? আমরা তো অনেক দিন থেকেই জানি। বাদশাহী খেয়াল! শাহ-য়েন-শাহ্ ঐ তিন-নম্বর মক্কারাটা বানিয়েছিলেন তার জ্ঞানার শ্রেষ্ঠ স্থপতিবিশদের জন্য। ...কী? চেন লোকটাকে? তার নাম : উস্তাদ আলিওয়াল খান!

বজ্রাহত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বৃন্দ। কুর্নিশ করতে, কৃতজ্ঞতা জানাতে ভুল হয়ে গেল তার। এ কি বিশ্বাস? মহামহিম দিল্লীশ্বর...অভিকন্দ কীট আলিওয়াল...সেই রহস্যজন রসিকতা...বু-খাল্-ই হিন্দো ওশ্ বখ্শম্ সমরখন্দ-ওয়া-বুখারারা!

দু-হাতে মুখ ঢেকে বর বর করে কেঁদে ফেলল বৃন্দ শিল্পী!

* হিন্দুস্থানের অন্তরাখ্যার প্রকৃত পরিচয় বখন কেউ পায়, তখন তার নাওয়া-খাওয়া ঘুচে যায়। সুস্থোখিত মানুসটা বেবাক-উন্মাদ হয়ে যায়।

গ্র্যান্ড-ট্রাঙ্ক-রোড ধরে যদি কখনো পশ্চিমে যান—
আল্ফার দোহাই—একবার গাড়ি থামাবেন সাসারামে।
কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হবে না, নজরে পড়বেই শের-
শাহ্ শূরের প্রকাণ্ড সমাধি। কাকচক্ৰ নির্মল জল
নয়, সবুজ শয়ওলা-গোলা ঘোলা পানি। নীল-আস্তর
করা গম্বুজটার হাড়-পাজিড়া বেরিয়ে গেছে। তা হোক,
তবু অন্ধও সেই মনোচৈতন্য ইমারৎ একদৃষ্টে তাকিয়ে
আছে—দেখছে, নিজের প্রতিবন্ধটাকে। শের রসিকতা
করে কলোছিলেন, এ ইমারৎ নার্গিস্! সত্যিই, প্রতি-
বিশ্বের দিকে নিবন্ধদৃষ্টি ঐ কঙ্কালসার ইমারৎকে
দেখে নার্গিস্! ফুলের সেই আশ্চর্যতমূলক গ্রীক
উপকথাটিই মনে পড়ে বাবে আপনার। কিন্তু, না!
সেটাই বৈশ্বকরি ওর শেষ কথা নয়। নার্গিস্! নিজ
প্রতিবিশ্বের দিকে তাকিয়ে ভাবছে কিন্তু আন জনের
কথা—একটা ভুলে-যাওয়া মূখের আদল! যে ব্যঙ্গবাক্য
মানুষটা ওকে চিনতে পেরেছিল, যে কলোছিল : তুমি
নার্গিস্!

তারপর চারশ বছর কেটে গেছে। তেমন দরদী
সমকদার আর কেউ আসেনি এ কলবাগিচার। কোথায়
হারিয়ে গেল সেই মানুসটা? কেচারা জানে না, সে
লীন হয়ে আছে ওরই অন্তরতম হয়ে :

হজারো সালসে নার্গিস্

আপনা বেন-রী-পর রোতী হৈ।

—বড়ী মূর্খকিল-সে হোতী হৈ

চমন্সে দিদাবর টৈদা ॥*

অনুরেই মিজা হাসান শূরের মক্কারা। বড়া-
ইমাম সাব জির্দিগিন্ডর বে-হক বাৎ কলেননি! তাঁর
দোহাই—চলুন দেখে আসি সেই দামাল ছেলে ফারিদের
স্বপ্ন-মাত্রের কবর। শেরশাহ্‌র দাপটে শের-বক্‌রি
নাকি একঘণ্টে পানি পিত। হলফ নিয়ে হক্-বেহক্
কবুল করতে পারব না; কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য
করেছেন? ওদের শরনের ভাঙ্গিটা? ঐ দেখুন—
জেন্দী এক রোখা মিজা হাসানকে সে শূইয়েছে ডান-
দিকের কবরটার, তার আশ্রয়ভাজনের কলিজা সই-সই
করে। যা আছে পশ্চিমে, পশ্চিমদিকে পাশ ফিরে।
স্বপ্ন তার পিছনে—ঐ পশ্চিমে ফিরেই। তার মানে?
জীবিতকালে যৌবনোত্তীর্ণ যে সারিকা ছিলেন জায়-

* হাজার বছর ধরে নার্গিস্

অনিয়া সৌন্দর্য-পদ্ম নিয়ে কলিত।

(ও জেনে) এ বাগিচার রঙী সমকদার

এক অতি সুদর্শিত কীর্তিকর ॥

(বেন-রী জটুলনীর সৌন্দর্য : চমন্স কলমঙ্গার;
দিদাবর প্রকৃৎ সমকদার, connoisseur)।

গীরদারের করুণার ভিখারিণী, আজ তিনিই আছেন
মুখ ফিরিয়ে, আর তার পিঠের দিকে বাপ আছে মায়ের
দিকে ফিরে।

এখানেই সাসারাম দেখা শেষ করবেন না যেন।
খোদ শেরের দোহাই—চলুন দেখে আসি তাঁর দিল্‌কা
কলিজাকে। রিক্সা-ওয়ালা, ভাজি-ওয়ালা, পথচলতি
মানুষজনকে ক্রমান্বয়ে জিজ্ঞাসা করতে থাকুন—কেউ
না কেউ হাদিস্ বাৎলে দেবেই। দেখিয়ে দেবে দূর
থেকে, ঘন কাঁটাগুল্মে আপাদমস্তক ঢাকা একটি চুন-
বালি-খসা উপেক্ষিত ধ্বংসস্তূপ। পুরাতত্ত্ব বিভাগের
কোনো তা-বড় তা-বড় 'দিদাবর' যে এ দিগড়ে আসেননি
তা 'চামনের' হাল দেখলেই বোঝা যায়। কোন্ এক নাম-
না-জানা আলিওয়ালের কবর।

‘—বহু কোন থা? ক্যা মালদুম। কোই ছোট-
মোটো মনসবদার, ইয়ে সিপাহ্-সালার হোগা সায়েরদ।
মুখে না মালদুম’—স্থানীয় লোকটা পাশ কাটাবে।

আজ্ঞে না, মীর মহম্মদ আলিওয়াল খাঁর হক-
হাদিস্ আমিও জানি না। অতি ভাসা-ভাসা কিছু
ঐতিহাসিক তথ্যকে মূলধন করে, মনগড়া সংলাপ
ফেঁদে এ কিস্সা পয়দা করেছে। তবু বিশ্বাস করুন,
ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখকের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যগ-
গাণ্ডির বাইরে আমি একবারও পদার্পণ করিনি।
শেরশাহ্ শূর অথবা তাঁর জমানার শ্রেষ্ঠ স্থপতিবিদ
আলিওয়ালের ইতিহাসকে আমি সজ্ঞানে বিকৃত করিনি
একটিল।

আম্বতীয় কুৎব মিনারের মূল স্থপতিবিদ কোন
হতভাগ্য—সে-কথা জানিয়ে কুৎবের গায়ে কোনো ফলক
লাগাবার কথা খেয়াল হয়নি আইবক-ইল্-তুংমিস্-
আলাউদ্-দৌলতের; বুলন্দ-দরওয়াজার ঐ আকাশচুম্বী
দাড়া জন্ম নিয়েছিল কোন্ বিশ্রুতকীর্তি স্থপতির
ধ্যানে সে-কথা উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন বোধ
করেননি জনদরদী স্বয়ং আকবর-বাদশাহ্ তাঁর দু-
হাজার একশ' ছিয়াশি পৃষ্ঠার জীবনীতে। তাজ-
মহলের নির্মাণ-ইতিহাসে নিখুঁত হিসাব খুঁজে
পাবেন : কত হাজার কতশ' কত চুনী-প্রবাল-পাল্লা-
ল্যাপিসলাজুলি ব্যবহার করা হয়েছে এ ইমারতে।
কিন্তু পরিকল্পনাকার? সেখানে লেখা আছে :
'কগজ-নকশায়ে-মক্‌বারা হর-এক উস্তাদ-য়ে' আআ-
জুদাদ। চুন-ইক নকশা-পসন্দ আলিচা হজরৎ'
—বাস! এটুকুই। অর্থাৎ জোবাল-টেম্‌জারে সাড়া
দিত কাবুল-কান্দাহার-ইরান-তুরান থেকে হরেক
উস্তাদ কাগজের-নকশায় টেম্‌জার দাখিল করলেন এবং
তার শ্রিতর বোছে-বোছে একখানি বিশেষ-নকশা পছন্দ

করলেন আলিচা হজরৎ, কিনা শাহজাহাঁ! কিন্তু কার নকশা? কে সে? কে দেখেছিল বিনীত ঐশ্যামা-
যামিনীর শেষ প্রহরে তাঁর ধ্যানের দৃষ্টিতে সেই মর্মর
স্বপ্ন,—সবার আগে, সবার অগোচরে? সেই মীর
মুহম্মদ উস্তাদো-কি-উস্তাদ গাজী মিঞা ‘এ্যানন্-
এর পিতৃদত্ত নামটা ইতিহাসে লিখে রাখতে ভুল হয়ে
গেল বেগম-বিরহাতুর আলিচা হজরৎ—শাহজাহাঁর!

এই হচ্ছে দখিনী ভারতজননীর সহস্রাব্দীকাপী
ললাটে-লিখন! ভারতীয় ভাবনার স্থূলদৃষ্টিতে—মাথা
নিচু করে স্বীকার করতে হবে—স্ত্রীলোক আর
স্বপ্নাতির এক দর। এ তোমার এ আমার পাপ!
স্বপ্নাতি পয়দা করে ইমারৎ, স্ত্রীলোক : ওয়ারিশ্।
তাই শাহ-য়েন-শাহ জাহাঙ্গীর তাঁর অতবড় আত্ম-
জীবনীতে গর্ভধারণী জননীর নামটা পর্ষিত উল্লেখ
করার প্রয়োজন বোধ করেননি। তাই রোমের সেন্ট
পীটস গীর্জার প্রতিটি আর্কিটেক্টের স্বাক্ষরিত
‘রিভাইজড্-প্ল্যান’ ইতিহাস বৃকে করে ধরে রাখে—
গ্রামান্টি-রাফায়েল-মিকেলান্জেলোর, আর কুংব-বুলন্দ-

তাজের স্বপ্নাতির নাম বে-হদিশ্ না-পাক্ষ!

তাই হয়তো আপনার মনে হবে—সেই দখিনী
ভারতজননীর কণ্ঠে গ্রান্ড-ট্রান্স-রোডের শতনরী
দুলিয়ে দিয়েছেন বলেই নয়, দার্ভিক-পীড়িত সাহা-
বাদবাসীর অল্প জোগাতে নিজ মক্কারার বিচিত্র
প্রাণিৎ রূপায়িত করার জন্যই শব্দ নয়—কিহরের জন-
পদপ্রান্তে এ কুদ্রাতিকুদ্র মক্কারাটি বানিয়ে শিল্পের
উপর শিল্পীর মর্যাদা স্বীকার করেছেন বলেই স্বপ্ন-
দিনের সম্রাট শেরশাহ শূর ভারতের ইতিহাসে অনন্য,
একমাত্র সুদর্শন বাতিক্রম : লা-জবাব!

: বড়া মুশকিল্-সে হোঁত হার চামনমে দিয়ার
পয়দা!

কণ্টকগুম্বাত সেই ভ্রমস্তম্ভের পুণ্ড্রস্বয়ম্বর
পরিবেশে দাঁড়িয়ে কোনো অন্তর্দৃষ্টিভাসিত সম্বন্ধ
হঠাৎ হয়তো আপনার মনে হবে—না, শাহজাহাঁ নয়,
একমাত্র শেরশাহ শূরের প্রতিই এ পংক্তিটা সূত্রবৃত্ত :
‘তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি বে মহৎ!’

□



চিত্র—8.5 শেরশাহ শূরের সম্ভাব্য আলোচনা।

আবুল ফজল

ঘটনা	সময়কাল	বছর	ঘটনা	সময়কাল
আবুল ফজলের জন্ম	.. Oct,	1542	ফতেপুর্-সিদ্ধি নির্মাণ	.. 1569-70
হুসেনা বেগমকে বিবাহ	.. Nov,	'51	গুজরাট অভিযানে যাত্রা	.. July, '72
আবুল ফজলের অভিযেক	.. Feb,	'56	প্রত্যাভর্তন, বুলন্দ-শহর ও রাজা	.. 1573
পানিপথের স্থিতীয় যুদ্ধ	.. Nov,	'56	আবুল ফজলের দরবার-প্রবেশ	.. 1575
আবুল ফজল-উল্লাহকে বিবাহ	..	1557	টোডরমল দেওয়ান নিযুক্ত	.. 1575
নদীপথে আত্মদর্শন	.. Dec,	'58	হলদিঘাটের যুদ্ধ	.. June, '76
কৈলাস কিতাবিত	.. Jan,	'61	আবুল ফজলের নতুন জীবনদর্শন	.. 1576-79
মহম্মদীয় রূপসতীর মৃত্যু	.. Mar,	'61	ইবাদতখানা সর্বধর্মের জন্য উন্মুক্ত	.. Oct, '78
আবুল ফজল-কুমারীকে বিবাহ	.. Feb,	'62	ভারতে প্রথম আদমসুমারী	.. 1579 (?)
অনেক ও আদম খাঁর মৃত্যু	.. June,	'62	দীন-ইলাহি ধর্ম প্রবর্তন	.. 1582
জিহাদ-কর রত্ন	.. Mar,	'64	এলাহাবাদ-অভিযান	.. 1583
নবর চৈন-এর পতন	.. Oct,	'64	লাহোরে রাজধানী স্থানান্তরিত	.. 1585
আবুল ফজল-কুমারীকে বিবাহ	.. Sep,	'65	ফৈজির মৃত্যু	.. 1595
আবুল ফজল-কুমারীর ভিত্তিস্থাপন	..	1565	সেলিমের বিদ্রোহ, আবুল ফজলকে হত্যা	.. 1602
সেলিমের জন্ম	.. Aug,	'69	পিতাপুত্র পুনর্মিলন	.. 1604
হুসেনের জন্ম	.. June,	'70	আবুল ফজলের মৃত্যু	.. 1605

বাদশাহী জমানায় বিবাহের উদ্দেশ্য ছিল বিবিধ : রাজনৈতিক প্রয়োজনে ও উত্তরাধিকারার্থে। জৈবিক প্রয়োজনে বিবাহিত-পত্নী নিত্যন্ত 'অধিকন্তু ন দোষার'; কারণ হারেসে সে উপকরণ পর্যাপ্ত। এই বাতাবরণে এক বিচিত্র ব্যক্তিত্ব আবুল-ফজল-এর বিবাহ—তিনি প্রেম পড়ে কিয়ে করেছিলেন।

হুমায়ুনকে তখন বাঘে তড়া করেছে! শের খাঁর হস্তে পরাজিত আবুল-ফজল এসে তাঁর গাড়ে সিন্দূর নদের তীরে এক অখ্যাত গ্রাম 'রোহরি'-তে। হুমায়ুনের দুই বেগম—বেগম বেগম ও হাজী বেগম তখনো শের খাঁর অধীনে বন্দিনী; যদিও হুমায়ুন তখনও হয়তো জানেন না যে, শের খাঁদের যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে আপন হারেসে আত্মসমর্পণ করেছেন; আঁচরেই তিনি সসম্মানে তাঁদের ফেরত পাঠাবেন। সৈন্যসামন্তদের সেই রোহরি-গ্রামের অধ্যক্ষী ছাউনিতে রেখে একজন মাঠ দেহরক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে হুমায়ুন ছুটেছেন 'পাঠাড়', সিন্দূর নদের অববাহিকা ধরে প্রায় একশ' মাইল দাঁকি। সেখানে তাঁর ছোট ভাই মীরজা

হিন্দালের আস্তানা—যে ভাইকে তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন, এবং যে ভাই তাঁর চরম বিপদের সময় মদ্র ফিরিয়ে ছিল। সেখানেই হিন্দালের ছাউনিতে চার চক্ষুর প্রথম মিলন। হুমায়ুনের বয়স তখন তেত্রিশ পার হয়েছে আর হামিদা বানু বেগম মাত্র চৌদ্দ বছরের কিশোরী। বানু বেগমের আশ্বাজান মীর বাবা দোস্ত ছিলেন হিন্দালের একজন উচ্চপদস্থ সিপাহ-সালার—জাতে ইরানী। হুমায়ুন আকৃষ্ট হলেন অক্ষুণ্ট পশ্মকোরকের মতো ঐ অনাঘাতা ইরানী কিশোরীর সৌন্দর্যে। আশ্চর্য! বানু বেগমও মদ্র হলেন এই প্রায়-প্রৌঢ় পরাজিত প্রাক্তন সুলতানকে প্রত্যক্ষ করে। মীর বাবা দোস্ত এবং তাঁর পত্নীর ঘোরতর আপত্তি ছিল; থাকতেই পারে—হুমায়ুন পরাজিত, পলাতক, যে-কোনো মদ্রহর্তে শের খাঁর গুপ্ত-ধাতক তাঁকে হত্যা করতে পারে। তাছাড়া দুজনের বয়সেও যথেষ্ট ফারাক; কিন্তু দেখা গেল ওরা দুজনেই সংকল্পে দৃঢ়। মুসলিম-বিবাহে ধর্মতঃ পিতামাতার ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা অনুমতি অবান্তর—মিঞা-বিবি রাজী,

তো ক্যা করিগা কাজী?' হুমায়ূন অন্তিমকালস্বেই বান্দ বেগমকে বিবাহ করলেন (14 Aug, 1541)। ফলে, হিন্দালের আশ্রয় ত্যাগ করতে হল তাঁকে।

প্রায় বছরখানেক হুমায়ূন মিথ্যা আশ্বাসের মোহে মাড়ওয়ার-যোধপুরে ছোটোছোটো করলেন। রাজপুত রাজন্যবর্গকে দোষ দেওয়াও চলে না; তত্ত-তাউসে আসীন হয়েই শেরশাহ্ এমন দৃঢ়মুষ্টিতে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন যে, সমগ্র রাজপুতানা সম্মুখে নির্যোজিত তখন হুমায়ূনকে সমর্থন করা হবে নিতান্ত বড়বাকি। হুমায়ূনের অনুগামীরা একে একে সরে পড়তে থাকে। যে-কোনো দিন তিনি শেরের গুপ্ত-হাসীসায়ূনের হাতে খুন হয়ে যেতে পারেন! পূর্ণগর্ভা বেগম-সাহেবাকে নিয়ে হুমায়ূন বৈদিন অমরকোটে হাজির হলেন সেদিন তামাম হিন্দুস্থানের প্রাক্তন-মালিকের সহচর মাত্র নয়জন।^১ অমরকোটের রাজা সংবাদ পেলেন, বাবুর-বাদশাহ্‌র পুত্রবধূ পান্থশালায় প্রসববেদনায় কাতর। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁদের আহ্বান জানালেন দুর্গমধ্যে। শেরশাহ্‌র ভয়ে অমাত্যবর্গ নিষেধ করেছিল, রাজা কর্ণপাত করেননি। সেখানেই হামিদা বান্দ বেগমের গর্ভে জন্ম নিলেন ভারতেতিহাসের সেই বিস্ময়কর পদ্রুষ্টি।

হামিদা বান্দ বেগম পরবর্তীকালে আকবরের হারেম-প্রচণ্ড প্রভাব ফেলেছেন। হুমায়ূনের অপরা মহিষী হাজী বেগম ছিলেন একটু আত্মনিয়ন্ত্রণ। কিন্তু এ-সব কথা বলার পূর্বে প্রবেশ্য আকবর-জমানায় হারেম-ভুক্ত কয়েকজন প্রধানা মহিলার ইক-ইদিশ্ এখানে লিপিবদ্ধ করতে চাই। ইতিহাসে মহিলাবন্দ নবতই উপেক্ষিত। আগেই বলেছি, জাহাঙ্গীর তাঁর সুদীর্ঘ আত্মজীবনীতে গর্ভধারিণী জননীর নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেননি! জাহাঙ্গীরের পূর্বে আকবর-বাদশাহ্‌র যে যমজ-সন্তান হয়েছিল—মারা মাত্র এক-মাস বয়সে মারা না গেলে হয়তো হিন্দুস্থানের তত্ত-তাউসে আসীন হত, তারা যে কার গর্ভজাত তার ইদিশ্ আমি আজও সঠিকভাবে উদ্ধার করতে পারিনি। ফতেপুর্-সিক্রি ও আগ্রার জেনানা-মহালে ইমারৎ-গুলিকে সনাক্ত করার প্রয়োজনে ইতিহাস তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি এবং বারে বারে বড়বক্ বনোঁছি। 'মরিয়াম' নাম দুজনের—আকবরের মা ও পত্নী: ফলে গলং হতেই পারে। আপনারাও যাতে আমার মতো বে-ওকুফ্ না বনেন, তাই 'আকবর-স্থাপত্য' নাটকে জেনানা-মহালের কুশীলবদের প্রথমেই সনাক্ত করে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

হাজী বেগম : হুমায়ূনের মহিষী, যিনি শেরশাহ্‌র হাতে বন্দী ও পরে বৃত্ত হন। হুমায়ূন-সমাধি এঁরই স্মৃতিধনে নির্মিত। পরে হীন হজ করেন। মক্কা থেকে ফিরে 1582 সালে মারা যান। আকবর এঁকে মাতৃজ্ঞানে শ্রদ্ধা করতেন।

হামিদা বান্দ বেগম : বীর বাবা দোস্ত-ওরফে আলি আকবর জামির কন্যা এবং আকবরের গর্ভধারিণী জননী। হুমায়ূন মক্কার এঁর সমাধি। হারেমের তাঁর পরিচর 'মরিয়াম মকানী' (বিশুদ্ধজননীর সমতুল্য)। ফতেপুর্-সিক্রিতে 'সুন্দহারা মকামে' থাকতেন। আকবরের মৃত্যুর মাত্র একবছর আগে মারা যান।

বেগা বেগম : হুমায়ূনের অপরা মহিষী। হুমায়ূন-সমাধিতে এঁর কবর।

গুলবদন বেগম : বাবুরের কন্যা, অর্থাৎ আকবরের পিসি। হামিদার চেয়ে দু-চার বছরের বড়: হামিদার অন্তরঙ্গ বান্ধবী, একই সঙ্গে থাকতেন। ফার্সিতে আলিম, অত্যন্ত বিদ্বা। হুমায়ূনের প্রামাণিক জীবনী 'হুমায়ূন-নামা' রচনা করেছেন: মিসেস্ বিভারিক্কৃত তার অনুবাদ আছে। 'সুন্দহারা মকামে' প্রায়শই থাকতেন। বিরাগী বছর বয়সে, আকবরের মৃত্যুর মাত্র দু-বছর পূর্বে এঁর এন্টিকাল হয়।

রুখিয়া বেগম : হুমায়ূনের চাচা হিন্দালের কন্যা। আকবরের প্রথম স্ত্রী। বিবাহ : 1551; গ্রন্থ-কারের অনুমানে ফতেপুর্-সিক্রিতে তথাকথিত বীরবল-প্রাসাদে থাকতেন। তার পূর্বে, অর্থাৎ ঐ মহল তৈরী হবার পূর্বে, 'তুর্কি-সুন্দতানা' মহলে থাকতেন। নিঃসন্তান। শাহজাহাঁকে মানুষ করেন।

সালিমা বেগম : আবদাল্লা খান মঙ্গল (যিনি ছিলেন হুমায়ূনচাচা কামরানের শ্যালক)-এর কন্যা। আকবরের দ্বিতীয়া মহিষী। বিবাহ : 1557। গ্রন্থকারের অনুমান—ইনিও বীরবল-প্রাসাদের অপরাংশে থাকতেন। ইনি মুরাদের জননী।

মরিয়াম জামানী : আকবরের প্রধানা মহিষী। বিবাহ : 1562; অম্বররাজ ভারমলের কন্যা ও জাহাঙ্গীরের গর্ভধারিণী জননী। কন্যার পিতামাতার উদ্যোগে কোনো হিন্দু কুমারীর এই প্রথম উল্লেখযোগ্য মঙ্গলমান বিবাহ। ফতেপুর্-সিক্রিতে বোধপুর্নী প্যাঙ্কসে থাকতেন।

সালিমা সুন্দতানা : হুমায়ূনের ভাগিনেরী, ফার্সী-কবি। কয়েকটি ফার্সি কাব্যের রচয়িতা।

আকবর কতগুলি বিবাহ করেছিলেন এ-বিষয়ে ঐতিহাসিকেরা একমত নন। কেউ বলেন সাত, কেউ বলেন বেশি। প্রধানা কয়েকজনের কথাই শৃংখলা করা হল।

শিশু আকবরকে তার ঝড়িমা সুলতানা বেগমের (হুমায়ূনপ্রাতা আশ্কারীর পত্নী) হেপাজতে রেখে হান্সিমা বানু তার স্যামীর সঙ্গে পলাতকজীবনে অংশগ্রহণ করেন। সেই শৈশব থেকেই আকবরের জীবনে

কথা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি (চিত্র-6.5)।

শিশু আকবরের জীবনের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করব, যদিও তা আপাত-বাহুল্য। এসব তথ্য সাধারণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না ; তাছাড়া আংকা ও আধম খরি সমাধিসৌধ দর্শনকালে তথ্যগুলি আমাদের রসোপলব্ধিতে সাহায্য করতে পারে।

শিশু আকবর ততদিনে আশ্কারীর পরিবার থেকে কামরানের হেপাজতে এসেছেন। তখন তাঁর



চিত্র-9.1 শিশু আকবর ও জননীর পুনর্মিলন।

[আকবর-নামার হুগল-পেইন্টিং অনুসরণে আঁকিত। স্বীকার্য : যে কপি থেকে এঁকেছি তাতে হুমায়ূন, বনু-বেনস ও আকবর বর্তীত অন্যান্য চারিত্র্যমণ্ডল অস্পষ্ট। ফলে কম্পনার আগ্রহে সেগুলি হুগল-শৈলীতে পাদপূরণ করেছি।]

অঙ্কিত হয়ে পড়েন তিনজন কবি, বাদির প্রসঙ্গ আলোচনা করতে হবে আকবরী-স্বাপ্নত্যা ; এঁদের দুজন যত্নে আকবরের বাইলা ; বাদির বৃকের দৃষ্টি থেকে আকবর স্বপ্ন-স্বপ্ন আপা এক জীজী আপা। আর তৃতীয় জন বীর সামসউদ্দীন গজনাভ, জীজীর স্বামী, বাদির আমরা পরে তাঁর উপাধি আংকা খান নামে অভিহিত করব। প্রসঙ্গতঃ কল ক্রাশ, হাফস আপার পুত্রের নাম আখর খান, বীর সমাধিসৌধের

করস মাত্র চার। হঠাৎ সংবাদ এল কাবুলযুদ্ধে নারিক হুমায়ূন হত। কামরান তৎক্ষণাৎ সিম্বাস্তে এলেন—হুমায়ূনের বা-কিছ, আছে হাতাতে হবে। শিশু আকবরকে বন্দী করে কামরান ঘোষণা করলেন, তিনিই বাবুর-বাদশার অবশিষ্ট সন্তানদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ, ফলে হিন্দুস্থানের তত্ত্ব-ভাউসের হক্ হিসাবাদার। হুমায়ূন কান্দবে অহত হরোছিলেন মাত্র ; মাস দুয়েকের মধ্যে সুস্থ হয়ে সৈন্য এসে উপস্থিত হলেন। কামরানের

কিল্লা আক্রমণের উদ্যোগ করতেই নজরে পড়ল দুর্গ-প্রাকারের সর্বোচ্চস্থানে দাঁড়-দিয়ে বাঁধা আছে একটি শিশু, আর তাকে এক হাতে জাপটে ধরে অপর হাত নেড়ে নেড়ে একটি মহিলা কী-যেন চিৎকার করে বলছে। ইতিপূর্বেই কামান দাগার হুকুম হয়েছিল। হুমায়ূন ছুটে গিয়ে কামানের মুখ ঘুরিয়ে দিলেন। অগ্নিস্পর্শে কামান গর্জে উঠল ঠিকই, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। বলা যায়, প্রায় অলৌকিকভাবে রক্ষিত হল শিশু আকবরের প্রাণ। আকবরকে আড়াল করে এবং মৃত্যুকে তুচ্ছ করে যে মহিলা কামান দাগতে নিষেধ করেছিলেন তিনি ঐ শিশুর ধাইমা : মাহমুদা আঙ্গা।^২

তবু যুদ্ধ হল। কামরানের 'ও কুমীর তোর জলকে নেমোঁছ' খেলায় এবারও হার হল। জান-মান নিয়ে তিনি খিড়কি দরজা দিয়ে পালাবার পর হুমায়ূন কিল্লা ফতে করলেন।

এর পরেই ঘটল দ্বিতীয় একটি কৌতুককর ঘটনা। আকবর ও তার মায়ের পুনর্মিলন।

মাত্র একবছর বয়সে আকবর মাকে ছেড়ে অন্যত্র মানুষ। হারেমের মহিলাবৃন্দের কৌতূহল হল জানতে যে, আকবর তার অদেখা মাকে ঠিকমতো চিনে নিতে পারে কিনা। আবদুল ফজল বলছেন^৩, হারেমের একটি কামরায় দশ পনের জন সমবয়সী ঔরং প্রায় একই রকম সাজ-পোশাক পরে বসেছিলেন। হামিদা বানুর মাথায় তাজ বা পরিধানে অন্য কিছু ছিল না, যাতে তাঁকে হুমায়ূন-মহিষী বলে সনাক্ত করা যায়। মাহমুদা আঙ্গা শিশু আকবরকে হাত ধরে সেখানে পৌঁছে দিয়ে বললেন, ঐ ঔদের মধ্যে তোমার আম্মাজান বসে আছেন, খুঁজে নাও দিকিন!

কাঁঠন পরীক্ষা। চার বছরের শিশু, মাকে খুঁইয়েছে মাত্র একবছর বয়সে। ফটো দেখিনি কখনো, গল্প শুনেছে মাত্র। অথচ একঘর মহিলার সম্মুখে নিজের মাকে না চিনতে পারাও যে বড় লজ্জার—সে বোধটুকুও হয়েছে তার। ডগর দুটি চোখ মেলে বালক একবার দেখে নিল গোল-হয়ে বসা মহিলাবৃন্দকে। তারপর ম্যাগনেটিক-কম্পাস যেমন দুল্ভূতে দুল্ভূতে এক সময়ে থেমে যায়, ঠিক সেইভাবে স্থির লক্ষ্যে তাকালো একটি অসামান্য সন্দরীর দিকে। এক ছুটে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর বৃকে। কাঁচলীর উপর মুখটা চেপে ধরে বসলে, তুমিই আমার মা! তাই না?

বানু বেগম ওর মুখটা চুমায় চুমায় ভরিয়ে দিয়ে বললেন, কেমন করে চিনলি শোকা?

কেমন করে চিনলেন আকবর? আবদুল ফজলের ব্যাখ্যা : এ হচ্ছে ডায়েমন্ড বাদশা, দীন-ইলাহীর হু

প্রবর্তক জালালউদ্দীন আকবরের 'গুণো' বোঝনা। তিনি এতই অভিজ্ঞত সে, তাঁর জীবনীর ঐ পৃষ্ঠায় একটি ছবিও যোগ করেছেন (চিত্র-৭.১)। ঘটনা যদি সত্য হয়, তা হলে এটাকে অলৌকিক বলে মনে করার কিছু নেই। পোশাক পরিচ্ছদ একরকম হলেও পুত্র-স্নেহবর্ণিত জননীর অন্তরেও যে চৌম্বকশক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল তা কি তাঁর মুখে রেখাপাত করেনি?

এই প্রসঙ্গে গনে পড়ছে, পরিণত বয়সে মকরং আকবরও একটি অদ্ভুত পরীক্ষা করেছিলেন—চারবছর বয়সে শিশুর মানসিকতা তোল করত। সে-কথা কলব, ফতেপুর-সিক্রিতে, আকবর নির্মিত 'গুণো-মহলের প্রসঙ্গে। আমি ভুলে গেলে, আপনারা আম্মাকে মনে করিয়ে দেবেন।

শেরশাহ-র অযোগ্য বংশধরদের হাত থেকে হুমায়ূন তাঁর হতরাজ্য উদ্ধার করে বখন দিল্লীতে পুনরায় প্রবেশ করলেন (July, 1555) তখন আকবরের বয়স তের। আর ষোড়শ পুরানা কিল্লার সিঁড়ি থেকে পড়ে মারা গেলেন সে সময় আকবর বৈরাম খাঁর হেপা-জতে পঞ্জাবে। হুমায়ূন যে মারা গেছেন এ খবর সংগোপনে রাখা হল। দ্রুতগামী গুপ্তচর ছুটল বৈরামকে গোপনে সংবাদ দিতে; আর প্রতিদিন সকালে পুরানা কিল্লার দেওয়ানী-আমের করোকর তাজ পরে, জোখা জড়িয়ে কৃত্রিম হুমায়ূন প্রজাবৃন্দকে আশীর্বাদ করে গেলেন। লোকটার নাম মোল্লা বক্শি—তার একমাত্র গুণ, তাকে দেখতে হুবহু হুমায়ূনের মতো! বৈরাম খাঁ এক অসামান্য চরিত্র। আকবরের প্রথম জীবনের ইতিহাসে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে (1556) আদিলশাহ শ্বরের মন্ত্রী হঠাৎ-সুলতান হিমুকে পরাস্ত করে বৈরামই আকবরের বাদশাহীর সূচনা করেন। তিনিই তাঁর অভিষেকের যাকতীয় আয়োজন করেন।

আকবর তের-চৌদ্দ বছর বয়সে বাদশা হলেন। বৈরাম তাঁর অভিভাবক। কিন্তু বছর পাঁচেকের মধ্যেই বৈরামের সঙ্গে কিশোর আকবরের মতপার্থক্য দেখা দিল। বিরোধের নয়টি হেতু দেখিয়েছেন আকবর-জমানার প্রামাণিক ইতিহাসকার।^৪ কিন্তু সে-সব ইতিহাস আমাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। আকবর বৈরামকে একটি ব্যক্তিগত চিঠি লিখে তাঁকে মক্কা-তীর্থে রওনা হবার পরামর্শ দিলেন। ঐ পত্রেও তিনি বৈরামকে 'খান-বাবা' বলে পিতৃ-সম্বোধন করেছেন এবং যথেষ্ট মর্যাদা দিয়েছেন। বৈরাম স্বেীকৃত হয়ে মক্কা বাওয়ার আয়োজন করতে থাকেন; হঠাৎ সামান্য ভুল বোঝা-বৃদ্ধিতে বৈরামের মৃত বদলময় এবং তিনি বিদ্রোহ করে

ফসেন। আকবর এ বিদ্রোহ দমন করে বৈরামকে বন্দী করেন। কিন্তু তিনি তাঁকে পুনরায় সসম্মানে মুক্তি দিয়ে মক্কায় চলে যাওয়ার পরামর্শ দেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ মক্কা যাবার পথে অততায়ীর ছুরিকায় বৈরাম নিহত হন। এ কাজে আকবরের কোনো হাত ছিল না। বরং তিনি বৈরামের স্ত্রী-পুত্রকে ফিরিয়ে আনেন। বৈরাম পুত্রই সুবিখ্যাত পণ্ডিত আবদুর রহিম খান-ই-খানান্, যিনি বাবরের চুগতাই তুর্কীতে লেখা আত্মজীবনী সহজবোধ্য ফার্সীতে অনুবাদ করেন এবং যার সমাধি আমরা খুঁটিয়ে দেখব একটি বিশেষ কারণে।

বৈরাম-বিতাড়ন নাটকের নেপথ্যে যে চিত্রান্ত হয়েছিল তার প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ দুটি চরিত্র আমাদের অপরিচিত নন—মাহমুদ আঙ্গা এবং তাঁর পুত্র আধম খান। মাহমুদ আঙ্গা সম্রাটকে প্রাণাধিক ভালোবাসতেন ; তাঁর কিস্তততার বিষয়ে কেউ কোনদিন সন্দেহ প্রকাশ করেননি। কিন্তু তাঁর একটা চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ছিল—বাদশাহী রাজনীতির জটিল ঘূর্ণাবর্তে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার উগ্র বাসনা। নিশ্চয়ই তার বনিয়াদে ছিল উচ্চাশা ; কিন্তু তা আকবরকে অতিক্রম করে নয়। অপরপক্ষে মাহমুদ আঙ্গার পুত্র আধম খান ছিল বে-পরোয়া, মুশকিল-পসন্দ, অসম সাহসিক বোম্বা অথচ ইন্দিয়াসভ, নীতিজ্ঞানহীন এবং নিষ্ঠুর। তাঁদের প্রসঙ্গে এখনই আসব।

ইতোমধ্যে—অর্থাৎ বৈরাম-বিতাড়নের পূর্বযুগেই একবার আকবর বম্বনা বেয়ে কজরাচেপে এসে হাজির হনেন আগ্রায় (Oct, 1558)। তখনও আগ্রা-কিল্লার পরদা হয়নি ; উনি এসে উঠলেন সিকান্দার লোদী নির্মিত ‘বাদলগড়’ দুর্গে। এখান থেকেই তিনি গোরালিয়র, মালোয়া, রণথম্ভোর প্রভৃতি অভিযানের আয়োজন করেন।

বৈরামের বিদ্রোহের সময় আকবরকে বাধ্য হয়ে দিল্লীতে ফিরে আসতে হয়। তিন-চার জনকে উনি পর পর প্রধানসচিব নিযুক্ত করলেন ; এমন কি স্বয়ং মাহমুদ আঙ্গাকেও কিছুদিন বোখভাবে। কিন্তু মনোমত হল না। বৈরামের শাসনস্থান পূর্ণ করবার মতো উপবৃত্ত সোক পাওয়া কঠিন। মাহমুদ আঙ্গা চেয়েছিলেন, আকবর তাঁর পুত্র আধম খানকে ঐ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করুন। কিন্তু আকবর ঐ বে-দরদী জঙ্গী মানদুর্ভাগি হত্যার তামাম হিন্দুস্থানের শাসনদায়িত্ব দিতে স্বীকৃত হলেন না। পরিকল্পিত ক্রীড়ী আঙ্গার স্বামী গজেনবীকে করলেন ‘আংকা খান’ অর্থাৎ চীফ সেক্রেটারী। আধমকেও বঞ্চিত করলেন না তা বরং তাকে সেনাপতি করে পাঠিয়ে দিলেন মালোয়া জয় করতে।

মালোয়ার তদানীন্তন অধিপতি বাজ বাহাদুর সে-আমলের হিন্দুস্থানে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। শৌর্য-বীর্যের জন্য নয়, সম্পূর্ণ অন্য কারণে। কারণ মতে সঙ্গীতসম্রাট তানসেনের তিনি পূর্ব-সূরী—এমনই ভারত-বিখ্যাত সুযশ ছিল তাঁর সঙ্গীত জগতে। আকবরী দরবারে তখনও সঙ্গীত প্রবেশ করেনি, তানসেন অনাগত, সেই প্রাক-তানসেনী জমানায় বাজ বাহাদুর গীতভারতীর বরপুত্র। তাঁর দরবারে সেনাপতির চেয়ে সঙ্গীতজ্ঞের কদর বেশি। আর সবার চেয়ে খ্যাতি ছিল এক অসামান্য বাঈজীর : রূপমতী !

অনিন্দসুন্দরী রূপসী এবং অসামান্য গায়িকা। বাজ বাহাদুর নাকি তার মহম্মতে বাওরা। বাঈজী কিন্তু হারামে থাকতে রাজী হয়নি ; নগরপ্রান্তের নিজ্জান নদীতীরে নিভৃত মঞ্জিলে বাস করত সে। মধ্যরাতে সহসা সেখানে আবির্ভূত হতেন বাজ বাহাদুর, দরবারী-কানাড়া শুনবার বাসনা হলে ; অথবা শেষ রাতে—রামকেলীর আকর্ষণে। কারণটা বড়ই বিচিত্র—দুজনেরই বিশ্বাস : বিরহ নাকি শূদ্ধ মহম্মতেরই নয়, সঙ্গীতেরও অন্যতম উপজীব্য !

এ-হেন কিসের রাজ্যে বাদশাহী ফৌজ নিয়ে বীরদর্পে আবির্ভূত হল আধম খাঁ আর পীর মহম্মদ—যেন কুমোরের দোকানে জোড়া বলিবর্দ ! বাজ বাহাদুর তানপুরা-বীণা-রবাবের ভিতর থেকে কোনোক্রমে খুঁজে বার করলেন তাঁর মরিচাধরা তলোয়ারখানা। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। ধন-দৌলত, ইমান-ইজ্জৎ বিসর্জন দিয়ে পালিয়ে গেলেন খান্দেশের দিকে।

বিজয়োন্মত্ত আধম আর পীর মহম্মদ মালোয়ায় যে অকথা অত্যাচার চালালো তার বর্ণনা দিয়ে গেছেন প্রত্যক্ষদর্শী ঐতিহাসিক “ওরা দুজন বসেছিল সুউচ্চ মণ্ডের উপর, আর হতভাগ্য মালোয়াবাসীদের সার দিয়ে নিয়ে আসা হিচ্ছিল কুরবানী করতে। মৃত্যুভয়ে ভীত আত্ম নরনারীর চীৎকার শুনে ওরা দুজন হাসিমুখেরা করছিল। শেখ-সৈয়দদেরও নিষ্কৃতি মেলেনি।

আধম হুকুম জারি করে রেখেছিল—মুগলসৈন্য মালোয়ার যৌবনবতীদের ইচ্ছামতো দখল করতে পারে, শূদ্ধ যদি রূপমতীকে জীবন্ত ধরতে পারা যায় তাহলে কেউ তার গাত্রস্পর্শ করবে না। তাকে পোঁছে দিতে হবে স্বয়ং সিপাহ-সালারের শিবিরে।

হত্যা-উৎসব শেষ হল রাতির তৃতীয় যামে। ক্রান্ত প্রসঙ্গ রক্তমাখা অধম শয্যাগ্রহণের উপক্রম করছে, ঠিক তখনই এসে জবর খবর : রূপমতীকে জিম্মা পাওয়া গেছে !

উৎসাহে চারপাইয়ের উপর উঠে বসল আধম : তব
লাও বহু ছুকরিকো !

দুই মঙ্গলসৈন্য দুই বাহাদুর ধরে নিয়ে এল
বন্দিদ্বীপকে। রূপমতীর ঘাঘরা ছিন্নাভিন্ন, ওড়না খসে
গেছে, কাঁচুলি স্থানচ্যুত। তার কপালে রক্তের ধারা।
আধম অবাক বিস্ময়ে দেখছিল তাকে—একই অঙ্গে এত
রূপ !

কে-যেন বলেছিল—পানের গিক যখন ওর কণ্ঠ-
নালী দিয়ে নামে তখন ঐ কোকিলকণ্ঠীর কণ্ঠ নাকি
রক্তিম হয়ে ওঠে। আধমের মনে হল, কথাটা
হয় তো মিথ্যা নয়।

বন্দিদ্বীপকে সিপাহ-সালারের সম্মুখে রেখে দুই
সৈনিক কুর্নিশ করে নিষ্কান্ত হল।

শিবির নির্জন হলে নতনৈ বন্দিদ্বীপ তার হরিণ
নয়ন দুটি তুলে একবার তাকালো সেনাপতির দিকে।
সে দৃষ্টিতে মৃত্যুভয়ের আর্তি নেই কিন্তু। আধম
বললে, তোমারই নাম রূপমতী ?

প্রথা মারফিক আদাব জানালো বাঈজী। যার নীরব
ভাষ : জী হাঁ, খোদাবন্দ !

গোঁফে চাড়া দিয়ে আধম বললে, শোন বাঈজী !
বেয়াদবী আমার বিলকুল লা-পসন্দ। রাতে যাকে
আমার বিছানায় উঠে বসার অধিকার দিই তার সত্যী
পনা আমার বরদাস্ত হয় না। বেচাল দেখলে তোমারে
ঐ কাঁচুলী-খসা বকের উপত্যকায় এই ছোরাখুঁসি
আমূল বিস্ম করে দিতে আমার হাত কাঁপবে না।

কিছু বদলে ?

রূপমতী একটি কুর্নিশ করে অক্ষুটে বললে,
'বক্ৎল-এ চুন মনীগর খাতিরং

খুশনুদ মী গরদদ্।

বজায় মিন্নং ওয়ালি টেঘ-ই-তু দন্

আলদুদ মী গরখদ্ ॥*

কিছু বদলেন ?

আধম ফাসী না জানে তা নয়, কিন্তু কাব্যমাদুর্য
শিরস্তাণ ভেদ করে ওর মগজে প্রবেশ করতে পারল
না। বললে, সোজা ভাষায় বল, কী বলতে চাও ?

—সোজা ভাষায় তার অর্থ—আপনার শারীর্-
জবানে আমি বে-হুস্ ! কিন্তু খোদাবন্দ ! আমি
বাকিরা নই, বাঈজী, সুরং আর জওয়ানি নিয়েই
আমার মহন্বতের বেসাতি। আর জানি গাইতে, নাচতে,

* 'খুন-খারাবির রক্ত-তামাশায় খেলতে হোলা চাও ?
খুশ্ হবে কি গুপ্তিখানা বিধলে বকে ? দাও !
তোমার খুশেই হই খুশিয়াল, ভয় শখ্ মোর দিলে
খুন-কলংক লিপ্ত হবে তোমার ছোরাটাও ॥'

সুর ও সুরার ভানুমতীতে কেহস্ত পয়দা করন্ত !
তাই আমি তানতে চাইছি মঙ্গল সেনাপতির প্রতি-
রূচিটা কী-জাতের ? মালোয়ার রাজ্যের শ্রেষ্ঠ নটী
রূপমতীকে তার স্নর্মহিমার পেতে চান, না কি রক্ত-
মাখা একটা বিবস্ত্রা নারীদেহ দর্শন করতে চান ?

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোনো মরমানুষের
মুখে এমন মর্মান্তিক স্পষ্টভাব কখনো শোনেনি আধম।
সবিস্ময়ে বললে, তুমি খুশ-দিলে আমাকে গান
শোনাবে ? নাচ দেখাবে ?

খিলখিলিয়ে হেসে উঠল রক্তক্ষরী নটী। বললে,
এইমাত্র কি বললাম, শুনলেন না ? আপনার খিদ্র-
গারদের বলুন না নিয়ে আসতে—ঘুঙ-ঘট, তানপুরা,
বাঁয়া-তব্লা—আমি এই জঙ্গীছাউনিতেই কেহস্ত
পয়দা করব !

আধম বললে, বহুৎ খুব ! এখানে নয়। কাল
সূর্যাস্তকালে তোমার মঞ্জিলে যাব, দেখব মেহমানকে
কেমন আদর-আখ্যায়ন করতে পার। গান শুনব,
নাচ দেখব, আর...

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে পাদপূরণ করল বাঈজী,
সিরাজি পান করব, আর...

আর ?

আড়ম্ব নত হয়ে আদাব জানাবার অছিলায় মুখ
লুকিয়ে বাঈজী অক্ষুটে বললে, আর পরখ করে
দেখব, সেটা কী জিনিস, যা সিরাজির চেয়েও নেশা
ধরায় !

বাকপটু বাঈজীর সঙ্গে রসালাপ দীর্ঘতর
করার হিম্মৎ নেই কস্তূর্তান্তিক অধম আধমের।
প্রহরীকে ডেকে বললে, একে এর ডেরায় পৌঁছে দিয়ে
আয়। লেঙ্কিন হুশিয়ার, সেখান থেকে পালাতে না
পারে।

পরদিন শোণিতপিচ্ছিল মালোয়ার রাজপথে ঝোড়া
ছুটিয়ে মঙ্গল সেনাপতি এসে উপস্থিত হল বাঈজীর
মঞ্জিলে। আজ আর তার জঙ্গীপোষাক নয়, সাম্বা
অভিসারে সিপাহ-সালারের জামদার আঙুরাখার
আতরের সূবাস, মৌচ-এর প্রান্ত মোম দিয়ে পাকানো।
দেউড়িতে যে প্রহরী ছিল সে এগিয়ে এসে ধরল
ঘোড়ার লাগাম। বাঁদী চিরাগ-হাতে পথ দেখিয়ে নিয়ে
চলল অন্দর মহলে, মমর-অলিন্দের শেষ প্রান্তে রাজ-
নটীর খাশ-কামরায়। বিধবস্ত নগরীর কোন মসজিদ
মিনার থেকে ভেসে আসছে শাম-ওয়াক্তের আজান যেন
প্রিয়জনবিরহে কোন হতভাগের বিলাপধ্বনি। পূর্ব-
বর্তিনী হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো ; কুর্নিশ করে নিঃশব্দে
তুলে ধরল একটি স্ফারপথের রেশমী পর্দা। ডান হাত-

খানা বাড়িয়ে দেয় ঘরের দিকে, বার অর্থ : তসলিম রাখিয়ে।

সতর্ক আশ্রয় খাঁর কেমন যেন মনে হল—এমনটা হবার কথা নয়, এতটা আপ্যায়ন, এতটা অভ্যর্থনা! ষষ্ঠ-ইন্দিরের নির্দেশে কোমরবন্ধ থেকে সমসের-খানা টেনে বার করল সে, স্মারপথে মাথা গলানোর পূর্বে। তার কেবলই মনে হচ্ছে, কোথায় কী-যেন একটা বিস্ময় তার জন্য ওৎ পেতে প্রতীক্ষা করছে!

না কক্ষের অভ্যন্তরে নেই কোনো প্রতীক্ষারত গৃহস্থাতক। চোক সাধা-কালো মার্বেলের মেঝে, বেন দাবার ছক। নির্জন কক্ষের কেন্দ্রস্থলে চন্দন-কাঠের প্রকাণ্ড পালঙ্কে রূপমতী শায়িতা। তার ভীষণটা দেখে চমকে উঠল আশ্রয়।

বাইজীর সর্বাঙ্গ আবৃত করে রাখা আছে একটি অস্বচ্ছ ব্রেসমী চীনাংশুক—তাজা-বুনের বরণ, ঠিক ঐ পশ্চিম আকাশটার মত লালে লাল! কেন কাকন! পালঙ্কের ধারে পাশাপাশি দুটি মেজ। একটিতে চুপার, চষক, সিরাজি, তবক্-দেওয়া সুগন্ধী পান, রেকাবিতে একজোড়া স্নেড়ে মালা। সেটি মেহমানের প্রতীক্ষার প্রহর গুণ্ছে। পাশের মেজ-এ ঠেপ্ দিয়ে রাখা আছে একটি প্রকাণ্ড তানপুরা, তার তারগুলো ছোঁড়া, আর সেই ছোঁড়া তারের গায়ে জড়ানো একখণ্ড কুন্ডল-কাপড়ে মৃত্তোর মতো ভুগুরী হরকে কী-যেন সোকা!

বুকে আর বাকি রইল না কিছু! তবু হাত কড়িরে সরিখে দিল আচ্ছাদনটা। রাজনর্তকীর মূখে মৃত্যুবল্লভের কোনো স্মারক নেই। সে মূখে বিস্ম-কিষ্কিনীর হাসি।*

তানপুরার তারে জড়ানো চিঠিখানা তুলে নিল। বুকে অস্বাধি হর না—এটা তার জন্য নয়, সেই পল্লভক মালোয়া-রাজের উদ্দেশ্যে বাইজীর শেষ সম্ভাষণ—সেই যে পালঙ্কটা অমন সুন্দরীকে হারেন-জাত করেনি, বিরহ-সঙ্গীতের সোহাই পেড়ে!

কিন্তু অশ্রম খাঁর নীতিজ্ঞান অত প্রখর নয়—পরের পর পড়তে তার সন্ধ্যা নেই কোনো। পড়ল, কিন্তু অর্থগ্রহণ হয় না কিছু!

“তুমি কো দর্শনরাজে গল্পদর্শনে কুরসং নহী,
সবসে উল্লসিত সতী মরুসাহি মৃত্যু না সতী।
সে তুমিহারি হা, রতী মেয়ে জিয়ে ক্যা কম হৈ
তুমি মেয়ে হো কে রতী, রে মেয়ে কিস মং না সতী।
তুমি মূখে কুল্যতি জাকো, রে হক হৈ তুমকো,
সেরী বাত ঠের হৈ, সে জো মৃত্যু কি হৈ ॥”

মালোয়ার নৃশংস খিয়নৎ-এর কথা আকবর বাদশার কানে উঠল। শূনে বাদশা শূদ্র সংক্ষেপে বললেন, বাহিনী সাজাও। আমি এখনই মালোয়া যাব।

শিউরে উঠল মাহম আঙ্গা। আকবরকে সে চেনে। তারই বৃকের দুধ খেয়ে আজ শিশু জালাল হিন্দু-স্থানের শাহ-য়েন-শাহ! ক্ষুরধার-বৃষ্টি মাহম আঙ্গার। তৎক্ষণাৎ দ্রুতগতি সংবাদবহ প্রেরণ করল মালোয়ায়। নির্দেশ দিল পুত্রকে—এখন কী করতে হবে। আকবর মালোয়াতে উপস্থিত হতেই তাঁর চরণপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ল আশ্রয় খাঁ। অপহৃত ধনদৌলৎ উজার করে টেলে দিল সম্রাটের চরণে।

আকবর বললেন, তোমার মা পুত্রহীন হবে—শূদ্র সেজন্যেই এ-যাত্রা তোমাকে ক্ষমা করলাম। কিন্তু মনে রেখ, এই শেষ বার! তুমি তৈরী হয়ে নাও। আমার সঙ্গে আগ্রা ফিরে যাবে। মালোয়ার শাসন-দায়িত্ব তোমার হাতে রাখতে পারব না।

এর পরেই আকবর হজরৎ খাজা মৈনুউদ্দীন চিস্তির দরগায় তীর্থ করতে যান। পথে রাজপুত কুল-তিলক অম্বররাজ ভারমল প্রস্তাব পাঠালেন, তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যার সঙ্গে আকবরের বিবাহ দিতে ইচ্ছুক। সম্রাট সম্মত হলেন। তীর্থ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি অম্বর-কুণ্ডারীর পাণিগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, অম্বর রাজকন্যার ধর্মান্তরকরণ হয়নি। তিনি আজীবন হিন্দু দেবদেবীর পূজা-অর্চনা করেছেন। বোধকরি ইতি-হাসে তিনিই প্রথম মহিলা, যিনি মূসলমানের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও হিন্দু! বিবাহের পক্ষকালের মধ্যেই সম্রাট এক ফরমান জারী করে আদেশ করেন, যুদ্ধে বন্দী হিন্দুদের কলপূর্বক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা চলবে না; পরাজিত সৈন্যদলের স্ত্রী-কন্যাদের উপর কোনো অত্যাচার করলে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। ইতিহাসে দেখনি, আশা করব আপনারা দেবেন প্রকৃত অধিকারী-কেই। আমি এই মানবিক আদেশের জন্য ধন্যবাদ দেওয়ার কথা বলছি; আকবরকে নয়, অম্বর-কুণ্ডারীকে।

এর পরেই আগ্রা-কিল্লাতে ঘটে গেল কয়েকটি ঘটনা, যা এত বিদ্যুৎগতি যে, ইতিহাস তার কার্য-

* “দর্শনরাজের দৃশ্যদর্শনা থেকে

তোমার কোনো ফরসং এখন নেই।

সবার সঙ্গে তোমার প্রতিষ্ঠা ফলন, শূদ্র আমিই বাদ।

আমি সে তোমার, এটাই তো আমার তরফে শেষ কথা,

তুমিও সে আমার হবে, এমনটা আশা করি কিসের জোরে?

সম্রাট তুলে সাওয়ার ঢেক তোমার আছে;

জানি, জানি তা।

আমার কথা স্মরণে!

আমি সে সীতাই তোমাকে ভালবেসেছিলাম ॥”

কারণ সম্পর্কের ধরতাইটা ঠিকমতো ধরে রাখতে পারিনি। আংকা খানের উপর গাহম আগ্যা এবং আধম খানের জাতক্ৰোধ ছিলই—বোধকরি আধম অনুমান করেছিল, তার মালোয়ার কীর্তিকাহিনী আর রূপমতীর কিসসা ঐ আংকাই সম্রাটের কানে তুলেছে। তা সত্য হলেও অন্যায় নয়—সে—কাজ মদুখ্য-সচীবের কর্তব্যভূক্ত। মোটকথা একদিন সকালে আংকা খান যখন আগ্রা-কিল্লার সদর-দফতরখানায় বসে কাজ করছেন তখন দুর্বীর বেগে দই সহচরকে সঙ্গে নিয়ে হঠাৎ আধম খাঁ এসে হাজির। আধম খাঁ সিপাহ-সালার, তাই প্রহরীরা বাধা দেয়নি ; এমন কি দফতরের অন্যান্য কর্মচারী—মুনীম খাঁ, সিহারউদ্দীন প্রভৃতি সসম্মানে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। পদমর্যাদায় আংকা উচ্চতর ; ফলে গজ্জনবী শূদ্র চোখ তুলে তাকিয়ে দেখলেন, গাগ্রোথান করলেন না।

আধম তার সহচর কুশম্ উজ্জবেককে কনুইয়ের এক গোঁস্তা মেরে বললে, কী দেখাছিস বড়বকের মতো ? এই তো সেই বেইমান ! কাজ হাসিল কর !

উজ্জবেক বিনা বাক্যব্যয়ে তার ছুরিটা আমূল বসিয়ে দিল আংকা খানের পাঁজরে ! হায় হায় করে উঠল সবাই। যন্ত্রণার চেয়েও যেন বিস্ময়ের অভিব্যক্তিটা বেশি—বৃন্দ আংকা খান টলতে টলতে উঠে দাঁড়বার চেষ্টা করলেন ; ঠিক তখনই কোষমুক্ত আধমের সামনের খানা আকাশে একটি ঈদের চাঁদ রচনা করল—আর আংকা খাঁর দেহচ্যুত মস্তক ছিটকে গিয়ে পড়ল দফতরখানার প্যাষণ-চত্বরে।

চিৎকার চেঁচামেঁচিতে ছুটে এসেছে সবাই। আধম ঘুরে দাঁড়ালো। রক্তরাঙা আলা-ই-মহলিখ-খানা তুলল মাথার উপর। সন্তুষ্ট প্রহরীর দল পিছিয়ে গেল এক-এক পা। আধম লাফ দিয়ে নেমে এল নিচে ; রুদ্ধ-শ্বাসে ছুটল খাশ্-মহলের দিকে। সম্রাট তখন হারেম।

হাতিয়ারবন্দু সিপাহ-সালারকে ঐভাবে ছুটে আসতে দেখে হারেমের খোজা প্রহরী নিজ বৃন্দ বিবেচনামতো রুদ্ধ করে দিল প্রকাণ্ড সিং-দরওয়াজা। আধম তরবারীর আঘাত করল রুদ্ধ কবাটে : ক্যারি খোল্ দো !

আকবর ছিলেন খোয়াবগাহ-এ। সোরগোল শব্দে এদিকেই আসাছিলেন। কে একজন প্রহরী ছুটে এসে বললে, সর্বনাশ হয়েছে, জাহাপনা ! সিপাহ-সালার আধম খাঁ নে হামারা আংকা খান-সাবকো জান-সে মার ডালা !

জান-সে মার ডালা ! বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন

সম্রাট। উন্মাদের মতো ছুটে গেলেন হারেমের নির্গমন-দ্বারের দিকে। সেই যে খোজা প্রহরী সিং-দরওয়াজা রুদ্ধ করেছিল সেই লোকটা বাধা হয়ে দাঁড়ালো। দরওয়াজার পিঠ দিয়ে দূ-দিকে দূ-হাত প্রসারিত করে রুদ্ধ সম্রাটকে। বজ্রহত হয়ে গেলেন সম্রাট ! সামান্য খোজা-প্রহরী আজ তাঁর পথ রোধ করতে চায় ! এয়া সম্বাই কি বিদ্রোহীদের দলে ! হৃৎকার দিয়ে উঠলেন তিনি : তোরা এত বড় স্পর্শ ! আমার পথ রুদ্ধছিল !

লোকটা আত্মীয় নত হয়ে কুর্নিশ করে কল্লে, দীন-দুনিয়ার মালেক ! আমি শূদ্র আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—আপনি নিরস্ত !

কোমরবন্দু থেকে একটা বাঁকা ছুরি বার করে সে সম্রাটের পদপ্রান্তে নামিয়ে রাখে। তৎক্ষণাৎ পথ ছেড়ে তিন-পা পিছিয়ে যায়, কুর্নিশ করতে করতে।

স্বার খুলে বেরিয়েই মদুখোমুখি হলেন আধম খাঁর। তার হাতে তখনো আংকা খানের রক্তরাঙা নাভ্য তলোয়ার। সম্রাটের হাতে বিষপ্রমাণ চোরা গোস্তা। আধম একটা চিতাবাঘের মতো লাফ দিয়ে পড়ল সম্রাটের উপর। ডান হাতে ধরা তলোয়ারটা সে কিন্তু কব্জার করেনি—শূদ্র বাঁ-হাতে বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরেছে শাহ-য়েন-শাহের দক্ষিণ মণিবন্দু ! চাঁৎকার করে ওঠে লোকটা : সমস্ত ব্যাপারটা আগে তলিয়ে দেখুন জাহাপনা ! আমার নামে আংকা মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছিল।

আধম খাঁর মায়ের যে অধিকার আছে, তার ভা নেই—সম্রাটের গাত্রস্পর্শ করার ! দুরন্ত ক্রোধে আকবর জ্ঞান হারালেন। দৈহিক শক্তি তাঁর অপরিসীম। মাত্র তের বছর বয়সে পানিপথের যুদ্ধক্ষেত্রে এক কোম্পে তিনি স্বহস্তে হিম্মত মস্তক স্কন্ধচ্যুত করেছিলেন ! এখন তিনি বিশ-বছর বয়সের নওজোয়ান। বাঁ-হাতে প্রচণ্ড আঘাত করলেন আধম খাঁর দক্ষিণ মণিবন্দু—হস্তচ্যুত হল হাতিয়ার। কিন্তু আধম খাঁও মস্তহস্তীর বল রাখে তার দেহে—ইতোমধ্যে হস্তচ্যুত হয়েছে আকবরের ডান হাতের সেই ছোরাখানাও ! দৃষ্টিতেই নিরস্ত ! দৃষ্টিতেই অসীম বলশালী ! ঈদের পায়ের কাছে পড়ে আছে একজোড়া হাতিয়ার। খন্ডমদুহুতের জন্য দুই রাজপুরুষ পরস্পরের দিকে নিঃসঙ্গ তাকিয়ে রইলেন—যেন আসন্ন কালকৈশাখীর পূর্বমুহূর্ত। সহসা বিদ্যুৎগতিতে আকবর মুষ্টাঘাত করলেন আধমের চিবুকে। ভূতলশায়ী হল যেন ভূমর ! তৎক্ষণাৎ তিন চারজন প্রহরী কাঁপিয়ে পড়ল ভূতলশায়ী লোকটার উপর।

আকবর বজ্রনির্ঘোষে বললেন, ওকে চাঙদোলা করে নিয়ে যাও ঐ পাঁচিলের উপর—ফেলে দাও নিচে !

দুর্গ-প্রাকার রাজপথ থেকে দশ মিটার উঁচু পাকা তিনতলা। নিচে শাহ-ন-বাঁধানো পাথরের চত্বর! নিঃসন্দেহে—এ মৃত্যুভয়!

আথম চাঁৎকার করে উঠল মৃত্যুভয়ে।

ইতিহাসকার আব্দুল ফজল দেখাছি উল্লেখ করতে ভুলেছেন—আথমের সেই মৃত্যুভয়-জানত আতীর সঙ্গে মালোরাবাসীর মৃত্যুভয়-জানত চাঁৎকারের কোনো ধনিসাদৃশ্য ছিল কিনা!

মৃত্যুভয়-দুর্গ-প্রাকারের কুঞ্জ-অন্তরালে অবস্থিত হল আথম খাঁর দোদুলমান দেহ।

আকবর কুৎব মিনারের মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে ছিলেন বাহুবলবৎ। যে প্রহরীটা আংকা খাঁর মৃত্যু-সংবাদ প্রথমে জানিয়ে ছিল, তাঁকে কলেন ঝুঁকে পড়ে দেখতে। প্রশ্ন করলেন, আভি তক্ জিন্দা হয়, ক্যা?

লোকটা কুঁশ করে বললে, জী হ্যাঁ, খোদাবন্দ! মখসুর! লোকিন জিন্দা।

আকবর তাঁকে আদেশ করলেন, তাহলে ওকে আবার উঠিয়ে নিয়ে আর। আবার ছুঁড়ে ফেল! না মরলে, আবার! কতক্ষণ না তুই এসে আমাকে কলতে পারিস্ : মর নে বহ্ আথম খান-সাকো জান সে মার জলা।

একটু পরেই প্রহরীরা আবার চ্যাঙদোলা করে নিয়ে এল হতভাগ্য সিপাহ-সালারকে। লোকটা মখসুর, অর্থাৎ মারাত্মকভাবে আহত, কিন্তু জ্ঞান হারায়নি। শ্বিতীয়বার প্রাণভিক্ষা চাইবার মতো বাক-ক্ষমতা তার ছিল না। একইভাবে তার দোদুলমান দেহটা দুর্গ-প্রাকার থেকে নিষ্কিন্ত হল রাজপথে। এবার পতন হয়েছে মাথা নিচু দিকে করে। চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে আথম খাঁর মস্তক!

আকবর পিছন ফিরেই মৃণোমুখি হলেন তাঁর ধাই-মার। ঐতক্ষণে দুঃসংবাদ পেয়ে ছুটে এসেছেন মাহমুদ আল্লা। তিনি শব্দ জেনেছেন, আংকা খান নিহত এবং বাদশা স্কয়ং অততরীকে শাস্তি দিচ্ছেন। তিনি অনুমান করেছেন, শ্বিতধী আকবর অপরাধীকে প্রেফতার করে কারাগারে নিষ্কেপ করেছেন মার। মাহমুদ আল্লাকে দেখে বাদশা শব্দ বললেন, লোকটা আমার আংকাকে (চীক সেক্টোরীকে) কতবারত অবস্থার হত্যা করেছে। হক্ হাক্কিং ওকে ক্ষমা করতে পারে না।

মাহমুদ বললেন, তুম্ নে ঠিকই কিয়া হয় কোটা!

জানতে পারলেন অনার্তকস্বেই। অজ্ঞান ত্যাগ করলেন বৃথা। আকবরের সঙ্গে আর দেখা করেননি। আব্দুল ফজলের সর্চাশিত সিদ্দান্ত—তবু তিনি মনে মনেও আকবরকে অভিলাপ দেননি। একচাঁদ্রশ দিনের

দিন পূর্ণশোকে কাতর অনশনরতা বৃদ্ধার সব যন্ত্রণার অবসান হল। সংবাদ পেয়ে শাহ-য়েন-শাহ্ স্বেয়ং উপস্থিত হলেন আগ্রা-শহরের অপর প্রান্তে বৃদ্ধার আবাসে। শববাহীরা তখন তাঁকে ধরাধরি করে বাহিরে আনছে। আকবর তাদের একজনকে সারিয়ে দিয়ে স্বেয়ং কাঁধ দিলেন। কে একজন অমাত্য সাহস করে বললে, আপনি কেন জাহাঁপনা, আমরা তো আছিই।

সম্রাট কললেন, সে তোমরা বুঝবে না।

আংকা আর আথম খাঁর জন্য দিল্লীতে মক্‌বারা বানিয়ে দিলেন সম্রাট—রাজকোষ থেকে অকাতরে অর্থ ব্যয় করে। আথম খাঁর মক্‌বারার কথা ইতিপূর্বেই বলেছি (চিত্র—6.5); শব্দ তখন উল্লেখ করতে ভুলেছি, ঐ-অষ্টভুজাকৃতি ইমারতেই শায়িতা আছেন একজন ভগ্নহৃদয়া বৃদ্ধা—যিনি তোপের মৃদু থেকে শিশু আকবরকে রক্ষা করার উদ্দেশে নিজের বুক পেতে দিয়েছিলেন একাদিন, যাঁর মরদেহ বহন করতে তক্ত-তাউস ছেড়ে তামাম হিন্দুস্থানের শাহ-য়েন-শাহ্‌কে নেমে আসতে হয় পথের ধূলোয়।

গিয়াসউদ্দীন গজনবী, আংকা খান-এর মক্‌বারা নিজামউদ্দীন আউলিয়ার উত্তর প্রান্তে। ছোট্ট মক্‌বারা। ভিতরটা মাত্র 6 মিটার দৈর্ঘ্য-প্রস্থে। নিজামউদ্দীন আউলিয়ার বড় বড় ইমারতের মাঝখানে একান্তবাসী ঐ ইমারৎটা দেখলে মনে হয় যেন ধর্ম-ভীরু একজন কেরানী আপন মনে দফতরে বসে কাজ করছে—‘ডেবিট-ক্রেডিট’ আর ‘লেজার’-এর বাইরেও যে একটা দুনিয়া আছে তা ও জানে না। শর্মাজীর ভাষায়, ‘Although small in size, it is virtually a gem of architecture.’^{১৪} (হোক আকারে ছোট, এ একটি স্থাপত্য রত্ন)।

গাইড আমাকে বলেছিল, লক্ষ্য করে দেখুন, এ ইমারতের পাথর সব লাল, আর তার মাঝে মাঝে ধপ্পে সাদা কী সুন্দর মার্বেলের কাজ। এমনটি আর কোনো বাড়িতে দেখতে পাবেন না গোটা নিজামউদ্দীন আউলিয়া-চত্বরে।

তাই তো! কিন্তু কেন এই বিচিত্র পরিকল্পনা? গাইডকে প্রশ্ন করেছিলাম, সে জবাব দিতে পারেনি। আমিও কোনো কারণ খুঁজে পাইনি।

আজ আব্দুল ফজলের প্রামাণিক ইতিহাস পড়তে পড়তে মনে হচ্ছে—তার মানে সম্রাট কি ভুলতে পারেননি সেই দৃশ্যটা? দফতরখানার শাহ-ন আংকা খানের রক্তে লালে-লাল হয়ে গেছে! আর উবড় হয়ে পড়ে থাকা হতভাগ্যের পিঠ থেকে উঁচু হয়ে বেরিয়ে আছে আত-তারীর ছাঁরির সেই ধপ্পে সাদা হাতীর দাঁতের মূঠ?

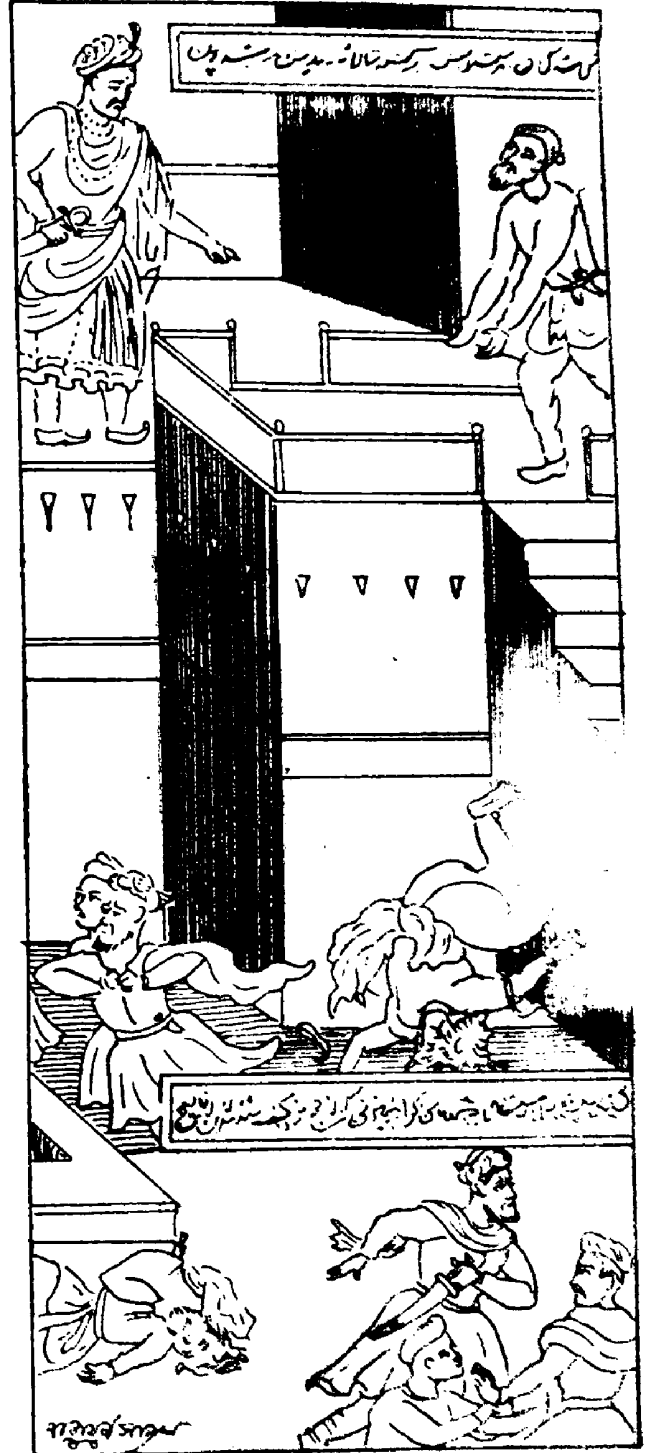
জীবনচরিতের ঐ পৃষ্ঠাখানি আকবর সচিত্র করিয়েছেন। ওয়াশিংটনে স্মিথসোনিয়ান সংগ্রহশালায় রক্ষিত" আকবর-নামার এই সচিত্র পৃষ্ঠাতে (চিত্র-9.2) দেখাছি শিল্পী অজন্তার ঢঙে ছবির মাধ্যমে কাহিনী বলেছেন। সর্বনিম্ন বামে আংকা খানের মৃতদেহ—তার মন্তক দেহচ্যুত ; পাশেই দেখাছি নাঙা তলোয়ার হাতে আধম খাঁ ছুটছে হারেমের দিকে। তার পাশে সহকারী উজবেগ খাঁ ও সম্মুখে প্রহরী। ঠিক তার উপরের ধাপে, বামে দেখাছি উজবেগকে নিয়ে আধম খাঁ এসেছে আকবরের সন্ধানে। চিত্রের উপরাধেব আকবর ও খোজা প্রহরী। আকবর সেখানে আদেশ দিচ্ছেন—যতক্ষণ না মৃত্যু হয় ততক্ষণ, বারে বারে, অপরাধীকে দুর্গ-প্রাকার থেকে নিচে ফেলে দিতে হবে। আধমের পতনও আঁকা হয়েছে।

ছবিতে আকবরকে প্রৌঢ় বলে মনে হয়, যদিও বাস্তবে তাঁর বয়স তখন মাত্র বিশ বছর। কিন্তু আধম ও উজবেগের দুটি চিত্রে 'ফটোজিনিক' সাদৃশ্য—যে চাতুর্ষ অজন্তায় বারে বারে দেখেছি—মহাজনক, সীকলী, বিশ্বান্তর, জুজুকের আলোখো।

দিল্লীতে মথুরা রোডের ধারে আকবরী-জমানার সর্বপ্রথম সুবৃহৎ স্থাপত্য-কীর্তি : 'ইমায়ুন-স্ টম্ব'। উদ্যান ঘেরা সমাধিসৌধ পূর্বযুগে যে নির্মিত হয়নি, তা নয় ; কিন্তু এত প্রকাণ্ড বাগিচায়, এমন সুসমঞ্জস তরুবিধিকার আবেষ্টনীতে স্থাপত্য-কীর্তিকে মহিমময় করে তোলায় প্রয়াস ইতিপূর্বে হয়নি—এ সেই বাবুরী চাহরবাগ পরিকল্পনার বিচিত্র বিকাশ। ইমায়ুন-মক্‌বারায় পারস্য স্থাপত্যশৈলী অত্যন্ত সোচ্চার।

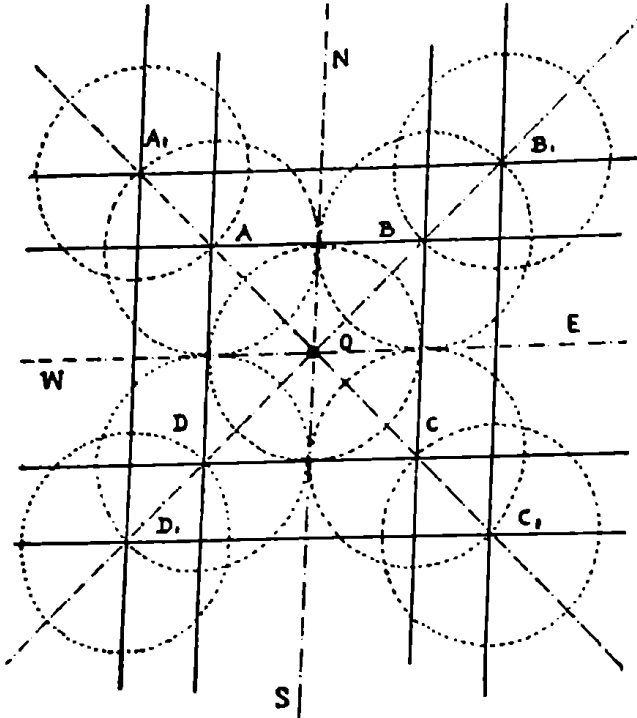
সমস্ত উদ্যানটি চতুঃখণ্ডে বিভক্ত। প্রধান প্রবেশ পথে সুউচ্চ একটি মিনতল দরওয়াজা, যা নিজেই এক স্থাপত্য-কীর্তি। বাগিচার কেন্দ্রবিন্দুতে যথেষ্ট উঁচু বেদী বা মোকাম-কুর্সির উপর মূল ইমারৎ। ত্রি-তল পরিকল্পনা। নিচের তলায়—যা নাকি মূল ইমারতের শ্লিথ, অত্যন্ত বিস্তৃত। তার প্রতি দিকে সতেরটি করে খিলান, অর্থাৎ সর্বমোট চার-সতের আটষটি এবং চারকোণায় চারটি মিলে বাহান্তরটি খিলান। এই খিলান-গর্দলি বস্তুত এক-তলার কক্ষগর্দলির প্রবেশম্বার। শব্দ কেন্দ্রস্থ খিলানে আছে সোপান, তা বেয়ে মিনতলের উপর ওঠা যায়। একতলার কক্ষগর্দলি ছিল আতিথিদের আবাসস্থল। মূল সৌধের চারপ্রান্তে চারটি কেন্দ্রস্থ জিয়ান, দূ-পাশে দুটি করে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার খিলান। সৌধের কেন্দ্রস্থলে প্রকাণ্ড

গম্বুজ. সাদা মার্বেল পাথরের। চার-কোণায় চারটি ছত্রী, এ-ছাড়া জিয়ানের দু-প্রান্তে দুটি করে ছোট

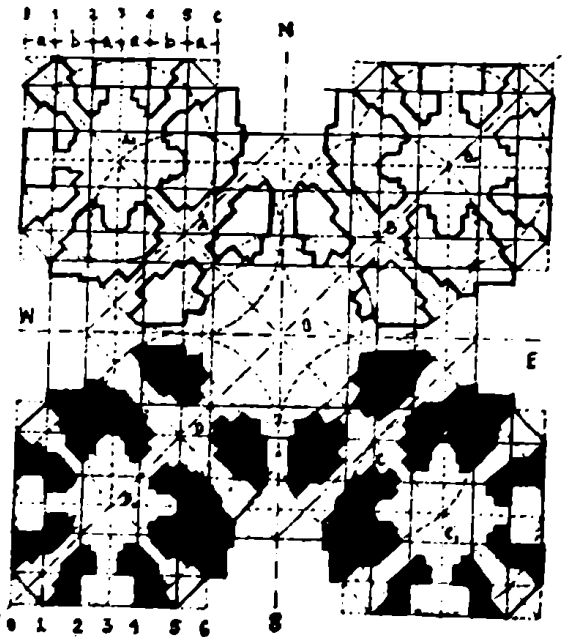


চিত্র-9.2 আংকা খানের হত্যা ও আকবর শাসিত।
[আকবর-নামা অনুসরণে]

ছোট ছত্রী। তাদের সলো মিডালী করেছে বোলোটি ছোট এবং আটটি বড় গুলদস্তা (চিত্র-9.5)।



চিত্র-9.3 হুমায়ুন-মকবরার নকবস্তের মৌলছন্দ।



চিত্র-9.4 হুমায়ুন-মকবরার বাস্তু নকশার জ্যামিতিক-বিস্ফার।

এ ইমারতে সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এর প্ল্যানিং-ছন্দ। ইতিপূর্বে, লক্ষ্য করে দেখুন-ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যের প্ল্যানিং-এর মর্মমূলে সরলরেখা ছাড়া আর কিছু ছিল না। বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র, ষড়ভুজ, অষ্ট-ভুজ বা কৌণিক-কোণ-বিশিষ্ট জ্যামিতিক ছন্দ। এ-ক্ষেত্রে বাস্তু-নকশায় দেখছি নকশা-নিবিশ কাজ শূন্য করেছেন নয়টি বৃত্ত দিয়ে। নয়টিই সমান মাপের (চিত্র-9.3)। কেন্দ্রে একটি এবং তারপর ঈশান, নৈঋত, অগ্নি, বায়ু কোণে কেন্দ্র স্থাপন করে চারটি সম-মাপের বৃত্ত এমনভাবে আঁকা হল, যাতে তারা উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম রেখাকে স্পর্শ করে। অতঃপর ঐ চারটির চার কোণে পুনরায় চারটি সম-মাপের বৃত্ত আঁকা হল A_1, B_1, C_1, D_1 বিন্দু চতুষ্টয়কে কেন্দ্র করে, যাতে এই বৃত্ত-চতুষ্টয় পূর্ববর্তী বৃত্ত-চতুষ্টয়ের কেন্দ্রকে স্পর্শ করে।

এই নয়টি সম-মাপের মৌল বৃত্ত থেকে কী-ভাবে ইমারতের বাস্তু-নকশা ছকা হয়েছে তা চিত্র-9.4-এ বোঝাবার চেষ্টা করছি। প্রান্তিক বৃত্তগুলিকে বেষ্টন করে যে বর্গক্ষেত্র, তার প্রতিটি পাশকে ছয়ভাগে ভাগ করা হল। ছয় সমানভাগে নয় কিন্তু। প্রান্তিক বৃত্তটির ব্যাস যদি হয় D , তাহলে $D=4a+2b$; . . i.

এখানে 'a' মাপ জ্যামিতিক হিসাবে পাওয়া যাচ্ছে। যে-হেতু 3-3 সরলরেখা A_1 ও D_1 বিন্দুর উপর দিয়ে টানা ; এবং 2-2 সরলরেখা A-বৃত্ত ও D-বৃত্তকে স্পর্শ করে উত্তর-দক্ষিণ রেখা, ফলে a মাপ সুনির্দিষ্ট। এখন যে-হেতু সমীকরণ (i)-এ আমরা D ও a-র মাপ জানি, তাই বীজগণিতের মাধ্যমে b-কে হিসাব কষে বার করতে পারি ; নয় কি ?

জ্যামিতি ও বীজগণিতে আপনার এ্যালার্জি আছে কিনা জানি না, আমি কিন্তু এ-খানেই ক্ষান্ত দিচ্ছি। কারণ এ্যালার্জি যদি না থাকে তাহলে যেটুকু বলেছি, তার সাহায্যেই আপনি গোটা প্ল্যানটা আঁকতে পারবেন।

প্রশ্ন সেটা নয়, প্রশ্ন হচ্ছে-এই যে বৃত্তকে মূল-ধন করে জ্যামিতিক মাপে প্ল্যান ছকা হল, এটা ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যে একটা নতুন কথা।

এটা নিছক পারসিক রীতি। শূন্য প্ল্যান নয়। এ ইমারতের সর্বত্র পারসারীতির ছাপ। গম্বুজটাকে লক্ষ্য করুন-সেটি ভূগলুক, সৈয়দী বা লোদী ঢঙের নয়। এমন কি শেরশাহ্ যে পশ্ম-কলস অলংকার ব্যবহার করেছিলেন এ গম্বুজ-চুড়ায় তাও পরিত্যক্ত। হুমায়ুন-মকবরার মেন তার সর্বাঙ্গ দিয়ে বলছে : আমি ভারতীয় নই, আমি আগলুক !

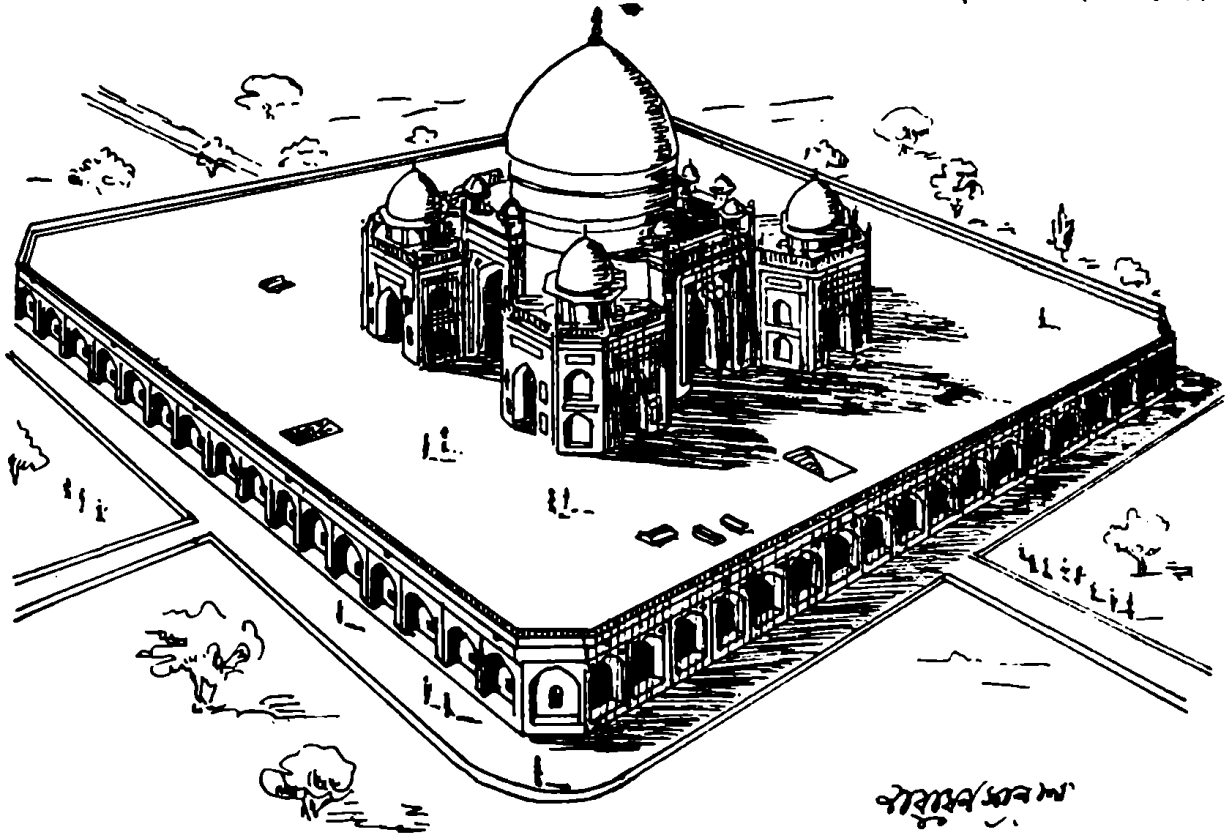
কেন এমনটা ঘটল ?

ইন্দো-ইসলামী শব্দ সমাসের ধারাবাহিক ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে কেন ও হঠাৎ সর্বাপেক্ষে এমন পারস্যের ছাপ নিয়ে আবির্ভূত হল ?

সকলেই বলছেন, এ মক্কারা নির্মাণ করিয়েছেন হুমায়ূন-মহিষী হাজী বেগম-সাহেবা। কিন্তু এর নির্মাণ শুরুর হয়েছিল 1564 সালে, শেষ হয় বছর পাঁচেক পরে। অথচ দেখাচ্ছে, হাজী বেগম-সাহেবা মক্কা রওনা হন 1564 সালে, সেখানে থাকেন বছর চার-পাঁচ।¹⁰ তাহলে এ কৃতিত্বের হিসাবদার তিনি হন কোন হক-হিসাবে ?

তিনি : উস্তাদৌ-ই-উস্তাদ মীরক মিজা গিয়াস।

হুমায়ূন যখন পারস্যে নির্বাসিত জীবন যাপন করছেন, তখন শেরশাহ-র হাঙ্গাম থেকে মুক্তি পেয়ে হাজী বেগম-সাহেবা সেখানে তাঁর স্বামীর সঙ্গে মিলিত হন। সেই সময়েই গুঁরা পারস্য-স্থাপত্যের এই বিশ্রুত-কীর্তি স্বপরিচয়দের সঙ্গে পরিচিত হন। তাই হুমায়ূনের মৃত্যুর পরে বেগম-সাহেবা সুদূর পারস্যে সংবাদবহকে প্রেরণ করেন ঐ প্রতিভাশালী বাস্তুকায়কে হিন্দুস্থানে আমন্ত্রণ জানিয়ে। হয়তো হাতের কাজ শেষ করে আসতে তাঁর কিছু বিলম্ব হল। বেগম-



চিত্র-9.5 হুমায়ূন-মক্কারা, গরুড়াকলোকে।

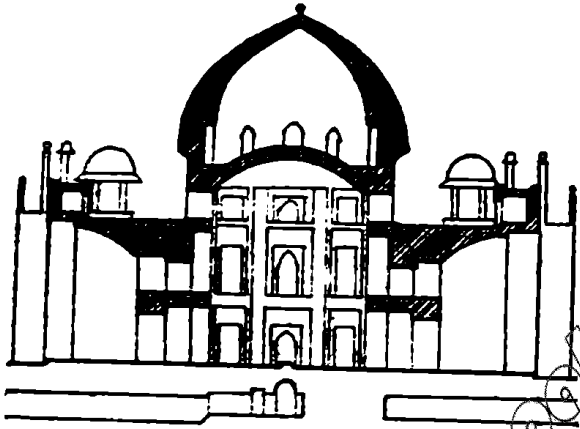
নিঃসন্দেহে এর নির্মাণ বায় হাজী বেগম-সাহেবার স্ত্রীধনে। স্থান-নির্বাচনও হয়তো তাঁরই কীর্তি— তাঁর স্বামীর প্রতিষ্ঠিত দীনাপনাহ-র সন্নিহিতে। ব্যবস্থাপনা যা কিছু করার তা করেছেন তরুণ আকবর, আগ্রা থেকে। অথচ স্পষ্টতই এ ইমারতের স্থাপত্য-শৈলী আকবরী চিন্তাধারার সঙ্গে আদৌ কোনও ঐকতান রচনা করে না। ফতেপুর-সিক্রি অথবা আগ্রা-কিঙ্গলায় আকবর-নির্মিত প্রাসাদ-স্থাপত্যের সঙ্গে এর ফারাক আশমান-জমিন। তাহলে এই অপূর্ণ স্থাপত্য-কীর্তির জন্য সালাম জানাব কাকে ?

সাহেবাকে সূক্কা, তিনি বৈষম্যসহকারে প্রতীক্ষা করে-ছিলেন। আর হয়তো সেটাই হেতু—কেন কাজ শুরুর হতে দেৱী হল দীর্ঘ নয় বৎসর। না হলে অর্থেরও অভাব ছিল না, রাজ্যেও ছিল না কোন অশান্তি। এবং সেটাই একমাত্র হেতু—কেন এ ইমারৎ নির্ভেজাল পারস্য রীতির। মীজা গিয়াস বৈষম্যের সাসারামেও বাননি, তদানীন্তন ভারতবর্ষের বৃহত্তম মক্কারাটি দেখতে।

মীজা গিয়াস ডব্ল-ডেম বানিয়েছেন (চিত্র - 9.6)। নব্বটি বস্তুর মূলধন করে বিচিত্র জটিল প্ল্যানিং-এ এমন সুবন্দুস্ত কাজটি শেষ করেছেন,

যা প্রায় ভেল্কির পৰ্যায়। কিন্তু সে হিম্মৎ ছিল মীর্জা গিয়াস্-এর। হাজী বেগম-সাহেবা—তার লাখো বরিষ্ বেহেস্ত-বাস মজ্জুর হোক—নিশ্চয়ই খুশ হবেন না, এই মওকায় যদি আমরা মাথার টুপি খুলি উস্তাদ মীরক মীর্জা গিয়াস্-এর উদ্দেশ্যে।

প্রসঙ্গান্তরে যাবার পূর্বে উল্লেখ করে যাই—এই মক্‌বারাতেই শান্তি আছেন—বেগা বেগম, হাজী বেগম এবং হামিদা কান্ বেগম। এখানেই আছে শাহজাহার সেই হতভাগ্য জ্যেষ্ঠপুত্রের সমাধি—দায়া শেকো ; আছে ফারুকশায়ারের কবর এবং এই মক্‌বারাতেই আশ্রয় নিয়েছিলেন সিপাহী কিদ্রোহের আমলে শেষ মুসল সন্ন্যাস্ত স্বতীর্থ বাহাদুরশাহ্। এখান থেকেই লেঃ হডসন তাঁকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে ধরে নিয়ে যায়।



চিত্র-9.6 হুমায়ুন-মক্‌বারা, সেকশনাল এলিভেশন।

হুমায়ুন-মক্‌বারার সংলগ্ন, দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে যে ভূমিপ্রান্ত ইমারতগুলি দেখিয়ে গাইড আপনাকে কলবে ওর নাম 'আরবসরাই, ওখানে আরবী মোল্লার দল বাস করতেন, এখানেই থাকতেন মীর্জা গিয়াস্ এবং তাঁর পারসিক সহকর্মীরা। আরবী মোল্লার দল ওখানে কয়েকদিন বাস করেছেন কি করেননি খোদায় বালদ—কিন্তু মূল ইমারতের নির্মাণ সময়ে ঐ কক্ষগুলিই ছিল আর্কিটেক্ট আর এঞ্জিনিয়ারদের 'সাইট-অফিস-অন-রেসিডেন্স'।

অতি সাম্প্রতিককালে শুনছি—স্কট্‌কে দেখিনি—এখনকার সেওয়ারসে নাকি কিছু মুরাল আঁকছেন করা পেতে যাতে কুরান শরীফের ঐ 'বরিসব' অধ্যায় থেকে প্রাচীর চিত্র আঁকা হয়েছিল। সেরী ও শীশুর চবি। নিঃসন্দেহে আকবরের নির্দেশে।

সে সময় আকবরের বসন্তপুত্র ভ্রমগ্রহণ করে এবং এক মাসের মধ্যেই মারা যায়, প্রায় সেই সময়েই

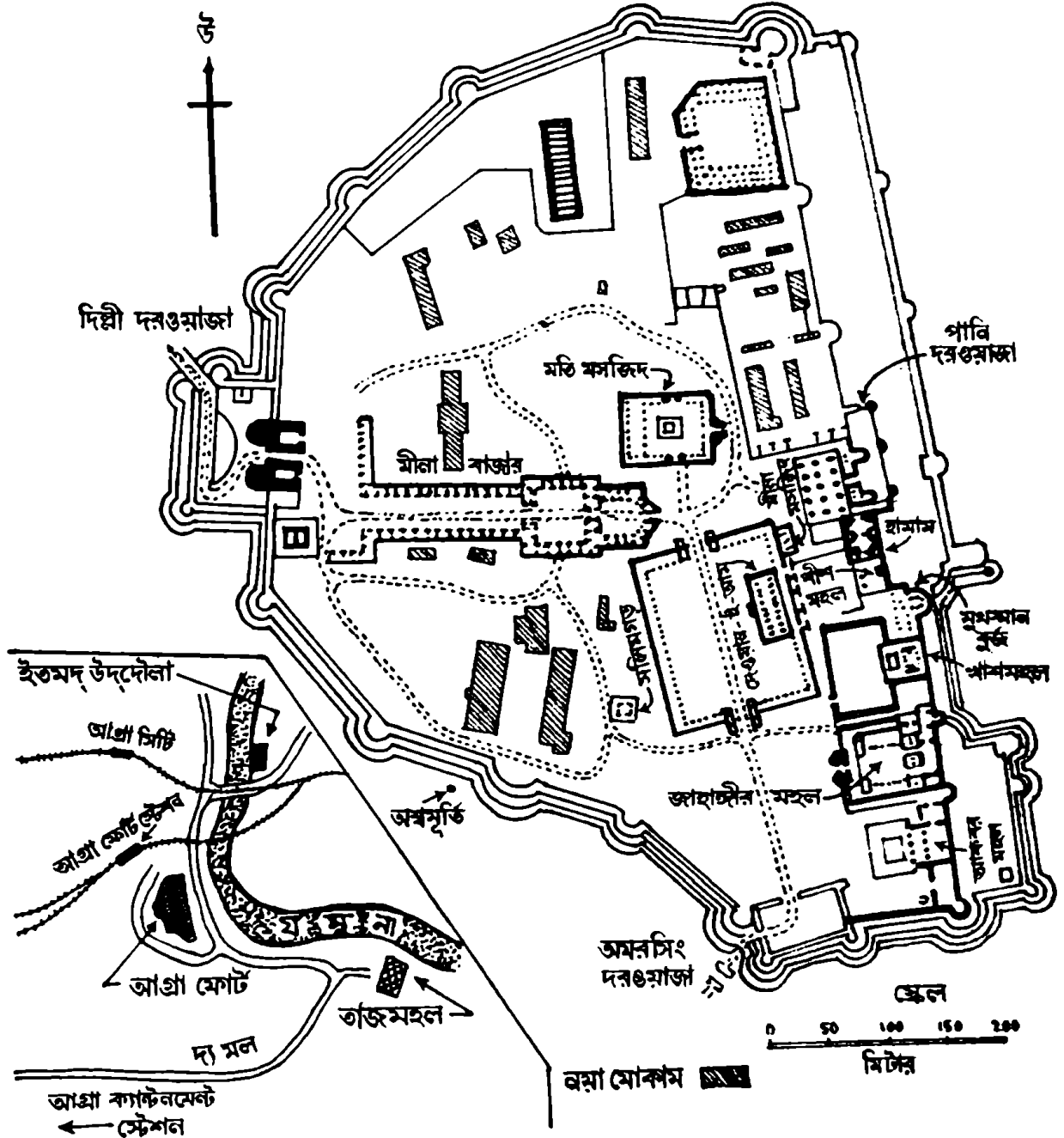
মাণ্ডু থেকে ফিরে এসে তিনি একটি নতুন নগর পত্তনের জন্য ফরমান জারী করেন" (Oct, 1564)। স্থান নির্বাচিত হয় আগ্রা নগরীর প্রায় এগারো কিলো-মিটার দক্ষিণে, গোয়ালিয়র যাবার পথে এক নগণ্য গ্রামে : কাকরালা। এই অঞ্চলে ইতিপূর্বেই দু-একবার সন্ন্যাস্তের অস্থায়ী শিবির পড়েছিল, শিকারের প্রয়োজনে। সন্ন্যাস্ত এই নতুন নগরীর নাম দেন : 'নগর-চৈন—শান্তি নগরী'। সন্ন্যাস্তের আদেশে অনেকগুলি ইমারৎ গড়ে উঠতে থাকে, আমীর মালিকেরাও দু-চারখানা করে মোকাম বানাতে থাকেন। কিন্তু ছয় মাস যেতে-না-যেতেই সন্ন্যাস্তের মত পরিবর্তন হয়। তিনি নগর-নির্মাণের কাজ বন্ধ করে দেন। অর্ধসমাপ্ত ইমারৎ ভেঙে ফেলে পাথরগুলি নিয়ে আসা হল আগ্রায়—অজ্ঞাত আগ্রা-কিল্লায় 'সাইটে'।

আকবর বোধহয় প্রণিধান করেছিলেন, এমন চারিদিক খোলা মাঠের মাঝখানে বাস করাটা ঠিক নয়। ফিরোজশাহ কোজুরার কথা সম্ভবত মনে পড়ে যায় তাঁর। তাই মহাজনগতঃ পন্থায় তিনি অনতিবিলম্বে আগ্রা-কিল্লা বানাতে শুরু করেন যমুনা-পুলিনে। আবুল ফজল বলছেন, সন্ন্যাস্ত আগ্রা-কিল্লা নির্মাণের হুকুমনামা জারী করেন 1565 সালে। ততদিনে সেকেন্দার-শাহী পুরাতন দুর্গ—'বাদলগড়' ভগ্নদশায়। সুতরাং আগ্রা-কিল্লা হচ্ছে আকবরী-জমানায় প্রথম বড় জাতের স্থাপত্য-কীর্তি। দৈনিক তিন-চার হাজার মেহনতী মানুষ কাজ করত সেখানে। লাল পাথরের দুর্গ-প্রাকার—সুদৃঢ় তার গাঁথনি, অত্যন্ত প্রশস্ত দেওয়াল, উচ্চতায় 21.34 মিটার (70 ফুট)।

বিশেষভাবে লক্ষণীয়, আকবর যখন এই মহাযজ্ঞের আরোজন করছেন তখনো মীর্জা গিয়াস্ দিল্লীতে উপস্থিত ; হুমায়ুন-মক্‌বারার 'ফিনিশিং টাচ' তখনো শেষ হয়নি। লাখো-সেলাম জালালউদ্দীন আকবরকে—তিনি ঐ বিপ্রতর্কিত স্থপতিকেকে দিল্লী থেকে আগ্রায় নিয়ে আসেননি ; পরিবর্তে তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে স্থানীয় এলেমদার মিস্ত্রিকে সমবেত করলেন আগ্রায়। কারণ তরুণ সন্ন্যাস্ত একটি অচিন্ত্যপূর্ব অনুভাবনায় দোলায়িত হচ্ছিলেন সেই আমল থেকেই! একটা চিন্তা তাঁর মস্তিষ্কে দানা বেঁধে উঠেছিল : পারস্যের অন্ধ অনুকরণে হিন্দুস্থানের সমগ্র সর্বনাশ! একথা নিশ্চিত, সেই তরুণ বয়সে তিনি হিন্দু-ইসলামী যৌথ রীতির স্বরূপটা ধরতে পারেননি ; কিন্তু বোঝেছিলেন—কোন পন্থা চললে সেই সমস্যার তীর্থে উপনীত হওয়া যায়। তাই তাঁর এই বিচিত্র ব্যবহার। মীর্জা গিয়াসকে

উপেক্ষা এবং মিলিত হিন্দু-মুসলমানের এই ভারত-বর্ষকে নিজের পায়ে দাঁড় করানোর প্রচেষ্টা। গুজরাট, দাক্ষিণাত্য, কলিঙ্গ ও বঙ্গদেশ থেকে নাম-না-জানা স্থপতির দল আহ্বান পেয়ে আসতে থাকে গুটি

আছে তার খোঁজ রাখতেন)। খিলজী-তুগলক-সোদী-সেরদ শৈলীতে দিল্লীশ্বররা যুগে যুগে পার্শ্ব-মুখী স্থানীয় কারিগরদের গির্জা-বীম, ব্রাহ্মণ, খ্রীষ্টান, ঘণ্টা-বলস-চক-পদ্ম অলঙ্করণ, ট্রান্সক্রেট



চিত্র-9.7 আগ্রা-কিল্লা, ভূমি-নকশা।

গুটি। পার্সি ব্রাউন বলছেন¹². "It will be seen from this that the emperor was already aware of the artistic nature of his more distant subjects." (বেশ বোঝা যায়, সম্রাট তাঁর সাম্রাজ্যের দূর প্রান্তস্থিত অঞ্চলে কোথায় কী-জাতের শিল্পী

পম্পহিতে ভারবহনের আরোহণ যতদূর সম্ভব করান করতেন। জালালউদ্দীন আকবরই হচ্ছেন প্রথম দিল্লীশ্বর যিনি স্থাপত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বলছেন না! এ হতে পারে না! হিন্দু-মুসলমান শৈলীর সহাবস্থানই এ-দেশে একমাত্র সমাধান। দুই

মহান শৈলীকে, দুই ভিন্ন মেরু-প্রান্তবাসীর চিন্তা-ধারাকে এমন একসঙ্গে গাঁথতে হবে, যাতে জোড়ের দাগ দেখা না যায়। সে পরীক্ষার চূড়ান্ত সাফল্য ফতেপুর-সিক্রিতে—কিন্তু সে কীর্তি প্রৌঢ় আকবরের। আমরা এখনও আছি তার প্রথম যৌবনে। আসুন,

উন্মূল্য-অর্থ

ভূমি-নকশায় আগ্রা-কিল্লা যেন অষ্টমীর চাঁদ (চিত্র-৯.৭)। পূর্বে যমুনা, পশ্চিমে জনপদ। উত্তর-দক্ষিণে কিল্লার দৈর্ঘ্য পোনে এক কিলোমিটার। দুটি প্রবেশদ্বার—পশ্চিমে দিল্লী দরওয়াজা, দক্ষিণে আকবরী দরওয়াজা (বর্তমান নাম অমরসিং গেট)। দিল্লী দরওয়াজার নির্মাণ শেষ হয় ১৫৬৬ সালে; সেলিম তখনও জন্মগ্রহণ করেনি।

দিল্লী স্টেট : এ দরওয়াজা কোনো বিজয় তোরণ নয়; নয়নাভিরাম কোন ইমারতের অবতরণিকা-স্ফার নয়, এর মূখ্য ভূমিকা জঙ্গী প্রয়োজনে। স্থপতির মূল লক্ষ্য সেখানেই নিবদ্ধ। তাই বিসর্পিত পথে এমনভাবে তিনি আগমন-সড়ক বানিয়েছেন যাতে দুর্গরক্ষীর দল সহজে অস্পসংখ্যক সৈন্য নিয়েও বহিঃস্থ বিশাল বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়। ইতিহাস কহে—এই ‘পেপারে’ আকবর একশয় একশ পেয়েছেন! সেলিম ও খুররম যথাক্রমে ১৫৭৭ এবং ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁদের পিতৃদেবদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বিশাল বাদশাহী ফৌজ নিয়ে আগ্রা-কিল্লা আক্রমণ করে এবং দুর্গ-প্রবেশে ব্যর্থ হয়। জেনারেল লেক অবশ্য ১৮০৩ সালে ঐ পথেই দুর্গ-প্রবেশ করেছিলেন—কিন্তু তার জেবের ভিতর ছিল এমন একটি ‘একাঘি’ ব্রহ্মাস্ত্র—স্বা পৃথিবীর যে-কোন দেশে যে-কোনো দুর্ভেদ্য দুর্গের পতন ঘটতে সক্ষম : দুর্গ-ধীপের বিশ্বাসঘাতকতা! তাই ডক্টর রথ^১ বলছেন, “Militarily, the Fort of Agra was impregnable in medieval times.” (সামরিক বিচারে, কথামুগে আগ্রা-কিল্লা ছিল সম্পূর্ণ দুর্ভেদ্য)।

প্রয়োজনের মূল্য পাই-পরমা মিটিয়ে দিয়ে এবার দেখুন আকবর সেই স্থাপত্য-কীর্তিকে কীভাবে রূপায়িত করলেন। পার্সি গ্রাউন^২ কহছেন, “It displays an originality and spontaneity

প্রথমে দেখা যাক, তাঁর প্রথম কীর্তি : আগ্রা-কিল্লা! হুমায়ুন-মক্‌বরা নির্মাণ শেষে মীর্জা গিয়াসকে নানান উপঢৌকনে ভূষিত করে, পশ্চিমমুখো রওনা করে দিয়ে যে আগ্রা-কিল্লায় নতুন জাতের পরীক্ষা করতে এলেন জালালউদ্দীন।

denoting the beginning of a new era in the building art and one in which its creators were closely imbued with a fresh spirit, free and unrestrained.” (এ স্থাপত্য-কীর্তিতে মৌলিকতার ছাপ আছে; বেশ বোঝা যায় এর নির্মাতা একটা তাজা, বন্ধনহীন, সজীব প্রেরণায় নতুন কিছু গড়তে চান)। এ-কথা একশবার! তাজা, নতুন-কিছু! এর সঙ্গে তুলনা করুন গিয়াসউদ্দীন কিম্বা ফিরোজশাহ দুর্গের অথবা শেরশাহর পুরানা কিল্লার প্রবেশদ্বারের। স্পষ্টত অননুভব করবেন, আকবরের দিল্লী দরওয়াজা ওদের ডেকে বলছে, ‘আব-ওয়া-অজ্জাদ-এর ঋণ আমি অস্বীকার করি না, তবু আমি স্বতন্ত্র, আমি নতুন, আমি অনন্য।’

এ-কথা কিন্তু হুমায়ুনের মক্‌বরা বলেনি। সে-যেন এদের চেনেই না—ঐ প্রাণবর্তী গিয়াস-ফিরোজ-শের জমানার স্থপতিদের। সে শব্দ পশ্ম-কলসহীন পারসিক গম্বুজ-চুড়ায় দাঁড়িয়ে বলোছিল : আমি আগন্তুক!

দিল্লী দরওয়াজা বললে, আমি তোমাদেরই বংশের, যদিও তোমার-আমার চিন্তাধারার মাঝখানে ‘জেনা-রেশান-গ্যাপ’!

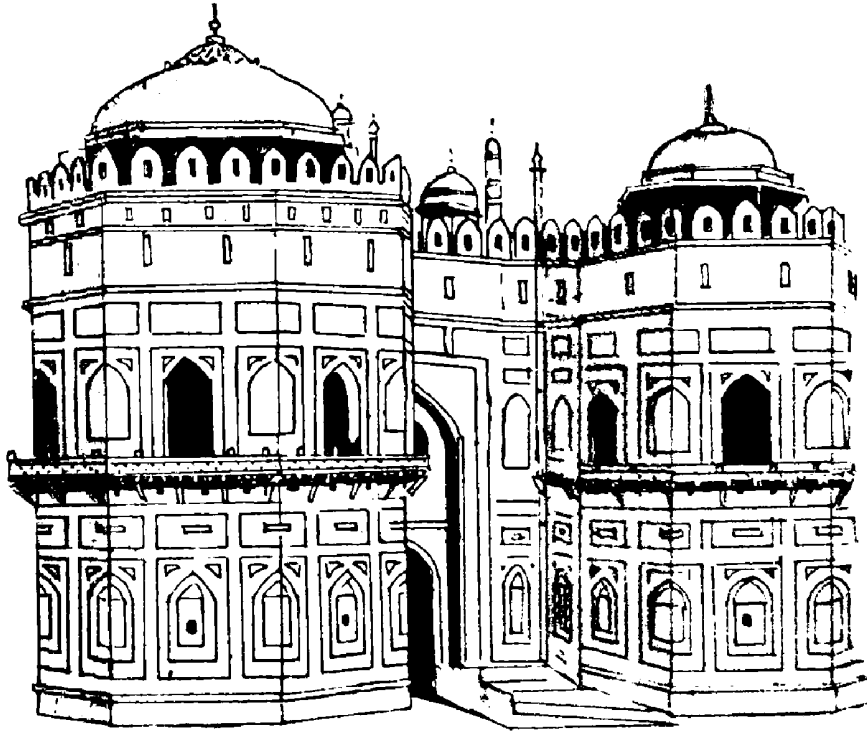
দরওয়াজার দু-পাশে দুটি অষ্টভুজাকৃতি ইমারৎ—যেন দু-পায়ে ভর দিয়ে সমভঙ্গ ঠামে দাঁড়িয়ে আছে দুর্গপ্রহরী (চিত্র-৯.৮)। তাদের মাথায় একসারি পল-তোলা কুঞ্জর—যেন যোম্মার শিরস্ত্রাণ। মিনারিকা নেই, চবুতরা নেই, গম্বুজ নেই। তবু বেশ কিছুটা অলঙ্করণ আছে তার প্রাচীরগায়ে—যতটা শোভন সমরসাজে সজ্জিত যোম্মার ঢালিকায়, কোমরবন্ধে অথবা তরোয়ালের মুঠে; তার বেশি নয়। মূল প্রবেশ-দ্বারের দু-পাশে দুটি শীর্ণকায় গুলদস্তা যেন শব্দ-হস্ত প্রহরীর হাতের বল্লম। প্রবেশদ্বারের দু-পাশে দুটি পাদপাঠি নিশ্চয় নজরে পড়েছে আপনার—এখানে

আকবর স্থাপন করেছিলেন দুটি হস্তীমূর্তি, চিতোর-বিজয়ের পর-সেনাপতি জয়নাল ও পুস্তুর গজারূঢ় মূর্তি।

এবার ভিতরে চলুন। তোরণ অতিক্রম করে পিছন ফিরে দাঁড়ান দেখি? চিনতে পারছেন? আঙ্কে হ্যাঁ, এ সেই তোরণই, ভিতর-থেকে দেখা রূপ। প্রবেশ-দ্বারের দু-পাশে দুই অরিয়ল-গবাক্ষ, মূল-খিলানের কিনার বরাবর পশ্চিমকুঁড়ির নকশা, খিলানের উপর জোড়া পশ্চিমের একটা শ্বেত পাথরের ব্যান্ড; তারও উপরে ব্র্যাকেট-শোভিত ঝোলা-বারান্দা, অলিন্দ, ছত্রী। নানান সৌখিনতার রাজসিক আয়োজন। কিন্তু সেটাই তো স্বাভাবিক। অতন্দ্র-প্রহরীর ভীমকান্তিই তার মোলো-আনা পরিচয় নয়—দেহলী অতিক্রম করে ভিতরে ঢুকে খোঁজ নিয়ে দেখ, তারও মা থাকে, মেয়ে থাকে, স্ত্রী থাকে। তারা খবর রাখে, ঐ ভীমকান্তি দুর্গ-রক্ষী আনন্দে হাসে, দুঃখে কাঁদে, সোহাগে চুম্বন করতে জানে! ভিতর দিক থেকে তারা দেখতে পায়, ঐ দুর্গরক্ষীর পশ্চিমকুঁড়ির পাড় বসানো ঘরোয়া ছবি।

আইন-ই-আকবরী বলছেন, “এই আগ্রা-কিল্লার ভিতর সম্রাট আকবর অর্ধসহস্রাধিক ইমারৎ নির্মাণ করিয়েছিলেন—লাল পাথরের, সাদা মার্বেলের পক্ষ বসানো নানান নতুন জাতের পরীক্ষা-নিরীক্ষা; আর সেজন্য সম্রাট গুজরাট এবং বঙ্গাল-মুসলু থেকে নানান-জাতের দক্ষ শিল্পীকে আগ্রাতে নিয়ে আসেন।”

শুধু অলঙ্করণে নয়, স্থাপত্যরীতিতেও নানান ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছিল হিন্দু ও মুসলমান শৈলীর মেলবন্ধনের। তার চরম সাফল্য দেখতে পাবেন ফতেপুর-সিক্রিতে। কিন্তু ফতেপুর-সিক্রি তো আঙ্কের শেষ ফলাফল। Q.E.D.! মাকের ধাপগুলো? আগ্রা-কিল্লার ঐ শ-পাঁচেক ইমারতে হরোঁছিল সেই ঐতিহাসিক বিশ্বয়কর পরীক্ষা। ঐ পাঁচশ মোকামের কোন এক নিহৃত করোঁকর ভিতর দিয়ে হরোঁছিল প্রথম চার-চোখের মিলন! ট্রাবিয়েট রাজকন্যা তার কাজল-কালো হরিণ নয়ন তুলে প্রথম তাকিয়ে দেখে-ছিল অশ্বারোহী আগন্তুক আকুইয়েট-শাহ জাদার দিকে! ঐ পাঁচশ ইমারতের কোন এক নির্জন



চিত্র—৩.৪ আকবর-নির্মিত দিল্লী-গেট; আগ্রা-কিল্লা।

এই যে ভিতর ও বাহির—দু-দিক থেকে দুই ভিন্নমেরুর রূপারোপ, আকবরী স্থাপত্যের এ এক বিচিত্র বৈশিষ্ট্য। এর চরম সাফল্য বুলন্দ-দরওয়াজায়। সে-কথা যথাস্থানে।

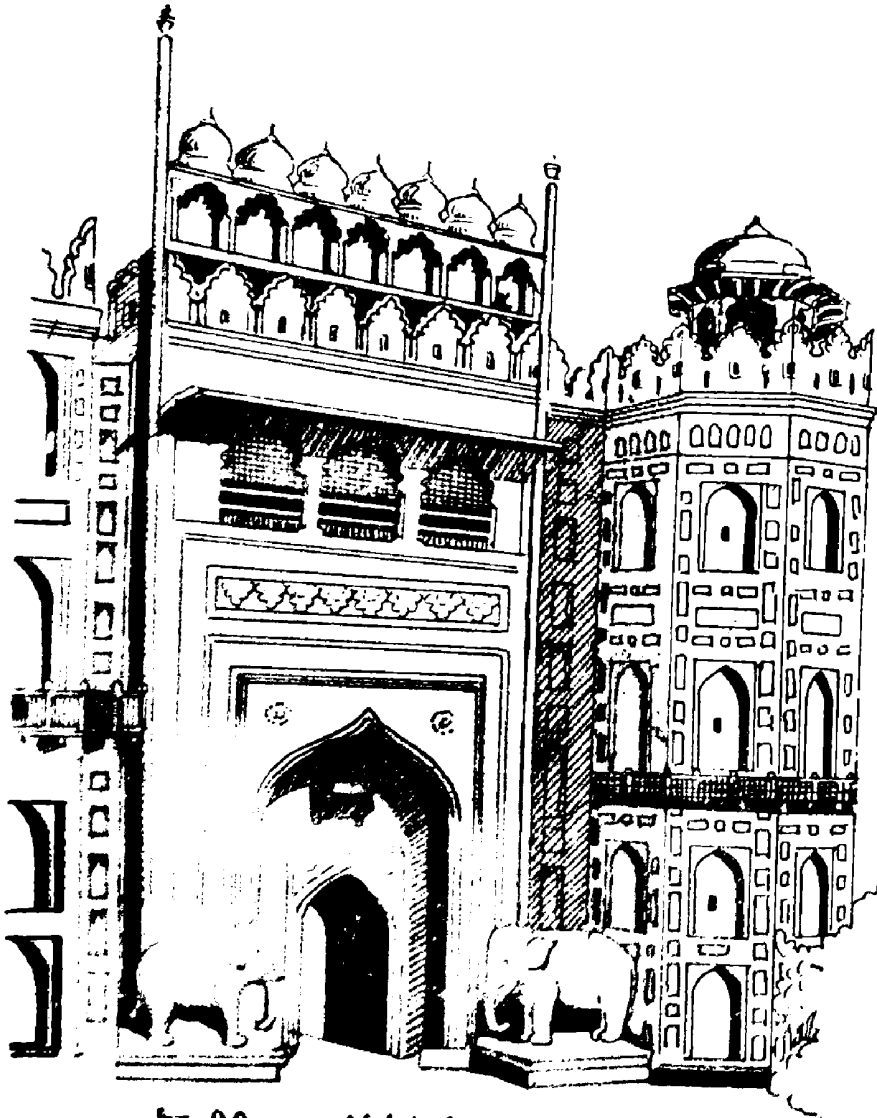
অলিন্দে ‘কবেল্ড-বীম’ তার পশ্চিমকোরকতুলা হাতখানা বাড়িয়ে দিয়েছিল স্ট্যালেসক্‌টাইট-নওজোয়ানের বহু-মূর্তির দিকে—ঠিক যে-ভঙ্গিমায় অশ্বরোহী জেনারেল কুস্তারী প্রসারিত করে দিয়েছিলেন তার মেহীদ-

রঞ্জিত পাখাপরা হাত, তরুণ জ্বালালের দিকে !

আপসোস্ ! হরগিজ আপসোস্-কী-বাতে- সেই যুগান্তকারী মিলনদৃশ্যগুলি, ভারত-ভূখণ্ডে ইন্দো-ইসলামী-স্থাপত্যের সেই প্রথম প্রথম দৃশ্যগুলি আজ আর আপনি দেখতে পাবেন না। আকবর-নির্মিত সেই পাঁচশত ইমারতের মাত্র দুটি টিকে আছে। বাদ-বাকি চারশ আটশখানেকই জমিন-সামিল ! আছে না ! ভূমিকম্প নয়, মহাকালের স্থূল হস্তাকলেপন নয়—এ

ছেন অবনীন্দ্রনাথ, 'সম্রাটের মৃত্যু' ; যার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ !'

ঠাকুর্দার ঐ যুগসংস্করণের ঐতিহাসিক ইমারৎ-গুলি ভেঙে ফেলে তিনি হাল-ফাসনের 'মার্বেল-মোকাম' বানিয়েছেন—যেমন পণ্ডিত ঠাকুর্দার লাইব্রেরী কালেকশ্যন সেকেন্ডহ্যান্ড দামে বেচে দিয়ে হাল-আমলের নাতিরা টি. ডি. সেট কেনেন !



চিত্র ৩.৩ শাহ জাহানীনির্মিত দিল্লী-সেট ; মাল কিল্লা।

আর এক জাতের কল্যাপহাড়ী কিছুকালিলা। কে সেই যে-তরুণ, বুদ্ধক কল্যাপহাড়ী ?

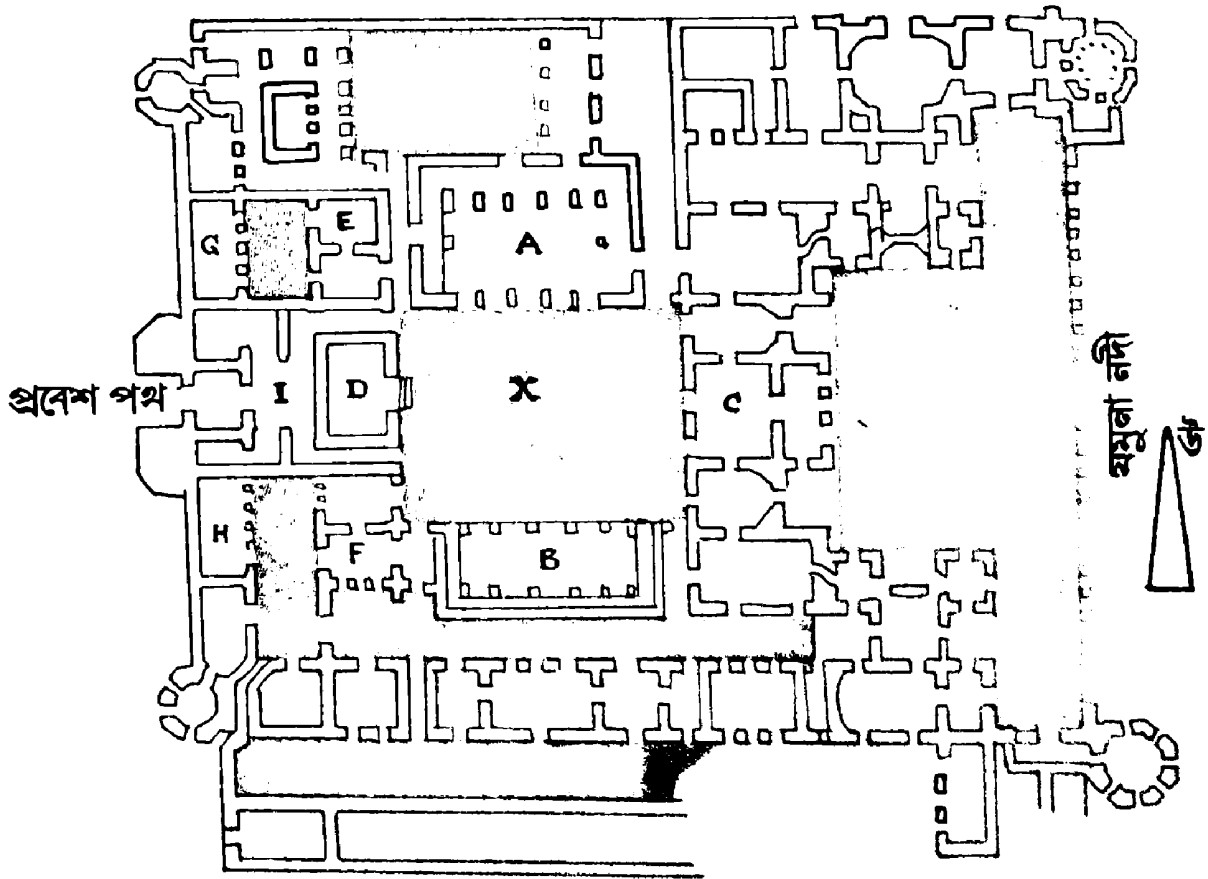
সেই যে দাড়িওয়ালা ভক্তলোকটি যার হাতি এংকে-

আজ্ঞে হ্যাঁ, জাহান-শাহ-জাহান যুগল-স্থাপত্যে এক স্বর্ণশির নাম 'জাহানগল' তিনি উপহার দিয়েছেন জাহাঙ্গীরকে যা, ফুল কালাম, পৃথিবীকে। তা সে

কীর্তির ক'-আনার হিসাবাদার সেই ভদ্রলোক, সে-
বিচার যথাকালে করব। ষোলো-আনা হিসাবাদার হলেও
বল্বে—তার ঠাকুরদার যে মৌলিক স্থাপত্যচিন্তা—
কাজ, স্বয়ম্ভর, ইন্দো-ইসলামী বে-দাগ মেলবন্ধনের
সেই বিস্ময়কর পরীক্ষার আদিম উদাহরণগুলিকে
সৌখিন-মজদুরীর অজুহাতে এ-ভাবে তছনছ করার
জন্য স্থাপত্যের কোনো ছাত্র কোনোদিন শাহজাহাঁকে
ক্ষমা করতে পারে না। কী প্রয়োজন ছিল সেগুলি
ছুমিসাৎ করার? আগ্রা-কিল্লার আট-আনা অংশ তো
তখনও ছিল ফাঁকা—'ভেকেন্ট প্লট'। না হয় নদী
কিনার থেকে কিছুটা দূরেই নির্মিত হত সৌখিন
মর্মরে-গড়া রঙমহালে শাহ-য়েন-শাহ শাহজাহাঁর
কিলাসের আয়োজন?

সাহিত্য-শিল্প-সঙ্গীত-দর্শন-ইতিহাসচর্চা, কল্পিত জ্ঞান-
বিজ্ঞান-ললিতকলার বাবতীর শাখার মূলমন্ত্রের
সূর্য ছিলেন 'জেনিথ' তার ঐ ঠাকুরদার আশ্রয়ে।
জাহাঙ্গীরী-জমানার মিনিরেচার পোর্টলে, যসে সে
সূর্য পশ্চিমে ঢলেছে। আর তাজমহল জে অস্ত-
গামী সূর্যের পশ্চিম-দিগন্ত-ঔদ্ভাসী শেষ বর্ণ-
সম্ভার। তার পরেই বিবি-কা-বক্সার কিল্লুল
আল্বেরা!

বিশ্বাস করতে না পারেন তো এখনই ঘুরনা করে
দেখুন না কেন ঐ আগ্রা-কিল্লার আকবরী দিল্লী
গেট-এর সঙ্গে লাল-কিল্লার শাহজাহানী দিল্লী-
গেট-এর। তাহলেই বুঝতে পারবেন শাহজাহাঁর
কোনো মৌলিক চিন্তা ছিল না। আকবরী দরওয়াজা



চিত্র-9.10 জাহাঙ্গীরী মহল, বাস্তব নকশা : আগ্রা-কিল্লা।

একটিই হেতু : যতখানি প্রতিভা থাকলে সমকালে
দাঁড়িয়ে প্রতিদান করা যায় যে, আকবর-নির্মিত সেই
অর্ধসহস্র ইয়ারং স্থাপত্য-ইতিহাসের বৃক্ষলম্বিকবধের
প্রতীক, ততখানি স্থাপত্য-প্রতিভা ছিল না শাহজাহাঁর।
শাহজাহাঁ বুঝতে পারেননি শূন্য স্থাপত্য নয়।

যেমন তুগলকী-লোদী-শরী স্থাপত্যকে ডেকে বলে-
ছিল 'আমি নবাবড!' - শাহজাহাঁর দরওয়াজা তা
কলতে পারেন না। বরং বলেন : আমি প্রটোটাইপ!
আমার ঠাকুরদার!

লাল-কিল্লার দিল্লী-গেটের (চিত্র-9.9) দৃ-

প্রান্তে সেই দুই আটকোনা ব্যাস্টিয়ান, একই ছাঁদের। খিলানও তাই। ছতী, গুলদস্তা, সবই মাছি-মারা নকলনিবিশের নিপুণ হুবহু অনুলকরণ। মায় দরওয়াজার দ্ব-পাশে ঐ যে জোড়া-হাতী, ওটাও উট-ঘোড়ায় রূপান্তরিত হতে ভরসা পায়নি। তফাতের মধ্যে—ব্যাস্টিয়নের কুঞ্জগদূলি এখন আর সাদামাটা নয়, তিন-তিন পাপিড়িওয়ালা। যা ছিল যোম্মার শিরস্তাণে বর্মগদূলিকা, তা হয়েছে বাদশাহী তাজের হাল্কা পাখির পালক। আর দেখছি, কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের উপর একসার ছোট-ছোট গম্বুজ এবং ভিতর দিককার অলঙ্কৃত গবাষট্টা এসেছে অন্দর থেকে সদরে। দূতোর একটাও মৌলিক চিন্তা নয়। ঐ একসার ক্ষুদ্রকায় গম্বুজের দুই পাশে দুই গুলদস্তা, তলায়-তলায় ছোট-ছোট খিলান—ওটা বুলন্দ-দরওয়াজা (চিত্র—9.21) থেকে টুকে মেরে দেওয়া। শাহজাহাঁ এটুকুও বুঝতে পারেননি যে, বুলন্দ-দরওয়াজা একটা বিজয়-তোরণ, কেজো ভূমিকার চেয়ে তার তরফে বড় কথা মাথার উপর ঐ লরেলপাতার মুকুটখানি। তাঁর নিজের দিল্লী দরওয়াজা কোনো বিজয়-তোরণ নয়, সে দুর্গ-রক্ষী মাত্র। সৌখিন, নয়নাভিরাম কিছু মোকাম বানাতে পারলেই কেউ জাত আর্কিটেক্ট হয় না ; মার্বেল দিয়ে মূড়ে দিলেই ইমারৎ লাভ করে না ‘আর্কিটেক্টনিক্’ মহিমা!

আগ্রা-কিল্লার ঐ শ-পাঁচেক আকবরী-ইমারতের ভিতর মাত্র দুটি মহল রক্ষা পেয়েছে : আকবরী মহল ও জাহাঙ্গীরী মহল।

আকবরী মহল : এটি 1569 সালে সমাপ্ত হয়। আবুল ফজল বলেছেন, তখন এর নাম ছিল ‘বঙ্গাল-মহল’। বোধকারি বঙ্গদেশীয় স্থপতিবিদদের প্রতি কৃতজ্ঞতার সন্নাট এই নামকরণ করেন। এই ইমারতেই দেখছি, বাঁম ও ব্র্যাকেট পদ্ধতিতে ছাদের ভার বইবার আরোহণ করা হয়েছে, আর্কুয়েট-পদ্ধতির পরিবর্তে। কক্ষগুলির ভিতরে গিরে উপর দিকে তাকিয়ে দেখবেন—গম্বুজ নেই, সমতল ছাদ। কোনো ইসলামী ইমারতে এত ব্যাপকভাবে বাঁম ও ব্র্যাকেট ইতিপূর্বে ব্যবহৃত হয়নি।

পুনরুদ্ধার দোষ এড়াতে দুটি ইমারতে একই জাতের স্থাপত্য-প্রয়োগবিদ্যার কচ্‌কচি না করে শুধু জাহাঙ্গীরী মহলেরই বিস্তারিত বর্ণনা দিই (চিত্র—9.10)।

জাহাঙ্গীরী মহল : সুউচ্চ প্রবেশ ভোরণের ভিতর দিয়ে এসে পেঁছাবেন I-চিহ্নিত হল-কামরায়। এটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার—চারপ্রান্তে চারটি খিলান কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হয়ে আসছে, অথচ স্কুইণ্ড-পেনেড্রিউগদূলি হিন্দু-স্থাপত্যের ‘ট্র্যাবিয়েট’ পদ্ধতির। অর্থাৎ ইমারতে প্রবেশমাত্র দেখতে পাবেন, হিন্দু-মুসলীম মিলিত শৈলী—অম্বরকুমারী আর আকবরের যুগলমূর্তি। পূর্ব দিকে এগিয়ে চলুন—রজ্জু-রজ্জু গমনাগমনের পথ নেই। এ-কান্ডটা পরে ফতেপুর-সিক্রিতেও দেখবেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে, জেনানার পদারক্ষা। গমনাগমনের পথ সরাসরি হলে বাইরে থেকে অন্দর-মহলটা দেখা যেত।

কেন্দ্রস্থ প্রাঙ্গণটি (X) প্রায় সমচতুষ্কোণ, 21.95 মিটার বর্গক্ষেত্র। লাল পাথরের গাঁথনি, সুনিপুণ হাতে গড়া ব্র্যাকেট ও খিলান। উত্তরে একটি সম্মেলন কক্ষ (A), 18.9×11.3 মিটার মাপের। দরজার মাথায়—লক্ষ্য করে দেখুন, খিলান নেই, আছে হিন্দু-পদ্ধতির লিন্টেল অথবা কর্বেল-করা বাঁম। ব্র্যাকেটে গুজরাটী নকশার হাতী অথবা মকর। বাঁকের মূখে মূখে হংসগ্রীবা।

দক্ষিণদিকের কক্ষটি (B) আকারে কিছু ছোট। এখানে লক্ষণীয়, তিন দিক ঘেরা একটি অলিন্দ, আর তার সঙ্গে জালি-কাজ-করা পর্দা—যেমনটি দেখেছি গোয়ালিয়রের মানমন্দিরে ‘আখ-মিচৌলী’-তে।

D-চিহ্নিত কামরাটি অলঙ্করণে আকীর্ণ। মাঝে মাঝে কুলদ্বীপ। যেন ছোট-ছোট দেব-দেবীর মূর্তি সাজিয়ে রাখার ঠাই। ‘যেন’ নয়, বাস্তবেই তাই—এ কক্ষটি ছিল মুসলমান সম্রাটের হিন্দুমহিষী ও পুত্রললনাদের মন্দির। মহলের পূর্বপ্রান্তে সুদীর্ঘ বারান্দা, যেখান থেকে যমুনা দেখা যায়।

কেউ কেউ বলেছেন, এ প্রাসাদ জাহাঙ্গীরের তৈরী, তাই তার ঐ নাম। নিঃসন্দেহে সে তথ্য ভুল। আবার কেউ বলেন, এটি সম্রাট আকবর তৈরি করিয়েছিলেন শাহজাদার আবাস হিসাবে। আমার মনে হয়, সেটাও সঠিক নয়। কোনো ঐতিহাসিক নজির বা শিলা-লিপির জোরে এ-কথা বলছি না ; আন্দাজ করছি ইমারতের স্থাপত্যশৈলী দেখে। আমার অনুমান এটির নির্মাণকাল 1565-72 ; সেলিম যখন অজ্ঞাত অথবা নিষ্ঠুর শিশু। ফতেপুর-সিক্রির পরিণত শৈলীর পূর্বসূরী এই ইমারৎ।

আওলু-ই-ইস্লাম

সেলিমের জন্ম-ইতিহাসটা আমাদের অজানা নয়। স্যার যদুনাথ, ডঃ রমেশ মজুমদার বা ডঃ শ্রীবাস্তব না পারলেও সোরাব মোদী তা পেয়েছেন—গোটা ভারত-বর্ষকে জানিয়ে দিতে, সেই ‘মুঘল-এ-আজমে’র কিস্সা। নিতান্ত রূপকথার ‘গম্পা’। রাজার হাতিশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া আছে, অথচ রানীমার কোল-আলোক করা সাতরাজার-ধন মাণিক নেই। 1564 সালে রাজার যমজপুত্র হয়েছিল, কিন্তু জোড়া ঈদের চাঁদ জোড়া-পূর্ণিমা দেখিনি! আরও বছর খানেক পরের কথা। কে একজন সম্রাটকে সংবাদ এনে দিল : আগ্রার অনতিদূরে সিক্রি গাঁয়ে বাস করেন এক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ফকির—শেখ সেলিম চিস্তি। তাঁর আশীর্বাদে কী না হয়? ‘অপুত্রের পুত্র হয়, নির্ধনের ধন!’ আকবর স্থির করলেন—সম্রাটের দোরে ধনী দেবেন। বিরাট শোভাযাত্রা চলল আগ্রা থেকে সিক্রিতে। হাতী-ঘোড়া-সৈন্য সামন্ত। আর সবার পুরোভাগে তীর্থ দর্শনে চলেছেন তামাম হিন্দুস্থানের শাহ-য়েন-শাহ! পদব্রজে।

বৃন্দ ফকিরের বয়স তখন নব্বই পুরতে মাত্র দু-বছর বাকি। সম্রাটের আর্জি শুনে বললেন : হবে! খোদাতালা তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন!

অনতিবিলম্বেই সংবাদ পাওয়া গেল অম্বরমহিষী আবিস্তা—তাঁর গর্ভসত্তারের লক্ষণ দেখা গেছে। আকবর তাঁকে রাজপ্রাসাদে রাখলেন না। সিক্রি গ্রামে ঐ সম্রাটের খান্কার কাছাকাছি রাতারাতি এক মোকাম বানিয়ে দিলেন। চতুর্দেলায় চেপে অম্বর-মহিষী এসে আশ্রয় নিলেন সেই আবাসে। সেখানে 30শে আগস্ট 1569 তারিখে সম্রাটের জন্ম হল অম্বরমহিষী। আকবর ঐ ফকিরের নামানুসারে তার নাম রাখলেন : ‘সেলিম’। ডাকতেন ‘শেখ-বাবা’ বলে।

শহর-আগ্রা থেকে উনত্রিশ কিলোমিটার দূরবর্তী এই গ্রামটি সম্রাটের পছন্দ হয়ে গেল। তিনি হুকুম দিলেন এখানে একটি মহানগরী স্থাপনের। যেন ময়দান-বের কান্ডকারখানা। বছর না ঘুরতে তৈরী হয়ে গেল দুর্গপ্রাকার, দুর্গ, ইমারৎ ও তাল্লাও (চিত্র—9.11)। দীর্ঘাট প্রাকৃতিক। শব্দ সেচ-স্থপতির কারিগরী

কৌশলে জলটা ধরে রাখার ব্যবস্থা হল, নিকাশের দিকে একটি বাঁধ নির্মাণ করে। শহরের চৌহন্দী প্রায় দশ কিলোমিটার। এটিকে সুরক্ষিত দুর্গের মতো বানানো হয়নি, প্রয়োজনও ছিল না। আকবরী শাসনের বনিয়াদ এত দৃঢ় যে—আর তা ছাড়া অদূরেই তো রইল দুর্ভেদ্য আগ্রা-কিল্লা। বহিঃশত্রুর আক্রমণ অথবা বিদ্রোহের সূচনা দেখলেই সেখানে আশ্রয় নেবার সুবন্দোবস্ত করা থাকল। তবু রাজাবরোধ বেবটনকারী প্রাকার হল প্রথমাত্মিক সুদৃঢ়। ছয় কিলোমিটার দীর্ঘ, ষষ্ঠে উঁচু এবং প্রাকারের উপর আড়াই মিটার চওড়া প্রশস্ত পথ দিয়ে অনায়াসে ঘোড়-সওয়ার টহল দিতে পারে। দুর্গ-প্রাকারে কিছু দূরে দূরে প্রচলিত পদ্ধতিতে ব্যাস্টিয়ান ; অনেকগুলি দরওয়াজা। প্রধান প্রবেশ পথ উত্তর-পূর্বে। নাম : আগ্রা দরওয়াজা।

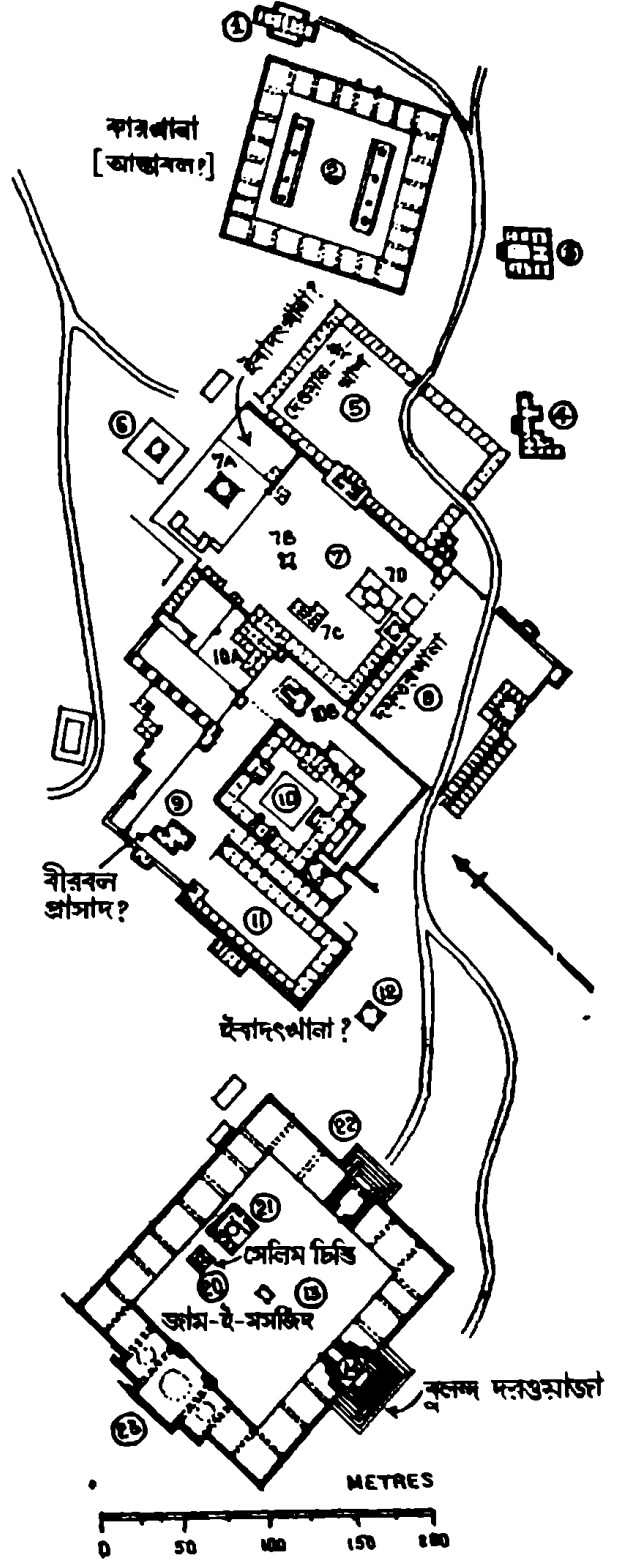
আপনি নিশ্চয়ই আগ্রা থেকে আসছেন। ফলে প্রধান তোরণ আগ্রা দরওয়াজা অতিক্রম করেই দেখবেন সামনে নহবৎখানা (16)। ঠুঁরা কলতেন, ‘চহার-সুখ’। তার ভিতর দিয়ে রাজপথ বিসর্পিল পথে এগিয়ে গেছে। ডাইনে একটি কাঁচা সড়ক। সেটা দিয়ে এক কদম এগিয়ে গেলেই পাবেন ‘তানসেন বারাদরী’ (15)। উস্তাদো-কী-উস্তাদ গাজী মিক্রা তানসেনের আবাস। গত দশকেও দেখেছি, ফাঁকা টিলার উপর ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত কিছু ভাঙা পাথর—মাঝে মাঝে অবলুপ্ত ইমারতের ভিতের আজস। নির্জন প্রান্তরে দাঁড়িয়ে সেবার মনে হয়েছিল ‘সু-সরস্বতী সেখানে লুটিয়ে পড়ে কাদিছেন—‘বাল-বিশ্বরকে টুটি কবরোপে যব কোই মেহেজবান রোতি হয়’! পটাবিরল বাবুলার ডালে নিদাঘ-মধ্যাহ্নে ঘুঘুর কুঞ্জে বৃথাই সেদিন কান পেতে শুনতে চেয়েছি ইমন, বেহাগ বা পুরিমার রেশ! এ বছর (1980) দেখে এলাম, সেই ইমারৎটা পুরাতত্ত্ব বিভাগ থেকে আদ্যন্ত নতুন করে বানানো হচ্ছে। আকবরী শৈলীতে। আগামী বছর যদি যান, দেখবেন সেই ‘বালবিশ্বারী’ বিশ্ববার নিকা সুসম্পন্ন। সে জমিয়ে কসেছে ঠুংরির আসরে। তার সর্বাপেক্ষা বলমূল করছে নানান আভরণ। তার বাজুবন্দ খুলু-খুলু যায়!

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. রেন্ট হাউস | 10. A. পাঁচমহল |
| 2. কারখানা (আস্তাবল) | 10. B. সুনহারামহল |
| 3. কোনও অমাত্যের গৃহ | 11. অশ্বাবাস/উষ্ট্রাবাস |
| 4. স্নানাগার | 12. ইবাদৎখানা (?) |
| 5. দেওয়ান-ই-খাশ | 13. জাম-ই-মসজিদ |
| 6. সুখতাল (পুষ্করিণী) | 14. বুলন্দ-দরওয়াজা |
| 7. A. দৌলতখানা (?) | 15-19 চিত্র-9.11 দৃষ্টব্য |
| 7. B. পাঁচশী কোর্ট | (প্রদর্শিত অংশের |
| 7. C. আবদারখানা | বাহিরে) |
| 7. D. অনুপতলাও | 20. সৌলমর্চিস্তর দরগা |
| 8. দফতরখানা | 21. ইসলাম-খাঁ মক্‌বরা |
| 9. বীরবল-প্রাসাদ (?) | 22. পূর্ব-দরওয়াজা |
| 10. যোধপুত্র-প্রাসাদ | 23. মসজিদ-কিব্বলা |

এ জিনিসটা—মাপ করবেন, আমার ভালো লাগেনি। মেরামতির কাজ নিশ্চয়ই হবে আকবরী শৈলীতে; কিন্তু এমন একটি সুক্ষ্ম সীমারেখা টানতে হবে, যাতে দর্শক বুঝতে পারেন কতটা আদিমরূপ, কতটা পুরাতত্ত্ব বিভাগের মেরামতির কেরামতি। এ বিষয়ে আমার পূর্ববর্তী গ্রন্থ অজন্তা-অপরূপাতেও¹⁶ আলোচনা করেছিলাম। লোক পরম্পরায় শূন্যে, এ মত স্বীকার করতে পারেননি পুরাতত্ত্ব বিভাগের অতি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত একজন বাঙালী অফিসার। তাঁর মতে মেরামতি এমন নিখুঁত হবে, যাতে দর্শক বুঝতে না পারে কতটুকু আদিম রূপ, আর কতটুকু সংযোজন। তা মতপার্থক্য ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রভেদ তো থাকতেই পারে। অন্তত পুরাতত্ত্ব বিভাগ এইটুকুই করে দিন না—নব-নির্মিত স্থাপত্য-কীর্তিতে রেখে দিন কিছু ফ্রেমে বাঁধানো ফটোগ্রাফ—কাজ শুরুর পূর্বের অবস্থা দেখিয়ে। তাহলেই আমাদের মতো সাধারণ দর্শক তৃপ্ত হবে।

আর পুরাতত্ত্ব বিভাগকে ধন্যবাদ তাঁদের ঐ মতটাকে সম্প্রসারিত করে অজন্তার নষ্ট হয়ে যাওয়া প্রাচীর চিত্রে নতুন করে রঙের পোঁচরা মারতে কাউকে বসিয়ে দেননি।

ফতেপুর-সিক্রির স্থাপত্য-কীর্তিকে আমরা ত্রি-ধারায় বিভক্ত করে আলোচনা করব। এক : রাজসিক প্রয়োজন (দফতর, দৌলতখানা প্রভৃতি); দুই : পারিবারিক প্রয়োজন (জেনানামহল, খোয়াবগাহ ইত্যাদি); তিন : ধর্মীয় প্রয়োজন (মসজিদ, দরগা ইত্যাদি)। অবশ্য স্থানে স্থানে নির্দিষ্ট সীমারেখা মেনে চলা হয়তো সম্ভবপর হবে না, যেমন রাজসিক বুলন্দ-দরওয়াজা পড়বে ধর্মীয় পর্যায়, ধর্মীয় ইবাদৎখানা আলোচিত হবে রাজসিক-বিভাগে।



চিত্র-9.12 প্রধান দর্শনীয় অংশের ভূমি-নকশা, ফতেপুর-সিক্রি।

সেওয়ানখানা-ই-আম : আয়তক্ষেত্রের আকারে প্রকাণ্ড উদ্যান, তার চারদিকে অলিন্দ। পশ্চিমপ্রান্তের অলিন্দের কেন্দ্রস্থলে ম্বিতলে একটি কোলা-বারান্দায় পাশাপাশি পাঁচটি কক্ষ। কেন্দ্রস্থ অলিন্দ-ঝরোকা (চিত্র-9.13, A) বসতেন শাহ-য়েন-শাহ ম্বয়ং। তিনি এখানে প্রতাহ প্রাতে প্রজাবন্দকে দর্শন দিতে উপস্থিত হতেন পিছনের (C) প্রবেশপথ দিয়ে। বাহিরের দিক থেকে অন্যান্য বিশিষ্ট অমাত্যেরা, আমীর-মালিকেরা ম্বিতলে উঠে আসতেন একটি পৃথক সোপান (B) বেয়ে। এই ঝরোকায় উত্তর-পশ্চিম কোণে দেখবেন এখনো একটি লোহার আঙটা পাষাণ চম্বরে সন্দুতভাবে আটকানো আছে—গাইডকে প্রশ্ন করবেন, সে দেখিয়ে দেবে। সেখানে রজ্জুবন্ধ অবস্থায় নিত্য হাজিরা দিত একটি সূর্যশিক্ষিত রাজহস্তী। কোনো হতভাগ্যের মৃত্যুদণ্ড হলে সর্বসমক্ষে ঐ হস্তীর পদ-তলে তাকে পিষ্ট করা হত! বলা বাহুল্য, এ ঘটনা ঘটত ক্বচিৎ কখনো—তবু রাজশক্তির প্রতীক হিসাবে মাহুং নিত্য উপস্থিত করত সেই হস্তিপ্রবরকে। অর্থাৎ কামড়াই আর না কামড়াই ফোস করতে দোষ কি?

এই প্রশস্ত উদ্যানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মনে মনে ছবিটা আঁকবার চেষ্টা করুন—হিন্দুস্থানের শাহ-য়েন শাহ আকবর-বাদশার দরবারের দৃশ্যটি। সারি সারি শান্ত্রী সজ্জিনহাতে দণ্ডায়মান। ঘোষক উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করছে সম্রাটের আগমন বার্তা : হুশিয়ার! পিছনের দ্বারপথে সেই বৃক্ষকন্ড পুরুষটির আবির্ভাবমাত্র সসম্মানে নিজাম-উল-মুলকতক্ হাজারো প্রজা উঠে দাঁড়িয়ে পূজার দিচ্ছে : আল্লা হো আকবর!

প্রসঙ্গত বলি, কয়েক বছর পূর্বে ব্রিটেনের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী কালাহান যখন ভারতভ্রমণে আসেন, তখন ঐ A-চিহ্নিত ঝরোকায় একটি মৃগল-সিংহাসনে তাঁর সম্বর্ধনার আয়োজন হয়। তা-কড় তা-বড় ভারতীয় রাজনীতিজ্ঞ এবং পদস্থ মন্ত্রীমহোদয়গণের (নাম থাক, কে-জানে কবে আবার এমার্জেন্সি হবে) আসন পাতা হয়েছে। তাঁরা ঐ B-চিহ্নিত সোপান অতিক্রম করে যে-দ্বার আসনে বসে আছেন। কৃষ্ণম দরবারের জৌলুষ আর রোশনাইয়ে আকবরী-জমানাকে উজান বেয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। উদ্যানে কিছ্ প্রদর্শনারও আয়োজন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এসে সব কিছ্ দেখে তাক্সব। হঠাৎ তিনি বলে বসলেন, অসম্ভব। ঐ সিংহাসনে আমি কিছ্তেই বসব না! ভারতবর্ষের ইতিহাস আমার অজানা নয়!

এঁরা বে-ইচ্ছা! কুঁসিগুঁসি হাতে হাতে নিচে নামিয়ে আনা হল!

এ-কাঁহনৌ ফতেপুর-সিক্রিতে প্রত্যক্ষদর্শী সরকারী গাইডের মুখে শুনোঁছ। কতদূর সত্য তা তাম্বা-তুলসী-গঙ্গাজল হাতে বলতে পারব না।

ইবাদখানা : আক্ষরিক অর্থ—প্রার্থনাস্থল। আকবরের ইতিহাস নিয়ে বারিা গবেষণা করেন তাঁদের কাছে এ ইমারৎ—হিন্দু হলে কাশী, মুসলমান হলে মক্কা। সম্রাটের জীবনদর্শনের সৌরমণ্ডলে এই সৌধটিই সূর্যদেব। ইতিহাস ক্বাছে, 1575 সালে সম্রাট এটি নির্মাণ করেন—ঠিক কোথায় তা ক্বা হয়নি। প্রাথমিক পর্যায়ে উদ্দেশ্য ছিল—এখানে মুসলমান মোল্লাদের সঙ্গে সম্রাট ধর্মালোচনা করতেন। শিয়া ও সূফি সম্প্রদায়ের বিবাদ মিটিয়ে দেওয়া, সূফী সম্প্রদায়ের মূল বক্তব্যটা প্রাণধান করা ইত্যাদি। পরে আকবর এই ইমারতের দ্বার অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের জন্যও উন্মুক্ত করে দেন। মুসলমান, হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, জরথুষ্ট্র প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের পণ্ডিতদের তিনি পর্যায়ক্রমে আমন্ত্রণ করতেন—তাদের বক্তব্য শুনতেন, আলোচনা করতেন, তর্ক করতেন এবং নিজে সিদ্ধান্তে আসার পথ খুঁজতেন। এরই শেষ ফল-শ্রুতি—দীন-ইলাহী ধর্মের প্রবর্তন। তারপর থেকে ইবাদখানা এ কার্যে ব্যবহৃত হত না।

এই ইবাদখানায় যে ধরনের আলোচনা হত তা থেকেই সম্রাটের চরিত্রটা বেশ বোঝা যায়। কোনো কোনো ঐতিহাসিক ইঙ্গিত দিয়েছেন—আকবরের ধর্মসিদ্ধতা, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য প্রচেষ্টা এক দীন-ইলাহীর প্রবর্তন নিতান্ত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। অর্থাৎ মূল উদ্দেশ্য ছিল শাসন-স্বক্শ্বার বনিয়াদ সুদৃঢ় করা। এ-কথা আংশিক সত্য বলে মনে হয়, পূর্ণ সত্য নয়। নিরঙ্কর আকবরের অন্তরে লুক্কায়িত ছিল একটি তালিব-ইলম্বী, জিজ্ঞাসু ছাত্র, একটি জ্ঞানপিপাসু সত্ত্বা। নৈতি নৈতি করে তিনি তাম্বা জিন্দেগীভর কী-একটা খুঁজতেন; প্রান্তর পশরা পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সেই ফাঁকটা তাঁর ভরেনি! ফরাসী দার্শনিক ডেকার্টের চেয়ে অর্ধ শতাব্দী পূর্বে তিনি এসেছেন এই দুনিয়াদারীর দু-কুড়ি-সাততর খেলা খেলতে, অর্ধ শতাব্দী পূর্বে খেলা সাপাও করেন। ঐ ডেকার্টে যেভাবে প্রচলিত ক্যাথলিক ধর্মকে নিজ বিবেক-বুদ্ধির তুলনামুখে ওজন করে নিতে চেয়েছিলেন,

ঠিক তেমনভাবেই এ পূর্ববন্দে আকবর সম্মুখে
নিত্য চেরেছিলেন ধর্মাত্ম মোল্লাদের সংস্কারাচ্ছন্ন
মতবাদগুলি। ডেকার্টে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন :
Cogito, ergo sum (আমি চিন্তাশক্তি সম্পন্ন, তাই
আমি আছি) ; আকবর সিদ্ধান্তে এলেন : ম্যানিশ্
হামেশা জাহক্ শাদ্ বাদ (পরমাত্মাতে বিলীন হলেই
জীবাত্মার মূর্তি—আকরিক অর্থ অবশ্য তাঁর আত্মা
বিশ্বব্রহ্মের অন্তরে বিলীন হয়ে আনন্দলাভ করুক)।

ইবাদতখানার ধর্মালোচনার প্রসঙ্গে নানান তথ্য
লিপিবদ্ধ করে গেছেন আব্দুল ফজল ও ফৈজি।
দুটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করছি, আকবর-চরিত্রের দুটি
দিক উজ্জ্বলিত করতে ; তাঁর পরম সহিষ্ণুতা এবং
তাঁর বৈজ্ঞানিকসুলভ অনুসন্ধিৎসা।

একবার বৃন্দাবনবাসী এক তত্ত্বজ্ঞানী হিন্দু
সম্মাসীর বিষয়ে উৎসাহিত হয়ে সম্রাট তাঁর জনৈক
কর্মচারীকে বলেছিলেন সম্মাসীকে সদলবলে ফতে-
পুর-সিদ্ধিতে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে। সম্রাটের
বাসনা যে কর্মচারীটিকে চরিতার্থ করতে দেওয়া হল
সে মঙ্গলরীতিতে রশত, আকবরী-জমানার অভ্যস্ত নয়।
ধরে আনতে কাল সে বেঁধে আনে। সে সেপাই
পাঠিয়ে দিল বৃন্দাবন থেকে সেই সম্মাসীকে শিষ্য
শ্রেষ্ঠতার করে আনতে। শাহ-য়েন-শাহ-এর আদেশ!
সম্মাসীকে আসতে হল। পদব্রজে—বৃন্দাবন থেকে
ফতেপুর-সিদ্ধি। সম্রাট এসব বৃত্তান্ত কিছুই জানেন
না। ইবাদতখানায় যেদিন সম্মাসী উপনীত হলেন
সেদিন আকবর তাঁকে অনুরোধ করলেন সৃষ্টিতত্ত্বের
ব্যাখ্যায় কিছু বলতে। অকুতোভয় সর্বভাগী সম্মাসী
তৎক্ষণাৎ মুখে মুখে একটি স্বরচিত দোঁহা শুনিয়ে
দিলেন :

“সান্তান কো কাঁহা সিদ্ধি সন্ কাম ?

আগুয়ং-স্নাং পাইয়া টুটি*, ছোড় গ্যয়ো হর-নাম !

যাকে দেখে ঘিন্ উপযাং হায়,

তোহি করবে পড়ি সালাম !!”*

সমস্ত সভা স্তম্ভিত। স্বাক্ষরান্তে সিপাহ-
সালার অজান্তেই ডান হাতে চেপে ধরেছে কোমরবন্ধে
তরোয়ারের মূঠ। আকবর নির্বাক। সংবাদ নিয়ে

* আসাদের মতো ক্ষুদ্র প্রাণীর সিদ্ধিতে কী কাম ?

নেতে-আসতে পারের খিল খুলে যায়,

ভুলে গেলাম হরের নাম।

এসে যাকে দেখতে হল, তার দর্শনে তো পা ঘিন্

ঘিন্ করছে! উপায় কি? তাকেই সেলাম জানাই।

জানতে পারলেন কর্মচারীর অবিস্মৃতিশীলতার সম্মাসী
কী-ভাবে নিগূহীত। আগন্তুক সম্মাসীকে একমুঠো
আসরাফি প্রণামী স্বরূপ দেওয়ার আদেশ করলেন শূন্য।

শ্বিতীয় কাহিনীটি আকবরকে লক-বেকন-ভঙ্গ-
তেয়ারের শ্রেণীভুক্ত করে।

ইবাদতখানার প্রথম দিকের ঘটনা। তখন সেখানে
শূন্য মঙ্গলমান মোল্লাদেরই প্রবেশাধিকার। আকবর
একদিন বললেন, আপনারা বলছেন, এই দুনিয়ায়
সব কিছুই পয়দা করেছেন আল্লাহ ; কিন্তু সবকিছুই
প্রত্যক্ষভাবে তিনি সৃষ্টি করেননি নিশ্চয়? পরোক্ষ-
ভাবেও তো কিছু হয়েছে—মানুষের নিজের চেষ্টায়?

বড়ে-ইমাম ব্যাংগভরে বললেন, যেমন এই ইবাদত-
খানা-ইমারৎ?

আকবর গাম্ভীর্য কজায় রেখে এবং ব্যাংগটা গায়ে
না মেখে বললেন, না! যেমন ভাষা। বাকশক্তি।
আল্লাহ মানুষকে শব্দ দিয়েছেন ঠিকই—কিন্তু অর্থ-
বহ শব্দের ব্যবহারে মনের ভাব শ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে
সংক্রামণের যে বিদ্যা—ভাষার ব্যবহার, তা কি মানুষের
সৃষ্টি নয়?

ও-হরগীজ্ নয়! সম্ভবের প্রতিবাদ করে ওঠে
মোল্লার দল। ওদের সমবেত সিদ্ধান্ত : ভাষাও
ঈশ্বরের দান।

আকবর মানতে রাজী নন, বলেন—আমার ধারণা
মানবশিশু তার বাপ-মায়ের কথাবার্তা শুনে নিজের
চেষ্টায় ভাষা শেখে।

বড়ে-ইমাম তাঁর দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে
নিদান হাঁকেন, জাহাঁপনার এরকম ভ্রান্ত ধারণা হওয়া
কিছুই বিচিত্র নয়! আপনি কাফেরদের সঙ্গে বস্ত
বোশি মেলামেশা করেন।

: তার মানে আপনারা বলতে চান, কোনো
সদ্যোজাত শিশু যদি জন্মের পর থেকে মানুষের ভাষা
না শোনে তাহলেও আল্লাহ-র কৃপায় সে কথা বলতে
পারবে?

: আসবে পারবে! মনে করে দেখুন সম্রাট, এক
বছর বয়সে আপনি মায়ের ক্রোড়চ্যুত হয়েছিলেন ;
কিন্তু চার বছর বয়সে মাকে দেখেই চিন্তে পারলেন!
এ কী আপনার নিজস্ব কৃতিত্ব? এ তো সেই পরম
করুণাময় আল্লাহর কৃপা!

সমস্ত সভা একবাক্যে কেয়াবাং দিয়ে ওঠে।

আকবর হেসে বললেন, ঠিক আছে। এ প্রতর্ক
আজ মঙ্গলত্ববি থাক। পরে একদিন এ নিয়ে আলোচনা
করা যাবে।

এই ঘটনার ঠিক চার বছর পরে সম্রাট একদিন বলে বসলেন, মহাশয়গণ, আপনাদের নিশ্চয় স্মরণ আছে, চার বছর পূর্বে আমরা একটি প্রতীক মূলত্বাব রেখেছিলাম : ভাষা ঈশ্বরের দান, না মানুষ্যের সৃষ্টি। মনে পড়ছে ?

মোল্লার দল মৃদু তাকাতাকি করে। কারও কিছু স্মরণ হয় না। তখন সম্রাটের আদেশে মীর মুনসি চার বছর পূর্বেকার 'প্রসিডিংস্' পাঠ করে শোনালো। শব্দে সকলেই স্বীকার করলেন, ও হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে বটে।

বাদশা বললেন, আমি পরদিনই একটি পরীক্ষা শব্দ করেছিলাম। আজ তার ফলাফলটা যাচাই করার সময় হয়েছে। আমার আদেশে ফতেপুর-সিক্রির বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দশটি সদ্যোজাত শিশুকে সংগ্রহ করা হয়। আমি তাদের একটি পৃথক মোকামে আজ চার বছর ধরে লালন-পালন করছি। সেজন্য পাঁচজন মৃদু-বর্ধির দৃশ্যবতী ধাত্রীকে নিয়োগ করা হয়েছে। আমার হুকুমে সেই মোকামের ত্রিসীমানার মধ্যে গত চার বছরে কেউ কোনো শব্দ উচ্চারণ করেনি। আজ সেই দশটি শিশু চার বছরের বালক। আসুন, আমরা সেই 'গুংগা-মহলে' গিয়ে দেখি তারা কতটা বাকপটু হয়েছে।

পরীক্ষায় দেখা গেল দশজন শিশুর একজনও কোনো কথা বলতে পারে না। হাত-পা নেড়ে মনের ভাব ব্যক্ত করতে পারে মাত্র। আকবর বললেন, আশা করি এখানে আপনারা আমার মত মেনে নেবেন—ভাষা মানুষ্যের সৃষ্টি, আল্লাহ্-র এ দান প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ। 'আমারে দিয়েছ স্বর, আমি তার বেশি করি দান। আমি গাই গান।'

গাইডকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'গুংগা-মহলটা কোথায় ?

সে বলতে পারেনি। নামই শোনেনি বলল। তবে সরকারী হিসাব অনুসারে ইবাদত্থানার অবস্থানটা সে আমাকে দেখিয়ে দিয়েছিল। সেটা আবার আমার পছন্দ হয়নি।

পুরাতত্ত্ব বিভাগের মতে হারাম-সারা প্রাসাদের পিছনে, অর্থাৎ তোষাখানা ও আস্তাবলের দক্ষিণে (চিত্র—9.12-এ 12) যে ভগ্নস্তূপ সেটাই ইবাদত্থানার ধ্বংসাবশেষ।¹⁰ ওরা সে ধ্বংসস্তূপ ঘেঁষে সিঁড়িতে এসেছেন—ইবাদত্থানা, যার ভিতটুকুমাত্র অবশিষ্ট আছে, তা ছিল একটি চতুষ্কোণ ইমারত, 19.5 মিটার বর্গক্ষেত্র।

আমি একমুহূর্তে হতে পারিনি। আমার বিশ্বাস, ইবাদত্থানা ছিল দেওয়ান-ই-খানের পূর্বাঙ্গের চতুষ্কোণ অংশটিতে যার চতুর্দিকে আলন্দ এবং পূর্ব-প্রান্তে একটি প্রবেশ দ্বার ছিল (চিত্র—9.13, E)। এই E-চিহ্নিত দ্বারটি যে অতীতে ছিল, বর্তমানে কথ্য করে দেওয়া হয়েছে, সে-কথা পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রানে ও রিপোর্টে স্বীকৃত। "Emerging from the Jewel House (আমাদের চিত্র—9.13-এর প্লানে, দেওয়ান-ই-খান), glance at the remnants of cloisters, towards the north-east corner, which formed a partially enclosed quadrangle. They abut a large ruinous building of two storeys, built of rubble masonry and trimmed with stone. They continued along the bare plastered back wall of the Diwan Khana-i-Amm where the sockets, hollowed out to fix bases of pillars, can still be seen, and would have screened the now closed doorway from that building." (italics ours)

আশ্চর্য! ঐ বৃহৎ ম্বিতল ইমারতটি এবং বর্তমানে বন্ধ করে দেওয়া (E-চিহ্নিত) দ্বারটি কিজন্য নির্মিত সে-কথা আলোচনা করা হয়নি রিপোর্টে। বর্তমান লেখকের ধারণা, এটিই ইবাদত্থানা! এই আয়তক্ষেত্রের মোকামটি ইবাদত্থানারূপে চিহ্নিত হলে ঐ দ্বারটি অর্থবহ হয়ে ওঠে। না-হলে বলতে হয় এটি প্ল্যানিং-এর একটি প্রকান্ড ত্রুটি। দ্বারটি অহেতুকী হলে তাকে ত্রুটি বলতে হবে এক্সন্য বে, এটি গোটা প্রাসাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে। ঐ খিড়কি-দরজার জন্য পৃথক শাস্ত্রীয় প্রয়োজন হচ্ছে। যে-কারণে পুরাতত্ত্ব বিভাগ এটি বর্তমানে বন্ধ করে দিয়েছেন। অথচ ঐ অসনাত্ত ম্বিতল মোকামটি ইবাদত্থানা হলে ঐ দ্বারটি আবশ্যিক হয়ে পড়ে।

ইবাদত্থানার বাহিরের দিক থেকে পশ্চিমে আসবেন, সম্রাট আসবেন ভিতর দিক থেকে। তাই এ ইমারতে দু-দিক থেকে দুটি দ্বার আবশ্যিক। পুরাতত্ত্ব বিভাগ যে (চিত্র—9.12-এ 12) ভগ্নস্তূপকে ইবাদত্থানা বলে সনাক্ত করেছেন সেখানে যেতে হলে সম্রাটকে নানান কামেলার মধ্যে পড়তে হয়। হারাম-সারা বা খোম্বাবগাহ্ থেকে সম্রাট নিশ্চয় ঐ উট এবং ঘোড়ার আস্তাবলের মধ্যে দিয়ে কোনো খিড়কি পথে প্রতিদিন ইবাদত্থানায় যেতেন না। তাহলে তাঁকে যেতে হয়

বিকল্প পথে, দক্ষিণ-পূর্ব-দিকের দিকে, ঘোষণা-প্রাসাদের পার্শ্ব-পার্শ্ব-দিকের জন-হাতি রেখে (ইয়া আল্লাহ! সে-আমলের খাটা-পায়খানা!) উট ও ঘোড়ার আশ্রয়-পাঠা-পাঠি নির্মিত ঐ পুরাতন-বিভাগ-চিহ্নিত ইবাদতখানায়! বেশ তাই যদি যান, তো কী-ভাবে যান? এতটা পথ সম্মুখে নিশ্চয়ই প্রতি-দিন পদক্ষেপে যেতেন না। ফলে ঘোড়ার দরকার, দেহ-রক্ষা ও নিরাপত্তার প্রয়োজন হয়ে পড়ে আর্থিক। সুতরাং কিছুতেই মনে নিতে পারছি না, পায়খানা ও আশ্রয়-সংলগ্ন ঐ ধ্বংস-স্থাপনা ইবাদতখানার।

অপরপক্ষে দেওয়ান-ই-খামের পূর্বে ইবাদতখানা যদি অবস্থিত হয়, তাহলে বহিরাগত পণ্ডিতেরা যেমন E-চিহ্নিত দ্বার দিয়ে সেখানে যেতে পারেন, তেমনি সম্মুখেও হারেম থেকে প্রাসাদ-প্রাচীরের বাহিরে না গিয়েও সেখানে উপস্থিত হতে পারেন। হারেমকে আড়াল করে যে একটি পাথরের জালিকাজ করা প্রাচীর ছিল সে-কথা তো রিপোর্টে স্বীকারও করা হয়েছে—ফলে অন্দরমহলের পর্দাও ব্যাহত হচ্ছে না।

জানি না, বাঙলা গ্রন্থে লেখা এ যুক্তি পুরাতন-বিভাগের নজরে আদৌ পড়বে কিনা এবং আকবরী ইবাদতখানাকে ভবিষ্যতে ঐ উটের পুরীষ এবং হারাম-সারার শোচাগারের পরিবেশ থেকে মুক্তি দিতে তাঁরা স্বীকৃত হবেন কিনা।

বাদশাহী হামাম : গাইডকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবেন, এই স্নানাগারে কী ধরনের ব্যবস্থাপনা ছিল। এখনো তার চিহ্ন দেখা যায়—শীতল ও গরম জল আসার পাইপ, জল গরম করার আয়োজন, ঠান্ডা ও গরম জলের পৃথক চৌবাচ্চা। তৈলমর্দন-কক্ষ, সংলগ্ন শোচাগার, স্নানকক্ষ, বস্ত্র-পরিবর্তন কক্ষ সমস্তই পৃথক। এ ছাড়া আলো আসার কান্দাটাও লক্ষণীয়। আরও বিশেষ করে দেখবেন, স্নানঘরের ডায়েতে কী মসৃণ 'স্পেল্ড' টালি বসানো ছিল। সাড়ে পনের-আনাই অবলম্বিত তবু কিছু কিছু ভগ্নাবশেষ চিহ্ন আছে। ওর সামনে একটি দেশলাই কঠি জ্বালিয়েই কম্পনায় দেখতে পাবেন—একটিমাত্র চিরাপে ঘরটা কী পরিমাণ কলংক করত।

অনুপ-তাল্লাও : চতুষ্কোণ কৃষ্টিম জলাশয়ের কেন্দ্র-স্থলে প্রস্তর-নির্মিত বেদী। তানসেন, কৈয়ুমখানার প্রভৃতি সূর-সরস্বতীর বরপুত্রদের সেই অবিস্মরণীয় সঙ্গীতের আসর কসত এখানে। গান-বাজনার সখ যদি থাকে তাহলে, চুপি চুপি বাঁজ, ঐ বেদী-পাথরে

হাতটা ঠেকিয়ে সবার অলক্ষ্যে কপালে একবার ছুইয়ে নেবেন!

বাদশাহ সচরাচর বসতেন উত্তর-পূর্ব কোণের চত্বরায় (সঙ্গীত-প্রোতার মণ্ড)।

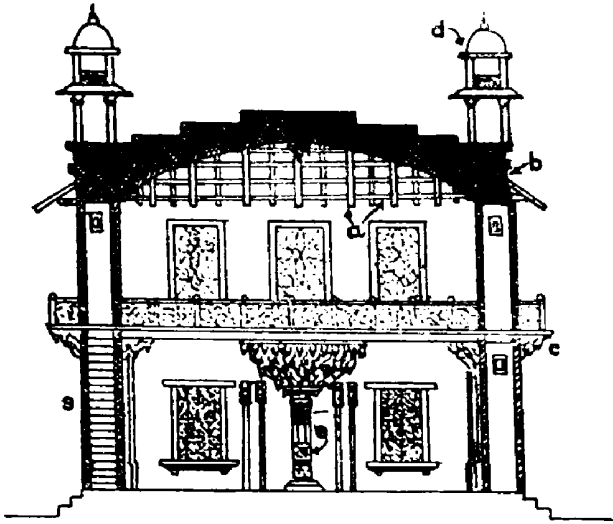
খোয়াবগাহ : অনুপ-তাল্লাও-এর দক্ষিণে অতি বিচিহ্নিত অলিন্দ-সম্মিলিত একটি বিশ্রামাগার, তার দক্ষিণে শাহ-য়েন-শাহের শয়নের আয়োজন। পালঙ্ক প্রস্তর নির্মিত; তাতে উঠতে হয় সোপান বেয়ে। ঐ প্রস্তর-পালঙ্কের নিচে থাকত এক হাত জল—যা ক্রমাগত ইভাপরেশান-এ কক্ষটিকে স্নিগ্ধ-শীতল করে রাখত। লক্ষ্য করে দেখবেন, অথবা গাইডকে প্রশ্ন করলে সে দেখিয়ে দেবে—এই শয়নকক্ষ থেকে বেগম-মহলে যাবার, বরং বলা উচিত বেগমমহল থেকে এই খোয়াবগাহ-এ আসবার একটা গোপন পথ আছে! পথ দীর্ঘ এবং এখন মনে হতে পারে সেটা 'গোপন' নয়; কিন্তু সে-আমলে তাই ছিল। পাথরের স্তম্ভীন দেওয়ালগুলি অবলম্বিত হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে গোপনীয়তার আয়োজনটা সহজে বোঝা যায় না।

আবদারখানা : অনুপ-তাল্লাওয়ের উত্তর-পশ্চিমে ইংরেজ L-অক্ষরের মতো এই ইমারতটিকে কেউ কেউ বলেছেন মেয়েদের স্কুল। সম্ভবত এ ধারণা ভুল। হারেমের বাহিরে, বিশেষত অনুপ-তাল্লাও, যানার্নাক নাচ-গানের আসর, তার সংলগ্ন এ মোকাম নিশ্চয়ই স্ত্রী শিক্ষায়তন ছিল না। এটি অন্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত হত। কী প্রয়োজনে? আমার যা অনুমান তা এখনই বলব।

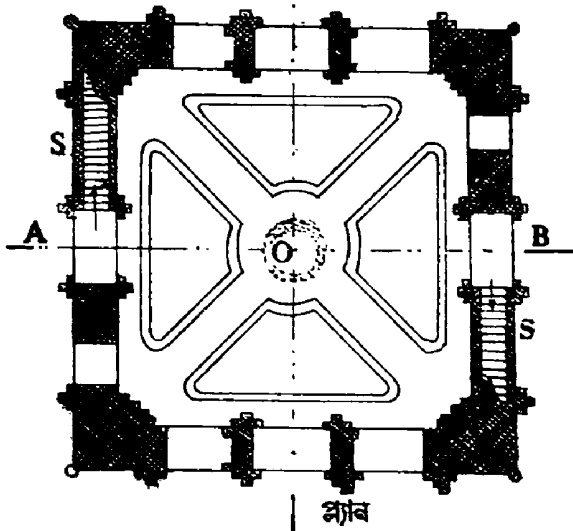
পাচিশী কোর্ট : অনুপ-তাল্লাওয়ের উত্তরে অক্ষের যোগ-চিহ্নের মতো দাগটা কোনো ইমারতের নয়। ওটা একটা প্রকান্ড পাশা-খেলার ছক। মেঝেতে খোদাই করে দাগ দেওয়া। খেলা সাঙ্গ হয়েছে চারশ বছর আগে, জীবন্ত ঘুটিগুলি আজ ছায়ার চেয়েও ছায়া। খেলোয়াড়েরা টিকে আছেন ইতিহাসের পাতায়—কিন্তু খেলার ছকের দাগগুলি পায়ে পায়ে আজও মিলিয়ে যায়নি! কেউ কেউ বলেন, খাপসদরং বাদীরা হত এই পাশা-খেলার জীবন্ত ঘুটি। তাদের হাতে ধরে সরিয়ে-নাড়িয়ে দিতে হত না। খেলোয়াড়দের আদেশে তারা ঘর পালটাতো। এ-কথা যদি সত্য হয় তাহলে আবদারখানার ঐ স্মিতল মোকামটি অর্থবহ হয়ে ওঠে। ওখানে কসলে খেলোয়াড়েরা গরুড়াবসোকনে ঘুটিগুলি দেখতে পান।

মোজান-ই-খাশ : মৌলভানাগরের পূর্বপ্রান্তে সম-চতুষ্কোণ এই ইমারতটি সুবিখ্যাত (চিত্র-9.14) তার কেন্দ্রস্থ মস্তম্ভটির কল্যাণে (O)। কেউ বলেন, এটি সন্ন্যাসের গোপন মন্দিরাসভা। কেউ বলেন, এখানে বসে তিনি হীরে জহরৎগুলি পরীক্ষা করতেন। কারণ এর ঠিক পশ্চিমেই মৌসংখানা বা 'ট্রেজারি'। অন্তত পুরা-

শ্বিতীয়ত্ব। হিন্দু ও মুসলিম-স্থাপত্যের মিলন হয়েছে এখানে। স্থপতি যদি নিত্যন্ত কাঁচুল বা অহৈতুকী উন্ন্যাসে অর্থব্যয়ে উৎসাহী না হন, তাহলে কব-হারিক উপযোগিতার (functional utilitarian values) মূল্যায়নে এ ইমারতকে কসে দেখতে হয়। এতটুকু এক-কামরার বাড়িতে দাঁটি সিঁড়ি (s) কাছাকাছি ;



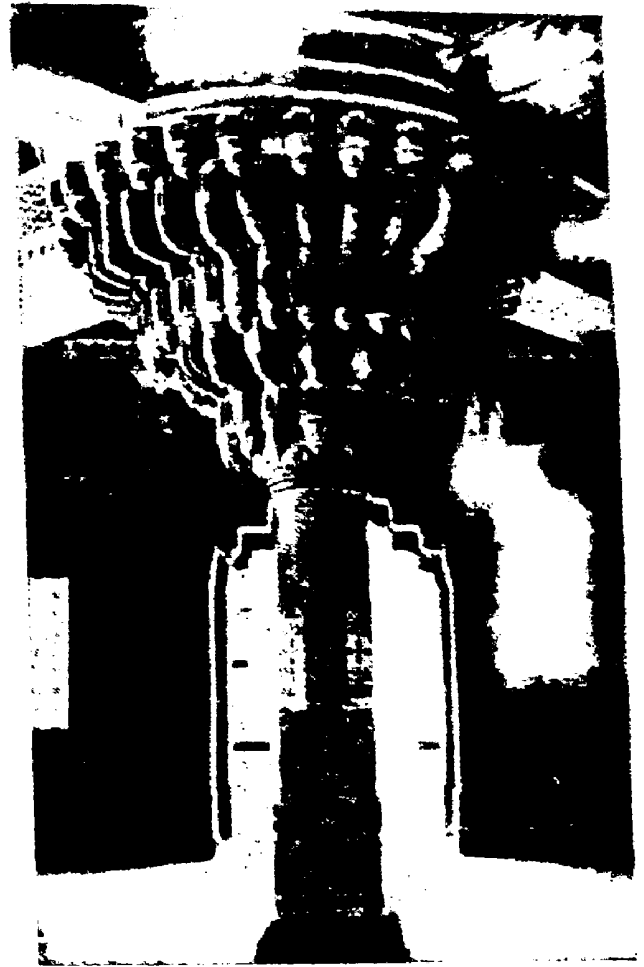
A-B সেকশন



চিত্র-9.14 খাশমহল (?) মৌলভানা (?)
[ইবাদতখানা-ই-খাশ ?]

তত্ত্ব বিভাগের রিপোর্টে এই দুটি সম্ভাবনার কথাই শব্দ বলা হয়েছে। কিন্তু তাহলে এ ইমারতের স্থাপত্য সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়ে যায়। কেন এ কেন্দ্রীয় বিচিত্র-দর্শন মস্তম্ভ? কেন দূ-পাশে দুটি সিঁড়ি? কেন ক্ষিত্তলে রাখনৈমির কেন্দ্রস্থলে আসনের আয়োজন?

স্থাপত্যের বিচারে এ ইমারৎ অনন্য-একমেবা-

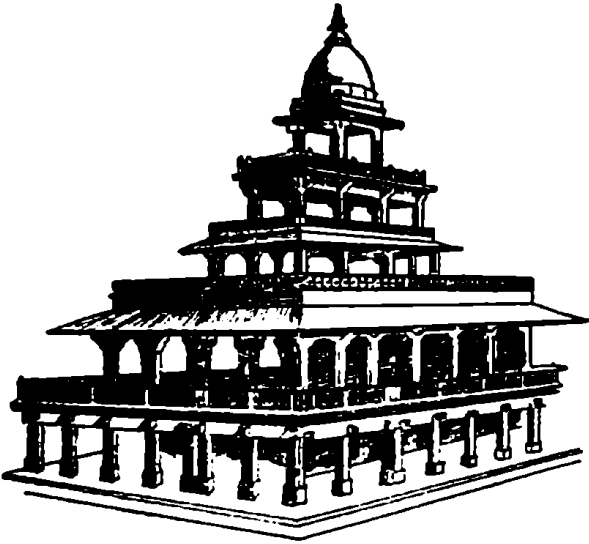


চিত্র-9.15 খাশমহলের কেন্দ্রীয় মস্তম্ভ, কতদূর-সিঁড়ি।

বাসের পক্ষে এ মোকাম সম্পূর্ণ অযোগ্য। স্থপতি গম্বুজ বানিয়েছেন, কিন্তু পাথরের কাঁড়-করুণা (a) স্বেভে বৃদ্ধিতে দেননি ছাদের জ্বর কী-ভাবে রক্ষিত হচ্ছে। গম্বুজ শব্দ ভিতর থেকেই লুকানো হয়নি। বাহির দিক থেকেও হিন্দু-শৈলীর কবেলিত-করা ধাপ দেখে (b) ভা আড়াল করা হয়েছে। শ্বিত্তলে হিন্দু-

শৈলীর কোলা-বারান্দা, উপরে ছক্কা (c) ; সবার উপরে, ছাদে চার-কোণার চারটি ইসলামী ছাঐ, গম্বুজ-সমন্বিত (d)। সবচেয়ে বিচিত্র-আকার কেন্দ্রীয় স্তম্ভটির (e)। পাদপাঠ চতুষ্কোণ, তার উপরে হিন্দু-মন্দিরের অষ্টদিকপালের আট-কোণা, তার উপরে পার-সিক-নকশা স্বচিত্র বোলো-কোণা। সবার উপরে তিন-ধাকে এক বিচিত্র অলঙ্করণ। কী এর ব্যঙ্গনা? সেটা আপনার অভিরুচির উপর নির্ভর করে। বলতে পারেন—এ একমেবাম্বিতীয়ম্ স্তম্ভটি বলছে : লা ইলাহা ইল্লা লাহা (অল্লা ভিন্ন মিতীয় প্রভু নেই)! অথবা I am, Who am! কিম্বা 'য একবর্ণা বহুধা শক্তিবোধ্যঃ বর্ণানেনকান নিহিতার্থ দধতি।' (চিহ্ন—9.15)।

আম্রার বিশ্বাস, গ্রন্থকার-চিহ্নিত ইবাদতখানার অতি স্নিকটে নির্মিত এই মোকামে বিশিষ্ট জ্ঞানী-



চিত্র—9.16 পাঁচমহল অথবা বাদগীর, ফতেপুর-সিক্রি।

গুণীদের নিয়ে সম্রাট ধর্মালোচনা করতেন—এমন বিষয়ে আলোচনা হত, যা ধর্মাল্প পণ্ডিত ও মোল্লাদের সামনে করা যায় না ; সাধনমার্গে যারা এক ধাপ উপরে উঠেছেন—যাদের সঙ্গে জনান্তিকে আলোচনা করা যায় নিরীশ্বরবাদীদের বৃদ্ধি, চার্বাকদর্শন, আউল-বাউল বা সুফী পণ্ডিতদের অন্তরঙ্গ কথা—তাদের নিয়ে সম্রাট এখানে ধর্মীয় দেওয়ান-ই-খাশ-এ বসতেন! প্রতি-বোগদীল ভিন্ন ভিন্ন সোপান বেয়ে শ্বিতঙ্গ উঠে আসতেন, বসতেন সম্রাটের চারিদিকে। সম্রাটের সিংহাসন ছিল একটি স্বর্ণাশ্রিত দ্বিচ্ছাভিঃ চেয়ার ; ইমারতের কেন্দ্র বিদ্যুৎ! শীকার করছি—এ আমার নিজস্ব অন্তর। পণ্ডিতেরা বঙ্গবর্ন। মানা-না-মানা আপনাদের অভিরুচি।

হারাম-সারা : আসুন, মনে মনে শাহ-য়েন-শাহের অনুমতি নিয়ে এবারে হারামে প্রবেশ করা যাক।

হারাম-সারার প্রধানতম প্রাসাদ হচ্ছে যোধবাঈ-মহল। আকবরী-জমানার তার নাম 'যোধবাঈ-মহল' ছিল না। যোধবাঈ হচ্ছেন জাহাঙ্গীরের মহিষী, মানসিংহের ভগ্নী এবং শাহ-জাহাঁর গর্ভধারিণী জননী। অম্বরমহিষী এবং অন্যান্য বেগমেরা এখানেই থাকতেন। এখানে মনে রাখতে হবে আকবরের দু-দুজন বেগম ছিলেন অম্বরমহিষীর চেয়ে 'সিনিয়ার' : রুখিয়া বেগম এবং সালিমা বেগম। তাঁরা ছোটরানীর নামে চিহ্নিত, মন্দির-সমন্বিত প্রাসাদে থাকবেন, এটা আশা করা অনায়াস। সে যাই হোক, এই যোধবাঈ-মহলের উত্তরে নওরোজ-বাগিচা এবং উত্তর-পশ্চিমে তথাকথিত বীরবল-প্রাসাদ। এই সমগ্র হারামসারাহ এবং দৌলৎ-খানার মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য ইমারৎ আছে—পাঁচমহল এবং 'সুনহারা-মকান'। এই তো হচ্ছে প্ল্যানিং। এবার মোকামগুলি সনাক্ত করা যেতে পারে।

পাঁচমহল অথবা বাদগীর : (চিত্র—9.16) অসহ্য গরমের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য দু-জাতির দাওয়াই বাৎলেছেন পারস্য-স্থপতি—'বাদগীর' অর্থাৎ বায়ুর চলাচলে এবং 'জীর-জমিন্' অর্থাৎ ভূগর্ভের কক্ষ। সিক্রিতে ভূগর্ভে মাটি নেই, পাথর ; তাই এখানে বাদগীরের আয়োজন। এই পাঁচতলা মোকামে সর্ব-মোট 176-টি স্তম্ভ। নিচের তলায় সাত-বারো চুরাশি, তারপর সাত-আস্টে ছাপান্ন ; তারপর 20, 12 এবং সর্বোচ্চ তলে মাত্র চারটি। বর্তমানে স্তম্ভের উপর ইমারতের কক্ষালটিই শুধু বর্তমান—যেন কর্কট-বাড়ির কলাম-স্ল্যাব ঢলাই কাজ শেষে সেন্টারিং-তত্ত্বা খোলা হয়েছে মাত্র। সে-আমলে প্রতি তলায় বাহিরের অংশ দিয়ে জালি-কাজের নকশা সমন্বিত পাথরের দেওয়াল ছিল ; তা-থেকে বুলতো খস-খস। সুবাস্তের উপক্রম দেখলেই দাসী-বাদীর দল সেগুলি ভিজিয়ে দিত। যাতে সন্ধ্যার পর স্নিগ্ধ হয়ে থাকত ঐ পাঁচমহল। গভীর রাত পর্যন্ত সেখানে চলত মহিলা-মহলের গুলতানি—কোথাও কথাকোবিদের খোশগল্প, কোথাও গজল-এর আসর, কোথাও বা নিছক 'গজালি'!

ঐ 176-টি স্তম্ভকে লক্ষ্য করে দেখবেন—আকবরী-হারেমের প্রতিটি সুন্দরীর মতো ওরা পৃথক। কেউ কারও হৃদয় অনুকরণ নয়। হয় গঠনশৈলীতে ফারাক আছে, অথবা অলঙ্করণে।

সুনহারা-মকান : (চিত্র—9.17) যোধবাঈ-প্রাসাদের

সা-জবাব দেহলি—অপরূপা আগ্রা

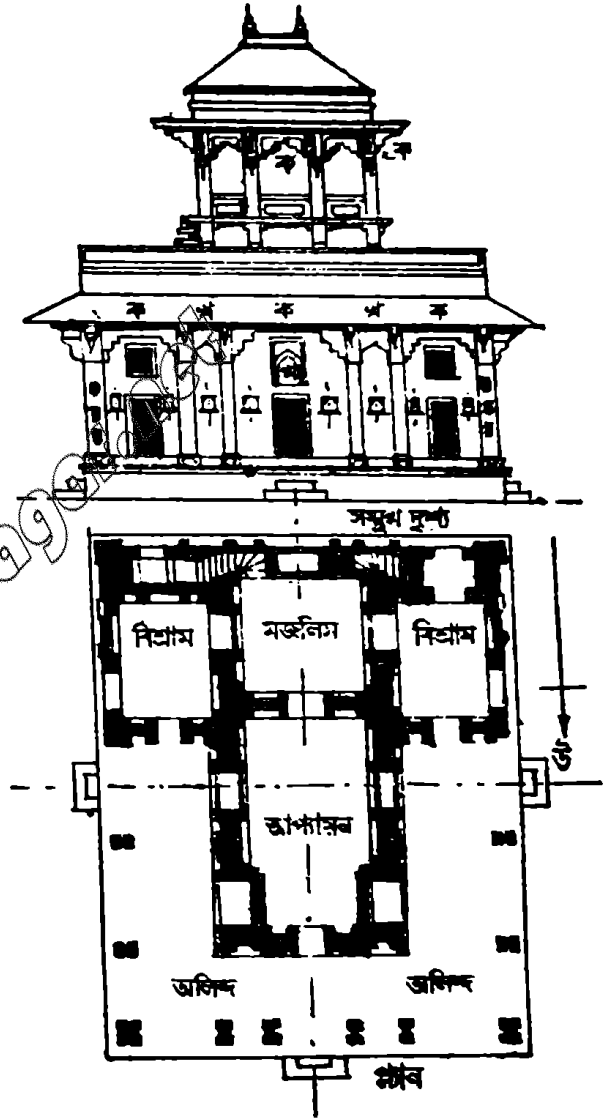
উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত এই ইমারতটিতে বাস করতেন আকবর-জননী হামিদা বানু। হারেমের মার পরিচয় ছিল 'মরিয়ম মকান'। হাতী বেগম, বেগা বেগম এবং গুলবদন বেগমও কখনও কখনও এই মোকামে থাকতেন। 'সুনহারা-মকান' মানে 'স্বর্ণ-কুটির'। 'মাতৃসদন' নাম থাকলেই যেন ভাল মানাতো। ইংরেজী 'T'-অক্ষরের আকারে নির্মিত এই মোকামের দূ-দিকে দুটি সিঁড়ি আছে, মিতলের চব্বতরায় উঠে যাওয়ায়। সম্মুখদৃশ্যে লক্ষ্য করে দেখুন, খিলানে ভারবহনের দূ-রকম আয়োজনই আছে এবং তারা আছে পাশাপাশি। 'ক'-চিহ্নিত খিলান হিন্দু-ষ্ট্রাবিয়েট-পদ্ধতিতে এবং 'খ'-চিহ্নিত খিলান ইসলামী-স্থাপত্যের আর্চ বা আকুয়েট-পদ্ধতিতে। ছম্ভার প্রান্তে যে ব্র্যাকেট তাতে হিন্দু-ভাস্কর্যের (ক) নকশা। পশু-পাখী তো আছেই, এমন কি স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র ও বজ্রহস্ত-বলী রামদাসও হাজির। এর সিলিঙে যে অপূর্ণ মুরাল ছিল তা নষ্ট হয়ে গেছে। টিকে আছে ফেঁজি-সাহেবের একটি বসে।

ভূকি-সুলতানার কুটির : এ স্থাপত্যে বিশেষ করে লক্ষ্য করে দেখুন ঢালু ছাদটা। খাপরা-টালি বা নুড়িয়া-টালির আকারে পাথরের ছাদ তৈরি করা হয়েছে। তাই এ ইমারতকে 'কুটির' বললেই বোধহয় মানায়।

যোধবাই-প্রাসাদ : এই চতুষ্কোণ প্রাসাদের বাহিরের দিকে অন্ধপ্রাচীর—এমন কি ভেনিশীয় পাল্লা-জাতীয় বিকল্প ব্যবস্থাও নেই—যেমন ছিল সত্যজিৎ রায়ের 'চারুলতা' ছায়া-ছবিতে, ঊনবিংশ শতাব্দীর পর্দা প্রথার চিত্র-চিত্রণে। অর্থাৎ বাহির থেকে শব্দ ভিতরই নয়, ভিতর থেকে বাহিরেও দেখা যেত না। প্রবেশ পথের দক্ষিণে প্রহরী মহল। দিবারাট সেখানে হাজির থাকত অতন্দ্র-প্রহরী। যোধবাই-প্রাসাদে যদি ঢুকতে চান, তাহলে সর্বপ্রথমে এখানে গিয়ে আত্মপরিচয় দিতে হবে। অনুমতিপত্র দেখাতে হবে—তবে ভিতরে ঢুকতে পাবেন। না, আপনাকে কলিছি না, আপনি তো বিংশ-শতাব্দীর টেরিস্ট ; আপনার সাতখুন মাপ। সোজা ঢুকে যান !

এ-ক্ষেত্রেও প্রবেশ-তোরণের দূ-প্রান্তে দুটি ম্ভার, তারা রুজু-রুজু নয়। চত্বরের উত্তরে ও দক্ষিণে যে দুটি মিতল অংশ আছে, তাদের গঠন-বৈচিত্র্যের ফারাকটা লক্ষ্য করুন। একটি গবাঙ্কহীন, পাথরের দেওয়ালের শাল-মুড়ি দেওয়া। সেটা শীতকালের আবাসস্থল। অপরটি জালিকাজ-করা কয়োকর

আনত সেন 'সান্ন্যাকুল' সেজি। সেটি নিদায-সম্মার এবংর মাপনের জন্য। চত্বরের পশ্চিমে যে ব-উপ, সেটি পূর্বমুখী মন্দির। অর্থাৎ পূজারীকে পশ্চিম-মুখে বসে পূজা করতে হবে। এ-নিম্ন দৃ-একজন পশ্চিম ভঙ্গি খোলা করবার চেষ্টা করেছেন, দেখাছি। অর্থাৎ আকবর ইসলামী 'কিবলার' নির্দেশে পূজা-



চিত্র-9.17 সুনহারা-মকান-এর বাস্তু-নকশা ও এলিভেশন, কলকাতা-সিটি।

রীকে, হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমমুখো পূজা করতে বাধ্য করেছেন! এ-কথার তৎপূর্ব যোকা ফেল না—কলিঙ্গ ও খাজুরাহোর অধিকাংশ মন্দিরই তো পূর্বমুখী !

বীরকল-প্রাসাদ : এই স্থাপত্য-কীর্তির বিষয়ে

আমাদের মতপার্থক্য শুধু পুরাতত্ত্ব বিভাগের সপোই নয়, ঐতিহাসিক মহাপণ্ডিতদের সপোও। লেখকের মতে এটি আদৌ বীরবলের প্রাসাদ নয়। সুতরাং এই স্থাপত্য-কীর্তির বিচার করার পূর্বে এর মালিকানার একটা ফয়শালা হওয়া দরকার।

বীরবলের নামে ষাঁরা মোকামটি চিহ্নিত করতে উৎসাহী তাঁদের যুক্তি তিন জাতের। এক : বিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা ডঃ শ্রীবাস্তব তাঁর মহাগ্রন্থে এটিকে বীরবলের প্রাসাদ নামে চিহ্নিত করেছেন। দ্বই : হিন্দু-স্থাপত্যের আধিক্য। তিন : নাম ;—স্থানীয় লোকেরা একে বরাবরই বলে ‘বীরবলের প্রাসাদ’।

এবার আমাদের আপত্তিটাও শুনুন। দূ-পক্ষের যুক্তি শুনে আপনারা না হয় রায় দেবেন।

মুগল-জমানায় হারেমের যে দুর্ভেদ্য পর্দাপ্রথা ছিল, তাতে কোন বহিরাগত হিন্দু অমাত্য—তা তিনি দীন-ইলাহী ধর্ম গ্রহণ করুন বা না করুন, আকবর-বাদশাহর সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেন বা না দেন,—আকবরের হারেমের ভিতর বাস করবেন, এ একেবারে অচিন্তনীয়। প্ল্যানে এ ইমারতের অবস্থানটা লক্ষ্য করুন। উত্তরে ও পশ্চিমে খাড়া প্রাচীর, দক্ষিণে অশ্বাবাস ও উষ্ট্রাবাস, পূর্ব দিকে অন্যান্য বেগমদের আবাস—যোধবাঈ-মহল (জাহাঙ্গীর-জননীর অর্থাৎ পাটওয়ানীর আবাস), সুন্দহারা-মকান (আকবর-জননীর আবাস), হাওয়া-মহল (পুরনারীদের সন্ধ্যাযাপনের অন্তঃপুর), নওরোজ বাগিচা (অন্তঃপুরচারিকাদের বাগান), এবং নাগিনা মসজিদ (শুধুমাত্র মহিলাদের প্রার্থনাস্থল) অর্থাৎ হারেমের কেন্দ্রবিন্দুতে।

এটা যদি বীরবলের প্রাসাদ হয় তাহলে প্রশ্ন হবে—তিনি কোন্ পথে যাতায়াত করতেন? উত্তরে ও পশ্চিমে খাড়া প্রাচীর, দ্বারের চিহ্নমাত্র নেই। তবে কি অশ্বাবাস ও উষ্ট্রাবাসের মাঝখান দিয়ে? নাকি বেগমমহলের সম্মুখ দিয়ে?

ডক্টর শ্রীবাস্তব তাঁর যুক্তির সমর্থনে যা বলেছেন তার আক্ষরিক অনুবাদ আগে শোনাই, তারপর তা বিশ্লেষণ করা যাবে :¹⁸

“আকবরের আদেশে বীরবলের জন্য একটি মর্মর-প্রাসাদ নির্মিত হয়, সেটির নির্মাণকার্য সমাপ্ত হলে সম্রাট তাঁর ঐ প্রিয় সন্তানদের দীর্ঘদিনের বাসনা চরিতার্থ করতে স্বয়ং তাঁর গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যান (জানুয়ারী, 1583); গৃহপ্রবেশের দিন আকবরের উপস্থিতিতে সম্মান জানাতে বীরবল এক বিরাট ভোজের আয়োজন করেন। সাম্প্রতিককালের কোন কোন গবেষক সন্দেহ প্রকাশ করেছেন—হারেমের এত কাছাকাছি বহিরাগত কোন পুরুষের বাসস্থান থাকা

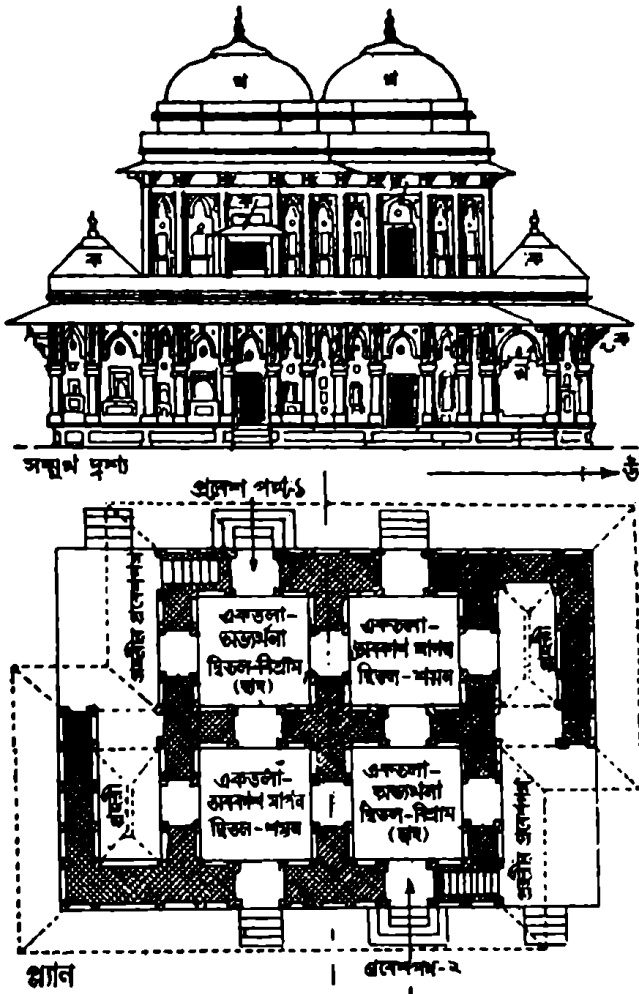
সম্ভবপর নয়। কিন্তু আবুল ফজল স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন, আকবর বীরবলের জন্য একটি মর্মর-প্রাসাদ নির্মাণ করিয়ে দেন। যোধবাঈ-প্রাসাদ সংলগ্ন ঐ একটিমাত্র প্রাসাদ ভিন্ন আর কোন বাড়িই দাঁড়িয়ে নেই। There is, therefore, no doubt that the building consisting of two-domed palaces, standing on the north-west corner of the edifices at Fatehpur-Sikri, is the palace built by Akbar for Raja Birbar. [সুতরাং এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ফতেপুর-সিক্রিতে ঐ (যোধপুর) প্রাসাদের উত্তর-পশ্চিমে দণ্ডায়মান প্রাসাদটি—যাতে দুটি গম্বুজ আছে—আকবর তৈরি করিয়েছিলেন রাজা বীরবরের (অর্থাৎ বীরবলের) জন্য]।

ডক্টর শ্রীবাস্তব একজন অসামান্য পণ্ডিত। আকবরের প্রামাণ্য জীবনীকার। তাঁর কাছে ইতিহাস তথা আমরা নিরতিশয় কৃতজ্ঞ। কিন্তু এটা তাঁর কোন্ জাতের যুক্তি হল? ‘আবুল ফজল জানাচ্ছেন—আকবর বীরবলের জন্য একটি মর্মর-প্রাসাদ তৈরি করিয়ে দেন। যেহেতু আর কোন প্রাসাদ টিকে নেই, তাই এটাই সেই বাড়ি।’—কেন? আকবর বানিয়েছেন বলে সে বাড়ি ধূলিসাৎ হতে পারে না? ঐ আবুল ফজলই তো বলেছেন, আগ্রা-কিল্লার আকবর পাঁচশ ইমারৎ বানিয়েছেন, এবং গুণে দেখছি, বর্তমানে খাড়া ইমারতের সংখ্যা এক শতের কম—তাহলে আগ্রা-কিল্লার যাবতীয় খাড়া-মোকাম আকবর নির্মিত? যেহেতু তারা টিকে আছে? বরং ডক্টর শ্রীবাস্তবের বর্ণনা তো তাঁর সিম্বাস্তের বিরুদ্ধ-যুক্তিকেই প্রতিষ্ঠা করে! মনে মনে কল্পনা করতে পারছেন—বীরবল তাঁর গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে পাঁচ-সাতশ কিম্বা হাজার-দু-হাজার মেহমানকে নিমন্ত্রণ করেছেন—সকলেই আবশ্যিকভাবে পুরুষ, যেহেতু মুগলযুগে এ জাতীয় উৎসবে স্ত্রীলোকের নিমন্ত্রণ হত না—আর মেহমানরা সার বেঁধে তসলিম রাখতে আসছেন? কিন্তু কোন্ পথে? ঘোড়ার আস্তাবলের ভিতর দিয়ে, উট ও ঘোড়ার পুরীষ ডিঙিয়ে সংকীর্ণ গলিপথে ‘কিউ’ দিয়ে? নাকি জেনানা-মহালের ভিতরে গর্দানা ঘর্ষিয়েছিল দ্বই-হাজার মর্দানা?

শুধু তাই নয়, শ্রীবাস্তব-সাহেবের যুক্তিতে আমাদের আরও দুটি আপত্তি আছে। প্রথম কথা : তারিখটা। 1583 সালটা। হারাম-সারার কাজ শুরু হয় 1571-এ, এবং বছর পাঁচেকের মধ্যে যাবতীয় কাজ শেষ হয়; বেগমরা বসবাস করতে শুরু করেন। ফলে 1582-তে হারেমের মাঝখানে একটি মোকাম বানাতে

বহিরাগত মিস্ত্রীরা আসবে, হারেম বে-পর্দা হবে, এটা আশা করা একটু অপারিস্থকর। দ্বিতীয় কথা : ডঃ শ্রীবাস্তব দৃ-দৃবার 'মর্ম্মর-প্রাসাদ' (marble palace) শব্দটা ব্যবহার করেছেন আব্দুল ফজলের উদ্দেশ্যে দিতে। আব্দুল ফজলের মূল রচনাপাঠের মতো বিদ্যে আমার নেই। অনুবাদক যদি ভুল না করে থাকেন তাহলে বলব : 'বীরবল-প্রাসাদ' মর্ম্মর-প্রাসাদ বা marble

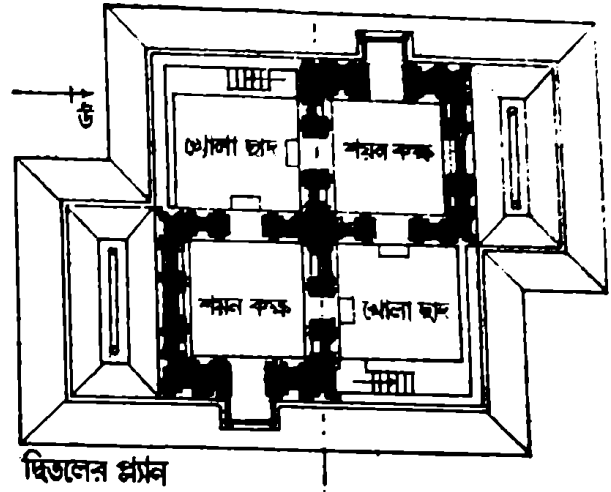
দ্বিতীয় মর্দীতি চিত্র এ ইমারতের হিন্দু-স্থাপত্যের আদিক। এ মর্দীতিটি আলো মানা চলে না। ফতেপুর-সিতির প্রায় প্রতিটি ইমারতে হিন্দু-শৈলীর প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বীরবল-প্রাসাদে হিন্দু স্ট্যাক্ট আছে ঘণ্টা-চক্র-পদ্ম, ট্যাক্টিক্সেট-পদ্মটি আছে, স্বীকার করছি—কিন্তু সেখানে রামসীতা-রামাকৃষ্ণ-হনুমানজী নেই! তা বরং আছে সুনহারা-মকানে, যে ইমারত-এ



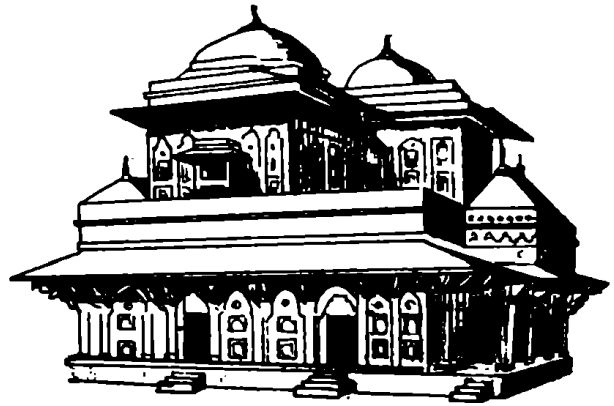
চিত্র-9.18 বীরবল-প্রাসাদ, বাস্তু-নকশা ও এলিভেশান, ফতেপুর-সিতি।

palace নয়, সেটি বালি-পাথর বা 'স্যান্ডস্টোন' দিয়ে তৈরী।

টোডরমল, তানসেনের আবাসস্থল চিহ্নিত—রাজ-প্রাসাদ থেকে বহু দূরে। নবরত্নের অন্যান্য পুরুষ—আব্দুল ফজল, ফৈজী, আবদুর রহিম খান-ই-খানান, ভগবানদাস, মানসিংহ প্রভৃতি কাউকেই প্রাসাদ-চত্বরের ভিতর থাকতে দেওয়া হয়নি—হারেমের ভিতর তো দূর-অন্ত—শুধুমাত্র বীরবলই ব্যতিক্রম?



চিত্র-9.18A বীরবল-প্রাসাদের মন্ডিতল।



চিত্র-9.18B বীরবল-প্রাসাদের সম্মুখদৃশ্য, পরিভ্রমিত, ফতেপুর-সিতি।

নিঃসন্দেহে বাস করতেন নিষ্ঠাবান মুসলমান আকবর-জননী এবং তাঁর পিসী গুলবদন। তাহলে?

ওদের তৃতীয় ও শেষ মর্দীতি ছিল : নাম। হ্যাঁ, এবারেও স্বীকার করছি, লোকপরিচয় এ ইমারতের নাম : 'বীরবল-প্রাসাদ'। কিন্তু বীরবলের নামটা ভারতবর্ষে কী-ভাবে ব্যবহৃত হয় তা কি আমরা জানি না? অসংখ্য মজাদার চুটকি গল্প, বা পরবর্তীযুগের কোন রসিকবাহির উর্বর মস্তিষ্কে জন্ম নিয়েছে তা

বীরবলের নামে চলে। তার শতকরা পঁচান্নশই ভাগ কাহিনীর সঙ্গে রাজা বীরবলের কোনও সম্পর্ক নেই। লোকমুখে নাম জড়িত থাকাকে যদি গুরুত্ব দিতে হয় তাহলে তো স্বাধীন ভারতের আর এক প্রখ্যাত প্রতি-রক্ষামন্ত্রীর নামে লোকমুখে প্রচলিত জ্যাকস্‌গলিকে ঐ মন্ত্রীমহোদয়ের জীবনীতে উল্লেখ করতে হয়।

তাহলে এ প্রাসাদে কে বাস করত ?

আমি একটি বিকল্প-সিদ্ধান্ত পেশ করতে চাই। কিন্তু আমার যুক্তি পেশ করার পূর্বে আপনাদের লক্ষ্য করতে কলব, এ প্রাসাদের অনন্যসাধারণ স্থাপত্য-বৈশিষ্ট্য।

স্থানে লক্ষ্য করে দেখুন (চিত্র-৭.১৪)—এটি একটি যমজ-বাড়ি বা ‘টুইন কোয়ার্টার্স’। কিন্তু সেটা অনন্যসাধারণ কেন? কারণ সচরাচর টুইন-কোয়ার্টার্সে আমরা দেখতে পাই—এক-অংশ অপর-অংশের দর্পণ-প্রতিবিম্ব। এখানে তা নয়। এ-মোকামের কেন্দ্র-বিন্দুকে স্পর্শ করে যে-কোনো দিকে একটি সরল-রেখা টেনে, যাতে প্ল্যানটি দু-ভাগে ভাগ হয়; তার-পর সন্তর্বিমুখল যে-ভাবে ধ্রুব-নক্ষত্রকে চক্রাবর্তন করে, সেইভাবে যে-কোন আখানা বাড়িকে কেন্দ্র-বিন্দুর চারপাশে ১৪০ ডিগ্রি পাক খাওয়ান; দেখবেন জ্যামিতি-বইয়ের ‘উপরিপাত’ পন্থাতিতে প্রতিটি দেওয়াল, দরজা, কুলুঙ্গি, কোণ খাঁজে-খাঁজে মিলে গেছে। যে-কোন সাধারণ টুইন-কোয়ার্টার্সে এমনটি হবে না। সেখানে অমন খাঁজে-খাঁজে মেলাতে হলে আখানের কন্ট্রিক ট্রেনিং কাগজে আঁকতে হবে এবং উল্টে করে অপর-অংশে কসতে হবে। সেখানে দেখ-কেন টুইন-কোয়ার্টার্সে প্রবেশপথ একই দিকে; এখানে তা নয়। তাই এই প্ল্যানিং অনন্যসাধারণ!

প্রশ্ন হচ্ছে, এ ইমারতের এই অদ্ভুত প্ল্যানিং-এর হেতু কী? কী প্রাচীন, কী মধ্যযুগীয়, কী অতি-আধুনিক প্ল্যান্ড-টেনশিপে তো এমন যমজ বাড়ি ছুঁ-ভাঙতে দেখিনি! এটা কি নিতান্তই কাকতালীয়?

আমার বিশ্বাস—তা নয়। এ প্রাসাদের মালিকানা আকবরের দুই মহিষীর—বারা অম্বর রাজকন্যার চেয়ে কমসে কড়, আগে সম্রাজ্ঞী হয়েছেন এবং হিন্দু-মন্দির-সম্বন্ধিত প্রাসাদে কনিষ্ঠ সপত্নীর তত্ত্বাবধানে বাস করায় বঁসের আন্তরিক স্নায় নাও থাকতে পারে। ইমা-রুটি যেন দুই বোন, যমজ বোন, যেন রুখেয়া বেগম ও সালিমা বেগম। দুজনেই সম্রাট রাজপুত্রনারী; রুখেয়া হচ্ছেন কবর-স্তন্য মিত্র। হিন্দুদের আকাজা এবং সালিমা হচ্ছেন কবর-স্তন্য কন্যা গুরুদেব-এর তনয়া। দুজনেই কবর-বাদশাহ্‌র নাটনি, দুজনেই

আকবরকে বিবাহ করেছেন প্রধানা বেগম অম্বরকুমারীর আগে। তাই এ যমজ বাড়িতে কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। প্রতিটি ফ্ল্যাটে প্রবেশপথ ভিন্ন মধুখী; প্রথমে অভ্যর্থনা-কক্ষ বা বৈঠকখানা, পিছনে অবকাশ-যাপন কক্ষ। দ্বিতলে সমুখের ঘরটির উপর খোলা ছাদ এবং পিছনে শয়ন-কক্ষ। পৃথক সোপান দিয়ে দ্বিতলে যাতায়াতের ব্যবস্থা। দুটি ফ্ল্যাটের মাঝখানে স্ভার আছে; অর্থাৎ প্রয়োজনে দুই সখী যৌথভাবে কোনও আপ্যায়ন-ব্যবস্থা করতে পারেন। দু-তরফের জন্য পৃথক প্রহরার আয়োজন।

এ-মত গ্রাহ্য হলে কলা যায়, এই ইমারতেই শৈশবাবস্থা অতিবাহিত হয়েছে খুররমের, অর্থাৎ ভবিষ্যৎ শাহজাহাঁর, নিঃসন্তানা রুখেয়া বেগমের তত্ত্বাবধানে।

পুরাতত্ত্ববিদ সৈয়দ আংহার আম্বাস রিজুভির মতে বীরবলের প্রাসাদ ছিল রাজপ্রাসাদ থেকে বহু দূরে—চাঁদ পোলের উত্তরে, বীর পোল-এর কাছে। ‘বীর পোল’ দরওয়াজার নাম নাকি ঐ রাজা ‘বীর-বলে’র নামানুসারেই।

নওরোজ বাগিচা : যোধবাস্ট-প্রাসাদের উত্তরে একটি চতুষ্কোণ বাগিচা—সেখানে বসত নওরোজ-এর বাজার। মীনা বাজার। সেখানে বিক্রেতার দল সম্রাটের হারেমভুক্ত ললনাকুল, অথবা আমীর-মালিকদের স্ত্রী-কন্যা-পুত্রবধূ, ক্রেতা শূদ্ধ বাদশাহ্‌। অথবা শাহজাদা!

“নওরোজ উৎসবের সময় হারেম বা জেনানামহলে একটি অদ্ভুত ধরনের মেলা হত। মেলা পরিচালনার দায়িত্ব নিতেন আমীর ওমরাহের পত্নীরা, সাধারণতঃ তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে রূপবতী স্ত্রী যারা, তাঁরা। যে সমস্ত দ্রব্য বাজারে সাজানো হয়, তার মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য জরীর ফুল-লতা-পাতা-তোলা রেশমী কাপড়, ভালো ভালো সুচীশিল্প, সোনার কারুকাজ-করা শিরস্ত্রাণ, দামী মসলিন ইত্যাদি সব বিলাসের সামগ্রী। মেলার প্রধান আকর্ষণ হল, কেনাবেচার হাস্যকর অভিনয়টুকু। সম্রাট ঘুরে ঘুরে সাজানো জিনিসপত্র দেখেন এবং সুন্দরী বিক্রেতা আমীর-মনসবদারের পত্নীদের সঙ্গে দরদস্তুর করেন।”^{১০}

শোনা যায়, এই নওরোজের মীনাবাজারে সেলিম ও নুরজাহাঁর প্রথম সাক্ষাৎ। কাহিনীটি রোমাণ্টিক। শাহজাদা সেলিম নাকি কোন এক সুন্দরীর কাছে দুটি কবর-স্তর কিনেছিলেন। তারপর আর এক দোকান-দারনীর কাছে কবর-স্তর দুটি গাচ্ছত রেখে মীনাবাজারে

অন্যান্য দোকানগুঁড়ি ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকেন। কেনাকাটা শেষ হলে সেলিম ফিরে এসেন সেই দোকান-দারনীর কাছে, যার জিম্বাদারীতে কবুতর-জোড়া রেখে গিয়েছিলেন। তখন তাড়াহুড়ার মধ্যে সেই মেয়েটির দিকে ভালো করে চোখ তুলে তাকানোই হয়নি। এখন তাকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেসেন! শাহজাদা পার্শ্ববর্তী অনুচরকে প্রশ্ন করলেন, মেয়েটি কে? সহচর অনুচরকে জানালো, মির্জা গিয়াস্ মুহম্মদ বেগ-এর কন্যা, ওর নাম মেহেরউন্নিসা! শাহজাদা অক্ষুণ্ণে বললেন, না! ওর নাম নূরজাহাঁ! জগতের আলো!

হঠাৎ লক্ষ্য হল, মেয়েটি একটিমাত্র কবুতরকে নিজের বকের উপত্যকায় চেপে ধরে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে, নতনেয়ে। শাহজাদা এগিয়ে এসে বললেন, এ কী! দু-দুটো পায়রা রেখে গেলাম, এখন দেখছি একটা। বাকিটা কোথায় গেল?

মেয়েটি নতনেয়ে বললে, উড়ে গেছে।

—উড় গ্যয়ে! কৈসে? —অবাক সেলিমের প্রশ্ন।

মেয়েটি অস্ফালনবদনে হস্তধৃত কবুতরটিকে বন্ধন-মস্ত করে নীল আকাশের দিকে উড়িয়ে দিল। বিশ্ব-বিজয়িনীর হাসি হেসে বলল, —গ্যাসে!

অনেক ঐতিহাসিক এ-কাহিনী মানেন না। তাঁদের মতে প্রাক-বিবাহ যুগে মেহেরউন্নিসার সঙ্গে সেলিমের নাকি দেখা শোনাই হয়নি; তা হোক, আপাতত ঐ রোমান্টিক কাহিনীটি মেনে নিয়েই বাগিচাটা ঘুরে-ফিরে দেখা যাক। বাগিচার পশ্চিম-প্রান্তে নাগিনা মসজিদ; নিষ্ঠাবান অন্তঃপুরচারিণীদের উপাসনার আয়োজন। নাগিনা মসজিদের দক্ষিণ-পূর্বে, নওরোজ বাগিচার পিছনে চতুষ্কোণ ঘরখানার বিষয়ে নানামূর্নির নানা মত। কেউ বলেন এটি কবুতরখানা, কেউ বলেন অস্ত্রাগার, আবার কারও মতে এটি পিলখানা। এখানেই নাকি থাকত ‘গজমস্তা’। গজমস্তা কে? সে গল্প বলব যখন তার মক্কারা দেখতে যাব।

হারেম দেখা শেষ করে গাইডকে বলি, সব দেখলাম, কিন্তু রঙমহল কই?

—রঙমহল? সেটা কি?

—ঐ যে মৃগল-প্রাসাদের রঙমহল, শীষমহল, নাচঘর? আগ্রা-কিল্লা অথবা লাল-কিল্লা শাহ-জাহানী-জমানায় যা দেখেছি। ভিতরে সিলিঙে হাজারো কুচি-কুচি কাঁচ। দেশলাই-কাঠি জ্বাললে রোশনাইয়ে চোখ ধাঁধিয়ে যায়! যেখানে বসে জাহাঁপনা সিরাজী পান করতেন, আর নৃত্যরতা বাঁজীর নাচ হাজারো

চুম্বিক-পাথরে প্রতিফলিত হতে দেখতেন?

গাইড মাথা নেড়ে বললে, না বাবুজি। তেমন কিছু ফতেপুর-সীক্রে নেই।

হবেও বা। জালালউদ্দীন তার বাপের মতো আফিঙের নেশায় বদ হলে পড়ে থাকতেও শেখেন, ছেলের মত স্ত্রীর আঁচল এক হাতে চেপে ধরে অপর হাতে পেয়ালার পর পেয়ালো মদ্যপান করতেও শেখেন। তার মানে এ নয় যে, আকবর-বাদশা ছিগেন ‘টিটোটালার’—ঔরঙ্গজীবের মতো ধর্মের কারণে মদ্য-স্পর্শ করতেন না। মদ তিনি খেতেন, কাঁচং কখনো—কিন্তু মরদের মতো, পাটো জোয়ানের মতো। তাহলে সেই কিস্সাই বালি, শূন্য^{১০} :

সম্রাট তখন সূরাটে। খবর এসেছে দমন-এ পর্তুগীজরা বস্ত বাড়বাড়ি করছে। আকবর বললেন, নাঃ! ঐ লালমুখো বিদেশী বেনিয়াগুলোকে এবার শাস্ত দিতে হয়! সৈন্য সাজাও—‘দমন’ যাব! দমন করতে।

পর্তুগীজ বেনিয়ার দল অত্যন্ত খলিফা। তারা ঠিক খবর পেয়ে গেল। বড় বড় পিপে ভর্তি সিরাজী পাঠিয়ে দিল সূরাট-কিল্লায়, ভেট স্বরূপ। কি কেন তার অদ্ভুত নামটা—মনেও থাকে না ছাই! হিন্দুস্থানে সে সিরাজী পয়দা হয় না—লালমুখোরা ‘শাম্পান’ না ‘শাম্পিন’ কী-ধেন বলে। কড় জম্বর সে-দারু!

আকবর সেদিন সন্ধ্যায় তাঁর ইয়ার-দোস্তদের নিয়ন্ত্রণ করলেন পানের আসরে। সূরাট-কিল্লার ছাদে, চবুতরায় মখমলের জাজিম বিছিয়ে তাকিয়া ঠেশ দিয়ে বসেছেন জাহাঁপনা, মাথায় জরীর তাজ, অঙ্গে ঢিলে-ঢালা আঙুরাখা, খিদমদ্দার ময়ূর-পাখায় ব্যঞ্জন করছে। আর তাঁকে ঘিরে তাঁর আমীর মালিক ইয়ার-দোস্ত-মোসায়েবের দল—খান-ই-আজম, মজঃফর খাঁ, লস্কর খাঁ, প্রভৃতি। বাঁজী নেই সেই জঙ্গী পরিবেশে। না থাক, কবি কোথায় নেই? অন্তত কাব্যরসিক? কেউ কেউ ফার্সী কবিতা পাঠ করে শোনালো। হাফিজ আর ওমর খৈয়াম। বাদশা বললেন, বড় খাঁটি কথা বলেছেন খৈয়াম :

‘গোয়েন্দ বহেস্ত-ই-ইদম বহর খুশ-অস্ত’।

মন-মে গোয়েন কি অব-ই-আঙুর খুশ-অস্ত’।

ই-নস্ত-বগীর ও-দস্ত আজ-আঁ নশিয়া ব-দার

কে আওরাজ বনাইল বরাদর আজ দুর খুশ-

অস্ত ॥*

* লোকে বলে, ময়ূরটা নাকি বড় জবর জারিয়া। হবেও বা। আমি বলি, এই আঙুরবাদই বা কয় কিসের? এটা নগদ, সেটা ধার। কি জানো ভাই—ও ঢোলের আওয়াজ দূর থেকে শুনতেই মিথি!

পানপাঠের ভুগার ফিরছে হাত থেকে হাতে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে একে একে কাৎ হয়ে পড়লেন সবাই। একমাত্র রাজা মানসিংহ বে-এক্কার হননি। প্রভুভক্ত মান সংবত হয়ে সম্রাটকে সঙ্গদান করছিলেন, তাঁর নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে। এমন বে-এক্কার পানের আসরে যে অনেক অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছে। কে একজন কিসসা শোনালো, রাজপুত জওয়ানদের হিম্মতের কথা। বললে, আমি শুনছি, জাহাঁপনা, রাঠোর রাজপুতদের মধ্যে এমন পাটা জোয়ান আছে যে, বর্ম পরে থাকলে তাকে বর্ষার আঘাতে পেড়ে ফেলা যায় না। বরং বর্ষার ফলা দু-টুকরো হয়ে যায়।

শাহ-য়েন-শাহ ততক্ষণে চর। জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, ফঃ! সে তো আম্মো পারি।

—পারেন?

—হরগিজ! এমন কি বকে বর্ম না-সেটেই! দেখবে?

সব কটা মাতাল উবু হয়ে উঠে বসে। বলে, ঠিক হ্যায়! দেখান! হয়ে থাক!

শাহ-য়েন-শাহ হাঁকলেন, এ্যাই! কোই হ্যায়?

হস্তদন্ত হয়ে ছুটে এল খিদ্মদগার। পঞ্চাশ-ষাট পাঠ কিলাইতির তলানি-প্রভাবে সেও বেহেম্মের দোর সোড়ায়। সম্রাট তাঁর কোমরবন্ধ থেকে বিশাল তলোয়ারখানা বার করে বললেন—এটাকে ঐ পাথরের বাক্সে গুজে দিয়ে আয়। মূঠ থাকবে দেওয়ালের দিকে। বদলি?

লোকটা আত্মমি নত হয়ে একটা মোগলাই কুর্নিশ কাড়ল। তারপর সেই নাভা তলোয়ারখানা নির্দেশ মত শব্দ করে সেটে দিল চব্বতরার এক স্তম্ভের ঝাঁজে। মূঠ দেওয়ালের ভিতর, সূচাগ্রভাগটা সামনে। বাদশ্য টল্টে টল্টে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, তোরা দেখ! ঐ সামসেরের উপর আমি ঝাঁপ খেয়ে পড়ব। কিস্য চোট লাগবে না! ওটা ঠুং করে—বাস! দু-টুকরো হয়ে যাবে।

সবাই সম্মুখে কেরাবাং দিয়ে ওঠে।

কোথাও কিছু নেই কক্ষের ও-প্রান্ত থেকে লাফ দিয়ে পড়লেন রাজা মানসিংহ। বহুদূরদৃষ্টিতে চেপে ধরলেন সম্রাটের ঝণিকণ। বাঁ-হাতে টেনে ফেলল দিগেন তলোয়ারখানা।

দূরন্ত ভ্রোমে হুংকার দিয়ে ওঠেন মদ্যপ সম্রাট : মান সিং! হোঁশিয়ার! তুমি শাহ-য়েন-শাহ-এর গা-স্পর্শ করছ! মনে নেই আথম খাঁর কথা?

সম্রাটের চোখে-চোখ রেখে মানসিংহ দৃষ্টান্তে বললেন, শাহ-য়েন-শাহ! আমি আথম খাঁ নই, আমি মান সিং। আমি আপনার আংকাকে খুন করে আমি সিং; আপনার আংকার মালিকের জান বাঁচাতে এ-কাজ করেছি।

আকবর দু-হাতে টিপে ধরলেন মানসিংহের কণ্ঠ-নালী। আবুল ফজলের মতে, সে সম্ভ্রায় সৈয়দ মজঃফর মানসিংহকে সাহায্য না করলে একটা দুর্ঘটনা হয়তো ঘটে যেত সূরাট-কিন্‌লায়।

পরদিন সকালে সম্রাটের খোঁয়ার ভেঙেছে খবর পেয়ে মানসিংহ দেখা করতে এলেন। তাঁকে দেখে আকবর মিটি-মিটি হাসতে থাকেন। বলেন, জান নিয়ে খুব বেঁচে গেছ মান সিং!

মানসিংহ হাস্য গোপন করে বলেন, জানে বেঁচেছি আমি, না বেঁচেছেন আপনি?

—তুমি। আমি কালকের কথা বলছি না মান,—কলি আজকের কথা।

—আজকের কথা! মানে?

—বাঃ! আজ সকালে তাহলে তোমার কী হাল হত বল দিকিন? এদিকে শেখদুবাবার অভিশেক, ওদিকে শাহ-য়েন-শাহকে গোর দেওয়া। সব দায়বাক্তি তো তোমাতেই বর্তাতো? না কি বল?

মানসিংহ হাজার হলেও হেঁদ। আঁংকে উঠে বললেন, থাক, থাক, এই সাতসকালে ও-সব অমঙ্গলের কথা বলবেন না, জাহাঁপনা!

আকবর খিল্ খিল্ করে হেসে উঠতে গিয়ে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যান। বলেন, রসিকতা নয় মান! এবার আমার নিজের মক্‌বারা বানাবার সময় হয়েছে! কদিন থেকে শব্দ সে-কথাই ভাবছি। তুমি উস্তাদ পীর মহম্মদকে একবার খবর পাঠাও। সিকেন্দ্রার সেই জমিটা তো...

হারেম দেখা শেষ হয়েছে; আসুন এবার মস্‌জিদে যাই। যোধবাস্ট-প্রাসাদের পাশ দিয়ে সড়ক আছে। ওখান দিয়ে দু-কদম এগিয়ে গেলেই জাম-ই-মস্‌জিদের পদ-দরওয়াজা; লোকে বলে, বাদশাহী দরওয়াজা। জুতো জোড়া খুলে ফেলুন; আমরা ভিতরে যাব।

জাম-ই-মস্‌জিদ : স্থাপত্যে নূতনত্ব বিশেষ কিছু নেই। সেই চিরচরিত প্ল্যানিং। মাঝখানে প্রকাণ্ড চকর-‘শেহান’; উত্তর-দক্ষিণে 133.6 মিটার, পূর্ব-পশ্চিমে 165.2 মিটার। পশ্চিমে মূল মস্‌জিদ, ডান-দিকে আকবরের গুরু সৌম্য চিহ্নিত দরগা, তার

পাশে, পূর্বদিকে শেখ সেলিম চিশ্তির নাতি তথা আব্দুল ফজলের ডাঙিনপতি ইসলাম খাঁর সমাধিসৌধ। শেখ সেলিম চিশ্তির দেহাবসান হল ফেব্রুয়ারী, 1572-তে। ততদিনে এ মসজিদের বারো-আনা কাজ শেষ হয়েছে। সম্রাট এ মসজিদ তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন—সে-কথা লেখা আছে প্রার্থনাসৌধের প্রাচীরে।

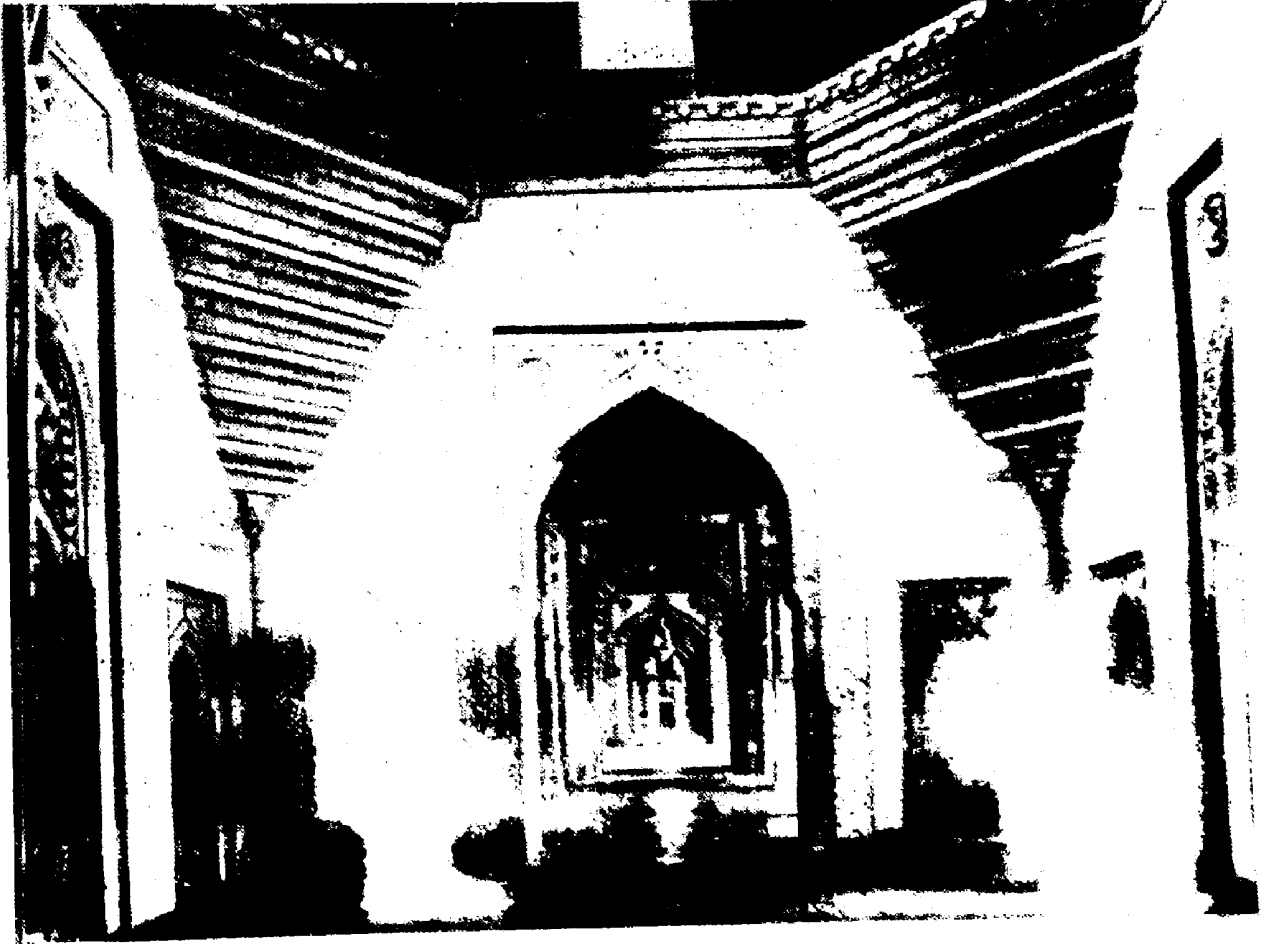
এ মসজিদে লক্ষ্য করবার মতো জিনিস হচ্ছে—প্রার্থনাকক্ষের দু-পাশের দুটি ঘরের উপর গম্বুজ-জোড়া। তার চার-কোণায় স্কুইণ্ড-পদ্ধতি নয়, হিন্দু-স্থাপত্যের করবেল-করা বাঁয়ের সাহায্যে ধাপে ধাপে ঐ চার-কোণা ঘরখানাকে আট-কোণা, ক্রমে ষোলো-কোণায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। এখানেই আকবরী-বৈশিষ্ট্য! আপাতদৃষ্টিতে মসজিদ নির্ভেজাল ইসলামী ঐতিহ্যের—কিন্তু দীন-ইলাহী ধর্মের প্রবর্তক ঐটুকু সূক্ষ্ম হিন্দু-শৈলী যোগ না করে তৃপ্ত পান-নি। তত্ত্বটা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, দু-দুটো আলোক-

চিত্র দিতে হল (চিত্র—9.19 ও 9.20)।

সেলিম চিশ্তির কবর : সৈয়দ রিজভি কলছেন,²¹ "শেখ সেলিম চিশ্তির মার্বেল-মক্কার কবর দিতে সকলেই ভাঙ্গা জাতের বিশেষণের খোঁজে অভিযান হাতিড়ান। এর কাব্যময় মনোরম রূপটিকে কবর করার উপযুক্ত বিশেষণের সত্যি কিছু অভাব। ভারত-বর্ষের যাবতীয় মর্মর সৌধের মধ্যে এটি অন্য।"

শ্বেতবর্ণের এই সমাধিসৌধ বার্তাবে না দেখলে অনুভব করা যাবে না এর নমনাভিরাম রূপ। আশি শব্দে কয়েকটি বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই :

প্রথমতঃ, আপনারা হয়তো ইতমদ্‌উদ্‌দৌলা অথবা তাজমহল দেখার পর কতেপুর্-সিক্রিতে এসেছেন। তাই প্রথমেই কথাটা খোঁজা করবেন—এ মর্মরসৌধ ইতমদ্‌উদ্‌দৌলা অথবা তাজের পূর্বরূপে নির্মিত। তাদের পূর্বসূরী। এইবার লক্ষ্য করে দেখুন, সন্দোখ ঘিরে ঐ পাথরের জালি-কাজটুকু। বিশেষ



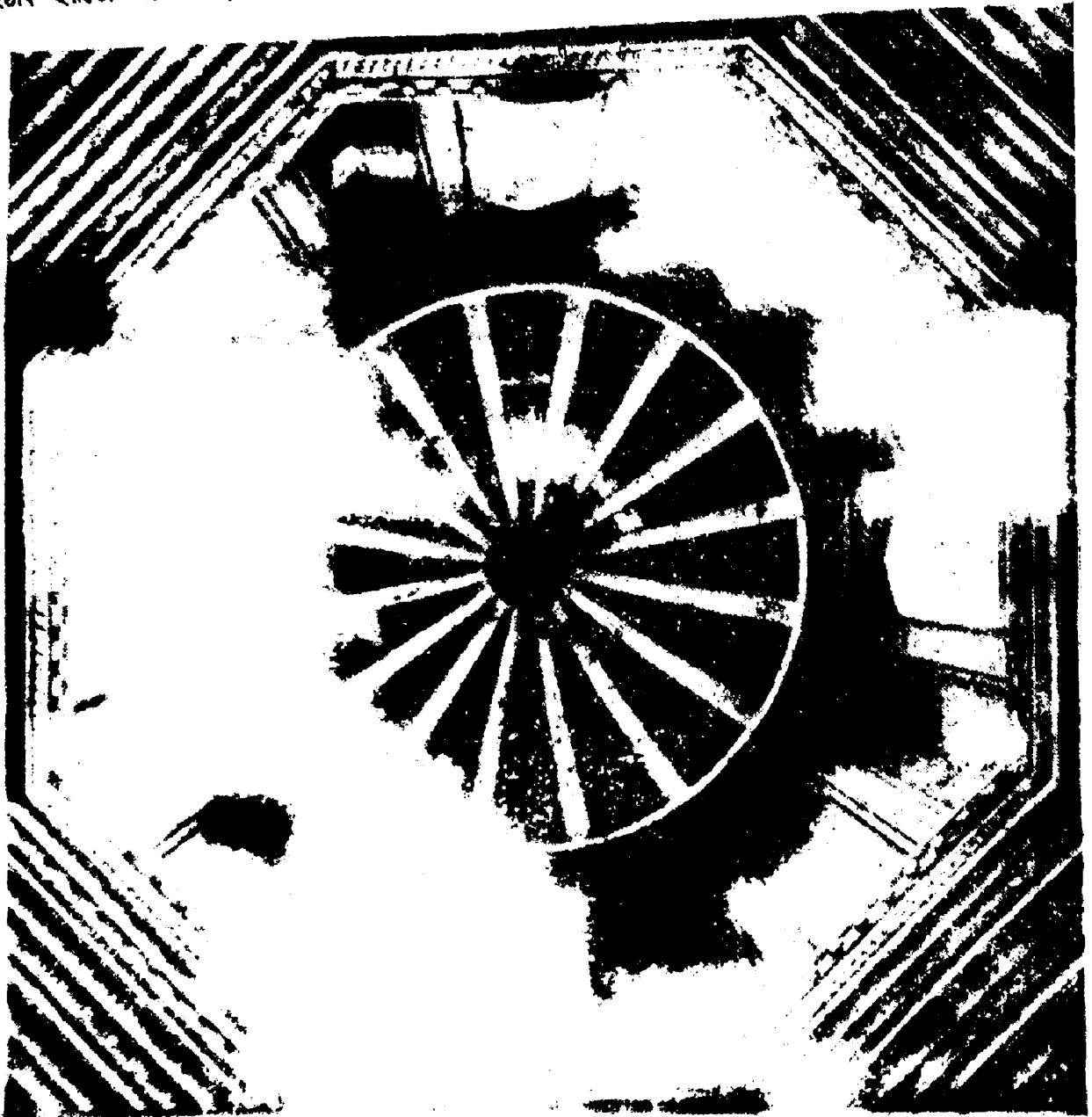
চিত্র—9.19 জাম-ই-মসজিদের করবেলিং (হিন্দু-শৈলীর প্রভাব লক্ষ্যীয়), কতেপুর্-সিক্রি।

করে দক্ষিণ-পূর্ব কোণার প্রকাণ্ড পাথরখানা। কী
নিখুঁত কাজ! শিখরীশ্রুতঃ, সমাধিসৌধ বেঞ্চেটনকারী
প্রসারিত-বাহু, হস্তা। যেন শেখ সেলিম চিন্তিত আতপ-
তাপ থেকে উত্তব্ধকে রক্ষা করতে বিস্তৃত করে
দিয়েছেন তাঁর হস্তছায়া। যেন শব্দ আতপ-তাপ নয়,
রোগ-শোক-দুঃখ দুর্দশার হাত থেকে রক্ষা করতে।
ভূতীরতঃ, লক্ষ্য করুন—গ্যাকেটের একটি বিচিত্র ডিজাইন।
ইংরেজী 'S'-অক্ষরের মতো দেখতে। যেন সাপের
কন্মা; নাঃ। ময়ালগ্যাবা! তাও নয়। তবে কিসের মতো?
হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে যাবে—বীরভূম বা বাঁকুড়ার

কোনো আউল-বাউল দরবেশদের মেলায় দেখা কোনো
মুশ্‌কিল-আসান বা ফকিরকে। তাঁর হাতের বটিকম-
যণ্টির কথা। নব্বই বছর বয়সের দরবেশ শেখ সেলিম
চিন্তিতকে কি অমনই একটা লাঠি ঠুক ঠুক করে ঘুরতে
দেখোছিলেন সম্রাট? সেলিম চিন্তিত চলে গেছেন,
কিন্তু সেই বটিকম-যণ্টির শাস্বত ছায়াপাত হয়তো
ঘটেছে ঐ গ্যাকেট-ডিজাইনে!

সব শেষে বলব—লক্ষ্য করে দেখুন, ছাদের জল-
নিকাশী ব্যবস্থাটা।

ছাদের চারিদিক ঘিরে নিশ্চিহ্ন প্যারাপেট। ব্যাপার



চিত্র-৭.২০ জাম-ই-জামিনের সিলিং (হিন্দু-শৈলীতে ভারবহন ব্যবস্থা), ফতেপুর-সিক্রি।

কি? জলনিকাশী নালি কই? জাদেব জলটা তাহলে নিকাশ হয় কোন্ পথে? গাইডকে জিজ্ঞাসা করবেন, সে দেখিয়ে দেবে। গম্বুজ-ধোয়া বন্টের জল একটি ফাঁপা মর্মর-স্তম্ভের ভিতর দিয়ে চলে যায় ভূগর্ভে। ঐ ভারবাহী ফাঁপা স্তম্ভের মাঝখান দিয়ে জমায়েত হয় মসজিদ-শেহানের কেন্দ্রস্থিত জলাশয়ে।

সেলিম চিন্তিত দরগায় মগ্ন হওয়ার অবকাশ অনেক—কিন্তু মাপ করবেন আমার স্থূল দৃষ্টিভঙ্গী-টাকে, আমি সবচেয়ে অভিভূত হয়েছি এই ‘এঞ্জিনিয়ারিং স্কিল’-এ—বিশেষ করে তার পিছনে যে শ্রমদায়ী হৃদয়টি আছে, তার কথা ভেবে। কী অপরিমিত শ্রম সন্নাটের। আকাশ থেকে যে জলধারা ঐ গম্বুজের উপর পড়বে তা যেন কোনো জলনিকাশী নালি দিয়ে মসজিদ-চত্বরের মেঝেতে নেমে না আসে। তাতে যেন কারো পা না লাগে! তাই নিঃশব্দে, সকলের দৃষ্টির অগোচরে ব্যবস্থা করা হয়েছে জলটা একটা ‘ভারবাহী’ ফাঁপা মর্মর-স্তম্ভের ভিতর দিয়ে সঞ্চিত হবে ভূগর্ভে। সেখান থেকে জলটাকে ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী দিয়ে এনে ফেলা হয়েছে শেহানের কেন্দ্রস্থ একটি জলাধারে। এমন একটি শ্রমাবিনম্র হৃদয় এবং বাস্তববিদ্যায় সেই শ্রম্যার বাস্তব রূপায়ণ ইতিপূর্বে কোনো স্থাপত্য-কীর্তিতে ‘দেখিনি। গুরুর স্মৃতিতে মঠ-মন্দির-মসজিদ তো কতই নির্মিত হয়েছে—এর পূর্বে ও পরে; কই এমনটি তো আর কোথাও দেখিনি।

বুলন্দ-দরওয়াজা : (চিত্র—9.21) জবাব নেই! মিনারের জগতে যেমন কুংব, গম্বুজরাজ্যে যেমন বিজাপুরের গোলগম্বুজ, মক্কার দনিয়ায় যেমন তাজ, তেমন দরওয়াজার ইতিহাসে বুলন্দ—লা-জবাব। ইংরেজের তৈরী বোম্বাইয়ের গেটওয়ে অব ইন্ডিয়া, অথবা দিল্লীর রাজপথের শেষপ্রান্তের ইন্ডিয়া গেটের সঙ্গে এর তুলনা চলে না। বরং বিশ্ব-ইতিহাসের অন্যান্য পর্যায়ে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে খুঁজলে এর দোসর পাওয়া যেতে পারে : সারগনের প্রাসাদ-তোরণ, সুসা-তোরণ, রোমের বিজয়-তোরণ অথবা পারীর আর্ক দ্য ট্রাম্ফ। তাদের মধ্যেও বুলন্দ বিশেষ, বুলন্দ একক, বুলন্দ অনন্য। কারণ আর সবাই ষোলো-আনা স্থাপত্য; আর বুলন্দ ষোলো-আনা স্থাপত্য ছাড়াও বাকি ষোলো-আনা ভাস্কর্য।

এ দরওয়াজা একটি প্রতিচ্ছবি : জালালউদ্দীন আকবরের প্রতিমূর্তি।

মৌদ্যার তৈরী বাজজাক-এর বিশ্ববিখ্যাত প্রতি-

মূর্তি দেখেছেন? অথবা তার ভালো ফটোগ্রাফ? সেখানে ঐ ফরাসী মনীষীর দৈহিক সাদৃশ্য বড়ো প্রতিবিন্দিত, বুলন্দ-দরওয়াজায় তার চেয়ে এক তিল কম নেই আকবরের।

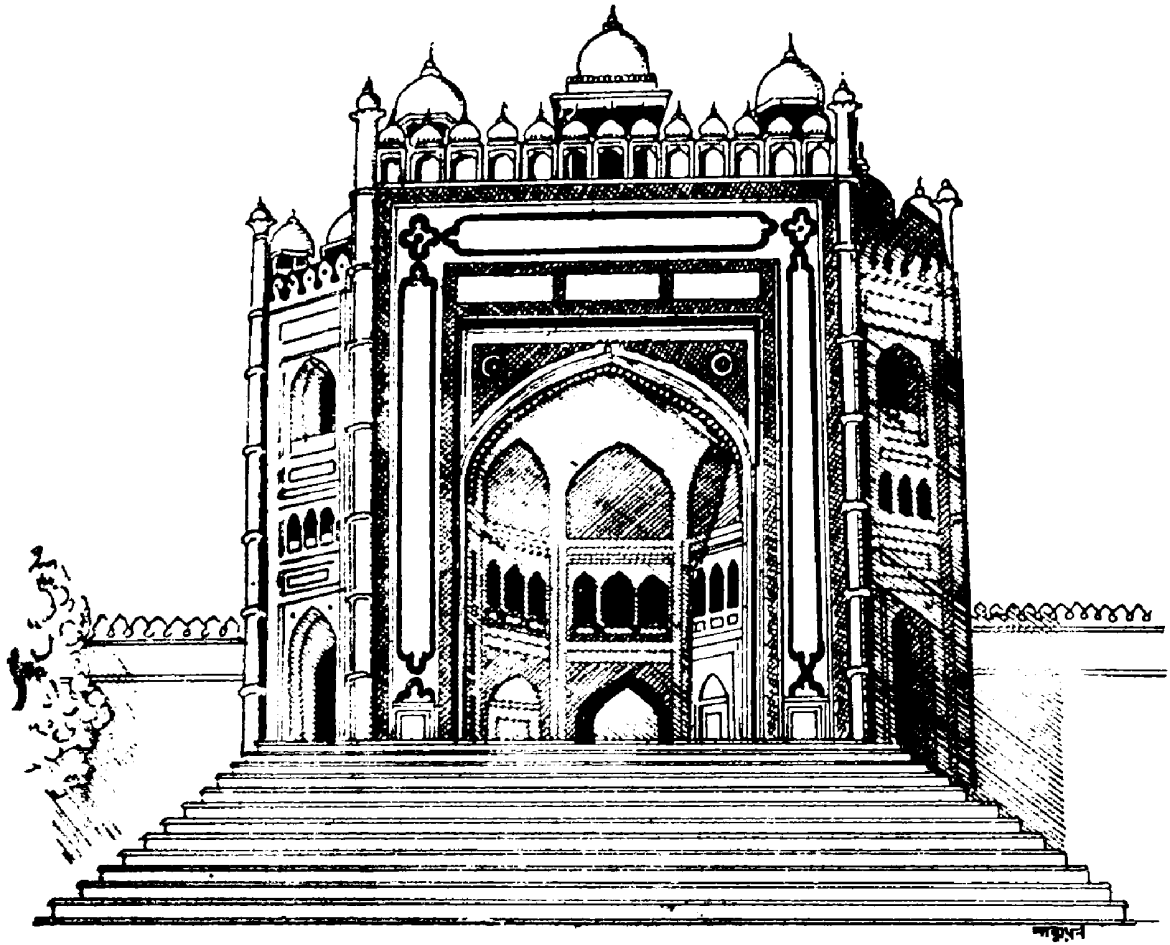
জাম-ই-মসজিদের দক্ষিণ প্রবেশ পথেও ছিল পূর্ব-প্রবেশদ্বারের অনুরূপ আর একটি দরওয়াজা। আকবর দক্ষিণাত্য জয় করে, বন্দুত গুজরাট-বিজয় সম্পূর্ণ করে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করে সেই প্রবেশ-তোরণটি ভেঙে ফেলেন। সেখানে গড়ে তোলেন এই অপূর্ব স্থাপত্য-কীর্তি (1573)। বাস্তব-নকশায় 40 মিটার × 27 মিটার। উচ্চতা মসজিদের শেহান থেকে 40.87 মিটার। সামনে থেকে সোপানপ্রণীর উচ্চতা যোগ করলে 61.24 মিটার বা 168 ফুট।

মানুষের উচ্চতা তো দুই মিটার হয়-কি-না-হয়। তাহলে প্রবেশ-তোরণ ভাঙ উচ্চ করে বানানো হয় কেন? তাতে ‘আর্কিটেকটনিক’ মহিমা আরোপ করতে। এম্পায়ার স্টেট্ বিল্ডিংস্ অথবা হুভার ড্যাম-এর উচ্চতা মানুষের প্রয়োজনে। পিরামিড, কুংব বা স্ট্রফেল টাওয়ারের উচ্চতা স্থাপত্যের প্রয়োজনে। তাই স্থাপত্যের ইতিহাসে যুগে যুগে নির্মিত হয়েছে বিশাল তোরণ। গ্রীক ও রোমক স্থপতি তোরণের গায়ে পোর্টিকো বানিয়ে বাতায়নের পথটা খাটো করে দুর্দিক বজায় রেখেছেন। ব্যাকলিন, সুসা বা পারস্যের রাজারা তা করেননি। তাঁরা মানুষের প্রয়োজন এবং স্থাপত্যের প্রয়োজনে কোনো সমঝোতা-আনার চেষ্টা করেননি। সন্নাট নেবুকাডনেজার-এর ইশার-তোরণ নির্মিত হয়েছিল বৃক্ষদেবের সম্মুখে (605 থেকে 562 খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে)। তার একটি মডেল রাখা আছে বালিনের পার্গামন সংগ্রহশালার। কিম্বা পারস্য-সন্নাট প্রথম শাপুর সুসাতে যে 36.5 মিটার উচ্চ তোরণটি বানিয়েছিলেন 275 খ্রীষ্টাব্দে। এ দৃষ্টিতে মানুষের প্রয়োজন এবং স্থাপত্যের প্রয়োজনে কোনো সমঝোতার চেষ্টা করা হয়নি। তাই ওর নিচ দিয়ে যাবার সময় দর্শক স্বতঃই এক হীনমন্যতার শিকার হয়। এর সঙ্গে তুলনা করুন বুলন্দ-দরওয়াজার। সামনের দিক থেকে বিশাল তোরণ, ভিতর দিক থেকে তা স্বাভাবিক উচ্চতার। আগমনকালে বা স্থাপত্যের প্রয়োজনে মহিমময় উচ্চতায় বিস্তারক, নির্গমনের সময়ে তা মানুষের প্রয়োজনে স্বাভাবিক উচ্চতার। অর্থাৎ সম্মুখদৃশ্যে বুলন্দ-দরওয়াজা হচ্ছে বাদশাহের সেই রূপ যা দেখে প্রজাবন্দ, এবং ভিতরদিক থেকে তার আবেদন মানুষ-আকবরের—‘হামিদা বান্দুর কাছে যার পরিচর মেরে লাল’; অম্বর রাজ-

কুমারীর কাছে 'জীবনের জীবন।' এই অনুভাবনাটো
স্থাপিত করতে সম্ভবদশের প্রকাশড খিলানকে
ভিতর-দিকে স্বাভাবিক উচ্চতার পরিণত করতে
বাস্তুবিদ্যার যে বিচিত্র প্রয়োগ-কৌশলের ব্যবস্থা করা
হয়েছে তার গাণিতিক স্বরূপটা সাধারণ পাঠকের কাছে
দুর্বোধ্য মনে হতে পারে—তা আলোচনা করাছি না ;
কিন্তু লক্ষ্য করে দেখুন—সে ব্যবস্থাটা কী নিখুঁত।
যেখোঁ যেখোঁ যেমন মিলে যায়, স্বপ্নে-স্বপ্নে যেমন মিলে
যায়, সেইভাবে ভিতর-বাহিরের খিলান বে-দাগ মিলে

আকাশচুম্বী মহিমায় মণ্ডিত হয়েছে। ঐ সারি সারি
সোপানের জন্য, জমির ঢালের জন্য। যেন সারবন্দী
সোপান সন্ন্যাসের পদপ্রান্তে প্রগতিরত।

স্বপ্নাতিবদ একটিমাত্র খিলান বানিয়েছেন।
লোদী-সৈয়দী শৈলীর অম্ব অনুকরণে পাশাপাশি
তিনটি খিলান নির্মাণ করলে কিন্তু সর্বনাশ হয়ে
যেত। যা কল্‌তে চান, তা বলা হত না। কী বস্তু
শিল্পীর? তিনটি ভিন্ন ধর্মী রসের ভাণ্ড নিয়ে তিনি
হাজির হয়েছেন। যে যেমনটি চায়, তাকে তেমনটি



চিত্র-9.21 বুলন্দ-দরওয়ারা, সম্ভবদশা (বীররস)।

পেছে! এ-কথা বলছি না—এটা আকবরের আবিষ্কার
—এই 'ইবান-হুন্দ' ইসলামী-স্থাপত্যের এক প্রচলিত
প্রয়োগরীতি; কিন্তু সেই রীতির কী সুন্দর সার্থক
প্রয়োগ করা হয়েছে এক্ষেত্রে, আকবর-বাদশার শৈবত-
রূপটা কীভাবে ফুটে উঠেছে।

বুলন্দ-দরওয়ারার চার-আনা সাক্ষ্য তার স্থান-
নির্বাকনে। 'সাইট সিলেকশনে'ই কামাল করেছেন
বাদশা। এখানে প্রাকৃতিক 'কন্ট্র', অর্থাৎ জমির ঢাল
এমন ছিল যে, বুলন্দ-দরওয়ারা নির্মাণ শেষে স্বতই

রস পরিবেশনের বাসনা তাঁর। তিনটি ভিন্ন মেজাজী
আবেদন : ভয়ানক, বীর ও শান্ত।

ভয়ানক রস কেন? ওটা দরকার। ঠিক যে
প্রয়োজনে দেওয়ান-ই-আমের চরপ্রান্তে রক্তদ্রব
অবস্থায় উপস্থিত থাকত সন্ন্যাসের গজদানব : গজ-
মৃত্যু। এই ভয়ানক রসটা রাজভক্ত প্রজাবৃন্দের জন্য
নয়—শত্রুগণ তাদের জন্য, যারা গোপন ষড়যন্ত্রে
যোগ দিতে চায়। মীর্জা হাকিমকে, বিদ্রোহী সেলিমকে
সদয় জর্জরে যারা বিশ্বাসঘাতকের মুনাক্কাতের

খোয়াব দেখে। বুলন্দ-দরওয়াজার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকুন—সামনের দিক থেকে মনে মনে কিছুটা অংশ চাপা দিয়ে ওর খাঁড়িত-অংশ লক্ষ্য করুন ; দেখতে পাবেন এক ব্যাদিত-বদন ভয়ঙ্কর দৈত্যকে। রাক্ষসটার চোখ আছে, কান আছে, মায় তার হাঁ-মুখে সারি সারি সাদা হাঙরের দাঁত ! কান পাতলে শুনতে পাবেন রাক্ষসটা হৃৎকার ছাড়ছে : হোঁশিয়ার ! (চিত্র—৯.২২)।

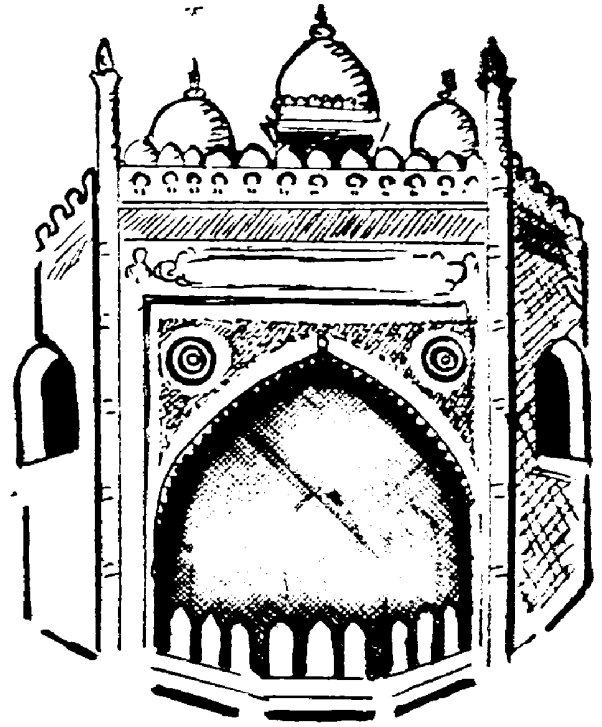
যদি বলেন, এ আমার দৃষ্টি বিভ্রম, অহৈতুকী কবি-কল্পনা, তাহলে আমি কিন্তু একটা প্রতিশ্রুতি তুলব। কলব, আকবরী-জমানার ইবান তো বড় কম দেখলেন না, তোরণও প্রচুর—ফতেপুর-সিক্রির ‘আগ্রা-দরওয়াজা’, বাদশাহী-দরওয়াজা, আগ্রা-কিল্লার অনেক অনেকগুলি সুউচ্চ প্রবেশ-তোরণ, সেকেন্দ্রার দক্ষিণ-দ্বার এবং মূল মক্কারার বিশাল-তোরণ—কই, ঐ বিশেষ জোড়া-নকশাটা তো কোথাও নেই—ঐ ষেটাকে আপনি বলছেন নিতান্ত এ্যাক্সিডেন্টাল গোলাকৃতি একটা অলংকরণ, আর আমি সভয়ে ভাবছি : দৈত্যের রক্তচক্র ?

তবু দৈত্যটাকে দেখতে পেলেন না তো ? তা পাবেন কেমন করে ? আপনি তো আর শাহজাদা সেলিমের কানে ফুস-মস্তুর ঝাড়তে আসেননি। বিদ্রোহে অংশ নেবার কোনো বাসনা নেই আপনার। এসেছেন মহামহিম আকবরের কীর্তি-কাহিনী দেখতে। বেশ, তাই দেখুন না কেন ? আবার মনে মনে নিচের অংশটা চাপা দিয়ে তোরণ-সম্মুখের মাথায় তাজটুকুকেই দেখুন বরং। এটি বীররস।

তৃতীয়তঃ, শাস্তরস। একটা জিনিস খেয়াল করে-ছেন ? বিজয়-তোরণ বানাতে চান তো মস্জিদে এলেন কেন বাদশাহ ? কেন ভেঙে ফেললেন জাম-ই-মস্জিদের দক্ষিণ দরওয়াজা ? তার চেয়ে কি বদ্বিমানের কাজ হত না যদি তিনি ফতেপুর-সিক্রিতে ঢোকান মুখে আগ্রা-তোরণটা ভেঙে ফেলে বুলন্দ-দরওয়াজা গেঁথে তুলতেন। বিজয়-তোরণ তো নগরে প্রবেশের মুখেই ভালো মানায়। বোম্বাই-এর গেট-ওয়ে অব ইন্ডিয়া থেকে বর্ধমানের কার্জন-গেট কি সেই শিক্ষাই দেয়নি আমাদের ? কিন্তু না ! ধর্মপ্রাণ সম্রাট তাঁর ঐহিক সাফল্যের জয়মালাটি প্রশ্রয় বিক্রেতা নাগিয়ে দিয়েছেন রাজার রাজার চরণমূলে। অর্থাৎ হিসাবে। জাম-ই-মস্জিদের প্রবেশদ্বার—যে মস্জিদে অন্তিম শয়ানে শয়ে আছেন তাঁর গর্ভ শেখ সৈয়দ চিদ্দিক—যে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করার পূর্বে তাম্রাম হিন্দুস্থানের

শাহ-নয়ন-শাহকেও তাঁর মর্শবাচিত মক্কার পদতলা খুলে রেখে নগ্ন পদে জনারঞ্জে সন্মিল হতে হয়, সেই পূণ্যভীর্ষের পদপ্রান্তেই তিনি উজার করে দিচ্ছেন তাঁর বিজয়-অভিমান !

সম্রাটের মানসিকতার সেই ঐক্যমত্যকে বুঝে নিতে হলে বুলন্দ-দরওয়াজাকে ঐক্যের দৃষ্টান্ত হতে ভিতর দিক থেকে (চিত্র—৯.২৩)। মস্জিদের আর তিনটি খিলানের সঙ্গে কোনো কান্নাক নেই। ছোট প্রবেশদ্বার, ঘরোয়া ছবি, স্বাভাবিক ককথাপনা। সেখানে দাঁড়িয়ে বিশ্বাসই হতে চায় না—কয়েক পা অগ্রসর হয়ে পিছন ফিরে দাঁড়ালেই দেখতে পাব



চিত্র—৯.২২ বুলন্দ-দরওয়াজার ভয়ঙ্কর রস।

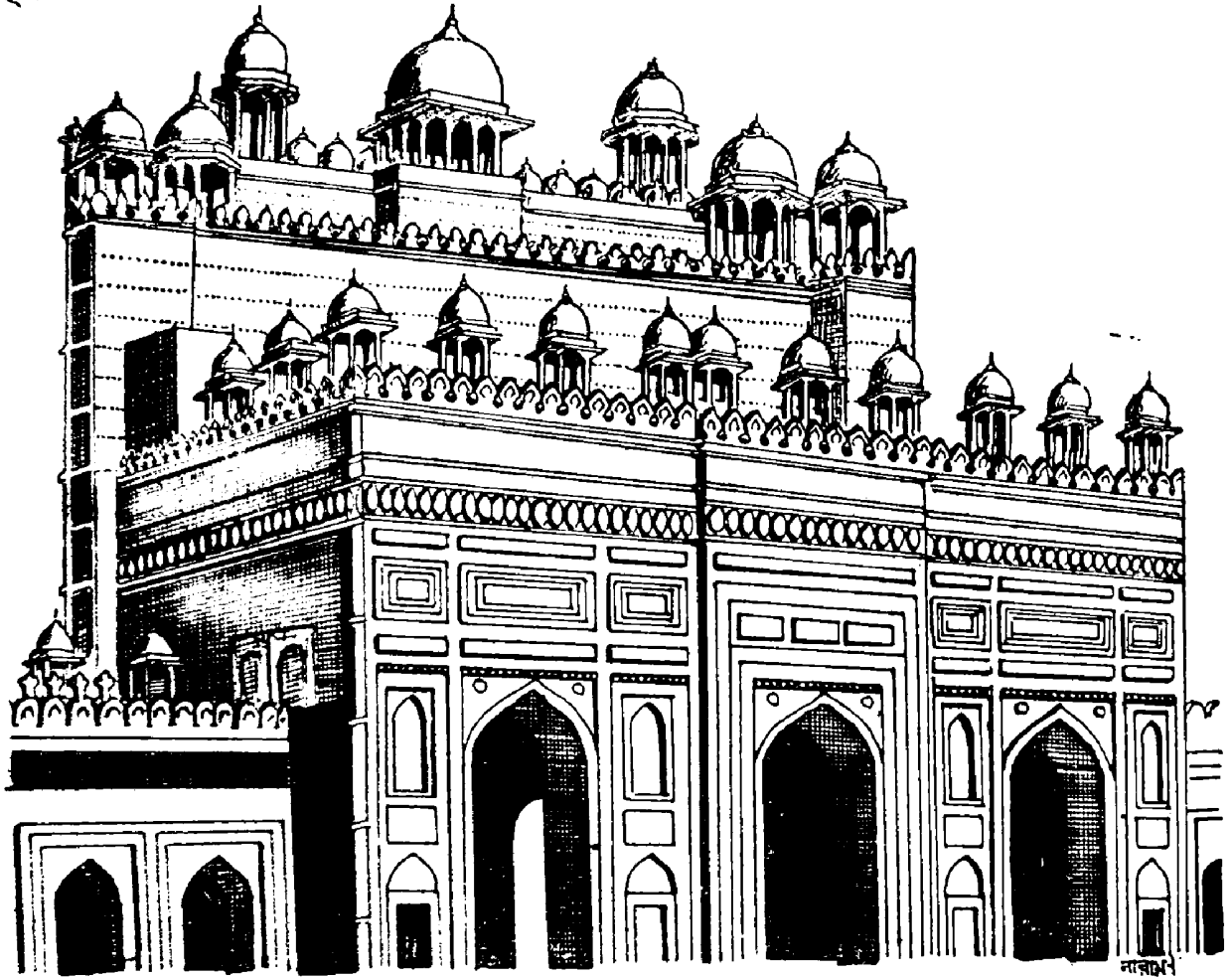
ভারতেশ্বরের আকাশচুম্বী বাদশাহী দার্চ—সারি সারি চরণাশ্রিত সোপান, ব্যাদিত-বদন রাক্ষস-খিলান, কিম্বদন্তি দরবার-আসীন সম্রাটের মাথায় সেই তাজের বাহার !

তাই ফাখ্রিলাম : বুলন্দ—লা-জবাব !

হয় তো নতুন কথা কিছুই কল্য হল না। হয়তো বুলন্দ-দরওয়াজার সামনে দাঁড়িয়ে এ-সব কথা আপনাদেরও মনে হয়েছে। সাহস করে সে-কথা বলতে পারেননি, কারণ আপনারা জানতেন, এ জাতীর ক্ষিপ্ত-ভাবনা ইসলামী ঐতিহ্যে নেই। এ নিভাসই হিন্দু শিল্পশাস্ত্রের একটি অনুভাবনা। যাকে অনন্যদ্বন্দ্ব-নাথ^{২২} বলেছেন : সাধু^{২৩}। শিল্পের বড়-অঙ্গের

পঞ্চম অঙ্গ। হয়তো আপনারা অবাক হয়ে ভেবেছেন—
আকবর-বাদশার মুসলমান শিল্পী অমনভাবে কেন
ডাঙছে? কিন্তু আকবরী-জমানার ফতেপুর-সিক্রিতে
কি সমবেদ হয়নি হিন্দুস্থানের শ্রেষ্ঠ হিন্দু চিত্র-
করেরাও? ঐ মন্দিরম-মকানী আর তুর্কি-সুলতানার
প্রাসাদে, বাদশার খোয়াবগাহে রামসীতা, রাধাকৃষ্ণ,
হনুমানজীর ছবি আঁকতে? সেটা কি ছিল না দেওয়া-
নেওয়ার বঙ্গ? টোবিয়টে রাজকুমারীর সঙ্গে আকুয়েটে
শাহজাদার মহম্মদের জমানা? হয়তো আকবরী যুগের

হিরণ-মিনার : ফতেপুর-সিক্রি থেকে বিদায় নেবার
আগে আর একটি দলছুটে স্থাপত্য-কীর্তি দেখে যেতে
ভুলবেন না : হিরণ-মিনার। ঐ জলাশয়ের ধারে,
জেনানামহলের পিছনে, প্রাকারের বাহিরে। এ মিনারে
নাকি সে-আমসে প্রতিদিন সম্মুখ দীপ জ্বলে দেওয়া
হত। পথভ্রান্ত পথিককে ঐ মিনার পথ দেখাতো।
হুদের বদকে বাইচ-প্রতিযোগিতা হলে, সংলগ্ন ময়দানে
মল্লযুদ্ধের আয়োজন হলে এই মিনারশীর্ষে বসে নিরা-
পদ দূরত্রে রাজাবরোধের জেনানামহল আনন্দলাভ



চিত্র—৩.২৩ হুসুদ্-দরওয়াজা, মসজিদের ভিতর থেকে (শান্তরস)।

শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের দল—ঐ কস্‌ওয়াল, কেশু, মদকুন্দ-
লাল, হারিকস, দাসকন্দের কাছ থেকেই মুসলমান
ঊস্তাদ শুনোঁছিল কাকেরদের সেই বস্ত্রটার ব্যাখ্যা :

রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাষ্যাবগ্যবোজনম্।

সাদৃশ্যং বর্ণিকান্তপ ইতি চিত্রং স্বপ্নকম্ ॥*

* রূপভেদ (anatomy), প্রমাণ (anatomical measurements), ভাব, লাবণ্যবোজনা, সাদৃশ্য, এবং বর্ণিকা-
ন্তপ—এই হচ্ছে চিত্রের স্বপ্নকম্।

করতেন। গাইড আমাকে বলেছিল, ঐ মিনারের নিচে
নাকি একটি হাতীকে কবর দেওয়া হয়েছে।

—হাতী! কোন হাতী? হাতী কেন?

গাইড তা বলতে পারেনি। পুরতত্ত্ব বিভাগের
স্থানীয় অফিসারকে প্রশ্ন করেছিলাম, তিনিও বললেন,
লোক পরম্পরায় কথাটা চালু আছে বটে। সরকারী
রিপোর্টেও বলা হয়েছে, 'হয়তো' হিরণ-মিনার একটি
হাতীর স্মৃতিস্তম্ভ।

দূরন্ত কৌতূহল হয়েছিল আমার। ফিরে এসে প্রামাণিক ইতিহাস ঘেঁটে যা উদ্ধার করতে পেরেছি তা নিবেদন করি :

হাতী জন্তুটা বাদশা আকবরের বড় প্রিয়। ফতেপুর-সিক্রির একাধিক প্রাচীর-চিত্রে হাতীর ছবি—হাতীর ম্বন্দরদুশ্শ, হস্তিপৃষ্ঠে শিকার, হাতীর শোভা-যাত্রা ইত্যাদি। বাস্তবেও তাঁর অনেকগুলি প্রিয় হাতী ছিল—গিরনবর, অপূর্ব, রণধ্বজন এবং গজমুক্তা।

শেষোক্ত গজমুক্তা ছিল সম্রাটের পিলখানায় হাজার হাতীর মধ্যে সবচেয়ে বড়। সব চেয়ে প্রিয়ও ছিল সে আকবর-বাদশার। একাধিক শোভাযাত্রায় সে বাদশাহকে পিঠে নিয়ে নগর পরিক্রমা করেছে। তখন তার গজকুম্ভে বিচিত্র আলিঙ্গন, তার পিঠে ম্বর্ণচিত্রিত হাওদা, তার গলার কাঁছ থেকে দোদুল্যমান অসংখ্য পিতলের ছোট ছোট ঘণ্টা। শব্দ উৎসবে নয়, বাসনেও সে আকবরের সঙ্গী। অনেক যুদ্ধে সে আকবরের বাহন। গজমুক্তা জীবনের শেষ যুদ্ধ করেছে হলদিঘাটের উপত্যকায়। হিরণ-মিনার কি তারই স্মৃতিস্তম্ভ? জানি না। তবে গল্পটা শুনুন। গল্প নয়, ঐতিহাসিক কাহিনী :

: আঠারই জুন, 1576; হলদিঘাটের (হলদিঘাট নয়) সংকীর্ণ গিরিবর্ষে নেমে এসেছেন চিতোর দুর্গ থেকে সেই আশ্চর্য মানুসিটি। তামাম হিন্দুস্থানের একমাত্র মানুস—কাশ্মীর থেকে কুম্মারিকা, গোড় থেকে গুজরাট এই বিস্তৃত ভূখণ্ডের একমাত্র ব্যতিক্রম যে মানুসিটি জ্বিদিগ-ভর বলে গেছেন : একলিঙ্গ ছাড়া আর কারও পায়ে মাথা নোয়াবো না! সারাজীবনে সে লোকটা আকবর-বাদশার বশ্যতা মানেনি। শেষ পর্যন্ত নাকি শাহ-য়েন-শাহ এমন প্রস্তাবও পাঠিয়ে ছিলেন যে, মেবারের শিশোদিয়া রাণা শব্দ নামমাত্র এক আশ্রয়ি নজরানা দিয়ে আকবরের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিন। রাণা সম্মত হননি—পরিকল্পিত বেছে নিয়েছিলেন আজীবনের জন্য নির্বাসিত জীবন, আধপোড়া জোয়ারের রুটি, ঝর্ণার জল আর ভূশব্দ! বাধ্য হয়ে আকবর সৈন্য মানসিংহকে প্রেরণ করলেন চিতোর জয় করতে।

হলদিঘাটের সংকীর্ণ গিরিবর্ষে মূখোমুখি দেখা হল ঐদের।

একদিকে সমগ্র হিন্দুস্থানের মিলিত রাজশক্তির প্রতিভূ মৃগল সিপাহ-সালার রাজা মানসিংহ; অপর দিকে শিশোদিয়া রাজবংশের একটিমাত্র মানুসের দুর্জয় সাহস, মৃত্যুঞ্জয়ী বীর্য আর অপারিসীম স্বাধীনতা-

স্পৃহা। আবুল ফজলের হিসাবে মৃগল সেনাপতি মানসিংহের সৈন্যসংখ্যার আশি হাজার, অপরদিকে চিতোরের সৈন্যসংখ্যা তার চতুর্থাংশ : বিশ হাজার। এই অসম যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ, তার কলকল আপনাদের অজানা নয়; টেডের জন্মের 'হলদিঘাট' হচ্ছে ভারত-ভূখণ্ডের ধর্মপলি! কিন্তু না, আমি তো রাণা প্রতাপের কীর্তি-কাহিনী শোনার জন্যে, আমি কলিছি 'গজমুক্তা'র কথা।

আকবর মানসিংহকে যেমন বেছে নিয়েছিলেন তাঁর অব্যুত দক্ষ সেনাপতির ভিতর, তেমনি বেছে নিয়েছিলেন যানের বাহন হিসাবে—পিলখানার অব্যুত হস্তিদানবের ভিতর থেকে গজমুক্তাকে। ফতেপুর-সিক্রি থেকে মানসিংহকে পিঠে করে গজদানব এসে উপনীত হয়েছে আজ এই সংকীর্ণ গিরিবর্ষে।

প্রতাপ প্রথমে যে হাতীর পিঠে সওয়ার হয়ে গড়াই করতে এলেন তার নাম 'লোনা'। আবুল ফজল কছেন, 'লোনা'ও নাকি এক গজদানব! হস্তিপ্রেমিক আকবরের নজর ছিল ঐ সুবিখ্যাত হস্তীটির উপর। লোনাও গজমুক্তার মত অসমসাহসিক, দৌহক কম-তায়, রণকুশলতায় তুল্যমূল্য! নিতান্ত দূর্ভাগ্য বলতে হবে—অতর্কিতভাবে গুলিবিষয় হয়ে লোনার মাহুং মারা পড়ল। লোনা ঐ মাহুংয়েরই শব্দ একান্ত অদ্ভুত; অন্য কোনো মাহুং এই ক্রান্তিকরী যুদ্ধে লোনাকে পরিচালনা করতে সাহসী হল না। প্রতাপ বাধ্য হয়ে বাহন বদল করলেন।

রণক্ষেত্রের একান্তে এতক্ষণ অশান্তভাবে ক্রমাগত মাটিতে পা ঠুক্ছিল ঠেতক। রাণা প্রতাপের আঁক-শোর বাহন! প্রভুকে পিঠে পেয়েই উত্তেজিতভাবে হুঁসখনি করল একবার। প্রতাপ অশ্বের মূখ ঘোঁরলেন। তরবারি সঞ্চালনে পথ করে তিনি এগিয়ে চললেন যুদ্ধক্ষেত্রের কেন্দ্রবিন্দুতে—ঐ বেষ্ট্রানে গজমুক্তার পিঠে হাওদায় বসে যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন রাজা মানসিংহ।

হায় হায় করে উঠল শিশোদিয়া সৈন্যদল! এ কী সম্ভব? অম্বারোহী কখনও মৈত্রয় সময়ে প্রবৃত্ত হতে পারে গজারুড়ের—কিশেব, সেই গজ যদি হয় ভারতপ্রেমী গজমুক্তা! কিন্তু রাণা প্রতাপকে সে-কথা বোঝাবে কে? তাই ওরা অন্য কৌশল করল। উপবৃ-পরি শরাঘাতে জর্জরিত করে দিল গজমুক্তাকে। বাতে যন্ত্রণায় সে রণে ভগ্ন দিয়ে ছুটে পাল্লয়! কিন্তু আশ্চর্য! গজমুক্তা তবু মূখ ঘোরালো না। তাঁরবিশ্ব দানবটা যন্ত্রণায় বৃহত্তরুনিতে রণক্ষেত্র মূখর করে

ভুলল, তবু পিছদ ফিরল না। ভিল ভিল করে এগিয়ে চলল প্রতাপের দিকে।

ঠিক সেই মূহুর্তটিতে চৈতক যে কাণ্ডটা করে বসেছিল তা মধ্যযুগের সময়-ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। সেই শব্দ-মূহুর্তে চৈতক—উঠেপ্রব। পিছনের দৃ-পায়ে ভর দিয়ে অসীম সাহসে সামনের দৃটি পা সে ভুলে দিল ঐরাবতের করিকুম্ভ। মূহুর্তমধ্যে প্রতাপ রেকাবের উপর দেহভার রেখে দাঁড়িয়ে উঠলেন—তীক্ষ্ণ শুলের আঘাত করলেন মানসিংহের কবাট-কক্ষে। সেই ভীম আঘাতে মানসিংহ আসনচ্যুত হলেন বটে কিন্তু ভূতলশায়ী নয়। ইতিমধ্যে মানসিংহের দেহরক্ষী বসিলে দিয়েছে চৈতকের সামনের পায়ে এক স্মৃত্তিক তলোয়ারের কোপ।

যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে সেই ঐতি-হাসিক আহ্বান : 'হো নীলা ঘোড়াকা সওয়ার!' এবং অল্প পরেই রক্তক্ষয়ী চৈতকের মৃত্যু। হল্দিঘাটের অন্যতম স্মৃতি-সেই বিজয়-প্রান্তরে, যেখানে আন্তিম শয়নে শেখ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল প্রভুভক্ত চৈতক সেখানে রক্তপুত্রে বানিয়ে দিয়েছে তার এক প্রতি-মূর্তি।

কিন্তু গজমুক্তার কথাটা ইতিহাস লিখে রাখতে ভুলেছে। হল্দিঘাটের যুদ্ধ শেষে শরাবিস্তৃত হস্তি-দানবও ভূতলশায়ী হয়েছিল ভীষ্মপর্বের শেষদৃশ্যটির অনুরূপে। হস্তি-চীৎকার তার দেহ থেকে শব্দগুণি একে একে মোচন করে ঔষধ প্রয়োগ করলেন। অতি-কষ্টে উঠে দাঁড়ালো গজমুক্তা। বিজয়ী মানসিংহকে পিঠে নিয়ে সে ফিরেও এসেছিল ফতেপুর-সিক্রিতে। কিন্তু কতক্ষণগুণি তার নিরাময় হল না। আকবর-বাদশাকে শেষ প্রণাম জানাবার জন্যই যেন সে তার কতকিঞ্চিৎ দেহটা টানতে টানতে এতটা পথ এসেছে।

ইতিহাস এটুকুই। ঝাঁকটা আপনাদের অভিরুচি।

ন—হিরণ-মিনারের গায়ে কোনও ফলক নেই। আকবর-নামা অথবা আইন-ই-আকবরীতে হিরণ-মিনারের কোনও উল্লেখ আমি খুঁজে পাইনি। 'হিরণ' শব্দটার অর্থ হিন্দিতে 'হিরণ'; হস্তী নয়। তাহলে কোন অজ্ঞেয় বসব, এ মিনার গজমুক্তার স্মৃতিস্তম্ভ? আমি শব্দ কয়েকটি বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেই ক্ষান্ত দেব।

'হিরণ' হিন্দিতে 'হিরণ', কিন্তু সংস্কৃতে? হিরণ অর্থ স্বর্ণ, হলুদ রঙ। কেমন হলুদ? হল্দিঘাট উপত্যকার মাটি যেমন হলুদ?

হল্দিঘাটের শৈবরথ সময় হো শব্দ, মানসিংহ আর

প্রতাপের নয়,—চৈতক এবং গজমুক্তারও। শেষোক্ত দু-জনেই প্রাণ দিয়েছে ঐ যুদ্ধে—কিছু আগে আর কিছু পরে। বিজিতদল তাদের বীর যোদ্ধা চৈতকের স্মৃতি-স্তম্ভ গড়ে দিয়েছে। বিজয়ী দলের আকবর-বাদশাহ তার 'জবাব' না দিয়ে থাকতে পারেন?

শব্দ তাই বা কেন? লক্ষ্য করে দেখুন না কেন ঐ মিনারটিকে। স্থাপত্যের শৈল্পিক নির্দেশনায় আকবর কি তাঁর বক্তব্য বলে যাননি? ঐ বিচিত্র-দর্শন মিনারটি—যা ঘৃণাক্ষরেও কোন পদার্থের মিনারের অনুরূপ নয়, আর ভবিষ্যতেও যা কেউ কোনদিন অনুরূপ করেনি, সে কি সোচ্চারে ঘোষণা করেছে না সে কার স্মৃতিবাহক?

মিনারের রঙ গেরুয়া—হলুদ ও লালরঙের সংমিশ্রণ। কেমন জান? যেন হল্দিঘাটের হলুদ-রঙের ধূসর মাটিতে লেগেছে রক্তের ছোপ! চতুষ্কোণ পাদপীঠের উপর অষ্টভুজাকৃতি মিনার কিছুটা উঠেছে স্ফারদেশের মাথা পর্যন্ত। তার উপরের অংশটা? মোটা থেকে সরু হয়েছে—যেন একটি অতি-পরিচিত বৃহদাকার ভূতলশায়ী মরণহত প্রাণীর আশ্মানে উৎক্ষিপ্ত আহত চরণ। তার গায়ে অসংখ্য কাঁটা, কাঁটা আর কাঁটা। স্তম্ভের সর্বাঙ্গে ঐ শত শত তাঁর বেঁধা আছে কেন গো? জানি না। তার কোনও রকম ব্যাখ্যা কোন পণ্ডিত দিতে পারেননি—না ঐতিহাসিক, না পুরাতত্ত্ববিদ, না শিল্প-বিশারদ। হয় তাঁরা প্রশ্নটা এঁড়িয়ে গেছেন, নয় বলেছেন—ও কিছু না! অ্যাক্সি-ডেন্টাল আর্ট।

আমার মন মানেনি। ঐ হিরণ-মিনারের সামনে দাঁড়িয়ে আমার কেমন যেন বার বার মনে হয়েছে—এ কোনো মিনার নয়, এ মক্কারা! স্থাপত্য নয়, এও এক ভাস্কর্য—বুলন্দ-দরওয়াজা যেমন আকবর-বাদ-শাহর। ফতেপুর-সিক্রির দুই প্রান্তে দুটি প্রতিকৃতি-ভাস্কর্য—বুলন্দ-দরওয়াজা আর হিরণ-মিনার—প্রভু ও ভূত্যের, সওয়ার ও বাহনের (চিত্র-9.24)।

পণ্ডিতেরা যে যাই বলুন, আমি বস্তু, ঐ মিনারের সামনে দাঁড়িয়ে মনের চোখ দিয়ে দেখুন—ঐ মক্কারার নিচে শান্তিতে শায়িত আছে সেই ঐতিহাসিক ঐরাবৎ : গজমুক্তা।

গ্র্যান্ড মদগজদের আধাজজন বাদশাহর প্রথম দু'জন ভাগ্যবানকে বাদ দিলে বাদবাকি সবারই শেষজীবনে একই জাতির মরণা-পুত্রের হাতে পিতার নির্যাতন। আকবর দিয়েই তার শব্দ। তাঁর শেষ জীবনে সেজিম

বিদ্রোহ করে বসল। সেলিমের আশঙ্কা অতিরিক্ত মদ্যপানজনিত অপরাধে তাকে বন্ধিত করে আকবর তাঁর নাতি খসরৌকে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে যাবেন, অথবা শাহজাদা খুররমকে, অর্থাৎ শাহজাহাঁকে, যাকে শৈশবাবস্থা থেকে মানুষ করছেন আকবরের প্রথমা পত্নী, পত্নহীনা রুখেয়া বেগম-সাহেবা, বা তুর্কি সুলতানা। আকবর-বাদশাহর জীবনের এই অংশের একটি সমসাময়িক প্রতিচ্ছবি সংরক্ষিত আছে নিউ ইয়র্কের 'মেট্রপলিটান মিউজিয়াম অব আর্টস'-এ। তার একটি রৈখিক অনুকৃতি আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করেছি (পৃষ্ঠা-৭১)।

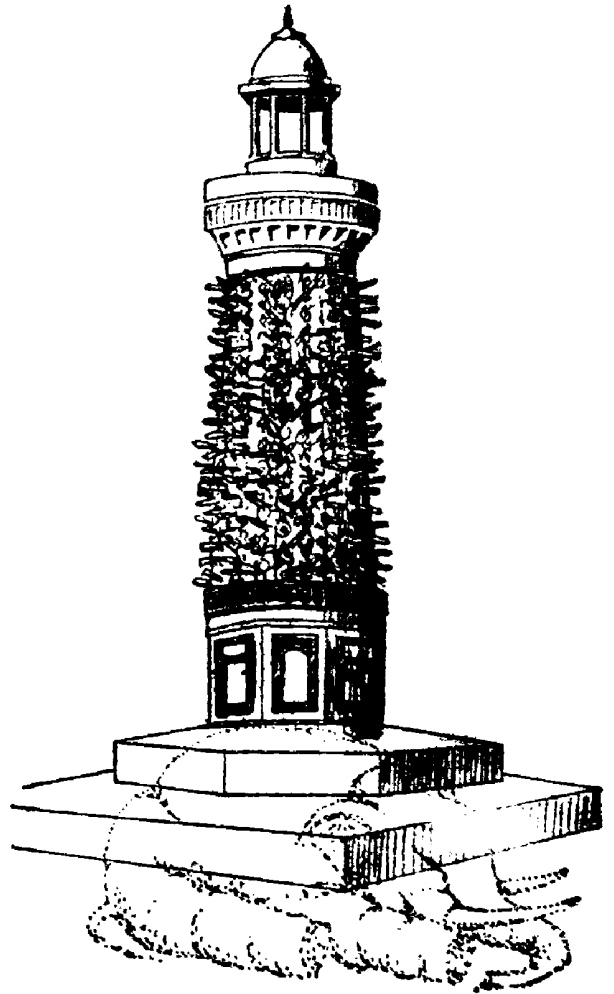
আকবরের মাথার পিছনে একটি রক্তচুটা বা 'হ্যালো' আঁকা হয়েছে, যদিও স্যার টমাস রো তখনও ভারত-বর্ষে আসেননি, এবং ভারতীয় চিত্রকর পাশ্চাত্য-চিত্রে সেন্ট, বা খ্রীস্ট-এর 'হ্যালো' দেখতে অভ্যস্ত হয়নি। সম্মুখে যুক্তকর, নতজানু, সেলিম, এবং তাঁর পিছনে রাজা মানসিংহ। আকবরের পায়ের কাছে শাহজাদা খুররম এবং তার সম্মুখে, সেলিমের নিচে খসরৌ। চিত্রের দক্ষিণপ্রান্তে, কিনারবেশে নিচের দিকে সম্ভবতঃ রাজা বীরবল। চিত্রের নিচে দুটি চিত্রল হরিণ, উপরে ময়ূর। কি-জানি কেন শিল্পী বাদশাহ আকবরের আলোখো কিছু বিরক্তির চিহ্ন রেখে গেছেন; তাঁর চকুটি এবং বামহস্তের ব্যঞ্জনায় বৃদ্ধ বাদশাহর শেষজীবনের বিড়ম্বনার যেন একটা ইঙ্গিত আছে।

যতই বিরক্ত হন, আকবর কিন্তু সেলিমকে উত্তরাধিকার থেকে বন্ধিত করতে চাননি কোনদিন, তবে হ্যাঁ, এ-কথা তিনি বলেছেন—তত্ত্ব-তাউসে বসবার যদি বাসনা থাকে তবে মদ্যপানের মাত্রাটা তাকে কমাতে হবে। সেটা আবার শাহজাদা সেলিমের খাতে সয় না। বড়ো বাপটা মাটি নিলেই মিটে যায়—তাহলে চুটিয়ে সুলতানী করতে পারে সেলিম। কিন্তু সে সৌভাগ্য আর কিছুতেই হয় না।

তা বটে—ভাবেন আকবর—বড় বেশি দিন তিনি রয়েছেন এই দুনিয়ায়। ষাট পার হয়ে এল। পুরানা জমানার জান-পহ্‌চান যারা ছিল এ দু-কুড়ি সাতের খেলার সাথী, সবাই একে একে রঙ্গমঞ্চ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছে। একলা চলার পথে রঙনা হয়ে গেলেন বৈরাম পুত্র আবদুর রহিম খান-ই-খানান—সেই অসাধারণ গুণগ্রাহী পণ্ডিত মানবটি। আকবরী নবরঙ্গের অন্যতম উজ্জ্বল রঙ্গ—যাঁর সম্বন্ধে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন, "পড়েছি, আকবরের সভাসদ আবদুর রহিম খান-ই-খানান হিন্দী কবি গঙ্গো-র চার-লাইনের

কবিতা শুনে চার লক্ষ টাকা পদুমফার দিয়েছিলেন।" দিল্লীতে নির্মিত হল আবদুর-নির্দেশে তাঁর মন্দির। বর্তমানে তা ভগ্নদশায়; কিন্তু তার বাহ্যরূপ নিঃসন্দেহে অনুপ্রাণিত করেছিল তাজমহল পরিকল্পনা-কারকে (চিত্র-9.25)।

এটিও হিন্দুদের পঞ্চরত্ন দেউলার ছন্দে নির্মিত। এর প্ল্যান-এর সঙ্গে হুমায়ুন-মকবারার মতো

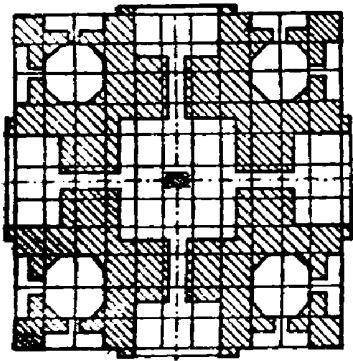
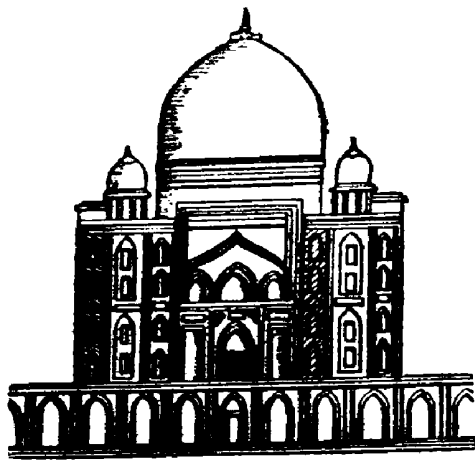


চিত্র-9.24 হিরণ-মিনার কি 'পঞ্চরত্ন'-র মক্‌বরার?

বৃন্তের বনিয়াদ নেই; আছে সরলরেখার সমাহার। অথচ একতলার সার-সার খিসান হুমায়ুন-মকবারার কথা দর্শকের স্মরণপথে এনে দেয়। মূল ইমারৎ ভূমি-ভূক্‌শায় বর্গক্ষেত্র এবং এগার-এগারং একশ-একুশের বাঁধনে বাঁধা হয়েছে। চার-প্রান্তে চারটি অষ্ট-ভুজ কক্ষ অথচ কেন্দ্রস্থ সমাধিকক্ষ চতুর্ভুজ-বর্গ-ক্ষেত্র। চারটি কেন্দ্রীয় লিয়ানও তাজমহলী জেত। এ

যেন হিন্দু-ঈশ্বরীতে হুমায়ূন-মক্কারার পারসিক শরনিং-এর ভারতীয়করণ!

একে একে প্রয়াত হলেন—হাজী বেগম-সাহেবা, ঐতিহাসিক ফৈজ, সঙ্গীতকেশরী তানসেন। তানসেনের মৃত্যু হল লাহোরে (1589)। মর্মান্বিত বাদশাহ্ মিক্রা তানসেনজীর মরদেহ নিয়ে এলেন পঞ্জাব থেকে স্মোল্লিয়ার। মুসলিম দুনিয়ার মহাধার্মিক শেখ মুহম্মদ গিয়াস্-এর সমাধিসৌধের সম্মুখে নির্মাণ করালেন ছোট একটি মক্কারা। ছোট, কিন্তু সুন্দর—



০ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১

চিত্র—৩.২৫ আকবর রাইস খান-ই-খানান-এর মক্কারা, বাস্তবকৃষ্ণ ও সম্বন্ধকৃষ্ণ, দিল্লী।

যেন বেহাগের একটি তান। শূইয়ে দিলেন প্রিয় কণ্ঠকে, পদ্মসাহী সঙ্গীত। সমাধিস্থ হল এক বৃদ্ধ। একই বছরে মৃত্যু হল রাজা টোডরমলের, আকবরের বিখ্যাত ব্রাহ্ম-আদায় ও শাসন-ব্যবস্থার নিয়ামকের। টোডরমল তখন বৃদ্ধ, অনুমতি চাইলেন বাদশাহ্-র কাছে, তিনি অবসর নিতে ইচ্ছুক। পথে লিখলেন, 'দুনিয়াদারী তো অনেকদিন হল, এবার জির্দেগির আঁকি দিন কটা আমি হরিব্বারের গঙ্গাতীরে ঈশ্বরের

সেবা করে কাটিয়ে দিতে চাই।'

লাহোর থেকে সে পত্রের জবাবে নিরঙ্কর বাদশাহ্ জ্ঞানালেন, "নিপীড়িত মানুষের সেবাই তো ঈশ্বরসেবা। আপনি আমার অমাত্য হিসাবে তো সেই মানুষেরই সেবা করছেন—যে মানুষ সৃজন করেছেন আল্লাহ্ অর্থাৎ রামজী! আপনাকে অবসর নিতে দিতে অক্ষম।"-২।

সে পত্র রাজা টোডরমলের হাতে যখন পৌঁছাল তখন তিনি নিতান্ত অসুস্থ। তবু তখনই যাত্রা করলেন লাহোর অভিমুখে। সেখানেই মৃত্যু হল তাঁর। মর্মান্বিত হলেন বাদশাহ্। মোত, মোত, মোত আর মোত! চঞ্চল হয়ে উঠলেন আকবর। আজীবন কত কত মানুষের জন্য মক্কারা বানিয়ে দিয়েছেন; কিন্তু নিজের জন্য তো কিছুই করা হয়নি! তাহলে কোথায় শোবেন তিনি নিজে? অম্বর রাজ-কুমারীকে পার্শ্বাটতে নিয়ে? তখনই ডেকে পাঠালেন তাঁর শ্যালক ভগবানদাসকে। টোডরমল নেই, মান সিং জগী মান্দু, —শিল্প-স্থাপত্য বোঝে না; পারলে ভগবানদাসই পারবে এ দায়িত্ব নিতে। ভগবানদাস অম্বর মহিষীর ভ্রাতা, সেলিমের মাতুল-তথা-স্বশুর। সেই হবে উপযুক্ত লোক। জমিটা পছন্দ করা আছে—সেকেন্দ্রায়, আগ্রার অনতিদূরে। মক্কারার বাস্তব-নকশাও মনে মনে ছকা আছে, কাজে হাত দেওয়া হয়নি।

আহবানমাত্র কিন্তু রাজা ভগবানদাস হুজুরে হাজির হতে পারলেন না। সংবাদবহ ফিরে এল দুঃ-সংবাদ নিয়ে। রাজা টোডরমলকে দাহ করতে ভগবানদাস স্বয়ং গিয়েছিলেন সম্মানে। সেখান থেকে ফিরে এলেন জ্বর গায়ে। বর্তমানে শয্যাশায়ী।

বাদশাহ্ বললেন, তাঁকে বলে এস, একটু ভালো হয়ে উঠলেই যেন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ব্যাপারটা জরুরী।

সেই বাদশাহী নির্দেশটা আর মানতে পারেননি প্রভুভক্ত ভগবানদাস। জ্বর থেকে মুক্তি পেলেন না আদৌ। টোডরমলের মৃত্যুর সপ্তাহ না ঘুরতেই বিদায় নিলেন ভগবানদাস।

নাঃ! সেলিমের যুক্তিটাই ঠিক। বড় বৌশ দিন বেঁচে আছেন উনি!

লাহোর থেকে ফিরে এলেন আগ্রায়। সেই আগ্রায়, যেখানে তরুণ জালাল একদিন এসেছিলেন হুমায়ূন-মক্কারার স্থপতি মীর্জা গিয়াস্কে বিদায় দিয়ে। এসেছিলেন নিজ তত্ত্বাবধানে জীবনের প্রথম স্থাপত্য-



চিত্র 9.26 আবুল ফজল সম্রাটকে 'আকবর-নামা'-র দ্বিতীয় খণ্ড উপস্থাপন করছেন,

চিত্রকর গোবিন্দন (1602 ?)

[ডাবলিন-এর 'সেন্টার বীয়েটলি' গ্রন্থাগারের সংগ্রহশালার মূলচিত্রটি আছে ।]

কীর্তি রচনা করতে—হিন্দু-মুসলিম যৌথ স্থাপতি
রূপায়িত করতে। এবারও এলেন নিজ তত্ত্বাবধানে
জীবনের শেষ স্থাপত্য-কীর্তি রূপায়িত করতে :
'আকবরস্ টম্ব্—আট সিকান্দ্রা'।

আগ্রা-কিল্লা থেকে আট কিলোমিটার দূরে
সিকান্দ্রার মোদী প্রতিষ্ঠিত 'সেকেন্দ্রা' জনপদ।
সেখানেই নির্বাচন করেছেন নিজ সমাধিক্ষেত্র। অতি
প্রকাণ্ড বাগানবোঝা চৌহদ্দী—হুদায়ুন-মক্‌বারার অন্ত-
করণে আবুদী চাহারবাগ। কিন্তু ঐ পর্যন্তই।
যাকিটা ইন্দো-ইসলামী-শৈলীতে পরসরীতিতে নয়।
বাগিচার চার প্রান্তে চারটি ভোরণের আডাস ; শব্দ
দক্ষিণ দিকের দরওয়াজাটাই বাস্তব প্রবেশ-তোরণ।
প্রতিবোধিত-মূলক নানান নকশা বানালো নানান
স্থাপতি। হঠাৎ কি-জানি কেমন করে আইজিয়াটা
মাথায় এল। দরওয়াজার মাথায় গেঁথে তুলতে হবে
চারটি মিনারিকা—যেন মুরাশ্জিন-মিনারে দাঁড়িয়ে বড়-
ইমাম-সাব দই হাত আশ্মানের দিকে তুলে আজান
দিচ্ছেন : আল্লাহ্ হো আকবর।

তৈরী হল কাঠের মডেল। দারুণ পছন্দ হয়ে
ফেল বাদশাহর। তিনি জানতেন না, ঐ অপূর্ব
প্রয়োগ-কৌশল অনুকৃত হবে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মক্‌বারায়
—তাজমহলে !

আকবর-পরিকল্পিত এই প্রবেশ-তোরণটি ম্বিতল।
সম্মুখদৃষ্টে তিনখণ্ডে বিভক্ত। দ-পাশে দুটি করে
খিলান এবং কেন্দ্রস্থলে একটিমাত্র লিয়ান উচ্চতায়
ঐ দ-পাশের খিলানদ্বয়ের বৌধ উচ্চতাকে ছাপিয়ে
গেছে। ঐ কেন্দ্রস্থ খিলানের গর্ভে আবার দুটি ক্ষুদ্র-
কার খিলান। এ সৌধের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ঐ
মিনারিকা চতুষ্টয়।

মূল সৌধটি বর্তমানে যেমন দেখছেন, আকবর যে
সে-ভাবে চিন্তা করেননি এ-কথা প্রায় নিঃসংশয়ে বলা
যায়। আকবর কী চেয়েছিলেন? জানি না! তবে যা
হয়েছে, তা নয়। প্ল্যান না ছকে নিশ্চয় তিনি কাছে
হাত দেননি, হয়তো কাঠের মডেলও নির্মিত হয়েছিল।
যে-কালগুই হোক সেটা ভবিষ্যতে অনুসরণ করা হয়নি।
সম্মুখদৃষ্টের লিয়ান এবং চারটি বৃহদায়তন ব্যাস্টি-
য়ান-সদৃশ অঙ্গসলি একতলা পর্যন্ত গাঁথা শেষ হতে-
না-হতেই কম্ব বন্ধ করে দিতে হল। সম্মিলিতভাবে।
করল এদিকে শব্দ হয়ে গেছে তাঁর শেষ-জীবনের
প্রাণান্তকর ইতিহাস :

সেলিম বিদ্রোহ করে বসল !

মর্মান্বিত হলেন বাদশাহ। তবে তিনি ছিলেন

স্থিতিশীল, বিচক্ষণ মানুষ। উত্তেজিত না হয়ে একটি
পত্র রচনা করলেন সযত ভাষায়। তরুণ বয়সে বৈরাম
বিদ্রোহ করায় যেমন তাঁকে পিতৃসম্বোধন করেছিলেন
মোসায়েম ভাষায়, এই পরিণত বয়সেও তেমনি
সেলিমকে পত্রসম্বোধন করে বলেছিলেন ইঠকারিতায়
সামিল না হতে। সেলিমের অন্তরঙ্গ দোসত্ মহম্মদ
সরিফের হাতে পত্রখানি পাঠিয়ে দিলেন বিদ্রোহী পত্রের
কাছে, এলাহাবাদ দুর্গে। তাকে মৌখিক নির্দেশও
দিলেন বায়সবার—সে যেন শেখদুবাকে বদ্বিয়ে-সদ্বিয়ে
আগ্রাতে ফেরত নিয়ে আসে। কিসের জন্য এ বিদ্রোহ ?
এ তত্ত্ব-তাউস বৃদ্ধ তো তারই জন্য পাহারা দিয়ে বসে
আছেন।

সোরাব মোদীর 'মুঘল-এ-আজম'-এর প্রভাবমস্ত
হবার জন্য এইখানে বলে রাখা ভালো যে, সেলিমের
বিদ্রোহের সঙ্গে তার পহেলী-প্যার 'আনারকলি'-র
কোন সম্পর্ক নেই। মেহেরউল্লিসাও নয়, এ শব্দ
আশু সিংহাসন লাভের মোহ।

ফল হল না। খাজা মহম্মদ সরিফ এলাহাবাদে
পৌছাতেই শাহজাদা সেলিম বলে ওঠে, এই যে তুমি
এসে পড়েছ! তোমাকেই খুঁজিছিলাম।

খাজা সরিফ অবাক হয়ে বলে, আমাকে? কেন?

—বাঃ! আমি তত্ত্ব-তাউসে উঠে বসলে তুমিই তো
হবে আমার উজীর-এ-আজম!

খাজা সরিফ একটা ঢোক গিলল। কম তাজব
কী-বাঃ! সে হতে চলেছে উজীর-এ-আজম-উল্-
মূলক! অগত্যা সম্রাটের পটটা সে জেব থেকে আদৌ
বার করল না।

আকবর বুঝলেন, এ কোন ছেলে-ছোকরার কাজ
নয়। কাকে পাঠাবেন? মানসিংহ জাতীয় জগী
গান্ধকে দিয়ে কাজ হবে না—চাই ধীর-স্থির কোন
পাণ্ডিত মানুষকে। যার পাণ্ডিত্যকে শ্রদ্ধা জানাতে
বাধ্য হবে সেলিম, যতই বিদ্রোহী বেপরোয়া হোক সে।
এই সময়েই একদিন গোবর্ধন এল গুঁর দরবারে।
গোবর্ধন আকবরী-জমানার শ্রেষ্ঠ হিন্দু-চিত্রকর। সে
সম্প্রতি শেষ করেছে একখানা জল-রঙে আঁকা ছবি—
ছোট্ট মিনিয়চার, 24×13.5 সেন্টিমিটার মাপের।
বিষয়বস্তু :—আবুল ফজল তাঁর 'আকবর-নামা'র
ম্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত করে গ্রন্থখানি দরবারে পেশ কর-
ছেন (চিত্র-9.26)।

চিত্রখানি দর্শনমাত্র সম্রাট মনোস্থির করলেন। এ
কার্যের দত্ত হবার উপযুক্ত মানুষ—আবুল ফজল।
অসাধারণ পাণ্ডিত্য, সর্বজনপ্রাণ্যে ঐতিহাসিক—

বিদ্রোহী সেলিমের কাছে এলাহাবাদ কিল্লায় এই পণ্ডিত মানদ্যুটি নিরস্ত হাজির হলে সেলিম ভুল বুঝবে না। কিন্তু আব্দুল ফজল এখন রাজধানীতে নেই ; ছিলেন দাক্ষিণাত্যে। তৎক্ষণাৎ প্রত্যাগমনী সংবাদবহ ছুটল সেখান থেকে তাঁকে নিয়ে আসতে। সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র প্রচুভক্ত আব্দুল ফজল রওনা দিলেন আগ্রার দিকে। দর্ভাগ্য তাঁর, এবং ভারতৌত্বহাসের,— রাজধানীতে পৌঁছাতে পারলেন না।

সেলিমের খোকা-বিদ্রোহের এইটেই সব চেয়ে বড় অপকীর্তি। আব্দুল ফজলকে সম্রাট তলব করেছেন খবর পেয়ে সেলিম তাঁর গদ্যুতহত্যার আয়োজন করল। বদেলদা সর্দার বীর সিং আগ্রার পথে হত্যা করল আব্দুল ফজলকে। ইতিহাসকার বলছেন, ব্যর্থনামা বীর সিং ঐ ইতিহাসকার মহাপণ্ডিতের কীর্তিত মৃণ্ডটা পাঠিয়ে দিয়েছিল তার প্রভুর কাছে। আর অমানুষ সেলিম আব্দুল ফজলের ছিন্নশিরটি ফেলে দিতে বলেছিল আস্তাকুড়ে।

তানসেনের মৃত্যুতে সমাপ্ত হয়েছিল ললিতকলার একটি বিশেষ অধ্যায়—সেটা স্বাভাবিক অবসান ; আব্দুল ফজলকে হত্যা করে সেলিম স্বহস্তে টেনে দিল আর একটি অধ্যায়ের স্ববানিকা : ইতিহাস চর্চা !

মুগল গৌরব-রবি পশ্চিমে ঢলতে শুরুর করেছেন।

দুরন্ত ক্রোধে জ্বলে উঠলেন আকবর-বাদশাহ্। হুকুম দিলেন : সৈন্য সাজাও। আমি স্বয়ং যাব এলাহাবাদ। বিদ্রোহ দমন করতে।

সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন অতিবৃদ্ধা মীরয়াম মকানী—আকবরের গর্ভধারিণী জননী। পুত্রের হাত দুটি ধরে বললেন, বেটা ! উস্কো মাফি কিয়া যায়। আমি তার হয়ে মাফ চাইছি।

অগ্নিগর্ভ আশ্রয়গিরির মত নিশ্চল দাঁড়িয়ে ছিলেন আকবর। শান্ত সমাহিত কণ্ঠে বললেন, তুমিই আমাকে মাফ কর, আম্মাজান ! তা হয় না। বিস্মিতা হামিদা বান্দু বলেন, আমার কথা রাখবি না ? আমি... আমি না দশমাস তোকে গর্ভে ধারণ করেছি ?

আকবর বললেন, মা ! তুমি আমাকে তোমার জঠরে লালন করেছ। সাজা বাৎ। কিন্তু ভেবে দেখ—যাঁর বৃকের দধ খেয়ে আমি মানদ্যু, তাঁকেও আমি রেহাই দিইনি। আধম আমার কর্তব্যরত কর্মচারীকে খুন করেছিল। সেলিমও ঠিক তাই করেছে। এখানে আমি কারও পিতা নই, কারও পুত্রও নই।

অতিবৃদ্ধা বান্দু বেগমের যেন মনে হল তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান ঐ বৃদ্ধটা সম্পূর্ণ অপরিচিত।

অক্ষুটে বললেন, কারও পিতা নয়, কারও পুত্র নয় ! তবে তুই কী ?

: হক্-হাকিমতের জিজ্ঞাসক অশ্ব-বধির এক নফর।

ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে গেল আকবর-জননীর মুঠি।

বাদশাহী সৈন্য অগ্রসর হল স্থলপথে। আকবর রওনা দিলেন ময়ূরপাখি বজ্রায়। যমুনাক্ষেপে সেলিমের কিস্মৎ প্রসন্ন—চড়ায় আটকে গেল বজ্রা। হাতী দিয়ে তাকে টেনে জলে নামাতে না নামাতে নামল প্রচণ্ড বর্ষা—তিন দিন চসল অক্লান্ত বর্ষা। মার্কি-মাল্লারা বজ্রা চালাতে সাহস গেল না—দিগ্দিগন্ত দেবা যায় না কিছই। ইতিমধ্যে আগ্রা-কিল্লা থেকে ছুটে এল কদমাস্ত এক অশ্বারোহী সংবাদবহ। দ্রুতসংবাদ এনেছে সে—মীরয়াম মকানী নাকি মৃত্যুশয্যায় : শেষ দেখা দেখতে চান পুত্রকে ! আকবর প্রথমটা বিশ্বাস করেননি। ভেবেছিলেন, তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে বাবার জন্য এ বৃদ্ধি এক হারোমি ফিকির। কিন্তু পরলৌকিকা স্বয়ং গুলবদন বেগম—অশীতিপর্যায় ধার্মিক মহিলা। তিনি মিছে কথা লিখবার লোক নন।

আকবর ফিরে এলেন আগ্রায়।

তার কদিন পরেই হামিদা বান্দু বেগমের মরদেহ নীত হল দিল্লীতে—হুমায়ূন-মকবারায় তাঁর চিহ্নিত সন্দোখ্-এর নিচে শইরে দেওয়া হল তাঁকে।

আকবরের মাতৃভক্তি আদর্শস্থানীয়। তন্ময় জিন্দগিতে তিনি মাত্র দু'বার মাতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করেছিলেন বলে লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর জীবনীকার। একটির কথা এইমাত্র বলেছি, সেটি লিখে বাবার ফুরুসং পাননি আব্দুল ফজল ; কারণ তিনি নিজেরই পরোক্ষ-ভাবে ছিলেন সেই ঘটনার মূলে। কিন্তু পূর্ববর্তী ঘটনাটি আব্দুল ফজল সবিস্তারে লিখে গেছেন :

সেবার আগ্রা-কিল্লায় সংবাদ এল পতুগীজ বোম্বেটের দল নাকি পবিত্র কুরান গ্রন্থটিকে একটি কুকুরের গলায় ঝুলিয়ে দমন শহরের পথে পথে দেখিয়ে নিয়ে বেরিয়েছে। শুনেন ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন হামিদা বান্দু বেগম। এর প্রতিশোধ চাই ! পুত্রকে আদেশ করলেন একটি গাধার গলায় একশত বাইবেল গ্রন্থ লটকিয়ে দিয়ে আগ্রা শহরে কোড়ুক বাঘার আয়োজন করতে। সম্মত হতে পারেননি নিরস্তর জাজাল-উদ্দীন আকবর। বলেছিলেন, মা, আমি জেনোঁছি—বাইবেল একটি মহান গ্রন্থ। কতকগুলো আশীর্ষিত পতুগীজ বোম্বেটেদের অবিম্বেকারিতার অপরাধে

আমি সেই পবিত্র গ্রন্থকে অবমাননা করতে পারি না।

সে যাই হোক, নিতান্ত ঘটনাচক্রে—যেন প্রাণ দিয়ে হামিদা বান্দু বেগম জান বাঁচালেন তাঁর নাতির।

পিতামহীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সেলিম নিজেই চলে এল আগ্রায়। প্রকাশ্য দরবারে—দেওয়ান-ই-আমের অলিম্দ্ আসীন বাদশার চরণপ্রান্তে প্রণত হয়ে কমা ভিক্ষা চাইল। অসাধারণ সংঘম বাদশাহ আকবরের। সর্বসম্মুখে কোনোরকম উদ্বেজন্য বহিঃপ্রকাশ হল না। হাজার হোক, এই অপদার্থ পুত্রকেই তো বসিয়ে দিয়ে ক্ষেতে হবে হিন্দুস্থানের তক্ত-তাউসে? মুরাদ ও দানিয়েল তার পুত্রকেই মারা গেছে—অতিরিক্ত মদ্যপান ও অসব্যমী জীবনযাপন করায়। অন্তঃপুরে এসে আকবর আচম্কা ছেলের কাঁধ ধরে ঘুরে দাঁড়ালেন। পিতা-পুত্র দুজনে মদ্যোন্মদ্বি। একেবারে আচম্কা আকবর এই অতকড় জোয়ান ছেলের গালে কষিয়ে দিলেন এক বাদশাহী থাপ্পড়। উন্টে পড়ে গেল সেলিম—ঠিক আঘম খাঁর মতো।

কাঁধের কাছে বাস্কে ধরে আবার দাঁড় করিয়ে দিলেন। কলেন, মনে থাকবে?

সেলিম ভতস্কেণ বাকশক্তি হারিয়েছে।

হিড় হিড় করে ওকে টেনে নিয়ে গেলেন গোসলখানায়। একজন হাকিম, একজন নাপিত ও একজন খিদমদগারের জিম্মায় এই ঘরে আবদ্ধ করলেন শাহজাদাকে। বিশ্বস্ত প্রহরীকে ডেকে কলেন, দশ দিন কারাগার! এর মধ্যে কারও সঙ্গে যেন দেখা সাক্ষাৎ করতে না পারে। খেতে চাইলে খেতে দিও—কিন্তু খবদার! এই দেউরার ভিতর এক ফোটা মদ বা এক দানা আকিং ঢুকেছে খবর পেলে তোমাদের তিনজনকেই হাতীর পায়ের তলায় পিষে ফেলব!

সেকেন্দার মক্কা বানানোর কাজ কিন্তু অগ্রসর হচ্ছে না। কাজ বন্ধুত বন্ধ আছে। দারোদা-ই-ইয়ার প্রতিদিনই আসে সম্রাটের নির্দেশ নিতে, প্রতিদিনই ফিরে যায়। বাদশা বস্ত্র দেখা হয় না। তা তো হবেই। ওদিকে যে ঘনিজে উঠেছে নানান অশান্তি। বাদশা অসুস্থ আর সিংহাসন নিয়ে কুকুরে-লড়াই শুরু হয়ে গেছে সেলিম আর তার জ্যেষ্ঠ পুত্র খসরোর। অমাত্যদের একদল এদিকে, একদল ওদিকে মদ্য জুগিয়ে চলেছে। সুসোগ-সম্মানী খসরুম শব্দ প্রহর পড়েছে।

দুঃখে অনুশোচনার শেষ শয্যা পাঠলেন জালাল-উদ্দীন সাদশা!

কঠিন রোগ-রক্ত আমাশয়।

ওবী-ই-হাজিক হামিক আলি গিল্লি চেঁটার দুটি করেননি। কিন্তু পারলেন না।

সেলিম এসে দাঁড়ালেন মৃত্যুপথযাত্রী পিতার শিয়রে।

আকবরের প্রায় নির্মীলিত চোখ-জোড়া উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দেহরক্ষীকে বললেন, আমার তাজটা নিয়ে এস, পরিয়ে দাও ওর মাথায়। আমার রাজ-পরিচ্ছদ পরিয়ে দাও ওর অঙ্গে। যাবার আগে দু-চোখ ভরে একবার দেখে যাই—সেখুবাবাকে কেমন মানিয়েছে।

সম্রাটের শেষ আদেশ পালিত হল। অর্ধশয়ান আকবর অতি কষ্টে তাঁর কোমরবন্ধ থেকে টেনে বার করলেন গজদন্তের মূঠ-ওয়াল ম্বর্ণখচিত একটি বাগ-দাদী ছুরিকা। তুলে দিলেন তাঁর সেখুবাবার হাতে। এটি তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন অর্ধ শতাব্দী পূর্বে হুমায়ূনের কাছ থেকে। অক্ষুণ্ণে বনলেন, সেখুবাবা, যে অধিকার তোমাকে দিয়ে গেলাম, দেখ, তার অমর্যাদা যেন না হয়।

পরম শান্তিতে চোখ দুটি বৃজে গেল শাহ-য়েন-শাহ জালালউদ্দীন আকবরের।

সাল-গুজস্তার সাল-তামামি তামাম শব্দ।

আমি ঐতিহাসিক নই। আকবরের যে আলোখ্যটি আমি এঁকেছি তাতে আপনাদের মনে হতে পারে আকবর ছিলেন আদর্শ-পুরুষ—আদর্শ সম্রাট! হয়তো ঠিক মতো বলতে পারিনি—অন্তত সে-কথা আমি বলতে চাইনি। আমি শব্দ বলতে চেয়েছি, আকবর ছিলেন আদর্শ আর্কিটেক্ট! মানুষ হিসাবে তিনি দোষে-গুণে মেশানো। জাহাঙ্গীরের চরিত্রে যে নিষ্ঠুরতার বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখব, হয়তো তার আদিম উৎস জাহাঙ্গীরের পিতৃরক্ত! বাদশাহী খেয়ালে আকবর এমন অনেক কিছুর করেছেন, যাতে তাঁকে আদর্শ ভারত-সম্রাট বলতে বাধে। তা যদি তিনি হতেন তাহলে 'গুংগা-মহল' পরীক্ষার অব্যবহিত পরে তিনি এই দর্শটি শিশুকে বৃত্তি দিতেন—তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন; জ্ঞান-পিপাসুর পক্ষে স্বাভাবিক হত, পরীক্ষাটা চালিয়ে যাওয়া এবং দেখা, পরবর্তী পাঁচ-সাত বছরে নিরন্তর প্রচেষ্টায় মৃক-বধির শিশুদের আবার স্বাভাবিক করে তোলা যায় কি না। তা তিনি দেখেননি। আকবরের মৃত্যুর পর এই গুংগা-মহল থেকে বালকদের উদ্ধার করা হয়, তখন তাদের যথেষ্ট বয়স—অথচ সকলেই মৃক। আকবর হাতীর আমত্ব লড়াই দেখতে ভাল-

বাসতেন। সে-বড় নৃশংস দৃশ্য! কিন্তু আমি তো মানুষ-আকবরকে যাচাই করতে চাইনি—চেয়েছিলাম স্থাপত্য-প্রেমিক আকবরের মূল্যায়ন। নিঃসন্দেহে তিনি তামাম মৃগল-জমানার প্রেষ্ঠ আর্কিটেক্ট! জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি স্থাপত্যে নানান জাতের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গেছেন এবং সাফল্য লাভ করেছেন প্রায় প্রতিবারেই।

শেষ পরীক্ষাটা অবশ্য সমাপ্ত করে যেতে পারেননি।

আকবরের মরদেহ যখন সেকেন্দার অসমাপ্ত মক্‌বারায় সমাধিস্থ করতে আনা হল, তখন সেই ইমারতের মর্মভেদী আত্নাদটা কেউ শুনতে পায়নি!

দক্ষিণ-তোরণটা সদস্যমাপ্ত, নির্মিত হয়েছে মূল ইমারতের প্রধান লিয়ান। আকবরী নির্দেশে তাতে উৎকীর্ণ করা হয়েছে ক্যালিগ্রাফির কাজ। তাতে লেখা হয়েছে : ‘আল্লাহ-হো-আকবর’ এবং ‘জাল্‌লে-জালাল্‌হু’—দীন-ইলাহির শ্বেত পদ্যকার। আশ্চর্য, উৎকীর্ণ হয়নি ইসলামের সেই শাস্বত-বাণী : ‘লা (নাই) ইলাহা (প্রভু) ইল্লা লাহা (প্রভু ভিন্ন) ; নূর-মহম্মদ রসূল-আল্লাহ্’ (জ্যোতির্ময় মহম্মদ সেই আল্লাহ্-র প্রেরিত)।

প্রবেশ-তোরণের ক্যালিগ্রাফিতে সর্বমোট ছাটশটি বাণী—তার প্রথম তেইশটি ঘোষণা করছে সেই মক্‌বারায় চিরশয়ান ব্যক্তিটির জাগতিক পরিচয়, তাঁর জীবনকথা। বাকি তেরটি বাণী ‘শাহী শরিয়তের

তারিকে’ (মহম্মদ-উক্ত ধর্মনির্দেশে) সীমিত নয় ; বিশ্ব-প্রেম-মৈত্রীর কথা, দর্শনের কথা, মর্জির কথা, ভাবের কথা। তাতে আছে সেই সব ইঙ্গিত বা শব্দ পরম্পর হৃদয়ং মহম্মদই দেননি, দিয়ে গেছেন আরও অনেক অনেক মহাপুরুষ : বুদ্ধ, জরথুষ্ট্র, বর্মান মহাবীর, যীশু, এমনকি আচার্য শঙ্করের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত উপনিষদের বাণী। শেষ শ্লোকটা তো নিতান্ত অশ্বত-বেদান্তের নির্যাস :

‘স্বানিচ্ছ হামেগা জহন্-শাদ বাদ

আজ্জু আলম্ কোয়াদাস আবাদ বাদ।’*

ভাষান্তরে যার মূল কথা পাওয়া যাবে ঐশোপ-নিষদে :

‘অগ্নি নয় সুপথ্য রায়ে অস্মান

বিস্বানি দেব বয়ুনানি বিস্বান্।

যদুযোধস্মজ্জুহুদ্রাগমেনো

ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম ॥†

□

* তাঁর (কবরস্থ ব্যক্তির) জীবাস্থা সেই বিশ্বস্ততার পরমাত্মার বিলীন হয়ে যাক। সব মালিন্য দহন করে তাঁর উপাস্বিত্তিতে দ্যালোক উজ্জ্বল হয়ে উঠুক ॥

† ‘হে অগ্নি! তুমি আমাদেরকে সুপথে লইয়া যাও। হে দেব! তুমি আমাদের সকল কর্মই জান ; আমাদের অপকারী পাপ-সমূহ বিদূরিত কর। আমরা তোমাকে বারংবার প্রণাম করিতেছি।’

জাহাঙ্গীর

ঘটনা	সময়কাল	ঘটনা	সময়কাল
সেলিমের জন্ম 1569	সেকেন্দ্রায় আকবর-সম্মাধি সমাপ্ত 1612
মেহেরউল্লিসার জন্ম 1576	আনারকলির সম্মাধি নির্মাণ 1615
সেলিম ও মানসিংহ (উমরসিংহের কন্যা) বিবাহ 1585	খস্রোকে হত্যা 1622
সেলিম ও মানসিংহ (উমরসিংহের কন্যা) বিবাহ 1586	জাহাঙ্গীর-জননীর সম্মাধি-নির্মাণ (সেকেন্দ্রায়) 1623
মেহেরউল্লিসার প্রথম বিবাহ (শের আফকন) 1592	নুরজাহাঁ কতৃক ইতমদ্-উদ্দৌলা	
খস্রোকের জন্ম (মাতা মানসিংহ) 1592	নির্মাণ 1624-28
সেলিমের অভিষেক 1605	খস্রোকের বিদ্রোহ 1624-25
শের আফকনকে হত্যা 1607	জাহাঙ্গীরের মৃত্যু 1627
নুরজাহাঁক বিবাহ 1611	জাহাঙ্গীর-সম্মাধি নির্মাণশেষে নুরজাহাঁর মৃত্যু 1645

জাহাঙ্গীরের আমলে নির্মিত মৃগল-স্থাপত্যের মূল্যবানে ঐ বাদশাহ-র জীবনী বিস্তারিত আলোচনা করা নিম্প্রয়োজন। স্থাপত্য-বিষয়ে তিনি ছিলেন উদাসীন। ওটা বদ্বতেন না। তবু তাঁর আমলে নির্মিত দুটি স্থাপত্য-কীর্তি আমাদের খুঁটিয়ে দেখতে হবে : আকবরের সম্মাধি এবং ইতমদ্-উদ্দৌলা।

জাহাঙ্গীর ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর। যে অপরাধে তিনি তাঁর পিতার হাতে একটি চড় খেয়েছিলেন এবং দর্শাদিনের জন্য সংকট জীবন-সাপনে বাধ্য হয়েছিলেন, ঠিক সেই অপরাধে তিনি পুত্রকে অন্ধ করে দেন ; এবং মরণান্তিক যন্ত্রণা দেবার পর। বিদ্রোহী পুত্র খস্রোর অন্ডচরদের যে নৃশংস-পন্থাতিতে তিনি হত্যা করেছেন তাতে তাঁকে স্যাঁতস্টি ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। একটি মৃত ঘাড় আর একটি মৃত গাধার ছাল ছাড়িয়ে তার ভিতর তাঁর বিদ্রোহী পুত্রের দুই সেনাপতিকে ঢুকিয়ে দিয়ে সেগাই করে দিয়েছিলেন। তারপর শোভাযাত্রা করে সেই বীভৎস-দৃশ্য আগ্রা শহরের মানুষজনকে দেখিয়েছিলেন। কীভাবে রুম্মশ্বাস দুটি মানব কাঁটা-মাংসের গন্ধে আকর্ষণ উৎকট বিষাক্ত বাতাসে জীবনের শেষ নিশ্বাস নিতে নিতে মৃত্যু বরণ করছে ! খস্রোর সাতশত অন্ডচরকে তিনি শৃঙ্গে দিয়েছিলেন। দুই সারি শৃঙ্গবিন্ধ্য মৃন্ময় সহকর্মীর মাঝ-

খান দিয়ে খস্রোকে শোভাযাত্রা করে যেতে হয়েছিল দৃষ্টিশক্তি খোয়াবার পূর্বে। বন্ধুদের যৌথমৃত্যু দর্শন করানোর পর সম্মাটের আদেশে তাকে অন্ধ করে দেওয়া হয় ! পুত্রের প্রতি পিতার এ নিষ্ঠুরতা ইতিহাসে দুর্লভ !

দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষের—জাহাঙ্গীর পুত্র খস্রো এবং শাহজাহাঁ-তনয় দারাশুকো হিন্দুস্থানের তক্ত-তাউসে আসীন হননি। হলে, হয়তো আকবরের স্বপ্ন সফল হত, এবং মৃগল গৌরবসূর্য এত দ্রুত অস্তমিত হত না।

শের আফকনকে হত্যা, তার বেগমকে মৃগল-হারেমে নিয়ে আসা এবং বিবাহ করার পিছনেও দীর্ঘ ইতিহাস। প্রচলিত কাহিনী বলে, সেলিম মেহেরউল্লিসাকে কুমারী অবস্থায় দেখেছিলেন, আকৃষ্ট হয়ে-ছিলেন এবং বিবাহে আগ্রহী হয়েছিলেন। আকবর সম্মত হননি, কারণ বাদশাহ জানতেন শের আফকনের সঙ্গে ঐ কুমারী কন্যার বিবাহ ইতিপূর্বেই স্থিরীকৃত হয়েছে। মেহেরউল্লিসার পিতা ও ভ্রাতা যথাক্রমে মিজাঁ গিয়াস উদ্দিন মৃহুম্মদ বেগ এবং আসফ খাঁ সে-আমলেই ছিলেন আকবরের রাজসভার দুই বিশিষ্ট অনাত্য। আকবরের জীবিতকালে সেলিম কোনো উচ্চবাচ্য করেনি ; কিন্তু মসনদে উঠে বসার মাত্র দু-

বছরের মধ্যেই সে শের আফকনকে হত্যা করায় এবং মেহেরকে নিজের হারেমজাত করে।

অনেক ঐতিহাসিকের মতে এসব গল্পকথা। কিন্তু কয়েকটি সঙ্গত প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তরও তাঁরা দিতে পারেননি।

এক : শের আফকন ছিলেন বর্ধমানের জায়গীরদার। তাঁর হত্যার ঘটনা অত্যন্ত রহস্যজনক। জাহাঙ্গীর নিয়োজিত সুবেদার কুৎবউদ্দীন বাদশাহী নির্দেশে একটি তদন্ত করতে বর্ধমানে আসে এবং শেরকে ডেকে পাঠায়। ইতিহাস বলছে, এই তদন্তে কুৎবের শিবিরে শের উপস্থিত হওয়ামাত্র বিনা প্ররোচনায় কুৎবের নির্দেশে একাধিক ঘাতক শেরকে বোধ আক্রমণে নিহত করে। শের আফকন বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন এমন একটি ইঙ্গিত কেউ কেউ দিয়েছেন—সেটা তদন্ত করতেই নাকি সুবেদার কুৎব-এর আগমন। তাহলে অভিযুক্তের উপস্থিতিমাত্র কেন কুৎবের নির্দেশে চার-পাঁচজন রক্ষী শেরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে হত্যা করবে? তদন্তকারী অফিসারের এ-জাতীয় আচরণের একটি ব্যাখ্যাই বোধহয় সম্ভবপর : সেটাই ছিল বাদশাহী নির্দেশ। প্রকাশ্যে না হলেও, গোপনে। না হলে, এ অপরাধে পরে কুৎবের গদান্না যেত ; অন্যতর বিচার হত। আরও লক্ষণীয়, শেরের ‘ষড়যন্ত্র’টা যখন অপ্রতিষ্ঠিত, অনুমান-নিষ্ঠার, তখন বাদশাহের এ-জাতীয় গোপন নির্দেশের হেতুও একটিই হতে পারে : মেহেরউল্লিসাকে দখল করা!

দুই : যদি ধরে নেওয়া হয় যে, বাদশাহী গোপন নির্দেশে এই হত্যাকাণ্ড অনুরূপিত হয়নি, অর্থাৎ কুৎবের অবিম্ভ্যকারিতা, ব্যক্তিগত আক্রোশ বা অন্য কোনও কারণে এ দৃষ্টানা ঘটে থাকবে এবং জাহাঙ্গীর তাকে ক্ষমা করলেন, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই আমরা আশা করতে পারতাম নিহত জায়গীরদারের বিধবা সসম্মানে তার পিতার আলয়ে নীত হবে। অথচ তা হল না! মেহেরের পিতা মির্জা গিয়াস্ ও ভ্রাতা আসফ খাঁ দ্বজনেই অত্যন্ত সম্মানিত অমাত্য : তাঁদের অর্থাভাব নেই, কন্যার প্রতি কোন কারণে মির্জা গিয়াস্ বিরূপ ছিলেন না। তাহলে সেই বিধবা কন্যাকে কেন মির্জা গিয়াস্ নিজ আশ্রয়ে নিয়ে আসতে পারলেন না?

তিন : ইতিহাস আরও বলছে, মৃগল হারমে এসে পরো চার বছর মেহেরউল্লিসা সম্রাটকে বিবাহ করতে স্বীকৃত হয়নি। বারে বারে সে জাহাঙ্গীরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। এজন্য জাহাঙ্গীর নানা-

ভাবে মেহেরকে মানসিকভাবে পীড়িত করেন। এ-থেকে একটিই সিদ্ধান্ত আসা যায় : মেহেরউল্লিসা জাহাঙ্গীরকে স্বামীহস্তা বলে চিহ্নিত করেছিল। না হলে দীর্ঘ চার বছর সে এভাবে জাহাঙ্গীরকে প্রত্যাখ্যান করত না। অপরপক্ষে, বাস্তবে বন্দি নী না হলে সে মৃগল হারমে ভাগ করে পিতার আলয়ে চলে যেত।

সূত্রাং মহাপণ্ডিত ঐতিহাসিকেরা বেকখাই কলন, কিছতেই মেনে নিতে পারা যায় না যে, শের আফকনের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জাহাঙ্গীরের সম্পর্ক নেই। ভাষান্তরে শের আফকনের দুর্ভাগ্যের মূল হেতু তার বেগমের প্রাক-বিবাহ জীবনের ঘটনা!

জাহাঙ্গীর দিনপঞ্জিকা লিখতেন। তাতে দেখছি, খুর্রম (ভাবিষ্যৎ শাহজাহাঁ) তার দাদা অশ্বখসরোকে হত্যা করেছে জানতে পেরে জাহাঙ্গীর বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। খসরোর মৃত্যুর তারিখটুকু শব্দে দিনপঞ্জিকায় উল্লিখিত হয়েছে।

মদ ও মেহেরউল্লিসার প্রতি জাহাঙ্গীরের আসক্তি প্রায় কিংবদন্তীর পর্যায়ে। আগ্রা-কিল্লায় জাহাঙ্গীরী-মহলের সম্মুখে রাখা একটা প্রকাণ্ড পাথরের চৌকোটা দেখিয়ে গাইডরা আজও বলে, সেটাকে মাদিরায় পুণ্ড করি জাহাঙ্গীর নাকি আকণ্ঠ ডুবে থাকতেন! হয়তো কথাটা বিশ্বাস্য নয়, কিন্তু রাজকাণ্ডের ব্যবসায় দারদারিৎ নুরজাহাঁর উপর ন্যস্ত করে তিনে যে মাদিরা ও অহিফেনের নেশায় বৃন্দ হয়ে পড়ে থাকতেন এটা ইতিহাস-স্বীকৃতই শব্দ নয়, তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে।

গৃহের মধ্যে মিনিয়চার মৃগল-পেন্টেন্স্ জিনিসটা তিনি ভালবাসতেন। ওটা সতাই বুঝতেন।

জাহাঙ্গীরী-জমানায় প্রথম স্থাপত্য-কীর্তি—আকবরের অসমাপ্ত সমাধিসৌধ সম্পূর্ণ করা। এটি একটি বিতর্কিত বিষয়। বিভিন্ন পণ্ডিত এ-বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। অনেকে এ-স্থাপত্যের অবিমিশ্র প্রশংসাও করেছেন। আমরা তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারছি না। যেটুকু বিষয়ে প্রায় সকলে একমত প্রথমে হাইপোথিসিস্-রূপে তা দাখিল করা যাক :

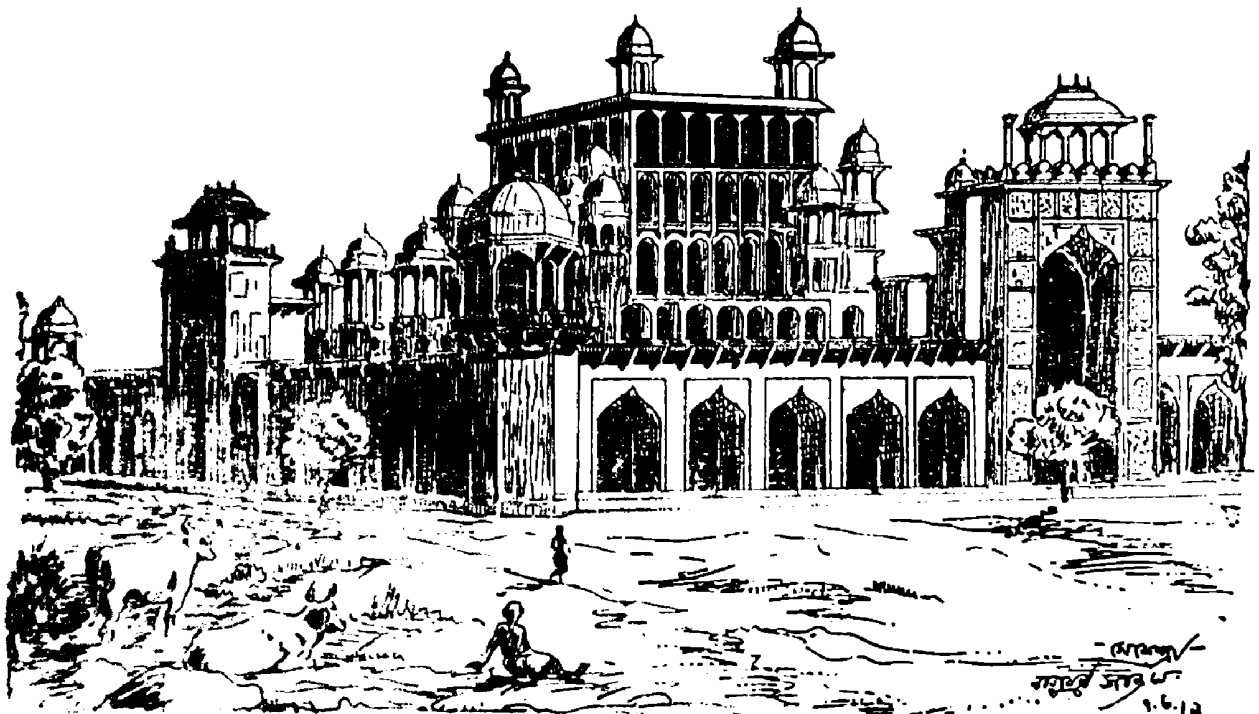
আকবরের সমাধি, নেকেন্দ্র : এ-ইমারতের মূল লক্ষ্যনিং যে আকবর-বাদশাহ্-র এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তিনি কাজ শুরু করেছিলেন, কিন্তু শেষ করে যেতে পারেননি। এটা ঐতিহাসিক সত্য। বাকিটা শেষ করেন জাহাঙ্গীর 1605 থেকে 1612-র ভিতর। প্রশ্ন হচ্ছে দুটি। প্রথমতঃ কতটুকু আক-

যরী-জমানার সমাপ্ত? দ্বিতীয়তঃ, যাকি অংশের কতটা আকবরী পরিকল্পনা-মতোবেক (চিত্র—10.1)।

আকবর বাগিচার ভূমি-নকশা (লে-আউট) সমাপ্ত করেন, দক্ষিণ-তোরণ নিশ্চয়ই শেষ করে যান। অপর তিনটি তোরণ-প্রতিম ইমারৎও খুব সম্ভবত তাঁর আমলে নির্মিত। মূল সমাধিমন্দিরের একতলাও তাঁর তৈরী। যাকিটা জাহাঙ্গীরী-জমানায়।

বিভক্ত দ্বিতীয় প্রশ্নটা আরও জটিল : মূল পরিকল্পনা জাহাঙ্গীর কতদূর অনুসরণ করেছেন? এ নিয়ে পূর্বসূরী স্থপতি-সমালোচকেরা খুব বেশি বিচার করেনি। যতদূর জ্ঞান, এ দৃষ্টিকোণ থেকে

কিন্তু প্রাথমিক পরিকল্পনা যার, শেষ দিকের সমাপ্ত ইমারৎ তো তাঁর স্বাক্ষর বহন করে না? সম্ভবতঃ পিতৃদেহের পরিকল্পনা এতই বৃহৎ ও ব্যয়বহুল ছিল যে, তা অনুসরণ করবার মতো হিম্মৎ, মানসিকতা ও অধ্যবসায় জাহাঙ্গীরের ছিল না। বাবুর-বাদশাহ্ মৃত্যু, শয্যা পত্রের প্রতি যে আদেশ করেছিলেন তা হুমায়ূন মেনেছেন জীবন দিয়ে। আর মৃত্যুশয্যা আকবর-বাদশাহ্ পত্রের প্রতি যে আদেশ করেছিলেন জাহাঙ্গীর তা মানলেন আড়ম্বর দিয়ে। মসনদে উঠে তিনি আখ্ৰা-কিল্লা থেকে যমুনা-তক্ বদলিয়ে দিলেন একটি ধাতব-শৃংখলে অসংখ্য ঘণ্টা; ঘোষণা করলেন :



চিত্র—10.1 সেকেন্দার আকবরের সমাধি (স্কেচ)।

এই সৌধের বিশ্লেষণ আরো করা হয়নি। কিন্তু প্রশ্নটা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। কারণ গোটা ইমারতে একটা বিসদৃশ স্থাপত্য-বৈপরীত্য বিদ্যমান।

সম্পূর্ণ ইমারতের নকশা ও নির্দেশ-সম্বন্ধিত কাগজপত্র এবং সম্ভবত কাঠের তৈরী মিনিয়চার-মডেল নিশ্চয়ই হস্তগত হয়েছিল জাহাঙ্গীরের। কিন্তু সেভাবে ইমারতটি যে শেষ হয়নি এ প্রায় নিঃসন্দেহে ধরে নেওয়া চলে। আকবরই মারা গেছেন কিন্তু তাঁর স্থপতি ও নকশাবিশেষরা নিশ্চয়ই যথাল তবিলতে হাজির ছিল। তাহলে জাহাঙ্গীর নিজের বৃদ্ধি খাটাতে গেলেন কেন? নিজের বৃদ্ধি? না-ও হতে পারে।

যে-কোন প্রজা এই ধাতব ঘণ্টায় নিনাদ তুলে সুবিচার দাবী করতে পারবে। তদানীন্তন ভারতবাসীর স্বেচ্ছাও একটার বেশি মাথা ছিল না। ফলে, তারা ঘণ্টা বাজায়নি, নির্বিচারে অনশনাক্রান্ত প্রজার দল খাজনা দিয়েছে, নজরানা জুগিয়েছে—জাহাঙ্গীরের নিদ্রায় তারা ব্যাঘাত বটায়নি।

আমাব বিশ্বাস : 1605 সালের পর স্থপতি ও কারিগরের বদল হয়েছিল। শিল্পী বদল না হলে নিচের তলা এবং উপর তলায় দৃষ্টিভঙ্গির এতটা পার্থক্য হত না। এতটা বৈপরীত্যের অর্থ : সম্ভবত জাহাঙ্গীর নিজ বৃদ্ধি বিবেচনামতো দায়সারাভাবে কাজ সেরে

পিতৃশ্রম থেকে মৃত্যু হতে চান। তাই এ স্থাপত্য-কীর্তির নিম্নাংশে ও উর্ধ্বাংশে ফারাক আসমান-জমীন! আর তাই আজ এই সৌধের সম্মুখে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে ভাবতে থাকি—ঐ শীর্ণকায় স্তম্ভ-শোভিত বামনাকৃতি ‘সুপারস্ট্রাকচার’ের জন্য এত সুদৃঢ় ভিত আর বনিয়াদ কেন? আর সবার উপর প্রশ্ন : ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যের আৱশ্যিক অঙ্গ গম্বুজটা কোথায় হারিয়ে গেল?

তাই বলি : আকবর বানিয়েছেন একতলা (1598-1604) এবং জাহাঙ্গীর বাকি চার তলা (1605-1612)। সর্বোচ্চতলটি সাদা মর্মরের; সেখানে জালিকাজের আধিক্য। প্রাচীরের চার প্রান্তে চারটি ছতী—সেগুঁলি ফতেপুর-সিক্তির দেওয়ান-ই-খাশের অনুসরণে। নিচের তিনটি তলায় সারি সারি সরু সরু স্তম্ভ, যার জন্য নিম্নাংশের দৃঢ় বনিয়াদ নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। আর নিচেরকার দৃষ্টি তলাতেই আছে সারবন্দী ছতী। বেশ বোঝা যায়, গম্বুজতবা আলী-সাহেব বর্ণিত ‘আর্কি-টেক্টোনিক মহিমা’ এখানে এসে হাজির হয়েছিল সৌধ নির্মাণের প্রথম পর্যায়ে; আর তারপর কখন-জানি আদাব জানিয়ে নিঃশব্দ চরণে সে নেপথ্যে সরে গেছে!

প্রশ্ন হচ্ছে, আকবর জীবিত থাকলে কী-ভাবে সেই মহিমাকে এই স্থাপত্য-কীর্তিতে শাস্বত আসনে অধিষ্ঠিত করতেন? সেটা আন্দাজ করা প্রায় অসম্ভব। দেখছি, ফাগুঁসন, হ্যাভেস, পার্সি ব্রাউনের মতো বিদগ্ধ পণ্ডিতও সে-কথা আন্দাজে বলতে চাননি। হয় সে প্রসঙ্গ আদৌ উত্থাপন করেননি, অথবা কৌশলে এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু আমাদের একটি সুবিধা আছে। আমরা বিদগ্ধ পণ্ডিত নই, এসেছি আনন্দ আহরণে। তাই আমরা বিচার করে দেখতে পারি, যুক্তি-নির্ভর সিদ্ধান্তে সেই আকবর-কল্পিত ইমারতের ছবিটা কতদূর আঁকা যায়।

(i) ফাগুঁসনের বিশ্বাস, এ-ইমারতের শীর্ষদেশে ইন্দো-ইসলামী ঐতিহ্য স্বীকার করে একটি গম্বুজ বসানোর পরিকল্পনা ছিল আকবরের। তাঁর কালজয়ী গ্রন্থে^১ ফাগুঁসন ছবিতে ফুটকি চিহ্ন দিয়ে গম্বুজের সম্ভাব্য আকৃতিটাও দেখিয়েছেন। কেন্দ্রস্থ কক্ষের বনিয়াদ সোচ্চারে ঘোষণা করছে অমন একটি প্রকাণ্ড গম্বুজের ভারবহনে সে সক্ষম। সুতরাং গম্বুজ একটা হতই। কিন্তু কী জাতের? না, তাজমহল ‘পেন্সাজী-গম্বুজ’ নয়। সেটা কল্পনা করলে তাজমহল ‘ডোম-ডিজাইনারের’ প্রতি—তা তিনি ঈশা অফান্দিই হোন অথবা উস্তাদ আহমেদই হোন—অবিচার করা হবে।

আকবর-সামলে মৃগল-শৈলীতে ‘পেন্সাজী-গম্বুজ’ রাজধানীতে নির্মিত হয়নি। সম্ভবত সে-জনই ফাগুঁসন গম্বুজটাকে ‘পেন্সাজী ডোম’ (Bulbous dome—বা একটা গোটা পেন্সাজের মতো প্রথমে বাইরের দিকে ঝুঁকে তার উর্ধ্বমুখী বাত্মা সরু করে) আঁকেননি; একেছেন হুমায়ুন-মক্‌বারা অথবা সেলিম-চিস্তির দরগাহ গম্বুজের অনুসরণে। আমরা কিন্তু তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারলাম না! আমাদের মতে, গম্বুজটার প্ল্যান গোলাকৃতি হত না আদৌ, হত আয়তক্ষেত্র। কেন? সেটা আলোচনা করব ইতমদ্-উদ্দৌলা দেখবার সময়।

(ii) হুমায়ুন-মক্‌বারার একতলায় চারটি কোণ ছেঁটে ফেলা হয়েছিল, পরিত্যক্ত ডিগ্রি কোণ রচনা করে। সেই ছন্দটা আকবর মেনে চলেছেন এই সৌধের প্রধান প্রবেশ-তোরণে। সেখানে তিনি একই কল্পদায় চারটি কোণা ছেঁটে ফেলেছেন। কিন্তু মূল সৌধের চারটি কোণা ছেঁটে ফেলা হয়নি। লক্ষণীয় বৈরামপুর আবদুর রহিম খান-ই-খানানের মক্‌বারাতেও (চিত্র—9.25) আকবর চারটি কোণা ছেঁটে ফেলেননি; কিন্তু তাজমহল পরিকল্পনাকার এ-বিষয়ে হুমায়ুন-মক্‌বারার ছন্দটি গ্রহণ করেছেন। আকবর এখানে চারটি প্রান্তে বাসিয়েছেন অত্যন্ত দৃঢ়মূল প্রকাণ্ড চারটি ক্যাস্টল। অষ্টভুজাকৃতি এবং বিশেষভাবে লক্ষণীয়, লাইন ছাড়া। কেন? এই অশুভ বৈচিত্র্য কেন করা হল? জাহাঙ্গীর দেখছি, জবাবে কলতে চেয়েছেন : ওদের মাথায় চার-চারটি বামনাকৃতি অতি হালকা ধরনের ছতী বসাতে। বে-শরম কি বাতে! কিল্লার চারপ্রান্তে আকবর-বাদশাহ্ চার-চারটে কামান বসালেন মছড়-বংশ ধ্বংস করতে! তাহলে?

একটিই জবাব :

এ সমস্যার মূর্তিমান সমাধান দক্ষিণ-প্রবেশমুখে। আকবর যেন সেই গৃহচূড়ার দাঁড়িয়ে আশ্মানের দিকে দুই বাহু উৎক্লিষ্ট করে তাঁর প্রাণের আবেগ জানাচ্ছেন—এ সমাধান কেন কেউ দেখতে পেল না!

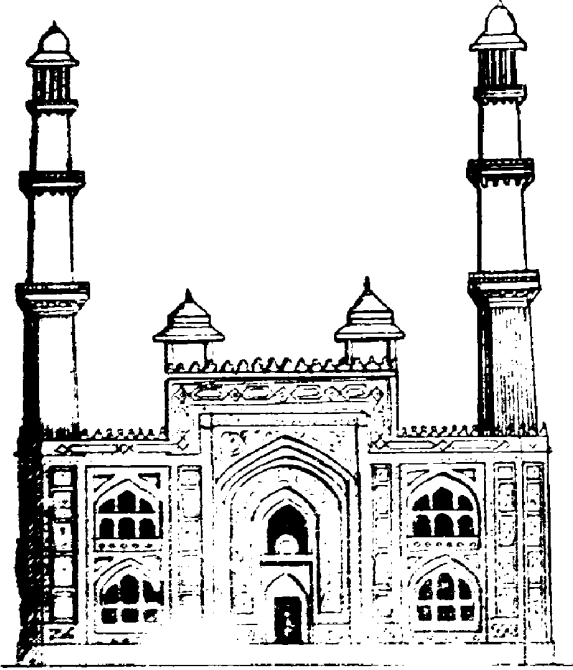
এ সমাধান নজরে পড়েন স্থলদৃষ্টি জাহাঙ্গীরের, কিন্তু পড়েনি তাঁর বেগম ফার্সী-কবি নুরজাহার! কেন, তা পরে বলছি।

লক্ষ্য করে দেখুন, দক্ষিণ প্রবেশ-তোরণে আকবর-বাদশা একটা অশুভ আবিষ্কার করে বসে আছেন। এ জিনিস উত্তর-ভারতে ছিল না, বহিঃ দক্ষিণ-ভারতে ছিল। আকবর যেন পথের বাঁকে পরেজন্মের মতো আচমকা কড়িয়ে পেরেছেন একটি পরশ-পাথর! পার্সি

গাউন বসেছেন, “এই নবাবিস্কৃত অলংকার মধ্যে আবির্ভূত হল চড়ান্ত সাফল্য সমন্বিত হয়ে।”

আমি ঐ মিনারিকা-চতুষ্টয়ের কথা বসছি (চিত্র—10.2)।

আদি কবি যেমন ‘মা নিষাদঃ’ শ্লোকটি মৃদুগয় ধরে তমসা নদীর তীরে ক্রমাগত পদচারণা করছিলেন আর চিন্তা করছিলেন ঐ অমূল্য ‘হৃদবন্দ্য-পদ’-এর সার্থক প্রয়োগ হতে পারে কোন মহামানবের কীর্তিকাহিনী বর্ণনায়, ঠিক তেমনি ঐ পরশপাখরটা জেবের ভিতর নিয়ে আকবর-বাদশাহ ও বোধকরি বহু বিনিমুরজনী যাপন করেছেন খোয়াবগাহ-র সম্মুখস্থ অলিন্দে



চিত্র—10.2 সেকেন্দ্রা মক্বারার প্রধান-ভোরণ, সম্মুখদৃশ্য।

অশান্ত পদচারণা। সম্ভবতঃ স্থাপত্যে একটি সন্তকান্ড রামায়ণ রচনার সিদ্ধান্তে এসেই আকবর তাঁর নির্মাণরতান সমাধিসৌধের চার প্রান্তে চারটি দৃঢ়মূল অষ্টকোণাকৃতি ক্যাপিটল পেপে তোলেন। আকবর-বাদশাহ আর এক দশককাল জীবিত থাকেন হঠাৎ আমরা ঐ সমাধিসৌধের চার প্রান্তে চারটি মিনারিকা দেখতে পেতাম—যার পূর্ণ বিকাশ দর্শন করে যুগে যুগে আমরা সত্যের জানাই তাজমহল-পরিকল্পনা-করকে। তবুও বাক্যে পেরেছিলেন তাঁর পত্রকাদ। কবি তিনি; তাই শব্দায়ের ঐ আকস্মিকতা দর্শনে পেরেছিলেন এবং বার বার কাজে ও লাগিয়েছেন আশায় এবং লাহোরে : পিতার, স্বামীর এবং নিজের

সমাধিসৌধে। প্রাক-তাজমহল যুগের এ তিনটি ইমারতেই আছে মিনারিকা-চতুষ্টয়।

(iii) হুমায়ুন-মক্বারার প্রথমতলায় বৈচিত্র্য নেই, যতিচিহ্নহীন একটানা পর পর সতেরোটি খিলান। মিতলে নির্মিত হয়েছে প্রকান্ড খিলান-সম্মিলিত ইবানটি। তুলনায় আকবর একতলার কেন্দ্রস্থলে একটি সুস্পষ্ট যতিচিহ্ন রেখেছেন; গড়েছেন জমিন-সই সুবহু ইবানটি। আর তার এক-এক পাশে পাঁচটি করে খিলান। আরও লক্ষ্য করে দেখুন—হুমায়ুন-ইবানে বৈচিত্র্য আনা হয়েছে শুধুমাত্র রঙের ফেরতাইয়ে, সাদা-মার্বেলের পাশে লাল-পাথরের বৈপরীত্যে, তার মাথায় দু-প্রান্তে দুটি তল্বী ছত্ৰী; ইবানের ফোকর দিয়ে দেখা যায় তিন-তিনটি খিলান। অপরপক্ষে আকবরী-ইবানে একঘেরোমি বিদূরিত হয়েছে জ্যামিতিক নকশার বৈচিত্র্যে, এক এক খোপে এক এক জাতের ডিজাইন। তাদের আলিম্পন-চাতুর্ষ্য এত বেশি নয় যে, চোখ পীড়িত হবে; এত কম নয় যে, একঘেরো লাগবে। ইবানের মাথায় একটিমাত্র চবুতরা—সেটা গোলাকৃতি নয়, আয়তক্ষেত্র এবং তিন তিন খিলান-সম্মিলিত—যেমন দেখেছি ফতেপুর-সিক্রিতে, রাজস্থানে এবং গুজরাটের হিন্দু-শৈলীতে। সেই ইবানের ফোকর দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটিমাত্র ছোটমাপের খিলান, যেমনটি দেখেছিলাম বুলন্দ-দরওয়াজায়। হুমায়ুন-মক্বারায় প্রথমতলের উচ্চতা ছিল 6.71 মিটার, আকবর সেটাকে বৃদ্ধি করেছেন প্রায় দেড়গুণ—9.14 মিটারে।

অনুমান করতে অসুবিধা হয় না—আকবর বৃহত্তর কিছু গড়তে চেয়েছিলেন। তাই ঐ সুদৃঢ় শিল্প; তাই ঐ সুদৃঢ় বনিয়াদ! এবং ইমারৎ যেন হুমায়ুন-মক্বারার প্রতিচ্ছায়া না হয়, যেন স্বকীয় মহিমায় রূপান্তরিত হয়ে ওঠে এ-বিষয়েও তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।

(iv) মূল সৌধে মিতল-গিতলে বাস্তু-নকশা বা প্ল্যান কেমনতর হত, সেটা আন্দাজ করা নিতান্ত অসম্ভব। শুধু অনুমান করা যায়, তা পারসারীতি-সঙ্গত বাস্তব-কেন্দ্রিক হত না, অর্থাৎ হুমায়ুন-মক্বারা যেমন নয়টি বস্ত, তাজমহল যেমন পাঁচটি বস্তকে মূল-ধন করে গড়ে উঠেছে, তা কিছুতেই হত না। প্ল্যান হত ভারতীয় ঢঙ, আরও সুনির্দিষ্টভাবে—ইন্দো-ইসলামী শৈলীতে; অর্থাৎ তার প্ল্যানিং-এর গোষ্ঠাটী-গোমুখে থাকত সরল-রেখায় বিধৃত কোনও জ্যামিতিক ছক। বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র, ষড়্ভুজ, অষ্ট-ভুজ। এ অনুমানের পিছনে যদিও একটাই—দীর্ঘ স্থাপত্য-জীবনে আকবর ঐ নীতিই বরাবর অনুসরণ

করে এসেছেন। যেমন ধরুন, খান-ই-খানান মক্‌বারা। এই স্থাপত্য-কীর্তি তাজমহল পরি-কল্পনাকারকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। আপাতদৃষ্টিতে, অর্থাৎ সম্মুখদৃশ্যে ঐ দৃষ্টি সৌধের—খান-ই-খানান মক্‌বারা এবং তাজের সাদৃশ্য বতই থাক, তাদের প্ল্যানিং-এর মৌল ছন্দ ভিন্ন মার্গের। যে-কোন দর্শক মনে করবে, (চিত্র—9.25) এর প্ল্যানিং মূলেও বৃষ্টি আছে পাঁচটি বস্তু—কিন্তু তা বাস্তবে নেই। যে-কোনো 'একক'কে মডুল ধরে পাঁচটি বস্তুর সাহায্যে ঐ পঞ্চ-বস্তু প্রতিম বাস্তু-নকশাটিকে বাঁধতে যান, পারবেন না। ও গড়ে উঠেছে সরলরেখার সমাহারে, বর্গক্ষেত্র থেকে।

(v) এবার প্রশ্ন হতে পারে, বাস্তু-নকশা না হয় আন্দাজ নাই করা গেল, ওর 'ফাসাদ' বা সম্মুখদৃশ্য কী-ভাবে পরিকল্পনা করেছিলেন মূল পরিকল্পনা-কার? সেটাও ধারণার বাইরে। আন্দাজেও কোন ইঙ্গিত দেওয়া অযৌক্তিক, অশোভন হবে। বোধকরি এটুকুই সাহস করে কলা চলে—যা হয়েছে, তা নয়! জাহাঙ্গীরী-কল্পনায় যে সারি-সারি সরু-সরু স্তম্ভের উপর গোলাকার ছত্রী রূপায়িত, তা ছিল না আকবরের সন্দের চিন্তাতেও। এ-কথা কলতে সাহস পাচ্ছি এজন্য যে, লক্ষ্য করে দেখুন—দক্ষিণাদিকের মূল প্রবেশ-তোরণে এবং পূর্ব ও পশ্চিমের দরওয়াজা-প্রতিম ইমারতে (উত্তরাদিকেরটা ভেঙে গেছে) ঐ ধরনের গোলা-কৃতি ছত্রী একটিও নেই। সর্বক্ষেত্রেই বর্গক্ষেত্র (ছজ্জা-সমন্বিত স্তম্ভচতুষ্টয়ের উপর স্থাপিত) অথবা আয়ত-ক্ষেত্র (সেক্ষেত্রে ছজ্জা-সমন্বিত আটটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত)। তার উপর ছত্রীসুলভ ছোট গম্বুজ কোথাও নেই, আছে হিন্দু-স্থাপত্যের কর্বেলিঙ-করা শিখর—যা দেখেছি যোধপুরে, বিকানিরে, গুজরাটে, অম্বরে, যা হিন্দু-ভারতের একান্ত সম্পদ, এবং যা ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যে প্রথম সলজ্জ পদক্ষেপ করেছিল আগ্রা-কিল্লায়, জাহাঙ্গীরী-মহলের চারচালা ছাদে। এবং যেটি অতি সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছে পরের দশকে, জাহাঙ্গীরী-জমানাতেই, ইতমদ্‌উদ্‌দৌলার কেন্দ্রীয় গম্বুজে।

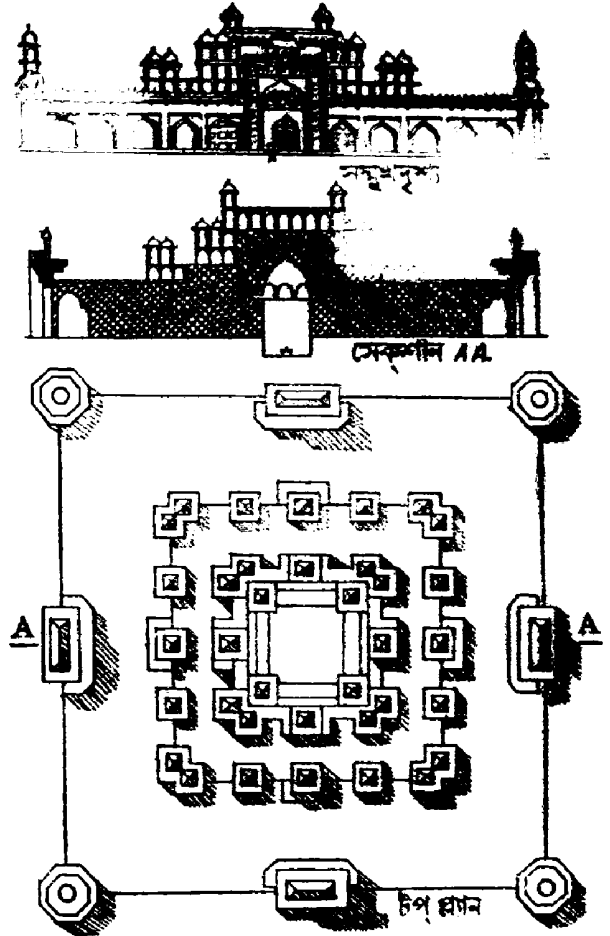
এজন্যই আপদাজ করছি, হয়তো মূলসৌধের প্রধান গম্বুজটি ফাগুর্সন অনর্মিত গোলাকার হত না, হয়তো হত আয়তক্ষেত্র।

ইতমদ্‌উদ্‌দৌলা : প্রায় দশ বছর পরে সম্রাজ্ঞী নূরজাহাঁ নির্মাণ করালেন আগ্রার যমুনা পুলিনে পিতা-মাতার সমাধিসৌধ : ইতমদ্‌উদ্‌দৌলা।

জাহাঙ্গীর

সেটি ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্য। একটি হাইকেন-চিহ্ন। সত্তমলক্ষ্যমণী। গগনের অঙ্গরে এতক্ষণ যেন বিশুদ্ধ ধূপদ-খামার চলাছিল, যেন কর্মকর্তার শিখর করেছেন এবার ঠারীর জরাটি অঙ্গর কসে। তাই দৃষ্ট মেনাজ্জী সুরসাধনার মাঝখানে, কীর্তিকালে, নূরজাহাঁ একটি আবেগময়ী ভজন গাইতে বসেছেন!

আকবরী-জমানার স্থাপত্য ছিল—স্ফটিক মতই—হাল্লেড পার্সেন্ট পূর্বব! বৃক্ষক, কবারক, আকান্দ-লম্বিত বাহু, শালপ্রাংশু। তার কল্পনা—কাজিরে,



চিত্র—10.3 সেকেন্দ্রা মক্‌বারার উপর-থেকে-লো-বাস্তু-নকশা, সেকশন ও সম্মুখদৃশ্য।

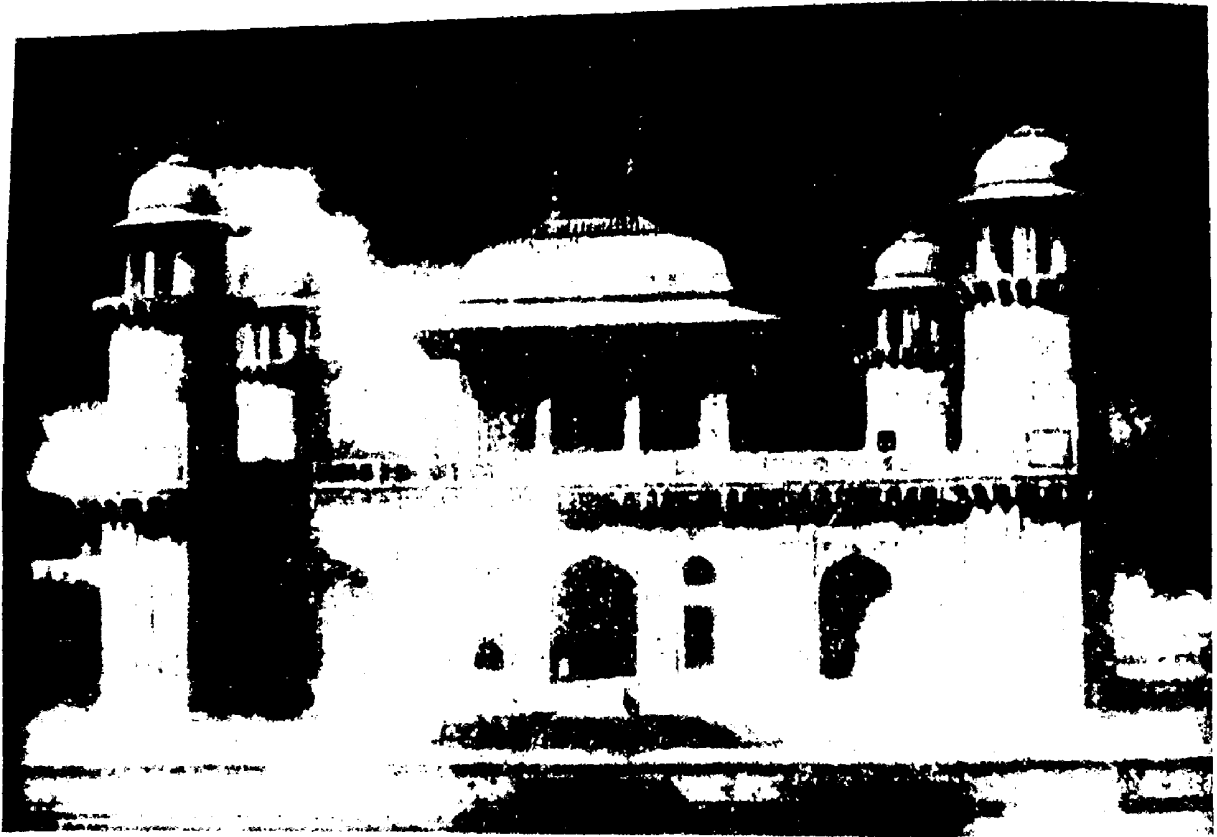
পৌরুষের, দাটোর। তাদের যা সাজ-পোশাক তরুত সৌকুমার্য যদি তোমার নজরে না পড়ে থাকে তবে বলব, তুমি অন্ধ। নকশা ছিল, তবে সীমিত। সমর-সাজে সিন্ধুত যোদ্ধার পক্ষে বতটা মানার—লৌহ-জালিকে জ্যামিতিক ছন্দ, কোমরকণ্ঠে বৃষ্টির নকশা, ঢালিকায় নকশার চুম্বিক, বড় জোর ডগোয়ারের মতই হাতীর-দাঁতে কিছু স্ক্রু কারুকার্য। তার বেশি নয়। এর ঠিক পরবর্তী যুগে স্থাপত্য আবিষ্কৃত হতে

চলেছে বরবার-নটীর বেশে—তার ওড়নায় সাজা-জরির জামনার কারুকৃতী, সর্বালো পামা-মোতি-হীরা-জহ-রতের জৌলুস, তার চরণে কলহস-নিম্বন-মধুর স্বেদনন্দুর।

আকবরী-স্থাপত্যে যেন মিকোলাজেলোর পৌরুষ-ব্যঙ্গনা—ব্যাঙ্কাস-ডেভিড-মোজেস্‌ই তাঁর হাতে ভালো খোলে; সিস্তিন-চ্যাপেলের সিবিল, লরেজান্সি সমাধি-সৌধের স্নাতি-গোথলি-উষা প্রভৃতি নারীমূর্তিরও কেমন যেন পুরুষালি উভ। আর শাহজাহার স্থাপত্যে যেন রাকাইলের শিল্পভাবনা—তাঁর পুরুষচিত্রেও নারী-

মক্‌বারায় দক্ষিণে, এখানে প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতায় - নদীর অবস্থানজনিত হেতুতে তা পূর্বে। প্রবেশ-স্মারিট লালয়ত্তের বালিপাথরের, তার মাঝে মাঝে সাদা মার্বেলের নকশা। অথচ কেন্দ্রস্থ মূলসৌধটি আদ্যন্ত দৃশ্যশূন্য নিখাদ মর্মরের (চিত্র —10.4)।

শেরশাহ শূর অথবা ফিরোজশাহ তুগলক ভারতীয় স্থাপত্য-ইতিহাসে দুর্লভ বাতীকৃত। তাই ইতিহাস জানে না—ইতমদ্‌উদ্‌দৌলার মূল পরি-কল্পনাকারের পরিচয়। আন্দাজ করছি : নুরজাহাঁ স্বয়ং মোটামুটি লে-আউটটা ছকেছিলেন। হয়তো



চিত্র—10.4 ইতমদ্‌উদ্‌দৌলা, সম্মুখ থেকে আলোকচিত্র।

সমস্ত পেলকতা। এই দুই বিপরীত-ধর্মী স্থাপত্য-চিন্তার মাঝখানে নুরজাহাঁর ইতমদ্‌উদ্‌দৌলা যেন জর্জনারীশ্বর! বিবর্তনের মধ্যপথে সংক্রমণ-ধর্মী একটি শ্বেতবর্ণের মর্মর সেতু।

165 মিটার বাহুর বর্গক্ষেত্র। চারিপাশে প্রাচীর—বাহুরী-জুড়ে তার চারিদিকে সুসমঞ্জস চাহুর বাগ। ঠিক কেন্দ্রস্থলে বর্গক্ষেত্রের বাস্তু-নকশায় মূলসৌধ। প্রবেশদ্বার এ-ক্ষেত্রে পূর্বদিকে। লক্ষণীয়, প্রবেশ-দ্বার হুমায়ুন-মক্‌বারায় ছিল পশ্চিমে, সেকেন্দ্রা-

তিনি সেটা পারতেন, কারণ তিনি কবি, শিল্পী, সৃষ্টিশীলতা। কম্পাস ধরে নকশা হয়তো ছকতে জান-তেন না, কিন্তু কী চান তা বুঝিয়ে কলার মতো শিক্ষা তাঁর ছিল। সে-ক্ষেত্রে আন্দাজ করতে পারি, তাঁর পূজাপাদ শ্বশুর নিজের সেকেন্দ্রা-সমাধির যে প্ল্যানটি ছকেছিলেন সেটি তাঁর হস্তগত হয়েছিল, অথবা কাঠের মডেলটি। কারণ লক্ষ্য করে দেখছি, সেকেন্দ্রা-মক্‌বারায় অনেকগুলি শৈল্পিক অনুভাবনা—যা মূল পরিকল্পনায় ছিল, কিন্তু জাহাঙ্গীরের

হাতে বাস্তবে রূপায়িত হয়নি—সেগুলি ইতমদ্-উদ্দৌলার সাধারণরূপে গৃহীত হয়েছে। অথবা আন্দাজ করতে হয়, নুরজাহাঁ এ-কাঞ্চার জন্য এক দশক পরে নিয়োগ করেছিলেন আকবরী-জ্ঞানার সেই বৃদ্ধ আর্কিটেক্টকে, যাকে হয়তো বাতিয়া বরোঁছিলেন জাহাঙ্গীর সেকেন্দ্রার সমাপ্তিকরণে।

এমনটা অনুমান করছি নিম্নলিখিত সূত্রকয়টি থেকে :

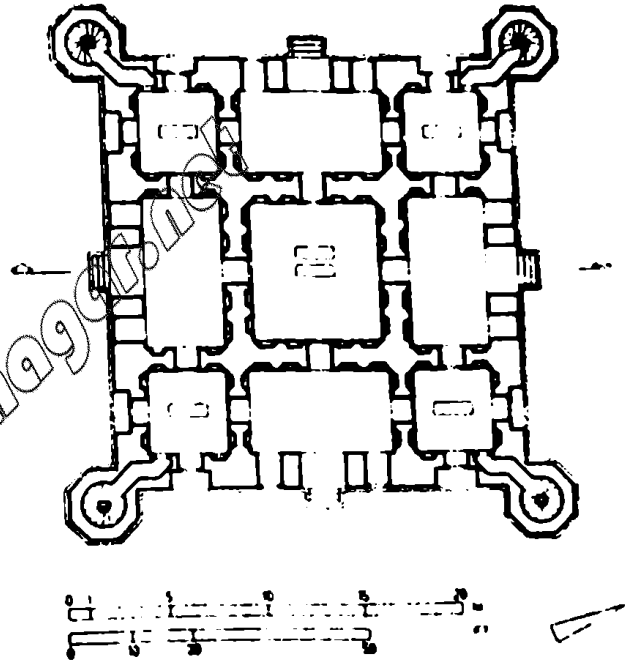
(i) আকবর তাঁর সমাধিসৌধের চার-কোণায় চারটি দৃঢ়মূল ব্যাস্টিয়ন কেন নির্মাণ করেছিলেন তা জানা ছিঁস ইতমদ্-উদ্দৌলা-স্থপতিত্ব। কারণ তিনিও দেখছি, ইমারতের চার-কোণা পয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ রচনা করে ছেঁটে ফেলেননি, পরিবর্তে আকবরী-জঙে চার-চারটি 'সাইন-ছাড়া' দৃঢ়মূল ব্যাস্টিয়ন বানিয়েছেন। অথচ জাহাঙ্গীরের মতো তাঁর মাথায় চারটি বামনাকার ছত্রী বসাননি। সেগুলিকে মিনারিকায় রূপান্তরিত করে-ছেন। যে-হেতু এই ইমারতের বিস্তার ও উচ্চতা খুব বেশি নয়, তাই মিনারিকাগুলিকেও নাতিদীর্ঘ করা হয়েছে। নিম্নাংশে অষ্টভুজ হলেও শ্বেতল অংশে আধা-আধি উঠেই তা গোলাকৃতি হয়েছে। মিনারিকায় ব্র্যাকেট-সম্বিত দুটি বাজুবন্ধ পরানো হয়েছে আকবরী সেকেন্দ্রা-তোরণের হুবহু অনুলকরণে। উপরস্থ ছত্রীটিও সেই ডিজাইন থেকে সংকলিত।

(ii) শ্বেতলে, কেন্দ্রস্থলে গোলাকৃতি গাছবুজ বসানো হয়নি আদৌ। এখানেও আকবরী-শৈলীতে চার-চালা চব্বতরা-ছাদ বানানো হয়েছে। এ-ছাদ দেখেছি সেকেন্দ্রায় মূল প্রবেশদ্বারের শীর্ষে এবং ফতেপুর-সিক্রির অনেক অনেক ইমারতে। এ-জন্মাই ফাগু-সন-সাহেবের অনুমান-নির্ভর চিত্রে হুমায়ূনী-গম্বুজটা আমাদের মনে নিতে সায় ছিল না সেকেন্দ্রার মূল সমাধিসৌধে।

(iii) একতলার কার্নিসে এবং মিনারিকা-চতুষ্টয়ের মণিবন্ধে যে ছজ্জা ও কোলা-বারান্দার ব্র্যাকেট তাও হিন্দু-শৈলীর, ফতেপুর-সিক্রির প্রভাবমণ্ডিত। এই আনুভূমিক অলংকরণটি রৌদ্রছায়ার মিতালীতে শব্দ মর্মর-প্রাসাদে একটা স্নিগ্ধতার আমেজ আনে। ভার বহনের প্রয়োজনে ঐ ব্র্যাকেটগুলি অহৈতুকী। এর উপস্থাপনের দুটি উদ্দেশ্য। এক : পূর্বযুগের শৈলীকে সম্মান জানানো। দুই : সমৃদ্ধশোভা কোলা-বারান্দার একটানা ছায়ারেখায় ছোট ছোট সাদা-দাগের আলিম্পনের মাধ্যমে একটা মনমুগ্ধকর প্যাটার্ন রচনা করা।

(iv) ইতমদ্-উদ্দৌলার বাস্তব-নকশা পারসারীত-সম্পন্ন বৃত্তকোণিক নয়; অর্থাৎ ইমারত-সমাধিতে যেমন নয়টি বৃত্তকে নুগ্ধন করে স্যান করা হয়েছে, সে পথ আকবর তাঁর দীর্ঘ স্থাপত্য-জীবনে একবারও অনুসরণ করেননি, সেই বৃত্তকোণিক প্রাচীর নুরজাহাঁরও মনে ধরেনি! শব্দ, ইতমদ্-উদ্দৌলার নয়, লাহোরে জাহাঙ্গীর-মক্‌বারাও পরিকল্পিত হয়েছে জ্যামিতিক সরলরেখার ব্যবহারে, বৃত্ত থেকে নয়।

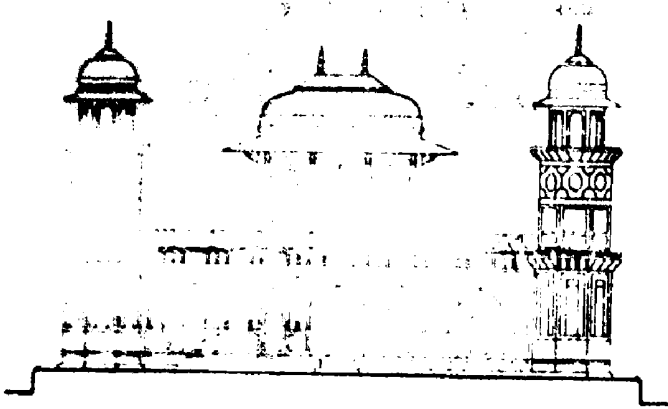
বাহিরগে আকবরী-জমানার পদ্যবালী-চক্রে সালাম জানিয়ে এ ইমারৎ কেন অস্তরণে আগমনী যুগের আগমনী গাইতে আগ্রহী। সমস্ত দেওয়াল জুড়ে



চিত্র—10.5 ইতমদ্-উদ্দৌলার বাস্তব-নকশা।

নানান জাতের জটিল জ্যামিতিক নকশা। সেগুলি মূলতঃ পারস্যরীতির, হিন্দু-শৈলীর নয়। সিলিঙে ও দেওয়ালে কারুকৃত আরও ঘননিবন্ধ, আরও জটিল। কী সূক্ষ্ম, কী নিখুঁত কারিগরী! জ্যামিতিক আপ-জোখের যেন হৃদয়হৃদয় হয়ে গেছে! দেওয়ালের গারে পাথরে খোদাই করা 'স্টিল-লাইফ পেইন্টিং'! কল-দানীতে পুষ্পগুচ্ছ, প্রসাধন-মঞ্জরা, সূর্য-ভঙ্গার, ফলের পাত্র, পানের মদিরা-চষক। দেখতে দেখতে মনে থাকে না—এ নকশাগুলি একটি সমাধিসৌধের দেওয়ালে খোদাই করা। মনে হয় যেন, ক্লাস বাসনের প্রয়োজনে নির্মিত এ বাকি কোন হারেম-রঙমহলের দেওয়াল। ঐ ঠাণ্ডা-বদন্ত অলংকার আর সূর্যভঙ্গারের

জৌলুকের মাঝে মাঝে কুরান সুরিফের বাণী উৎকীর্ণ করা। সেগুলিকে ঐ পরিবেশে যেন প্রহসন বলে মনে হয়! হয়তো অপরাধ আমার নিজের- হয়তো তদানীন্তন শিল্পবোধের নিরিখে এতে কোন রসভাস ঘটে না, কিন্তু বর্ণিকাভরণের উৎকর্ষে মৃদু হওয়া সত্ত্বেও স্বীকার করব—আমার কেমন যেন বারে বারে সুর কেটে যাচ্ছিল। মিশরীয় ফারাওদের পিরামিডে এটা আমার চোখে বিসদৃশ লাগেনি—কারণ তাদের জীবনদর্শনে পুনর্জন্মবাদ স্বীকৃত, মৃত্যুতে তাদের যবনিকাপাত নয় ; কিন্তু এই ইসলামী সমাধিসৌন্দর্যে এটা আমার ভালো লাগেনি। ইসলামী সমাধিসৌন্দর্যের অভ্যন্তরে মনটা যে গাম্ভীৰ্য, যে শান্ত সমাহিত উদাসীন পরিবেশ প্রত্যাশা করে, এখানে যেন তার ব্যত্যয় হয়েছে, বারে বারে, অলঙ্করণের আতিশয্যে।



চিত্র-10.6 ইতমদ্‌উদ্‌দৌলার সমাধিসৌন্দর্য।

বাহিরের দিকে নকশার বাহুল্যে কিন্তু সে-কথা মনে হয় না। প্রথমতঃ, সেটি সমাধিকঙ্কের অভ্যন্তর নয় ; দ্বিতীয়তঃ, এই রঙিন নকশাগুলি থাকায় মধ্যদিনেও শব্দ-মর্মে আলোর প্রতিফলন চোখকে পীড়িত করে না—যে অনুভূতিটা হয় নিদাঘ-মধ্যাহ্নে তাজমহল দর্শকের। অথবা হয়তো, হিন্দু-মন্দিরের বাহিরে এবং গর্ভগৃহে এই বৈপরীত্য দেখে দেখে আমি অজান্তে কসেই! এই প্রসঙ্গে আরও বলি, এখানে আলিম্পন চাকুরীর প্রয়োগবিদ্যায় একটা নতুন জাতের পদক্ষেপ করা হয়েছে। এতদিন মৃৎশিল্প-পাথরে মক্কারনা মার্বেল খোদাই করে তার ভিতর শব্দ কালো-রঙের মার্বেলই কসানো হত—অথবা লালচে জয়পুরী বালি-পাথরে সাদা এবং কালো রঙের 'পাতি'। পশ্চি-টার লাতিন নাম : Opus sectile ; এই ইমারতে সর্বপ্রথম রম্মর খোদাই করে তার ভিতর নানান জাতের দর্শন পথেরের ছোট ছোট টুকরো সুবিন্যস্তভাবে

সাজিয়ে বর্ণাঢ্য নকশা সৃজন করা হয়েছে—প্রবাল, পামা, মৃদু, পোখরাজ, নীলা প্রভৃতি। এ পশ্চি-টাহাজাহানী-জমানার এক ম্যানিয়া। এ পশ্চি-টিটার লাতিন নাম : pietra dura। ইতমদ্‌উদ্‌দৌলার এই পশ্চি-টিতে শিল্পী এমন বর্ণবোঁচকোর কেরামতি দেখিয়েছেন, যা পার্সি ব্রাউন সাহেবের ভাষায় 'Could only be excelled by those of a butterfly's wings'—অর্থাৎ যা মানুষ অতিক্রম করতে পারবে না, পারবে প্রকৃতি, প্রজাপতির ডানায়।

জাহাঙ্গীরের সমাধি, লাহোর : ইতমদ্‌উদ্‌দৌলার বিষয়ে পূর্বসূরীরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন—ফাগুদসন, হ্যাভেল, পার্সি ব্রাউন ; আমি আবিমিশ্র প্রশংসা করতে পারিনি। কোনো উম্মাসিক মনো-ভাবের জন্য নয় কিন্তু। যে-কথাটা আমি আপনাদের বলতে চেয়েছি, হয়তো বোঝাতে পারিনি, সেই সত্যটা প্রণিধান করেছিলেন স্বয়ং নূরজাহাঁ। হয়তো তত্ত্বটা বদ্বি দিয়ে নয়, বোধ দিয়ে বোঝার ; বৈদগ্ধ্যের দৃষ্টিতে তা দৃশ্যমান নয়, বেদনার পরকলায় তা অনুভব করা যায়।

রাজধানী থেকে বহুদূরে, লাহোরে, নূর মহম্মদ জাহাঙ্গীরের সমাধি নির্মাণ করতে যে এল, সে হীরা-মৃদু-জহরতে ভূষিতা ভারতসম্রাজ্ঞী নূরজাহাঁ নয়, সে পণ্ডাশোধর্মা, বিগতভর্তা এক হতভাগিনী। এখন তার ভূমিকা—'বাল বিখারকে টুটি কবরৌপে জব কোই মেহেজবীন রোতি হায়'-এর। তাই জাহাঙ্গীর-মক্‌বারায় নেই ইতমদ্‌উদ্‌দৌলার রাজসিক জৌলুয, রঙিন-পাথরে চোখ-ধাঁধানো চেকনাই। পানপাত্র, চমক, ফুলদানী আর সুরাভুগারের খিলখিলানি নেই তার খিলানে খিলানে। সে হিসাবে জাহাঙ্গীরের বেতনভুক কর্মচারী ইতমদ্‌উদ্‌দৌলার মক্‌বারার সঙ্গে তার নিজের সমাধির প্রভেদ—জগতের আলো নূরজাহাঁর সঙ্গে বিগতভর্তা শাহজাহাঁ-বিমাতার।

নূরজাহাঁ এ-ইমারতে আদৌ কোন গম্বুজ বানাননি। কেন? যে-হেতু স্বয়ং আকবর-তনয় বানাননি আকবরের সমাধিতে? কিন্তু এবারেও দেখাচ্ছি, মূল ইমারতের চার প্রান্তে চারটি লাইন-ছাড়া মিনারিকা বানানো হয়েছে, এবং সেগুলি মাপে খাটে নয়, যথেষ্ট উঁচু।

নূরজাহাঁর সমাধি, লাহোর : সেখানেই কিন্তু এ বিয়োগান্তক নাটকের যবনিকাপাত নয়। তারপর কেটে

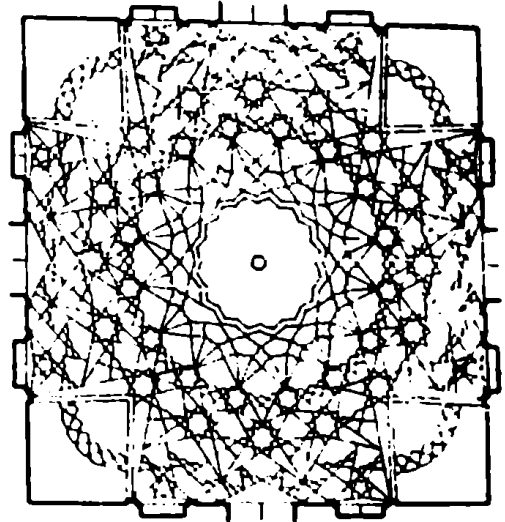
গেল আরও আঠারো বছর। নূরজাহাঁ এখন সম্বর ছুই-ছুই। ছুইয়ে-মুয়ে নুয়ে পড়ার জমানা। হারেম-আব্রতে দোপাটায় মূখ লুকিয়ে দিন গজরান করছেন জাহানের নূর-জগতের আলো। তস্‌বির-ছড়াই তখন তাঁর একমাত্র সম্পদ। শেষ-পারাণির খেয়াঘাটের পিচ্ছিল সৈকতে উপনীত হয়ে বৃন্দার আশঙ্কা হল—বোধকরি মৃত্যুর পরেও এই চোখের-বালি বিমাতাকে শাহজাহাঁ নিশ্চিন্তে শূতে দেবে না স্বামীর পাঞ্জর-ঘেঁষে। জিন্দা-জাহাঙ্গীর যাকেই পাটরানী করুক, বর্তমান দিল্লীশ্বর বেহেস্ত-আসীন জাহাঙ্গীরের পাশের সন্দোখটি সংরক্ষিত রাখবে নিজ গর্ভধারিণী জননীর জন্য। বেশ, তাই হোক—সব অবমাননা, সব ইব্‌তিজালই যখন সহেছেন দীর্ঘ আঠারো বছর, তখন ওটাও সহিবে। অন্তত স্বামীর ঐ মক্‌বারা-চৌহন্দীর একান্তে যদি ঠাই পান, তাতেই তিনি সন্তুষ্ট। হয়তো এ-কথা চিন্তা করেই লাহোর-মক্‌বারায় তাঁর চিহ্নিত সন্দোখ-এর আশাও ছাড়লেন। সেই লাহোর-মক্‌বারায় চাহ্‌র বাগের এক নিভৃত প্রান্তে, কলম্বনা রাভী নদীর কিনারে অতঃপর নির্মাণ করালেন একটি অনাড়ম্বর ক্ষুদ্রায়তন মক্‌বারা। পাশাপাশি দুটি সন্দোখ—একটি নিজের, একটি লাডলির।

হ্যাঁ লাডলির। লাডলি-বেগমের। বণ্টনা ছাড়া যাকে কিছ্‌ই হাতে তুলে দিতে পারেননি ভারত-সম্রাজ্ঞী, সেই কাব্যে উপেক্ষিতার জন্য নির্মিত হল একটি সন্দোখ। লাডলি হচ্ছে শের আফকনের কন্যা। নূরজাহাঁর একমাত্র সন্তান। শাহজাদা শাহরিয়ারের বেগম—যে কুৎসিত-দর্শন জড়বুদ্ধিসম্পন্ন শাহ-রিয়ারকে বিবাহ করতে বাধ্য হয়েছিল সেই অনিন্দ্য-কান্তি রূপসী মেয়েটি—মুগল রাজনীতির নির্দেশে, ক্ষমতা দখলের ক্রেদান্ত স্বপ্নে, এবং যে শাহরিয়ারকে শাহজাহাঁ প্রথমে অন্ধ ও পরে হত্যা করেছিল। নূরজাহাঁর গর্ভজাত একমাত্র সন্তান—উর্বশী-নির্দিত লাডলি-নগম তারপর আর নিকার বসেনি। বোধকরি গোটা ইনসানিয়াৎ-এর প্রতি দূরন্ত ঘৃণায় বিবাহিত জীবনের পাকে আর নিজেকে জড়ায়নি। যে মায়ের জন্য সে কৈশোরে বাপকে হারিয়েছে, যে মায়ের জন্য অনিন্দিতা অনাদ্যাতা মেয়েটি ঐ জড়বুদ্ধির অঙ্ক-শায়িনী হয়েছে—খোদাতাজার কী আজীব মহিমা—সেই আশ্মাজানের সেবাতেই সে কাটিয়ে দিয়েছে বাকি জীবন।

এ সমাধিসৌধ আরও নিরাডরণ ; আরও বিধবা ! সেটো দেখলে বিশ্বাসই হতে চায় না, তার নিচে মাটির

গভীরে কন্যাকে বকে জড়িয়ে শূতে আছেন—নূরজাহাঁ, দীর্ঘ দশক ধরে বিনি বরনিকার অন্তরাল থেকে ছিলেন বাস্তবে ভারতভাগ্যবিধাতা !

সে সমাধি এমন কি ইতমদ্‌উদ্‌দৌলার আদরিণী আশ্রয়ও নয়—সে মক্‌বারা সুন্দর বর্মান্তরিত্বের এক নগণ্য মনসবদারের মন্দভাগিনী কুলবধুর শেষশয়্য। যে মেয়েটি জানতো ঘুম-পাড়ানিরা গানে চাপড়ে চাপড়ে ছোট-সোনা-মেয়ে লাডলিকে ঘুম পাড়াত, সবে-বরাতের উৎসবে যে তরুণী মেয়েটি জানতো গাছ-কোমর করে শাড়ি জড়িয়ে মিলাদ-সরিক্ষের জমাল্লাতে দ-পাচ-শ লোকের জন্য ফিনি রাখত, অথবা জোনাক-জ্বলা মধ্যরাতে যে বৃকতীকৃষ্টি জানতো বর্মান-কিন্দার খিড়কির দেউড়িতে প্রতীক্ষা করতে—কখন শোনা যাবে ঘরে-ফেরা ক্রান্ত মরদের অবসরধ্বনি !



চিত্র—10.7 ইতমদ্‌উদ্‌দৌলার সিলেতে জ্যামিতিক নকশা।

আর সেই হতভাগিনীর কবরের পাশে উৎকীর্ণ করা আছে দু-ছত্র কবিতা। তাঁর স্মরণে একটি ফরসী কবিতা। তাও ভারতসম্রাজ্ঞী নূরজাহাঁর নয়, ইতমদ্‌উদ্‌দৌলার গর্ভবিনী আশ্রয় মেহেরউম্মার নয়, এমন কি বর্মান-দেহলীর গ্রাম্য কুলবধুরও নয়—তা নৈবার্ত্তিক, স্পর্শকাতরা এক বেদনা-বিধ্বংসাত্মক কবিতা আশ্রয় আর্তি :

‘বর্ মজার-ই-মশ্‌ খরীবান্‌ নই চিরাবী নই ঘলী।
নই পর-ই-পরওয়ানা সৃজন নই সদা-ই বদল-বদলি ॥’

কলম্বনা রাভী নদীর কিনারে ঐ নগণ্য মক্‌বারায় যে মাধুর্যস সৃজন করেছেন বৃন্দা কবি, তার কথা-মাগুও রচনা করতে পারেননি কোটিপতি নূরজাহাঁ তাঁর পিতৃস্মৃতির জোজবে। তাই দরদী কবি সত্যোপন্যাস

ইতমদ্‌উদ্‌দৌলার স্থাপত্যে মৃদু হয়ে রেখে যামনি কোন কাব্যোচ্ছ্বাস, এবং অনুবাদ করে গেছেন ঐ অনুবাদ যমসী বয়ে-টির :

“গরীব-গোরে দীপ জেবল না, দিও না কেউ ফুল
জুলে,
শ্যামাপোকায় না পোড়ে পাখ, দাগা না পায়
বুল-বুলে ॥”

* * *

প্রথম প্রকাশকালে যে তথ্যটা পরিবেশন করেছিলাম, সেটা বর্তমান পরিমার্জিত সংস্করণে কিছু বদল করতে হচ্ছে। কারণ ইতিমধ্যে ‘লাডলি বেগম’ নামে একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার উৎসাহী হয়ে নূরজাহাঁ সম্প্রদেয় আরও কিছু তথ্য-সংগ্রহ করেছি। লাডলি-বেগমের স্বামী শাহজাদা শাহরিয়ারকে হত্যা করা হয়েছিল বরহানপুর দুর্গে। আশা ছিল, তার সমাধি সেখানেই দেখতে পাব। মধ্যপ্রদেশের বরহানপুর কিল্লায় গাইড সেটা আমাকে দেখাতে পারেনি।

কিন্তু আগ্রার ইতমদ্‌উদ্‌দৌলা মক্‌বারার গাইড এবার আমাকে মীর্জা গিয়াস্ এবং আসরফ্ বেগম অর্থাৎ নূরজাহাঁর পিতামাতার কবর দেখানোর পর যখন দেখালো নূরজাহাঁর একমাত্র কন্যার কবর, তখন চমকে উঠেছিলাম আমি। বলেছিলাম : সে কি! লাডলি-বেগমের সমাধি তো পাঞ্জাবে? শাহদারায়?

লোকটা বলেছিল : নহী বাবুজী! ইয়েই হায় উনকী-কবর! পরে খবর নিয়ে জেনেছি, তথ্যটা হয়তো ঠিকই।

নূরজাহাঁর মৃত্যুর পরে আরও বছর পনের বোঁচে ছিলেন লাডলি-বেগম। তিনি থাকতেন পাঞ্জাবে, ঐ শাহদারায়; মায়ের সমাধির কাছাকাছি। মৃত্যুর পূর্বে তিনি একটি আখেরী-আজি পাঠিয়েছিলেন সজ্ঞাট শাহজাহাঁর কাছে—যেন তাঁর স্বামীর মৃতদেহ

বরহানপুর কিল্লা থেকে এনে শাহদারায় সমাধিস্থ করার অনুমতি সজ্ঞাট দেন। ঐ সজ্ঞা আজি ছিল, তাঁর নিজের মৃতদেহও মায়ের মক্‌বারাতে সমাধিস্থ করার। স্বামীর কবরের কাছাকাছি।

হতভাগিনীর ধারণা ছিল না—সেই এই সামান্য অনুরোধটুকু রক্ষা করার ক্ষমতাও ছিল না সেদিন শাহজাহাঁর। তিনি তখন আগ্রা কিল্লায় বন্দী। শাহজাহাঁর পুত্ররা—দারা-সুজা-মুরাদ রওনা হয়ে গেছে খুর্রমের ভ্রাতৃবৃন্দ—খসরৌ, দানিয়েল, শাহরিয়ারের পক্ষে। শাহজাহাঁর অত সাধের ময়ূর-সিংহাসনে তখন আসীন তার তৃতীয়-পুত্র আলমগীর।

জিন্দা ঔরংকে সম্মান না দিলেও মর্দাকে যথোচিত সম্মান দেবার কানুন ছিল—মুগল জমানায়। তাই শাহদারায় এক অখ্যাত অন্তর্বাসিনীর মৃত্যু হয়েছে সংবাদ পেয়ে হস্তদস্ত হয়ে ছুটে এল পাঞ্জাবের শাসনকর্তা। মৃত্যু নাকি সজ্ঞাট জাহাঙ্গীরের পুত্রবধূ! মুগল-হারেমের জাতি সম্মানীয়া মর্দা! মৃতদেহকে কফিন-বন্দ কবর শাসনকর্তা সেটিকে পাঠিয়ে দিল রাজধানীতে। প্রাকযাত্রা এসে থামল লাল-বিল্লায়।

প্রাকযাত্রা-দরওয়াজার প্রহরী জানতে চাইল কীসের এ প্রকযাত্রা? কার এ মৃতদেহ?

পরিচয় পেয়ে দর্দাভি-নিনাদ করল নক্করখানার ঘোষক।

সব বস্তান্ত শূনে নয়া শাহ-য়েন-শাহ আলমগীর বাদশাহ্ হুকুমজারী করলেন—‘ও বড়িটার দেহে খানদানী মুগল রক্ত নেই। ওর আত্মজান পাঠান : আত্মজান—ওর জন্ম সময়ে ছিল পাঠানের স্ত্রী! ওকে যেখানে ইচ্ছা কবর দাও।’

আমীর-ওমরাহ্‌রা নিজেদের বৃদ্ধি বিবেচনামত সিদ্ধান্তে এল—লাডলির দাদামশাই আর দিদিমার সমাধির পাশে শূইয়ে দিল লাডলিকে।

সে গরীব-গোরে দীপজ্বালার বা ফুল দেবার প্রশ্নই ওঠে না। □

শাহজাহান

উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা

	সময়কাল
জন্ম (মাতা : উদয়সিংহ-তনয়া মানমতী বা যোধবাই) ..	1592
পিতা সেলিমের অভিষেক ..	1606
জাহাঙ্গীর ও নূরজাহান বিবাহ ..	1611
খুর্রম ও আক্‌বান্দ-বেগমের বিবাহ ..	1612
ভারতে ব্যাপক দ্ব্যাবনিক-স্লেগ ..	1618-24
ঔরঙ্গজেবের জন্ম ..	1618
জাহাঙ্গীরের মৃত্যু ও শাহজাহান অভিষেক ..	1627
মমতাজমহলের মৃত্যু ..	1631
আগ্রা-কিল্লায় খাশমহল, শীশমহল, মীনা মসজিদ, নাগিনা মসজিদ, দেওয়ান-ই-খাশ, নির্মাণ	1631-40
তাজমহল নির্মাণ শুরু	1631
দিল্লীতে রাজধানী অপসারণের সিদ্ধান্ত	1638
লাল-কিল্লায় সৌধসমূহের নির্মাণ	1639-48
লাল-কিল্লায় উদ্বেখন মহানুষ্ঠান	1650
দিল্লীতে জাম-ই-মসজিদ নির্মাণ	1644-50
ঔরঙ্গজেব কর্তৃক শাহজাহান কবরী	1658
আগ্রা-কিল্লায় শাহজাহান মৃত্যু	1666

ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্য-ইতিহাসে শাহজাহান সর্ব-বিখ্যাত নাম। বলা হয়, মৃগল-স্থাপত্যকে তিনি গৌরবের গৌরীশ্বে উন্নীত করেছেন। নিঃসন্দেহে স্থাপত্য ছিল শাহজাহান এক দূরন্ত নেশা : প্যাশান ! মৃগল শিল্পরীতিতে তথা ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যে তিনি একটি নূতন 'স্টাইল' আমদানী করলেন, যার বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য হল—মর্মরের ব্যাপক ব্যবহার, নর পাপড়ি-ওমাজা খিলান, মণি-মুক্তা-খচিত *picture dura*-নকশার আধিকা, জাফ্রি-কাজে নিপুণতা এবং আন্তর-বৈশিষ্ট্য হল : আকবরী-যুগের স্থাপত্য-পৌরুষ ও হিন্দু-শৈলী-সখ্যতা বর্জন। শাহজাহান স্থাপত্য-সুখ্যাতির চার-আনা অংশ আগ্রা-কিল্লায়, চার-আনা লাল-কিল্লায়, চার-আনা দিল্লীর জাম-ই-মসজিদসহ

এখানে ওখানে ছড়ানো আর বাদবাকি ঝোলো-আনা আগ্রার তাজমহলে ! সোজা হিসাব !

শিল্পী-শাহজাহানকে করেক শ বছর ধরে নর বিশেষণে, নানান খেতাবে বিভূষিত করা হয়েছে। স্কুলপাঠ্য ইতিহাস বইতে, ট্যুরিস্টদের জন্য রচিত গাইড বইতে, এমন কি পান্ডিত্য-মণ্ডিত শিল্প-সম্বন্দীয় গবেষণা-গ্রন্থে। উজ্জ্বল বসে কেউ কেউ তাকে শিল্পী-হিসাবে লেওনার্দো, মিকেলান্জেলো, বিটোফেন তানসেন, শেক্সপীয়র বা রবীন্দ্রনাথের সম-শ্রেণীতে তুলতেও পরাড্রু নন ! বিশ্ব-জলিতকলার দরবারে এরা সকলেই নাকি সমশ্রেণীয় শিল্পপ্রকৃতি ! উজ্জ্বল-বিবাহিত এবং যুক্তি-নিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গিতে এই তথ্যটি বিচার করার সময় হয়েছে।

বাক্তি-শাহজাহাঁ সম্বন্ধেও—পশ্চিমেরা বাদে কিছু ঐতিহাসিক নাটকের প্রভাবে সাধারণ বাঙালী স্বতই অশ্রুসিক্ত। জীবনের শেষ আট বছর মহামান্য সম্রাটের কেটেছে বন্দী-দশায়। প্রাথমিক পত্র দারামুকো, মুরাদ, সুজা এবং পৌত্র সুলেমানের অপমৃত্যুবর্তা তাকে বুক পেতে সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই অনুভব করা যায়, এ বিষয়ে তাঁর তৃতীয় পত্র ইতিহাসের চক্ৰবিজিতে মহাকালের পাষণ-ফলকে লেখা পজাপাদ পিছুদেবের হস্তাক্ষরে দাগা বুলিয়েছে মাত্র! জাহাঙ্গীর মস্তাবস্থায় তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র বিদ্রোহী খসরোকে অশ্ব করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তার ছোটভাই খুররমের জিম্বাদারীতে। খুররম বৃহানপুত্র দর্পে বন্দী খসরোকে গুপ্তঘাতকের সাহায্যে হত্যা করে পিতাকে জানালেন, ‘দাদা কলিক-পেন-এ মারা গেছেন!’ জাহাঙ্গীর বুকলেন সবই, কারণ নির্দেশটাও সেই ইঙ্গিতবাহী ছিল।^১ তাছাড়া তাঁর আমলের ভাতিষেরেও ঋতম্ব হলে 1628 সালে উনিশে জানুয়ারী বেদিন শাহজাহাঁর অভিষেক হল “On the very same day he consigned Dawar Bakhsh to prison. Two days later, Khidmat Parast Khan arrived at the prison with a second *firman* and in obedience to it, Asaf Khan put to death Dawar Bakhsh, and his brothers Gurshasp, Shahriyar and Tahmurs and Hoshang, the sons of Daniyal.” [ঠিক সেইদিনই সম্রাট হুকুম দিলেন দাওয়ার বক্শকে (খসরোর পুত্র) কারাগারে নিক্ষেপ করতে। দু’দিন পরে ঋতম্ব পাস্তর^২ বাঁ একটি মিত্তীয় ফরমান নিয়ে কারাগারে উপস্থিত হল। শাহজাহাঁর এই মিত্তীয় ফরমানের নির্দেশানুসারে আসফ খাঁ একে একে হত্যা করল—দাওয়ার বক্শকে, তার ছোটভাই গসাস্পকে, শাহরিয়ারকে (লাডলি-বেগমের স্বামী, যাকে অশ্ব করে এতদিন করেদবারার জিইয়ে রাখা হয়েছিল, শাহজাহাঁর সেই জড়বশিসম্পন্ন ছোট ভাই) এবং দানিয়ারের (শাহজাহাঁর ঋতম্ব) দুই নাবালক পুত্র তাহমুস আর হোসাংকে।]

এদের অধিকাংশই কিশোর ও বালক—দারা-সুজা-মুরাদের মত বুক বা প্রাণ নয়। এবং অধিকাংশই সিংহাসন দাবীর কথা চিন্তাই করেনি, সে বয়সই তাদের হয়নি। পাছে কড় হয়ে তারা শাহজাহাঁর সন্তাননীতি বাধার সৃষ্টি করে তাই এই সাক্ষাৎ! মহাতারুতে অনেক-অনেক মহাতার অনেক-অনেক অপকীর্তির কথা

লিখে গেছেন বেদব্যাস ; কিন্তু রাষ্ট্রের অশ্বকারে পান্ডবশিবিরে পাঁচটি শিশুকে হত্যা করে আসা বোধ হয় সবচেয়ে নাকারজনক ; তেমনি মৃগল-জমানার অনেক-অনেক অপকীর্তি, এমন কি জাহাঙ্গীরের নৃশংসতাকেও ছাপিয়ে ওঠে শাহজাহাঁর এই গণশিশু-হত্যা। আর মজা হচ্ছে, এই গণহত্যার পক্ষকাল পরে আগ্রা-কিল্লায় উপনীত হয়ে যুবক শাহজাহাঁ এক বর্ণাভা বিজয়-উৎসব করেন। সেদিন দিলখুশ বাদ-শাহ তাঁর পেয়ারের বেগমকে দুই লক্ষ আসরফি উপহার দেন, এবং বার্ষিক দশ লক্ষ আসরফির মাসোহারার ব্যবস্থা করে দেন।^৩ অতগদলি শিশুহত্যার চিহ্নমাত্র নেই শাহজাহাঁর বিবেকহীন মানসপটে, পক্ষকালের মধ্যে !

কোনো কোনো সম্ভাবনাময় শিশুশিল্পীর অকাল-মৃত্যু হয়—আপনারা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন—তাদের অভিভাবকদের অতি-উৎসাহের তাড়নায়! গলা তৈরী হতে না হতেই তাকে সঙ্গীতের আসরে উপস্থাপিত করা হয়, তুলি বাগিয়ে ধরতে না ধরতেই তার একক প্রদর্শনীর আয়োজন হয় ; বানান রপ্ত হবার আগেই প্রভাবশালী পিতা তার কবিতা সাময়িক পত্রে ছাপিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন! সেই এন্তেজামে এন্তেকাল হয় শিশুশিল্পীর। তার অকালপক্ক দৃষ্টিতে ধরা ও সরা বে-ফারাক হয়ে যায়। খুররমের বয়স যখন তের, তখন তার আশ্বাজান তাকে কাবুলে নিয়ে যান। উর্তাবাগ নামে এক প্রাসাদে নাবালক-পুত্রকে রেখে জাহাঙ্গীর কিছুদিনের জন্য কোথায়-বুঝি গেছিলেন। “The existing buildings there not being to the Prince’s taste, he soon carried out suitable alterations.”^৪ (সেই সাময়িক-আবাসের হর্ম্যরাজী শাহজাদার পছন্দ না হওয়ায় তিনি সেগদলি ভেঙে হাল-ফাসানের মোকাম বানান) বুঝুন কান্ড! তের বছরের বালক! জাহাঙ্গীর ফিরে এসে পুত্রের কীর্তিতে বে-এস্তিয়ার! আনন্দের আতিশয্যে সম্রাট এক উৎসবের আয়োজন করলেন। পুত্রকে সোনা-রূপা-জহরৎ ও বেশম বস্ত্র ওজন করিয়ে সেগদলি গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিজিয়ে দিলেন।^৫ শুধু তাই নয়, চিত্রপ্রেমিক জাহাঙ্গীর এই ঘটনার একটি স্থায়ী স্মৃতিচিহ্নের ব্যবস্থাও করলেন। সমসাময়িক এক বিখ্যাত চিত্র-করের মাধ্যমে^৬ (চিত্র—11.1)।

কাবুলের গরীব-দুঃখীদের তাতে অশেষ উপকার হয়েছিল সন্দেহ নেই—কিন্তু সেইদিনই মৃত্যু পরোয়ানা ঘোষিত হল আগ্রা-কিল্লার সেই পাঁচশত ইমারতের,

যা বানিয়েছিলেন জালাল-উদ্দীন আকবর তাঁর কৈশোরে, হিন্দু-মুসলিম মিশ্রিত-শৈলীর প্রথম পরীক্ষা করতে।

তত্ত্ব-ই-সুলেমানে আসীন হওয়ার পর থেকে ঔরঙ্গ-জীবের হাতে বন্দী হওয়া-তক্ দীর্ঘ একটিশ বছর ধরে শাহ-জাহাঁ ক্রমাগত ইমারৎ গড়ে গেছেন—শুধু আগ্রা বা দিল্লীতে নয়, যখন যেখানে গেছেন, সেখানেই : কাশ্মীরে, লাহোরে, আম্বালায়, বারী, ফৈজাবাদ, গোয়া-লিয়র, কাবুল, সর্বত্র। তাঁর প্রথম কীর্তি আগ্রা-কিল্লাতে : দেওয়ান-ই-আম। সিংহাসনে উঠে বসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। বোধকার সেখানেই তাঁর শেষ কাজ : অনবদ্য মতি মসজিদ (1654), যা তাজমহল ও দিল্লীর জাম-ই-মসজিদ ব্যতিরেকে শাহ-জাহাঁর শ্রেষ্ঠ

দিল্লীশ্বরকেই ছাপিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তাই ভুলনা করতে হলে ভিন্দেশের কিন্তু সময়কালের আর একজন সম্রাটের কথা মনে পড়ে : ফরাসীদের গ্র্যান্ড মনার্ক, চতুর্দশ লুই। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন 1643 খ্রিষ্টাব্দে, শাহ-জাহাঁর শাসনসূর্য কখন মল-গগনে। আগ্রার তাজমহল যে দশকে শেষ হল প্রায় সেই দশকেই শুরুর হয়েছিল পৃথিবীর অপর প্রান্তে : ভার্সাই প্রাসাদ। একই রকম আড়ম্বর, একই রকম জাঁকজমক এবং প্রাক্-কলনের মূল্যবান একই ভঙ্গিতে আকাশচুম্বী। তাজ ও ভার্সাই প্রাসাদের নির্মাতৃত্বের সাদৃশ্য বিস্ময়কর! জীবন-যাপন পশ্চিমে তাঁদের এক সুরে বাঁধা। আহা-বিহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, শিকার-সঙ্গীত-সুরা-নারীতে আসক্তি ছাড়াও সাদৃশ্য আছে—



চিত্র—11.1 সম্রাট জাহাঙ্গীর খুদরমকে সোনা দিয়ে ওজন করছিলেন।
[মুগল মিনিয়চার; 1615 খ্রিষ্টাব্দে অঙ্কিত; বর্তমানে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত।]

স্থাপত্য-কীর্তি। শাহ-জাহাঁ-স্টাইলের মূল কথা : মর্মর প্রেম। তারই আনুর্বাণিক হিগাবে এসেছে অন্যান্য 'ম্যানারিজম',—নয় পাগড়ি-ওয়ালা খিলান, সমতল ছাদের চারপ্রান্তে চার ছত্ৰী, pietre dura পশ্চিতিতে খোদাই-এর কাজ, মোজেইক এবং জাফ্রিকাকাটা জালিকাজ।

শাহ-জাহাঁ জাঁকজমক ও আড়ম্বর খুব পছন্দ করতেন। এদিক থেকে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সব

দৃজনেই সুদর্শন, দৃজনেই 'লেডী-কিলার' : অশ্রু আশ্রয়, দৃজনেই হারিয়ে উৎপস্থিত সহস্র সুন্দরীর ভিতর বিশেষ এক-এক জনের প্রতি অনুরক্ত। শাহ-জাহাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী আজদুবানু বেগম এক চতুর্দশ লুই-এরও দ্বিতীয়া পত্নী Madame de Maintenon। শাহ-জাহাঁ এবং লুই দৃজনেই নিজ নিজ দেশে সর্বোচ্চ-মূল্যের, সুন্দরতম সৌখ বানিয়েছেন, খরচের জন্য পরোয়া করেননি। আর দৃজনেই এক-একটি দীর্ঘ-

স্বারী রাজবংশের শেষ জৌলুস। তাঁদের পরেই সুখ
পশ্চিমে চলে পড়েছে।

কিলাস-বালনে আকণ্ঠ নিমজ্জমান হলেও শাহজাহা
তার পিতৃদেবের মতো অলস, মাতাল এবং কত ব্যা-
কিম্বদন্তি ছিলেন না আদৌ। শয্যাভ্যাগ করতেন সূর্যো-
দয়ের দৃ-দৃষ্ট আগে। প্রাতঃকৃত্যাদি সেয়ে উপস্থিত
হতেন খোয়াবগাহ-সংলগ্ন তসবিখানায়। নামাজ-
অন্তে তসবি-ছড়া হাতে নিয়ে মালা জপ করতেন
সূর্যোদয় পর্যন্ত। তখনই এসে হাজির হত দশ-পনের-
জন খিদ্মৎগার—তাকে রাজসজ্জার সজ্জিত করতে।
বিচিত্র তার কার্য। এক-একজন ভূত্য রাজ-অঙ্গে এক-
একটি পোষাক পরিয়েই কুর্নিশ করতে করতে পিছু
হটে অন্তর্হিত হত। তৎক্ষণাৎ এগিয়ে আসত স্থিতীয়
জন। মোতির মালাটা রাজকণ্ঠে যে দুলিয়ে দেবে,
কিম্বা তাজটা বসিয়ে দেবে রাজমস্তকে, বাকি সারাটা
দিনে তার আর কোনো কাজ নেই।

আপাদমস্তক মহামূল্য পরিচ্ছদে—সাজা-জরি,
সোনা ও মণিমস্তা সমেত তার ওজন প্রায় চার কিলো-
গ্রাম—আবৃত করে শাহ-য়েন-শাহ এসে আবির্ভূত
হতেন স্বরোচ-দর্শনের চিহ্নিত গবাক্ষে। কিল্লার
বাহিরে মরদান-সামিল প্রজাবন্দ উর্ধ্বমুখে সম্মুখে
পূজার দিগে উঠত : পাদশাহ্ সালামৎ (বাদশাহ্ দীর্ঘ-
জীবী হন)। এ প্রথাটি পারস্য থেকে আমদানী। গুরু-
তর কোনো অভিযোগ থাকলে নিচে থেকে আম-জনতার
কোনো মদুখপাত সে আজি সন্ন্যাসের সম্মুখে পেশ করতে
পারত। যদিও তারা সাহস সত্তর করে সেই আইন-
মোতাবেক আজি পেশ করেছে বলে কোন ঐতিহাসিক
বিস্ময় নেই।

স্বরোচ-দর্শনের পর বৃথিকা-মঞ্জিল। রোজ নয়,
মাসে মাসে। হাতীর লড়াই দেখতে। একমাত্র সন্ন্যাস
জিবে লড়াই-য়ের আদেশ দেওয়ার অধিকার আর করত
ছিল না। বৃথিকা-মঞ্জিলের চব্বতরা থেকে নিচের ময়-
দানে হাতীর লড়াই স্পষ্ট দেখা যেত। বেগম-মহলের
গবাক্ষ থেকেও। সে বড় নিষ্ঠুর দৃশ্য। সুমাত্রা, যব-
খীপ আসাম, সিংহল, বর্ম ও শ্যামদেশ থেকে হাতী
অসংখ্য রাজধানীতে। মীর মাহৎ তা-থেকে বেছে বেছে
কিছু হস্তিগণকে নির্বাচন করত। বৃথিকাবিদ্যায়
তাদের শিক্ষিত করে তোলা হত। যে মাহতের দল
এই মনুসমুখে হস্তিপরিচালনা করতে সেত, তারা
পরিবারকর্মের কাজ থেকে শেষ-বিদায় নিয়েই আসত।
এই নশলে দৃশ্যটি দেখতে সব মঙ্গল-সন্ন্যাসই জাল-
বাসতেন।

বৃথিকা-মঞ্জিল থেকে জাহাপনা আসতেন দেওয়ান-
ই-আম-এ।

প্রকাশ্য দরবারের কেন্দ্রে শ্বেত-পাথরের সুউচ্চ
মণ্ডপ উপর সন্ন্যাসের আসন। পিছনে একসার খিদ্মৎ-
গার চামর বাজানরত। দক্ষিণে ও বামে শাহজাদারা।
একথাপ নিচে উজীর-এ-আজম আসফ খাঁ, অর্থাৎ
মমতাজমহলের পিতৃদেব। একপাশে চাঁদির রেলিং
ঘেরা অংশে সিপাহী-সালারদের জমায়েত। বাঁদিকে
নিশানধারী একসার পতাকাবাহী—নিশানে মঙ্গল
বাদশাহীর প্রতীক : উদীয়মান সূর্যের সম্মুখে নত-
জান্দ সিংহ। তার ও-পাশে আহাদী আর মনসবদার-
দের দল। মীর মুনশী, মীর আতিশ্ অথবা তোপ-
খানার মীর মুনসিফ। অর্জ-ই-মুখাররার অর্থাৎ মূখ্য
তথ্য-অধিকারিক দাখিল করত বিশাল সাম্রাজ্যের দূর-
দূর প্রত্যন্তদেশের নানান সংবাদ। শূনে বাদশাহ্
যদি কোনো ফরমান দিতেন তাহলে তা দ্রুতহস্তে লিপি-
বদ্ধ করে চমত একাধিক শ্রুতিধর। সেগুলি মিলিয়ে
দেখে, সংশোধন করে মীর মুনশীকে প্রস্তুত থাকতে
হবে, সুযোগমত জাহাপনার পাঞ্জাছাপ সংগ্রহের জন্য।
সভা স্তব্ধ চলে ততক্ষণ অতি মৃদু আলোপে আবহ-
সঙ্গীত বাজিয়ে চলত একদল নেপথ্য সঙ্গীতজ্ঞ।
তাদের সঙ্গীত যদি শ্রুতিগোচর না হয়, অথবা রাজ-
কার্যে বাধার সৃষ্টি করে তাহলে তাদের গর্দানা যাবে
নির্ঘাৎ।

বেলা সাড়ে-এগারোটা নাগাদ শাহ-য়েন-শাহ এসে
বসতেন দেওয়ান-ই-খাশ-এ। নিভৃত দরবারে। সেখানে
প্রবেশাধিকার কিছু উচ্চপদস্থ পেয়ারের লোকের এবং
বাদশাহজাদাদের। উজীর-এ-আজম আসফ খাঁ, প্যারের-
দোস্ত্ আফজল খাঁ, আবশ্যিকভাবে সন্ন্যাসের ব্যক্তিগত
চিকিৎসক—হাকিম-উল-মুলুক ওয়াজির খাঁ। দারা,
সুজা, মুরাদ অথবা ঔরঙ্গজীব, যে যখন রাজধানীতে
আছে। বাহিরে প্রতীক্ষা করত বিশ্বস্ত দৃ-একজন
জাসদসী (গুরুতর) কিংবা হসীসিয়ন (গুরুত্বহীন)।
তলুব হলেই আঙুরাখায় মূখ ঢেকে ভিতরে যাবে
কুর্নিশ করতে করতে। তবে তাদের তলুব পড়ার
আগে মন্ত্রপাশড়া আরও জনবিরল হয়ে পড়ত ; ক্ষেত্র-
বিশেষে বাদশাহজাদা অথবা উজীর-এ-আজম পর্যন্ত
থাকবেন কি না কলা কঠিন। তেমন তেমন ক্ষেত্রে

অর্থাৎ হসীসিয়নকে যে আদৌ আহ্বান করা হয়েছে
এ খবরটাও গোপন রাখতে সন্ন্যাস ও প্রকাশ্য দরবার ভেঙে
দিয়ে এসে বসতেন হামাম-এ। তৈজমদনরত শাহ-
য়েন-শাহ-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসত আপাদ-

গ্রন্থক কালো কাপড়ে ঢাকা কেউ। না-টোলমর্দন-কারী ক্রীতদাসের মাধ্যমে কথাটা জানাজানি হয়ে যাবার আশঙ্কা নেই। লোকটা অত্যন্ত বিশ্বস্ত এই শব্দ নয়, বোঝা এবং কাঙ্গা।

কোনো কোনো দিন স্নানের আগে সম্রাট সফর-তদারকীতে যেতেন। সঙ্গে থাকত দারোগা-ই-ইমারৎ আলি মর্দন খাঁ। কিল্লার ভিতর যে-সব মোকামে কাজ হচ্ছে তার তিল তিল বৃদ্ধি দেখতে দারুণ আমোদ পেতেন শাহজাহাঁ। ক্রমাগত বিশ-ত্রিশ বছর এ-ভাবে কাজ দেখে দেখেই ঐ চারুশিল্প সম্বন্ধে তাঁর বেশ কিছুটা এলেম পয়দা হয়েছিল।

বলতে ভুলেছি, ঐ দেওয়ান-ই-আমের কেন্দ্রস্থলে প্রতীক্ষা করত 'তন্ত-ই-তোস' বা ময়ূর সিংহাসন। 1628 সালে শাহজাহাঁর অভিষেক উপলক্ষ্যে এটি নির্মিত। এ সিংহাসন আজ নিশ্চিহ্ন; এর একটি ব্যর্থ অনুকরণের উপর এই সেদিনও বসেছেন ইরানের শাহ, খোমেনি কর্তৃক বিতারিত হবার পূর্ব পর্যন্ত। ময়ূর সিংহাসন নিশ্চিহ্ন হলেও তার পূর্ণ ইতিকথা ধরে রেখেছে ইতিহাস। সে-আমলে এজন্য খরচ পড়েছিল দশ লক্ষ তুংকা, গোটা লাল-কিল্লার যাবতীয় নির্মাণবায়ের দশভাগের একভাগ! জমি থেকে কিছুটা উঁচুতে একটি আয়তক্ষেত্রের আসনে শ্বাদশটি স্তম্ভ। উপরে 1.6×1.2 মিটার (প্রায় 6'×4') মাপের একটি সুবর্ণচন্দ্রাতপ—মণিমুক্তাখচিত শ্বাদশটি কনকস্তম্ভ, বৃক্ষকাণ্ডের অনুকরণে। তা-থেকে সুবর্ণ শাখায় প্রতিটি পত্র হীরকখচিত। প্রতিটি স্তম্ভের উপর এক-জোড়া করে বিকচ-কলাপ ময়ূর—হীরা-মুক্তা-পান্নায় ঠাশা। সিংহাসনে আরোহণ করতে হত একটি রজত-সোপান বেয়ে। মৃগল সভাকবি দর্শককে সর্বিনয়ে বলেছেন—বাণীটা খোদাই করা ছিল সোপানের গায়ে : "মণিকার আর কতটুকু মূল্যবৃদ্ধি করতে পেরেছে? এই দীন আসনের তো এটুকুই দাম—ও শাহ-রেন-শাহ-এর চরণচুম্বনধন্য!"

চাটুকারিণ্ডে এ শ্লোক সিংহাসনের উপযুক্ত!

শিবপ্রহরে হারেমের এক সুসজ্জিত কক্ষে বড়-হাজিরায় আরোজন।

জাহাঁপনা এসে বসতেন তাঁর চিহ্নিত আসনে। সম্মুখে মানান পদ থরে থরে সাজানো। ইতিপূর্বেই একদল তাতারী 'খানা-তদারিখ' এসে প্রতিটি পাও থেকে এক-এক টুকরো তুলে নিয়ে মূখে দিয়েছে, স্বয়ং আজুর্বান্দ বেগমের উপস্থিতিতে। পরীক্ষিত হয়েছে, রত্নখণ্ডালায় কোনো আহার্য গোপনে বিষ মেশানো

হয়নি। এসব সম্রাটের নৈপথ্যে। তিনি এসে সিক-পিরাচ শাহী-পোলাও, আধ-টুকরা মৃগ-মুসল্লম্ অথবা এক চামচ ফিরনি মৃৎ দিলেন-কি-দিলেন না। সামান্য দিবানিদ্রা সেরে উঠে দেখতেন, শাহী-পালঙ্কের পায়ের কাছে নিশ্চুপ বসে আছেন আজুর্বান্দ। নিত্য ত্রিশ-দিন। এ সময় হারেমের তরফ থেকে বেগম-সাহেবা কিছু আর্জি পেশ করতেন। কারও স্নেহের সাদির জন্য খিলাৎ, কারও পিতৃশ্রাস্থের খয়রাৎ, কখনও বা কোনও বিগতভর্তা মেহেজবানীর ভরণপোষণের মাসো-হার। শোনা যায়, মমতাজমহল অন্তিমত দয়ালু ছিলেন। তাঁর শরীফ-খয়রাতে অনেক অনাথা আবার পায়ের নিচে জমিনের স্পর্শ পেয়েছে।

মৃগল-হারেম সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই অস্পষ্ট ধারণা। হারেম মানে কিছু ইমারৎ নয়—হারেম একটা 'ইন্সটিটিউশান', একটা প্রতিষ্ঠান। সেখানে বাক্সার আছে, ধোপাখানা আছে, দর্জিখানা আছে, নাপিত আছে, রান্নাঘর, ভাঁড়ার, খেলার মাঠ, স্নানাগার, শিক্ষায়তন কী নেই? মায় ছোট ছেলে-স্নেহেদের 'ক্লেস্'। পৃথক তহখানা, পৃথক দফতর,—একটা স্মোট স্বায়ত্বশাসনব্যবস্থা। হারেম-তন্তের মধ্যমণি তথা প্রশাসনিক প্রধান হচ্ছেন সারাহ-বেগম, পাটরানী। হুমায়ূন থেকে আলমগীর, গোটা গ্র্যান্ডমৃগল জমানার এ-পদে পর্যায়ক্রমে অধিষ্ঠিতা ছিলেন : গুলবদন, মরিয়াম জামানী, সালিমা, নূরজাহাঁ, মমতাজ ও উর্দু-পদুরী বেগম। একটা প্রকাণ্ড ফাঁক থেকে বাছে—মম-তাজের মৃত্যু থেকে শাহজাহাঁর মৃত্যু পর্যন্ত, পরিত্রিশ বছরের। যতদূর অস্পষ্ট করতে পারি, ঐ সময়কালে হারেমের মধ্যমণি ছিলেন চিরকুমারী জাহান-আরা, শাহজাহাঁর অন্য কোনো পত্নী নন।

হারেমের নিরাপত্তার জন্য তিন জাতির ব্যবস্থা। প্রথমতঃ, তাতারী রণনীদেব একটি অস্তর-বেক্টনী। উজ্জবেগিস্তান ও তুর্কীস্থান থেকে এদের আনা হত। অত্যন্ত বলশালী, অস্ত্রচালনার দক্ষ এবং বিস্মৃত। বার্নিয়ার বলছেন, "in comparison the Amazons were soft and timorous" (বাঘের তুলনায় স্কিথিয়ার পৌরাণিক নারী বোঝা অমাজন-দেব ও মনে হবে পেলব ও ক্রীড়ানু)। দ্বিতীয়তঃ, খোজা-বাহিনী। তারাও হারেমভূক্ত। তৃতীয়তঃ, বিস্মৃত এক পুরুষ-বাহিনী; কিন্তু তারা থাকত হারেমের বাহির দিয়ে বেঁটন করে।

সে বাইহোক শাহজাহাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার

ফিরে আসা থাক। অপরাহ্নে বাদশাহ্ যে কবে কোন-
দিকে সফর-উদারকিতে যাবেন, তা কাকপক্ষীতে জানে
না। হয় পূর্বাভাগে, নয় দক্ষিণ-খানায়, কিম্বা
অশ্বাবাসে, পিলখানায়—স্বচক্ষে দেখতে, পোখা
জানোয়ারগুলো ঠিকমতো দানাপানি পাচ্ছে কি না।
সে সময় 'কার কপালে কী যে আছে বলা নাই যায়।'

তদারকিতে যাবার মন না হলে আবার এসে বস-
তেন শাহ্ বৃজ্-এ। দিনের শেষ রাজকার্ষে। সারা-
দিনে সঞ্চিত জরুরীবার্তা কিছু থাকলে শুনতেন ও
নির্দেশ দিতেন। কখনও বা আলিমদর্দন খাঁ, আহমেদ,
হামিদ প্রভৃতি স্থপতিবিদদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ
হত—তাজমহল অথবা অন্য কোন স্থাপত্য বিষয়ে।
পঞ্জাবে একটি আড়াই শ' কিলোমিটার দীর্ঘ খাল
খনন করার প্রস্তাব নিয়ে অনেক দিন তিনি বাস্তুবিদ-
দের সঙ্গে কথা বলেছেন, নকশা ও হিসেব-নিকেশ
পরীক্ষা করেছেন। সে কাজে হাত দেওয়া হয়নি শেষ
পর্যন্ত। তাজমহলের আকাশচুম্বী খরচের জন্যই।
পঞ্জাবের কৃষক চাষের জল পেল না, কালের কপোল-
তলে একবিন্দু নয়নের জলের খাতিরে!

শাম-ওস্তের নামাজের সময় হলে সভা ভঙ্গ হত।
শাহ্ জাহাঁ ছিলেন অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ সদ্গুণ মদসলমান।
নামাজ ফাঁকি কেত না তাঁর। বৌদ্ধ নামাজান্তে বাদশাহ্
এসে বসতেন নৃত্য-গীতের আসরে। তারও জমাদি
বদলেছে। আকবরী-আজমে ফতেপুর-সিক্রিতে সঙ্গী-
তের আসর বসত অনুপ-তালোও-এ, হারেমের বাহিরে।
তানসেন, কৈজ, বাওরা প্রভৃতিদের ঘিরে বসত শূদ্দ-
মাত্র পুরুষ শ্রোতা। হারেম থেকে কোনো সঙ্গীতানু-
রাগিনী হয়তো এসে বসতেন; কিন্তু তাঁরা থাকতেন
পিছনের করোকা-ঘেরা পর্দার আড়ালে। এখন ধূপদ-
ধামার-খেয়াল নিয়েছে বিদায়, এসেছে ঠংরী। এখন
পাখোয়াজ-বীণ-তানপুরা গেছে অনাদরের নেপথ্যে,
আসর জন্মিয়েছে এস-রাজ-ডুগি-তব্জা ও ঘুংঘুটে!
তাই সঙ্গীত-সরস্বতী এখন স্তব্ধ পর্দানশীন। কাম-
দার মখমলের তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসেছেন বাদশাহ্—
সামনে সুবর্ণপাশে ইম্পাহানী ভূঙ্গার, আর বাগ-
দাদী চষক,—ঠিক যেমনটি দেখেছি ইতমদ্ উদ্দৌলার
প্রচীর-চিত্রে। আলবোলায় সুগন্ধী তাম্বাকু। আতরের
গন্ধ পাল্লা দেয় বস্রাই গোলাপের সৌগন্ধের সঙ্গে।
প্রকাণ্ড ময়ূরপাখীর বীজন করে বিকচ-যৌবনা সুন্দরী
বাদী। হারেম-সুন্দরীরা থাকেন আশেপাশেই। আর
সামনের পাখা-চক্রে নিত্য-নূতন-নটকীর নূপুর-

নিকণে সচকিত হয়ে উঠত সাম্ভা-আসর। শীশ-মহলের
হাজরো দর্পণে প্রতিবিম্বিত হত নৃত্যরতা বাঈজীর
হাস্য-লাস্য-বিমণ্ডিত যৌবনোচ্ছ্বাস।

রাত দশটায় ভেসে আসত অনতিদূর নকরখানা
থেকে যামঘোষণা অথবা যমুনার পরপার থেকে
শিবাবদনি। আসর ভাঙত এবার। ওড়না সামাল দিয়ে
সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পথ করে দিত বেহেস্ত-হরুর
দল। বস্রাই-গল্‌টি হাতে নিয়ে জাহাঁপনা সেই
সারবাদি অনিন্দ্যসুন্দরীকুলের আদাবকে স্বিধাবিভক্ত
করে এগিয়ে যেতেন খোয়াবগাহ্-এ। শয়নকক্ষে।

এই মনোহর-উজ্জ্বল জন্য গোটা হারেম রুদ্ধ নিশ্বাসে
সারাদিন প্রহর গুণত।

সকলেই ইতি-উতি চাইতে থাকে, যেন অন্যমনস্ক,
—কিন্তু সকলেই অলক্ষ্য লক্ষ্য করে বিশেষ এক-
জনকে। সে বাদশাহ্‌র সারাহ্-বাদী—একান্ত-পরি-
চারিকা। সে কোন্‌ ভাগ্যবতীর দিকে এগিয়ে যায়।

সম্রাটের জাহাঁর পাশে নিত্য-নূতন খাদা,
সঙ্গীতজ্ঞরা শোনায় নিত্য-নূতন রাগ-রাগিণী, নত-
কীর বদল হয় প্রত্যহ—শূদ্দ মাত্র শয্যাসঙ্গিনী বদল
হবে না? এত বড় বেরসিক কোন বাদশাহ্? নিত্য-
নূতন নারীদেহের গোপন রহস্য উন্মোচনের উদ্দীপনা
না থাকলে কিসের এ বাদশাহী?

অবশ্য অধিকাংশ দিনই ডাক পড়ত সারাহ্-
বেগমের : মমতাজ মহলের।

এমন কি রাত্রের প্রথম প্রহর অন্য নারী সঙ্গে যাপন
করার পরেও।

প্রকাণ্ড মর্মরমণ্ডিত কক্ষের কেন্দ্রস্থলে বিরাটাকার
শাহ্-পালঙ। শ্বেতশয্যা—পাখির পালক-ঠাসা নরম
গদী, মখমলজড়ানো কামদার তাকিয়া। পাশের
মেজ-এ রাখা আছে সুদূর-ভূঙ্গার, চষক, তবক-মোড়া
পান, গোরে মালা, আতরদান। অন্তরালবর্তিনী
খিদমদ্‌গারের হেপাজতে-রাখা তাম্বাকুর প্রসারিতবাহু
আলবোলার নলমুখ। সম্রাট কিন্তু সরাসরি শয্যায়
উঠে বসতেন না। এ কক্ষে সারাহ্-বেগমের নিজস্ব
তত্ত্বাবধানে সায়মাশটা সারতেন। এই সময় বরোকার
বাহিরে উপস্থিত থাকত কিছু নিপুণ কথাকোবিদ
অথবা উস্তাদ গায়ক। কক্ষের অভ্যন্তরভাগ তাদের
দর্শিতগোচর নয়; কিন্তু এ-পাশ থেকে তাদের কণ্ঠস্বর
শোনা যেত। বাদশাহ্‌র অভিরুচি অনুযায়ী উস্তাদ
ইমন অথবা কানাড়ায় তান ধরত, অথবা কথাকোবিদ
কিছু পাঠ করে শোনাতে। ফাসীতে। শাহ্ জাহাঁ

আরবী, ফার্সী দুটোই জানতেন। মমতাজও। কোনো কোনো দিন গম্প পাঠ হত—গল্-ও-বুল্-বুল, শিরিন-ও-ফরহাদ, কিম্বা লায়লা-ইয়ে-মজনু। শাহজাহাঁর আর একটি গ্রন্থ বড় প্রিয়—বাবুর-বাদশাহর আত্ম-জীবনী। না, চুপ্-তাই তুর্কী-ভাষায় লেখা মূল গ্রন্থটি নয়, মহাপণ্ডিত আবদুর-রহিম খান-ই-খানান অনূদিত ফার্সী গ্রন্থটি।

হঠাৎ নজর হয় বাদশাহর—বিশ্বোষ্ঠে চম্পকাঙ্গুলি চাপা দিয়ে আশ্লেষণয়না মমতাজ একটি বিজ্জ্বলগন্ধে রোধ করবার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন। বাদশাহ হাসেন, বলেন, নিদ্ আসছে ?

সলজ্জ মাথা নেড়ে বেগম-সাহেবা বলেন, না না, চলুক না আরও কিছুক্ষণ : জাহাঁপনার যখন অভিরুচি—

বাদশাহ ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলেন, ভুল বলছ ! তোমার জাহাঁপনার অভিরুচিটা অন্য-জাতের।

করতালি দিয়ে ওঠেন আচম্কা। তৎক্ষণাৎ স্তব্ধ হয়ে যায় পাঠকের কণ্ঠস্বর। দ্রুতচ্ছন্দ কিছু পদধ্বনি মিলিয়ে যায় পাষণচক্ষরে।

বাদশাহ উঠে আসেন তাঁর নয়নের-মণি, দিল্-কাকলিজা মমতাজের পালঙ্কে। অথবা তার হাতটি ধরে বেরিয়ে আসেন খোয়াবগাহ-সংলগ্ন পূর্বদিকের চব্দ-তরায়। বিশেষ, যে-রাতে চাঁদ ওঠে—যমুনার ঢেউয়ে ঢেউয়ে ঝিকিঝিকি নাচতে থাকে চাঁদনীর কঙ্ক ! সেখানে, সেই জ্যোৎস্নাস্নানত অলিন্দে হয়তো কেঁপে-ওঠা আঙুল দিয়ে শাহ-য়েন-শাহ বসিয়ে দিতেন সেই বসরাই-গদালাবিট ভারতসম্রাজ্ঞীর আনন্দে-রাঙা কর্ণমূলে।

প্রতিভাবান স্থাপত্যবিশারদ না হলেও শাহজাহাঁ প্রথর বুদ্ধিমান ছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। স্থাপত্য-বিষয়ে শেরশাহ অথবা আকবরের মতো আলিম ছিলেন না বটে ; কিন্তু ও বিষয়ে জাহাঙ্গীরের মতো উদাসীন অথবা আলমগীরের মতো নিরেট ছিলেন না। গৃহ-নির্মাণ-শিল্পকে আন্তরিক ভালবাসার জন্য ও নিয়ে ভাবতেন, অধিকারীর শলাহ শুনতেন। দীর্ঘদিন এই প্রয়োগবিদ্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখায়, ঘষে ঘষে যতদূর হয়, ততদূর শিল্প-সচেতনতা তাঁর জন্মেছিল। কিন্তু অভ্যাসের অন্তর্গত বর্ণিকাভঙ্গে নিপুণতা লাভ করা যায়, ক্যালিগ্রাফীতে

দক্ষতা আনা যায়, মৌলিক স্থাপত্যদৃষ্টি আসে না ! শাহজাহাঁর সৃষ্টিগুণি লক্ষ্য করে দেখুন—শুধুই পৌনঃপুনিকতার ক্রমাবর্তন। অধিকাংশই একতলা মোকাম, ম্বেতল-ট্রিতল-পঞ্চতল পরিকল্পনা নেই। উপরে সচরাচর গম্বুজ নেই, সবই জমির সমান্তরাল ছাদ। তাতে একই ধরনের ছাটী। ভিতরে নয় বাঁক-ওয়ালা খিলান। খিলানের ভার বেসব প্রায়স্তম্ভের (pilaster) উপর পড়ে তার দুই প্রান্তে দুটি অনিবার্য কভেটো। খিলানগুলি প্রায়স্তম্ভের উপর সমান্ত-রালভাবে সাজানো। তারা ইমারতের দৈর্ঘ্যের দিকে এবং প্রস্থের দিকে পরস্পরকে সমকোণে ছেদ করে। আগ্রা-কিল্লার—দেওয়ান-ই-খাশ, খাশ মহল, দেওয়ান-ই-আম, মতি মসজিদ ; দিল্লী লাল-কিল্লার খাশ-আম, রঙমহল, খোয়াবগাহ, হামাম সবটাই ঐ একতলা পরিকল্পনা। সবটাই প্রসারিত-বাহুর ছম্ভা, নয় বাঁক-ওয়ালা খিলান এবং আদান্ত সাদা মার্বেল ! বৈচিত্র্য নয়, পৌনঃপুনিকতায় বে-এক্টিয়ার এই বাদশাহ। তাই তাঁর দিল্লী-আগ্রা-কাবুল-কাশ্মীর-লাহোরের স্থাপত্য-কীর্তিতে নেই ফতেপুর-সিক্রির বাদগীরের মতো পাঁচ-তলা পিরামিডী পরিকল্পনা, সেখানকার খাশমহলের সেই একস্তম্ভের অতুলনীয়তা, বীরকল-প্রাসাদের মতো ম্বেতল-মোকামে ম্বেত-বাজনার বৈচিত্র্য, তুর্কী-সুলতানা কোঠির কৃত্রিম পাথরের বাঙলো ধরনের একচালা, বুলন্দ-দরওয়াজার মতো আকাশচুম্বী দাচোঁর বজ্রনা কিম্বা হিরণ-মিনারের মতো রোমাঞ্চিততন্ম স্মারক-স্তম্ভ !

শাহজাহাঁ-শৈলীর আর এক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—আগেই বলেছি, তারা শুধু অন্তরেই নয়, বাহিরেও ‘মমতাজ-নারী’। মসজিদ বর্জ্য অথবা দিল্লীর জাম-ই-মসজিদ নিতান্তই ব্যতিক্রম—প্রথম ক্ষেত্রে আব-ওয়া-অজদাদকে, ট্রাডিশানকে, অস্বীকার করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল তরুণ সম্রাটের পক্ষে ; ম্বেতীয় ক্ষেত্রে সির-য়তী কানুনকে। বাদ বাকি মোকাম কিল্লুল ঔরং !

হিন্দু যুগে স্থাপত্যে পুরুষ-প্রকৃতির সহাবস্থান ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। নাগর-স্থাপত্যে শিখর-সম্মিলিত রেখ-দেউল পরুষ-প্রতীকী, তার কণ্ঠলগ্না পীড়-মন্ডিতা জগমোহন আবাশিকভাবে স্ত্রী-জাতীয়া। হিন্দু-স্থপতি—বিশেষ করে নাগর-স্থাপত্যে, হর্মের লিপ্যভদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। রেখ-দেউল ও পীড়-দেউলকে পাশ থেকে দেখলে যান হত একটি মিথুন, যেন সদা-বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী অগ্নিতে ঘৃতাহুতি

দিচ্ছে (চিত্র-11.2)। মুসলমান স্থপতি ইমারৎকে পুরুষ হিসাবে কল্পনা করে এসেছে এতদিন। আকবরী-জমানা-তক্ ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্য ছিল মূলতঃ পুরুষপ্রতীকী। ইতমদ্-উদ্-দৌলা হচ্ছে প্রথম সংক্রামণ-ধর্মী—‘ট্রানজিশন-ফেজ’ ; তারপর শাহ-জাহার যুগে স্থাপত্য নিছক প্রমীলারাজ্য।

তাই বলব, স্থাপত্যের নিরিখে আকবর ও শাহ-জাহার পাখকা শেরশপীর ও শেলীর! দুজনেই বিদ্রুতকীর্তি—কিন্তু মেজাজের ফারাক আশমান-জমিন্। আকবর ভূয়োদর্শী—নিত্য-নূতন পরীক্ষায়



চিত্র-11.2 হিন্দু-স্থাপত্যে ইমারতের লিঙ্গভেদ ;
রেশ-পক্ষি বিন্দে।

উৎসাহী—‘রোপিটেশান’ তাঁর ধাত্তে সয় না। বিশুদ্ধ হিন্দু-শৈলী, হিন্দু-অসলীম মিস্ত্র শৈলী, বিশুদ্ধ মুসলিম-শৈলী তিনই বানিয়েছেন। মদুজতবা আসী-সাহেবের ভাবায় ‘কতুবা মসগমানে’র প্রধান্য বেশি, কতুবা হিন্দুর। মাঝে-মাঝে এ-তিনের ব্যার-দলছট্ বুলন্দ-দরওয়াজা অথবা হিরণ-মিনার। সেন অসামান্য ট্রাজেডিক, কমেডিক, মোলোড্রামা-রচনা করার পরেও অনবদ্য সনেট রচনা করছেন শেরশপীর। অপরপক্ষে শাহ-জাহারী অভিব্যক্ত একমুখী, শেলীর মতো গিরিক-কবিতার মাদকতা। আঙ্গিকের দিক থেকে আকবর সর্বত্রগামী না হলেও বিচিহ্নগামী। একটু হাতে গড়া

এত বিভিন্ন আঙ্গিকের, বিভিন্ন মেজাজের সার্থকসৃষ্টি বিশ্বললিতকলায় অতি অল্পই সৃষ্টি করতে পেরেছেন কোনও মরমানুষ! এখনই যে দীর্ঘ তালিকাটি পেশ করেছি : ঐ আগ্রা-কিল্লার দিল্লী গেট, জাহাঙ্গীরী মহলের বাঙলা-চালা, ফতেপুর-সিক্রির দেওয়ান-ই-খাশ, দেওয়ান-ই-আম, প্রতিটি বেগমের ভিন্ন ভিন্ন জাতের প্রাসাদ, সেলিম-চিস্তির কবরের ব্র্যাকেট, জাম-ই-মস্-জিদে’র করবেলিং, হিরণ-মিনার, বুলন্দ-দরওয়াজা এবং সেকেন্দ্রা প্রবেশ-তোরণের ঐ মিনারিকা-চতুষ্টয়ের পরি-কল্পনা যে একই ব্যক্তির ধ্যানে ধরা দিতে পারে তা যেন বিশ্বাসই হয় না। সমান্তরাল ঐতিহাসিক নজির হিসাবে তিনটি বিচিহ্নদর্শন শতনরীর কথা মনে পড়ছে, যা তিনজন যুগপুরুষ তিন যুগে পরিয়ে দিয়েছেন বিশ্ব-ললিতকলার কব্দকণ্ঠে : ডার্বিন-অব-দ্য-রক, শেষ সায়মাশ, মিলানের অশ্বারূঢ় মূর্তি, মোনালিজা ও নোটবুক। ডেভিড, পীতা, মোজেস্, সেন্ট পীতর গীর্জা, লরেঞ্জান্তির সমাধিসোধে উষা-রাত্রি-দিবা-গোধূলী, সিস্তিন চ্যাপেল সিলিঙ ও শেরবিচার। গীতাজলি, গোরা, গল্পগদ্য, শেষের কবিতা, শান্তি-নিকেতন প্রবন্ধাবলী, কণিকা, বিশ্ব-পরিচয়, সহজপাঠ, ও সভ্যতার স্ফুট!

সম্রাট শাহ-জাহার দীর্ঘ একটশ বছরের সাধনা-প্রসূত অসংখ্য ইমারৎ থেকে এমন একটি বৈচিত্র্যমালিকা রচনা করতে পারবেন না কিছতেই।

তবে হ্যাঁ, জার্নি, এ তর্কে সুপ্রীম কোর্টের আখেরি রায়টাও জানা আছে আমার ; সে ‘রায়’ : ‘তথ্যপি আমার গরু নিত্যানন্দ রায় !’

তর্কে আমাকে হার মানতে হবেই।

কারণ অজ্ঞাত ঈশা-আফান্দ-নামক তুরূপের টেক্স-খানা ঘটনাচক্রে হাতফিরির সময় পড়েছিল ও হাতেই—যার মার নেই : তাজমহল।

আগ্রা-কিল্লার ভূমি-নকশা বা ‘লে-আউট প্ল্যান’ আকবর পরিচ্ছেদেই আলোচিত হয়েছে (চিত্র-9.7)। আকবরের আমলে নির্মিত জাহাঙ্গীরী-মহল ও আকবরী-মহলও আমরা খুঁটিয়ে দেখেছি। এবার ঐ কিল্লার পাট-জাহানী ইমারৎগুজি আলোচনা করা যাক। পাবেই বসেছি (পৃঃ 114) আকবর-নির্মিত বহু টমাবৎ ভূমিসং করে শাহ-জাহা হালফাশানের মার্বেল-মোকাম তৈরী করেন। সেগুলিই এখানে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হচ্ছে :

খাম্-মহল : জাহাঙ্গীরী মহলের উত্তরদিকে এবং আঙ্গুরীবাগের পূর্বদিকে এই মোকালাটি শাহজাহাঁর ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য নির্মিত। আদ্যন্ত সাদা-মার্বেলের। সম্মুখদৃশ্যে পাঁচটি খিলান, পাশ থেকে তিনটি—যথারীতি নয় পাপড়ি-ওয়ালা ; সমতল ছাদ, দু-পাশে দুটি ছত্ৰী। এর সঙ্গে এইবার তুলনা করুন দিল্লীতে অবস্থিত লাল-কিল্লার দেওয়ান-ই-খাশের। হুবহু একই বাড়ি ; যেন একে অপরের 'জবাব'। এই দুটি ইমারৎ—যা ভিন্ন দশকে, ভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে নির্মিত—তাদের সম্মুখ বা পার্শ্বদৃশ্য দেখে, প্ল্যান দেখে, যে-কোনও সেকশানাল এলিভেশান দেখে যদি কোনও গোয়েন্দা বলতে পারেন কোনটি 'হাম্‌টি' আর কোনটি 'ডাম্‌টি' তবে তিনি হয় শার্লক হোম্‌স্‌ নয় ব্যাসাস্টিক এক্সপার্ট ! এক দশক আগে-পিছে যমজ-সন্তান পয়দা করা যদি কৃতিত্ব হয়, তবে সে কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন শাহজাহাঁ। যে কারণে আজকের দিনে বিভিন্ন স্টেট পি. ডাব্লু. ডি., রেলওয়ে, বা সি. পি. ডাব্লু. ডি. ভিন্ন দশকে, ভিন্ন পরিবেশে 'টাইপ কোয়ার্টার্স' তৈরী করেন সে প্রয়োজন নিশ্চয় ছিল না শাহজাহাঁর। তাহলে এ-দুটি সৌধ হুবহু একই রকম হল কেন ? স্থপতি হিসাবে জাহাঁপনার দেউলিয়া-পনাই কি এতে ধরা পড়ছে না ?

শীশমহল : আঙ্গুরীবাগের উত্তর-পূর্ব কোণে, দেওয়ান-ই-খাশের সম্মুখে নির্মিত এই ইমারতে এত ভালো 'প্লাস-মোজেইক'-এর কাজ আছে যা ভূভারতে বিরল। দু-পাশে দুটি কক্ষ, একই মাপের (11.55 মি. × 6.40 মি.)। তার মাঝখান দিয়ে নয়-পাপড়ির খিলান-সমন্বিত গমনাগমনের পথ। কাচের কাজের এই নয়নাভিরাম প্রয়োগ কোশলটি শাহজাহাঁর উৎসাহে বাইজেন্টাইন থেকে ভারতবর্ষে আসে। ভারতীয় শিল্পীরা প্রয়োগ-কোশলটুকুই এনেছেন—নকশার ডিজাইনে স্বকীয়তার ছাপ। এই ইমারতের মেকের তলা দিয়ে একটি প্রবহমান পয়ঃপ্রণালী থাকায় কোনো কোনো গাইড বইতে একে 'হামাম' বা স্নানাগার কলা হয়েছে। সেটা ঠিক নয় ; জলকে আনা হয়েছে অন্য-কারণে—মূলতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কক্ষটিকে শীতল রাখতে।

মাস্‌মাদ বুরজ : শাহজাহাঁর প্রথম পর্বারের কীর্তি। মিনাংশ গোলাকৃতি। আকবরী প্রাচীরের

সঙ্গে ঐকতান প্রচনা করে একই ধরনের নিরেট পাথরে, একই শৈলীতে নির্মিত। লক্ষণীয়, এটির নির্মাণ সময়ে শাহজাহাঁ তার নিজস্ব স্টাইলটা বড়জে পাননি। তখনও তিনি আকবরী প্রভাবমুগ্ধ নন। তাই এর স্থাপত্য পুরুষধর্মী। মিনাংশে যে অষ্টভুজাকৃতি অলিঙ্গ তার তলার হিন্দু-শৈলীর স্যাকেট। এমন কি উদ্ভাসের আট-কোণা স্তম্ভবিধিত খিলানগুলিও নয়-পাপড়ি-ওয়ালা ম্যানারিজম্‌ নেই। সেগুলি কবেলিঙ-করা, নিছক হিন্দু বা আকবরী রীতিতে তৈরী। উভয় তলেই ছজ্জার নিচে হিন্দু-স্যাকেট।

এখানেই শাহজাহাঁর বন্দীজীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। এর পাশের অলিঙ্গই তাক দেখতে দেখতে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পড়ে। যে দৃশ্যটি অবনীন্দ্রনাথের বিশ্ববন্দিত 'সন্ন্যাসের মৃত্যুতে ধরা পড়েছে।

একটা কথা। অবনীন্দ্রনাথ যদি তাঁর দৃষ্টিকোণ কয়েক মিটার পিছনে সরিয়ে নিতেন তাহলে একটা অদ্ভুত জিনিস ধরা পড়ত তাঁর ছবিতে, যে জিনিস অবনীন্দ্রনাথের অতি আপন, অতি আদরের : স্বাভা-দেশের খড়ো চালা ! (চিত্র—11.3)।

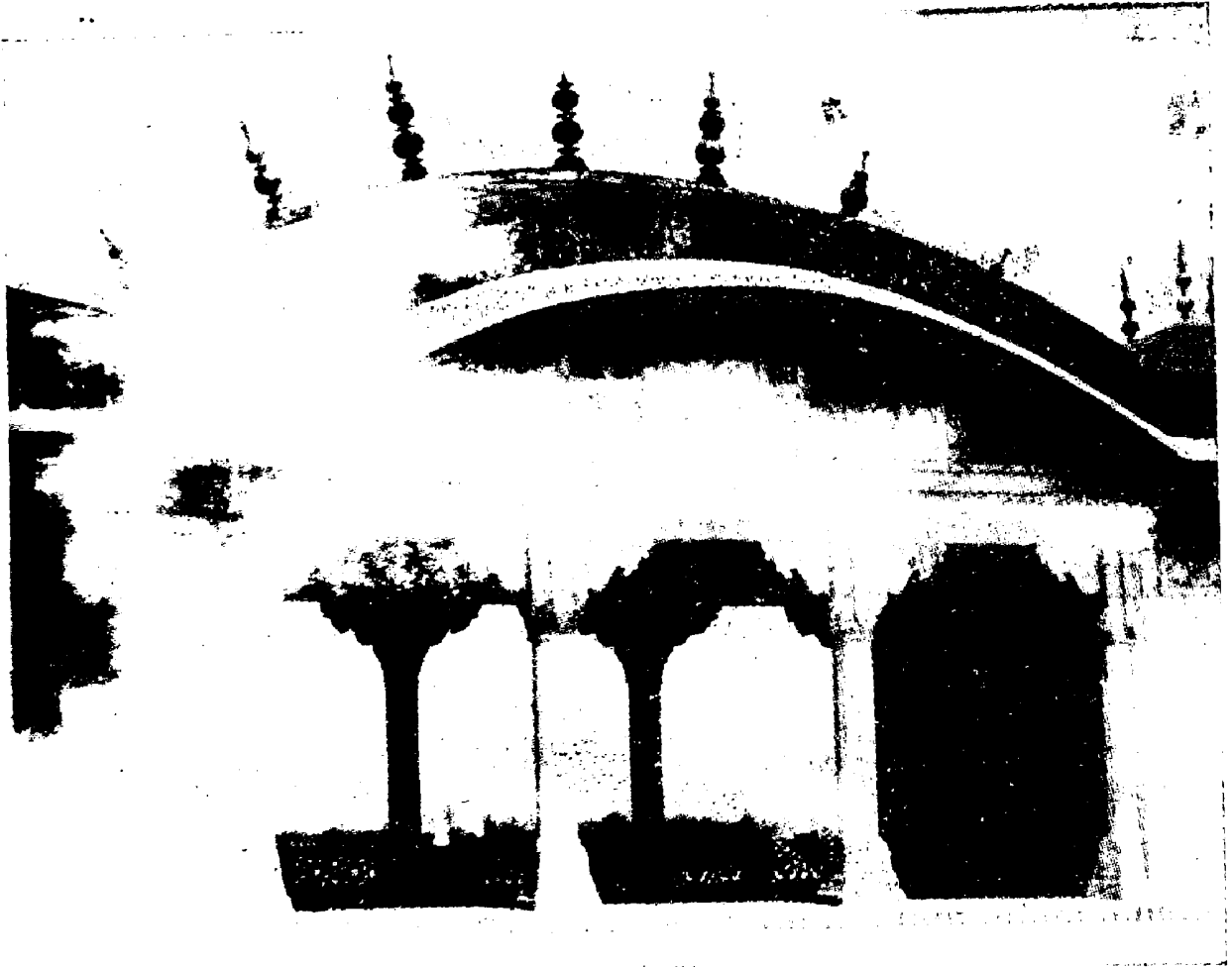
ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যে এটির অস্বাদন্য করেন আকবর। ইতিহাস তার সাক্ষী। এ রীতির প্রথম প্রয়োগ খাম্‌মহল সংলগ্ন চবুতরার (বর্তমানে নিশ্চিহ্ন)। আবুল ফজল তাঁর গ্রন্থে একে 'কুশখালী মহল' বলে উল্লেখ করেছেন। সেই বাঙালী কারিগর—যে চাঁদ-পানা বাঁশের ছাউনির 'বাঙলা-চালা'র অনুকরণে এই পাথরের ছাদ বানিয়েছিল, তার নাম ইতিহাস জানে না। তত্ত্বটা জানা থাকলে হয়তো সত্যেন্দ্রনাথের 'আমরা' কবিতার আরও দুটি ছত্র যোগ হত। কিন্তু তাঁর হাতের কাজ শাহজাহাঁকেও মুগ্ধ করেছিল। তাই এই বাঙলা-চালা আগা-কিল্লার মাঝে মাঝে রূপান্তর হয়েছে, যেমন এখানে, যেমন নাগিনা মসজিদে। এমন কি ধর্মাত্ম আলমগীর এই ছাদে তাঁর মতি মসজিদ বানিয়েছেন লাল-কিল্লায়। সম্ভবতঃ অজ্ঞাতে !

দেওয়ান-ই-খাম্ : সম্মুখদৃশ্যে যথারীতি নয় পাপড়ির পাঁচটি খিলান। ছজ্জামণ্ডিত সমতলছাদের একতলা মোকাম। তফাতের মধ্যে এখানে স্তম্ভগুলি জোড়ায় জোড়ায়। ছাদের উপর ছত্ৰী নেই। জোড়াস্তম্ভ নিশ্চয়ই একটা নতুন আইডিয়া ; কিন্তু ছত্ৰীর অনুপস্থিতি বোধহয় বৈচিত্র্যের পরিচায়ক নয়। মনে

হয়, ছটী ছিল, ভেঙে গেছে। আর তাই ছাদটা এত নেড়া-নেড়া লাগে।

কেওয়ান-ই-আজ : বৃহত্তর আয়তক্ষেত্র। সম্মুখ-দৃশ্যে নরীটি, পার্শ্বদিক্‌তে তিনটি শাহজাহানী পাৰ্পাড়ি-ওয়ারা খিলান। এখন বোধকারি জোড়া স্তম্ভের ফ্যাশন চলছে, এখানেও তাই। একই রকম প্রসারিতবাহু ছাড়া, ছটীহীন সমতল ছাদ।

নেই, সে ঘটি মতি মসজিদে সংশোধিত। প্ল্যানিং-এ কোন বৈচিত্র্য আশা করাই অন্যায্য ; কারণ সেটি ইন্দো-ইসলামী মসজিদ-এর চিরচর্চিত ছন্দ-মোতাবেক। শ্রী আর. নাথ বলেছেন, "তাজমহল সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যেহেতু-এ মসজিদের কাজ শুরু হয়, তাই আশা করাছি তাজের স্থপতিই এ কাজ করেছেন।"^৪ আমরা তাঁর সঙ্গে আদৌ একমত নই। তাজের যে বৈশিষ্ট্য—যার কথা পরে বিস্তারিত আলোচনা করেছি—তার



চিত্র-11.3 আগ্রা-কিল্লার যে অলিম্ব থেকে শাহজাহাঁ তাজমহল দেখতেন। উপরে বাঙলা-চালা।

নাগিনা মসজিদ : ছোট, কিন্তু নয়নাভিরাম। তিনটি গম্বুজ, মাঝেরটি কিছ্র বড়। মাঝের মোকর। এখানকার বাঙলা-চালার কথা বলছি। নাগিনা মসজিদে ছটী-পরিপূরক গুলদস্তা বদ্ধ হয়েছে।

মতি মসজিদ : মতি নয়নাভিরাম। নাগিনা মসজিদে কিল্লা-সম্বন্ধিত মিহরাবটি ঠিক পশ্চিমে

কোনও চিহ্ন নাই এ ইমারতের স্থাপত্যে। মতি মসজিদের প্রবেশ পথে ফাসীতে একটি দীর্ঘ বাণী উৎকীর্ণ করা। ইংরাজী অনুবাদে—গুণে দেখাছি তাতে ৪৫০টি শব্দ। তাতে অনেক কথাই বলা হয়েছে—‘আব্দুল মুজফ্ফর শিহাবুদ্দীন সাহিবকিরান-ই-খানি শাহজাহাঁ পাদশাহ্ গাজী’কে এর নির্মাতা বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং তাঁর নানান গুণের কথা বলা হয়েছে। জানানো হয়েছে, এর নির্মাণ ব্যয় তিন লক্ষ তাম্বা,

শাহজাহাঁর রাজত্বের ছাব্বিশতম বৎসরে, হিজরা 1063-তে (অর্থাৎ 1654 সালে) এটি সমাপ্ত হও জানানো হয়েছে। শুধু জানানো হয়নি বেতনভূক স্থপতির নামটা !

আগ্রা-কিল্লায় শাহজাহাঁ নির্মিত ইমারতে মার্বেলের উপর যে-সব নকশা তোলা হয়েছে, তার নৈপুণ্য অসাধারণ। নকশাগুলি অধিকাংশই পারস্য-রীতির, কিছু আকবরী-টঙ্কের। অল্টো রিলিভো (অর্ধোৎকীর্ণ) কিম্বা 'ইন্লে'-কাজ (মর্মর খোদাই করে ভিন্ন রঙের পাথর বসানো)। মাঝে মাঝে জলাধারে, ফোয়ারায় অথবা পয়ঃপ্রণালীর বিন্যাসছন্দে প্রয়োজনের

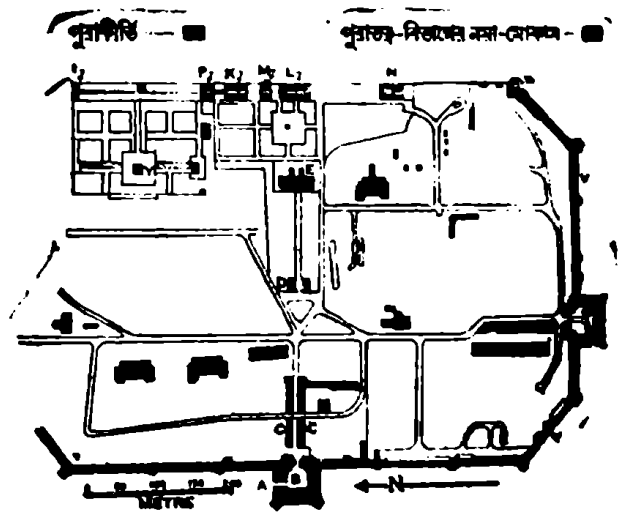
সঙ্গে সৌন্দর্য চমৎকার মিশ্রণী করেছে। নিদাঘ শ্বপ্রহরে এখন দর্শকের কাছে কক্ষাতন্ত্রের শূন্যতা সূর্বালোক প্রাতিফলন-জনিত কারণে পীড়াদায়ক মনে হতে পারে, কিন্তু সে আমলে এখানে স্বস্থসের রুরোকা টাঙানো থাকত ; তাই ঘরগুলি স্নিগ্ধ, শীতল ও মনো-রম ছিল। কচিং কখনও সন্ধ্যাট বৈচিত্র্য আনবার চেষ্টা করেছেন—জোড়াস্তম্ভের আমদানীতে, নাগিনা মস্-জিদের বাঙলা-চালায় অথবা নয় পাপড়ির ক্রান্তিকর খিলান কোথাও কোথাও বর্জন করে। নকশার কাজ সর্বত্র নিখুঁত। সংক্ষেপে বলা চলে, আগ্রা-কিল্লার শাহজাহানী কীর্তি ভাব ও লাভণ্যবোজনায় প্রত্যাশিত সার্থকতা লাভ না করলেও সুনিপুণ বর্ণিকাভাষে মনোমুগ্ধকর।

লাল-কিল্লা

লাল-কিল্লা দেখতে গিয়ে আজকের দিনে দর্শকের মনে দুটি প্রশ্নের উদয় হয়। এক,—মুগল প্ল্যানিং-এর প্রত্যাশিত সুসম ছন্দ, বাবুরী চাহর বাগ-এর জ্যামিতিক বিন্যাসটা কোথায় হারিয়ে গেল? ইমারৎ-গুলি আদৌ সুবিন্যস্ত নয়। বিক্ষিপ্ত, ছন্দবিজ্ঞ-ভাবে ইতস্ততঃ ছড়ানো। দুই,—স্তম্ভ-সমন্বিত ইমারৎগুলিতে দেওয়াল নেই কেন? শীতাতপ থেকে কী-ভাবে রক্ষা পেত ঘরের বাসিন্দা এবং কৌতূহলী দৃষ্টির অন্তরালে কেমনভাবে যাপিত হল গৃহবাসীর গার্হস্থ্য এবং বিশেষ করে দাম্পত্য জীবন?

প্রথম প্রশ্নটির জবাব : লাল-কিল্লার 'টাউন-প্ল্যানার' হামিদ ও আহমেদ (নাম দুটির উল্লেখ ছাড়া ইতিহাস প্রায় নীরব) আদৌ ইমারৎগুলিকে এলোমেলো ভাবে সাজাননি। সুসম ছন্দটি আজ আমাদের নজরে পড়ে না এজন্য যে, অনেকগুলি ইমারৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, বাগিচা নির্মূল হয়েছে এবং তার চেয়েও বড় কথা—পরবর্তী যুগে যারা মেরামতি করেছেন, রাস্তা বানিয়েছেন, তাঁরা সেই প্রাচীন ছন্দটি না-বুঝে অথবা না-মেনে কেরামতি দেখিয়েছেন। চিত্র-11.4-এ লাল-কিল্লার বর্তমান ভূমি-নকশাটি দেখা যাচ্ছে—নিঃসন্দেহে তা ছন্দ-বিরহিত। কিন্তু ফাগুর্সন-সাহেব তাঁর কালজয়ী গ্রন্থে 'একটি ভূমি-নকশা ছাপিয়েছিলেন 1910 খ্রীষ্টাব্দে। লেখক জানিয়েছেন, এই 'লে-আউট-প্ল্যানটি' প্রাচীন ফার্সী ভাষায় লিখিত একটি মূল

নকশার অনুসরণে (সেটি ফাগুর্সনের অধিকারে এই শতাব্দীর প্রারম্ভে ছিল, আশা করছি বর্তমানে পুরা-



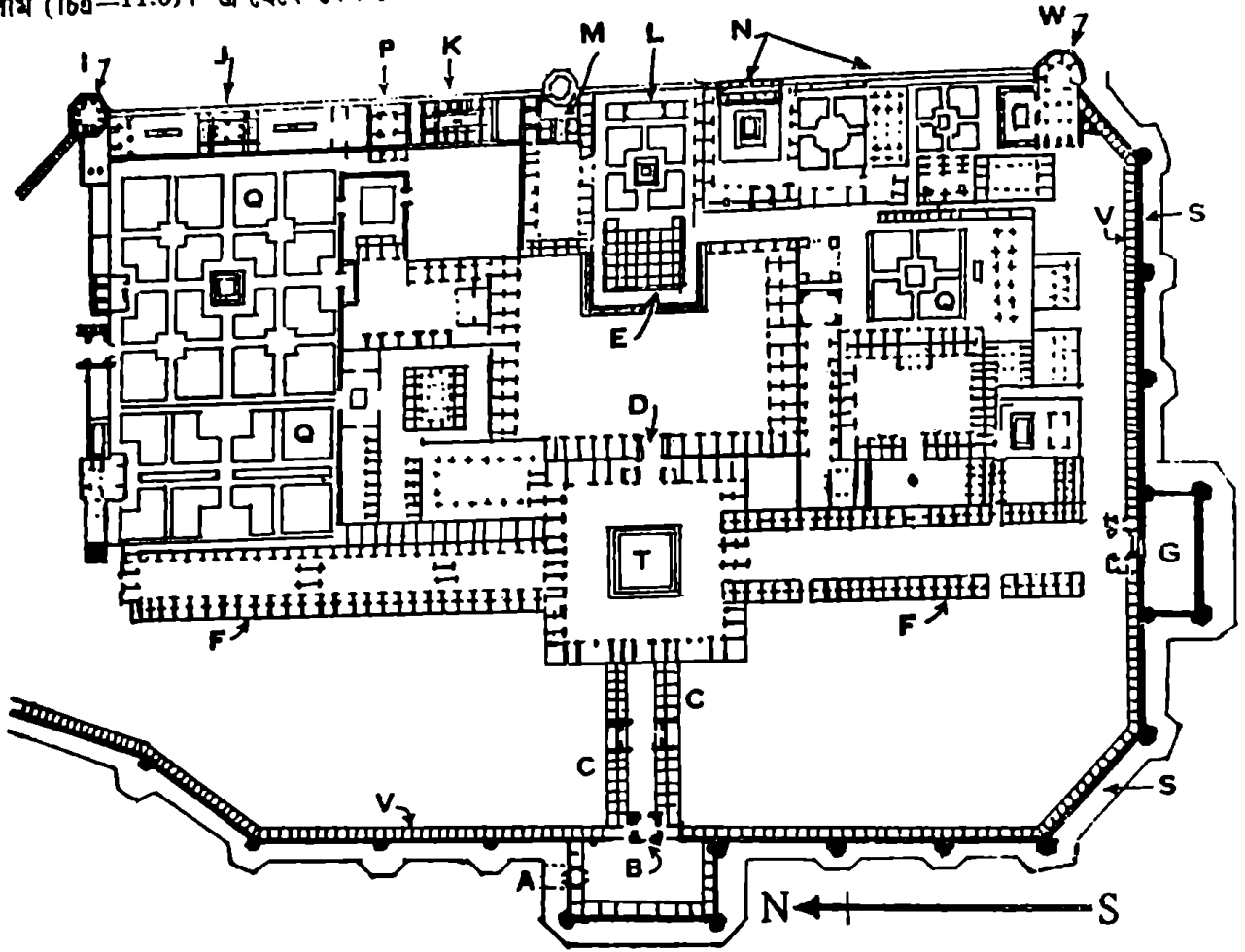
চিত্র-11.4 লাল-কিল্লার ভূমি-নকশা।
বর্তমান অবস্থা।

- | | |
|-------------------|-----------------|
| A-প্রাচীর | K-দেওয়ান-ই-খাস |
| B-প্রাচীরের গেট | L-রক্তমহল |
| C-মহল-বাগান | M-খোরাবগাহ |
| D-নকশ-খানা | N-মিউজিয়াম |
| E-দেওয়ান-ই-আম | P-হামাম |
| G-দিল্লী-দরওয়াজা | V-প্রাচীর |
| I-আহ-ব-জ | |

তত্ত্ববিভাগে সংরক্ষিত আছে)। সেই ভূমি-নকশার একটি অনুলিপি আমরা চিত্র-11.5-এ পরিবেশন করেছি। স্প্যান দেখে হয়তো সাধারণ পাঠক তদানীন্তন অবস্থাটা ঠিকমতো হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন না, তাই সেটি অবলম্বন করে গরুড়াবলোকনে-দেখা একটি 'আন্দাজী-চিত্র' বা 'কন্জেক্চারাল ড্রইং'-ও যোগ করে দিলাম (চিত্র-11.6)। এ থেকে বেশ বোঝা যায়, হামিদ

চিন্তা 'সেক্টরওয়াইজ'-বিভাগ, তার স্বরূপটা বোঝা যাবে চিত্র-11.7 লক্ষ্য করলে। এখানে আমরা 'টোটাল স্প্যানিং'-এর, অর্থাৎ বিন্যাসছন্দের আখ্যাটিকে তুলে ধরতে চেয়েছি—কোন প্রয়োজনের দিক থেকে কী-ভাবে অঙ্গগুণি সাজানো হয়েছে।

ফিরোজশাহ কিল্লার অনুসরণে পারিবারিক প্রয়োজনের ইমারৎগুলি শহরের পূর্বপ্রান্তে, নদীকিনার



চিত্র-11.5 লাল-কিল্লার ভূমি-নকশা ; শাহজাহানী জমানায়।

- | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| A—দু-বাইজ বা কাঠের সাজো | G—দিঘী-দরওয়াজা | P—হামাম |
| B—সাহার গেট | I—শাহ-বুর্জ | Q—চাহর বাগ |
| C—দুইসারি হলের মাকখান দিৱে প্রবেশপথ | J—মতিমহল | S—পরিখা |
| D—নক-করখানা | K—দেওয়ান-ই-খাশ | T—তালো |
| E—দেওয়ান-ই-আম | L—রঙমহল | V—দর্গা-প্রাচীর |
| F—মীনাকজার | M—খোরাবগাহ | W—আসাদ বুর্জ |
| | N—বেগম মহল | |

বা আহমেদ লাল-কিল্লার ভূমি-নকশা ছকবার সময় বাবুরী চাহর বাগ প্রথাকে অস্বীকার করেননি।

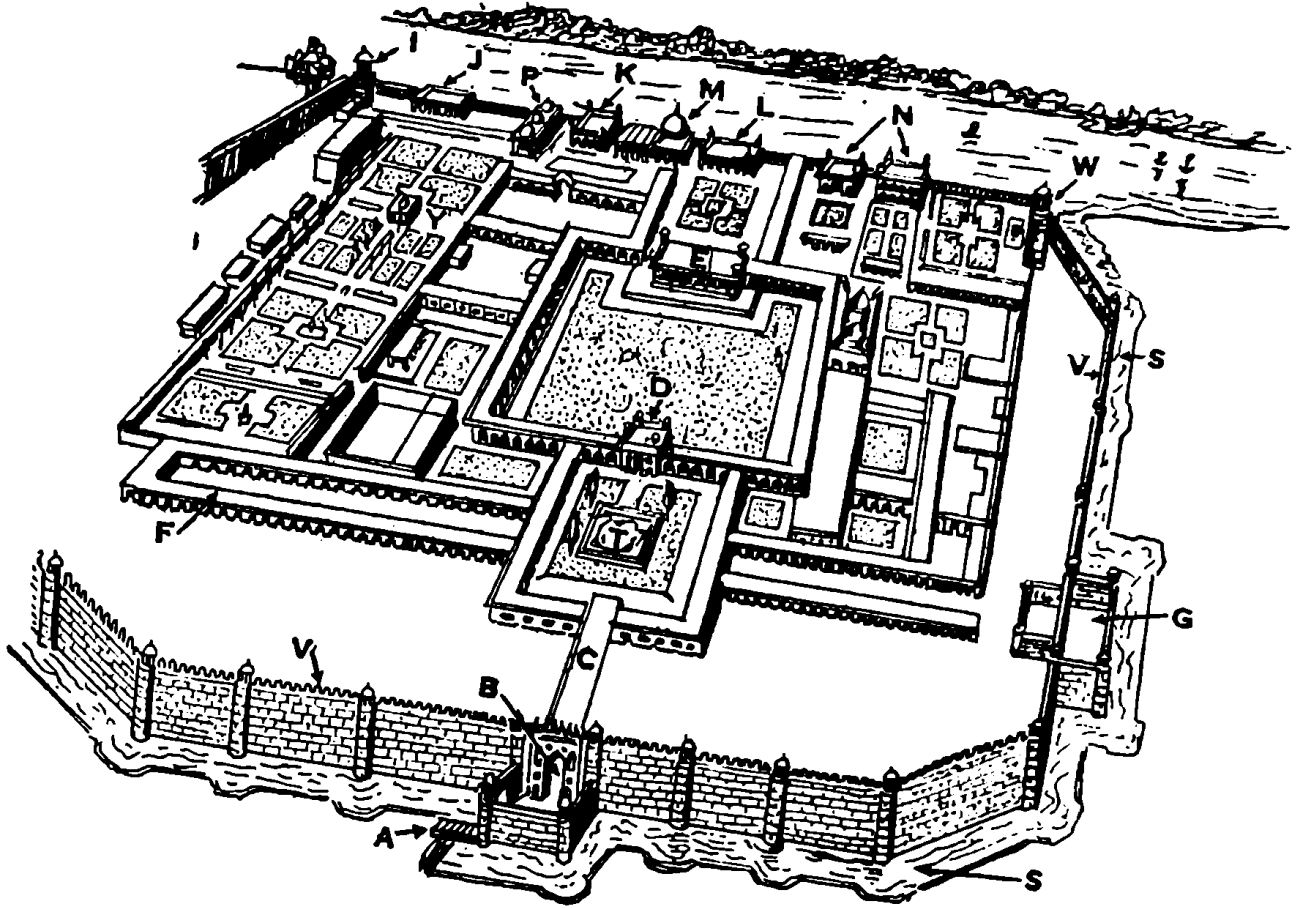
প্রকৃত প্রস্তাবে বিন্যাসছন্দটি রাজনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক—এই তিন প্রাথমিক প্রয়োজনের দিক থেকে অত্যন্ত সুবিন্যস্ত। নগর পত্তনের যে মৌল

বরাবর। মাঝখানে সম্রাটের আবাস, তার উত্তরে শাহজাদা এবং দক্ষিণে বেগমমহল। পশ্চিমপ্রান্তের কেন্দ্রবিন্দুতে (চিত্র-11.7) প্রবেশপথ (1); যেখান থেকে চওড়া সড়ক (2) বেয়ে আসতে হবে একটি বর্গক্ষেত্র আকারের উদ্যানে। তার কেন্দ্রস্থলে একটি জলাশয় (3) এবং

পশ্চিমপ্রান্তে নক্করখানা (4)। ঐ জলাশয়টির (3) দূর-দিকে উত্তর-দক্ষিণ লম্বা বিপণীর সারি-বাজার (12); দক্ষিণদিকে বাজারের শেষ প্রান্তে নিরাপত্তার জন্য দ্বিতীয় নিষ্ক্রমণস্বর (15)। বাজার ও প্রাচীরের মাঝখানে সুপারিসর স্থানে নিরাপত্তার জন্য আরক্ষা-বাহিনীর ছাউনি (14)।

সম্ভাবনা নেই।

আম-দরবারের পিছনে একটি ক্ষুদ্র বাগিচা (6); তার উত্তরে জাহাপনার একমুখ দরবার (8), দক্ষিণ বেগমদের (9) এবং সগ্রাসার নদীকিনারের প্রমোদকক্ষ (7)। শাহজাদাদের আবাস যথেষ্ট দূরত্ব রেখে (11) সম্রাটের বাসস্থান নদীকিনারে (10)।



চিত্র-11.6 লাল-কিল্লার ভূমি-নকশা, গরুড়াকালোকে।

- | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| A—ভূ-বীজ বা সাকো | I—শাহ-মুজ | Y—চাহ-রবাগ |
| B—লাহোর গেট | J—মতিমহল | S—পরিখা |
| C—প্রবেশপথ | K—দেওয়ান-ই-খাশ | T—তালো |
| D—নক্করখানা | L—রঙমহল | V—দুর্গ-প্রাকার |
| E—দেওয়ান-ই-আম | M—খোয়াবগাহ | W—আসান বজ |
| F—মীনাবাজার | N—বেগম মহল | |
| G—দিল্লী-দরওয়াজা | P—হামাম | |

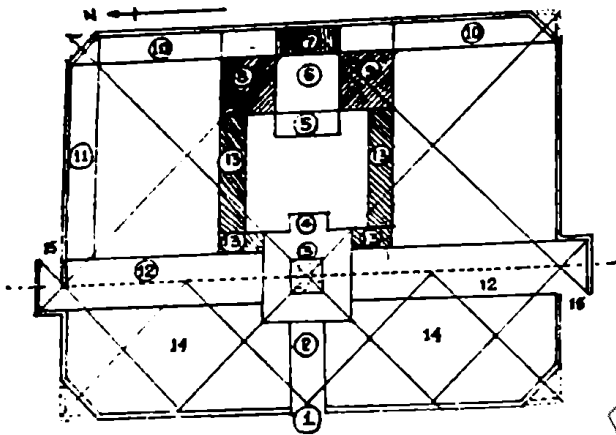
নক্করখানার পিছনে পুনরায় একটি প্রশস্ত উদ্যান, দফতরখানার কক্ষ (13) দিয়ে ঘেরা। তার সম্মুখে দেওয়ান-ই-আম (5)। এই পর্যন্ত বহিরাগতদের প্রবেশাধিকার, যেহেতু 12-চিহ্নিত বিপণীর পূর্বপ্রান্তে উত্তর-দক্ষিণ লম্বা নিশিদ্ধ টানা প্রাচীর; তাই কোন বহিরাগতের পক্ষে অন্দরমহলে ঢুকে পড়ার কোনও

এইবার চিত্র-11.4-এর সঙ্গে চিত্র-11.5 মিলিয়ে দেখুন : নক্করখানার সম্মুখস্থ তালোটি (T) নিশিদ্ধ। ইতস্ততঃ সড়ক নির্মাণ করার মূল ছন্দটা অবলম্বিত। তার চেয়েও করুণ অবস্থা হয়েছে এখানে-ওখানে নয়া-কোঠি বানানোতে। এছাড়া বেগম মহলের ইমারতগুলি ভূমিসাং হওয়ায় এখন মনে হয় নগর-বিন্যাস অহেতুক

উত্তর ঘেঁষা।

দ্বিতীয় প্রশ্নটির জবাব : অধিকাংশ ইমারতের বাঁহর দিয়ে জালিকাজ-করা করোকা প্রাচীর ছিল। এ বিষয়ে ফতেপুর-সিক্রি দর্শনকালে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে। সেই জালিকাজ-করা মর্মর-প্রাচীরের ভিতরদিকে খণ্ডখণ্ড টাঙিয়ে ভিজিয়ে দেওয়া হত। ফলে শীতাতপ থেকে রক্ষা পাওয়ার বিকল্প ব্যবস্থা ছিল।

এই প্রসঙ্গে আরও বলি—অনেকের ধারণা, গাইড-রাও তাই বলেন,—দরজাগুলিতে পাঞ্জা থাকত না। শব্দে অস্বচ্ছ পর্দা বুলত এবং তার বাহিরে নন্দন কুপাণ



চিত্র-11.7 লাল-কিল্লার প্ল্যানিং-এ বান্ধারিক ক্রিয়াসম্পদ।

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. মূল প্রবেশদ্বার | 8. গোপন মস্তণা |
| 2. প্রবেশপথ | 9. বেগম মহল |
| 3. বাহকের পানীয় | 10. সন্ধ্যা মহল |
| 4. ঘোষণার আরোহণ | 11. শাহজাদা মহল |
| 5. জনসংযোগ | 12. মীনাবাজার |
| 6. চাহুর কক্ষ | 13. দফতর |
| 7. নৃত্যগীতের আসর | 14. নিরাপত্তা |
| 15. আপদকালীন নিষ্করণদ্বার। | |

হস্তে খোজাপ্রহরী পাহারা দিত। ঐতিহাসিক উপ-ন্যাসগুলির বর্ণনাও সেই ইঙ্গিতবাহী। আমার এ বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। নন্দন কুপাণহস্তে খোজা-প্রহরী দ্বারের বাহিরে অষ্টপ্রহর প্রহরায় থাকলে নিরাপত্তা নিশ্চয় রক্ষিত হয় ; কিন্তু তা সত্ত্বেও গৃহ-ভ্রম্মরস্থ নয়নারীর গৃহস্থ্য-বিশেষ করে দাম্পত্য-জীবনে একটা কাঁটা বিধে থাকবেই। সে-কাঁটা মানসিক, 'সাইকলজিকাল'। প্রহরী তা দূর করতে পারে না, পারে শব্দে অঙ্গলবন্ধ কবাট। একজন আমি ফতেপুর-সিক্রিতে বিশেষভাবে লক্ষ্য করে দেখেছি। বহু দ্বারে 'হিজ' এবং

'টাওয়ার বোল্ট' বা ছিটকানির চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যায়। দু-একটি ক্ষেত্রে—যোধবাঈ-মহলে, তুর্কী-সুলতানা কোঠিতে এবং বুলন্দ-দরওয়াজায় সে-আমলের কাঠের চৌকাঠ অথবা পাঞ্জার ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়। তাতে হিজ, ছিটকানি অথবা হুড়কোর অস্তিত্ব নজরে পড়ে। আগ্রা-কিল্লা এবং লাল-কিল্লাতেও তা দেখেছি ; কিন্তু সেই মোকামগুলি ব্রিটিশযুগে ব্যবহৃত হয়েছিল, ফলে তা পরবর্তী যুগের সংযোজন কিনা বোঝা যায় না। অপরপক্ষে পরিত্যক্ত ফতেপুর-সিক্রির বোঝা যায় না। অপরপক্ষে পরিত্যক্ত ফতেপুর-সিক্রির ঐ চিহ্ন প্রমাণ দেয় যে, মদুগল যুগে দরজায় পাঞ্জা থাকত। তাছাড়া ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাসের বর্ণনা যেরকমই হোক, সমসাময়িক ইতিহাসে আমরা রুম্মদ্বারের বর্ণনা একাধিকবার পেয়েছি। আধম খাঁকে আকবরের অন্তর-মহলে প্রহরী ঢুকতে দেয়নি কবাট রুম্ম করে ; বর্হানপুর দুর্গে খন্দুরম-নিযুক্ত গদন্তঘাতক নিদ্রিত শাহজাদা খসরোকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করতে পারেনি, কপাট রুম্ম থাকায়।

দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করার পর (1638) প্রায় দীর্ঘ দশ বছর সময় লেগেছে লাল-কিল্লার বিভিন্ন ইমারৎ, উদ্যান, পরিখা ও প্রাচীর নির্মাণ করতে। সে-আমলে খরচ হয়েছিল দশ কোটি তস্কা। লাল-কিল্লায় দুটি দরওয়াজা। শহরের দিকে, পশ্চিমপ্রান্তে লাহোরী দরওয়াজা। সেটাই বর্তমানে প্রবেশপথ। এখন তার উপর আছে পাকা সাঁকো। শাহজাহানী জমানায় সেখানে ছিল একটি কাঠের 'ড্র-ব্রীজ', যা প্রতিদিন ওঠানো-নামানো হত। নগরের দক্ষিণপ্রান্তে 'এমার্জেন্সি একজিট' : দিল্লী-দরওয়াজা। তার বাহিরের দিকে যে হস্তিমূর্তি দুটি দেখেছেন, যার কথা পূর্বেই বলেছি (চিত্র-9.9) তা নিতান্ত হাল-আমলের, শাহজাহানী গড়া নয়। ঔরঙ্গজেব তক্ত-তাউসে উঠে বসে যখন কালাপাহাড়ী ধ্বংসলীলার প্রাচীন শিল্পগুলি মূছে ফেলতে বন্দ-পরিকর হয়,—সেকেন্দ্রা ও ফতেপুর-সিক্রির মদুরাল-গুলি চুনকাম করিয়ে দেয়, তখন ঐ পাথরের হাতী-দুটিকেও ভেঙে ফেলা হয়। বর্তমান শতাব্দীতে লর্ড কার্জন লাল-কিল্লা সংস্কারের সময় একই রকম দুটি হস্তিমূর্তি নির্মাণ করিয়ে ওখানে বসিয়ে দেন।

নক্করখানা : বাস্তব-নকশায় আয়তক্ষেত্র, উচ্চতায় মণ্ডল, রক্তিম বাগিচাপাথরে তৈরী এই সৌধ থেকে প্রহরে প্রহরে যায়যাযগা করা হত (D)। সম্মানীয়

কোনও অতিথি এলে এখান থেকে নাকাড়াবাদক তাঁর আবির্ভাব ঘোষণা করে সবাইকে জানিয়ে দিত। আগন্তুক হস্তিপৃষ্ঠে এলে এখানে তাঁকে অবতরণ করে বাকি পথ পদব্রজে বা পাল্কিতে যেতে হত। এটি নহবৎখানাও বটে। নক্করখানার পাখাণ ফসকে একাধিক রাজরত্নের মত্যা-স্বাক্ষর। জাহান্দারশাহ (1773) এবং ফারুকশিয়ার (1719)।

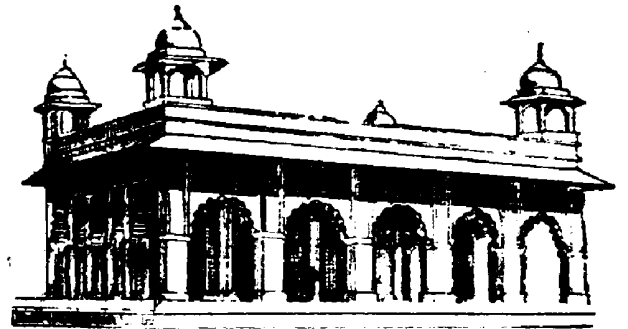
দেওয়ান-ই-আম : প্রকান্ড বাগিচার পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত এই ইমারতের (E) আকারও আয়তক্ষেত্রের। সম্মুখদৃশ্যে নয়টি খিলান, পার্শ্বদৃশ্যে তিনটি। সব-গুলিই নয়-পাপাড়ি-ওয়ালা শাহজাহানী খিলান। কেন্দ্রস্থলে পূর্বপ্রান্ত ঘেঁষে মর্মর সিংহাসন। পিছনে নানান কারুকর্ষে-শোভিত একটা পশ্চাদপট। তাতে নানান রঙিন-পাথরে 'ইন্লে-কাজে' ফুল-লতা-পাতা-পাখি। সঙ্গে বাইনোকুলার থাকলে কেন্দ্রীয় প্যানেল-টিকে লক্ষ্য করবেন। খালি চোখেও অস্পষ্ট দেখা যায় : একটি বৃক্ষতলে গ্রীক দেবতা অরফিউস্ বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছেন। চিত্রটি রাফায়েল অন্দসরণে। এটি তদা-নীন্তন দক্ষ শিল্পী Austin de Bordeaux-এর হাতের কাজ। 'বোর্দো' নামটা মনে রাখবেন, কারণ তাজমহলের মূল পরিকল্পনাকার হিসাবে এ'রও একটি 'ক্যান্ডি-ডেচার' আছে! খোদার কুদতে এই শিল্পটি শাহ-য়েন-শাহ আলমগীরের নজরে পড়েনি। তাই আজও অরফিউস বাজিয়ে চলেছেন : "Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter/ Therefore, ye soft pipes play on..."

মহম্মাজমহল : এখানে নয়টি ইমারৎ ছিল (N) ; যার তলা দিয়ে প্রবাহিত হত একটি স্বচ্ছতোয়া মর্মর পয়ঃপ্রণালী : নহর-ই-বিহিস্ত। স্বর্গীয় স্নেহতম্বিনী ! এই নয়টি ইমারৎ সম্মিলিতভাবে ছিল হারেম। যেটুকু টিকে আছে তাতেই বর্তমানে অবস্থিত : 'দিল্লী মাদুজি-য়ম অব্ আকি'ওলজি।' মুগল যুগের অনেক দুর্লভ বস্তু ও চিত্র সেখানে সংরক্ষিত। এটি দেখতে ভুলবেন না যেন।

রঙমহল : স্থাপত্যের নিরিখে বিশেষ কোনও বৈচিত্র্য নেই (L)। সেই সারি সারি নয়-পাপাড়ি-ওয়ালা খিলানের তলা দিয়ে প্রবাহিত নহর-ই-বিহিস্ত। মাঝ-খানে একটি মর্মরপদ্ম, মেঝেতে খোদাই করা। তাতে চম্পিকাটি পাপাড়ি। কেন্দ্রস্থলে সে-আমলে ছিল একটি

গজদন্ত-নির্মিত ফোয়ারা। তা দিয়ে গোলাপজল নির্গত হত। উপরের সিলিংয়ে ছিল ছোট ছোট আরসি। এ-কক্ষটিকে কেউ কেউ গাইড বইতে শীশমহল বলে-ছেন।

খাশ্মহল : তিনটি বিভাগ : খোয়াবগাহ (M), তসবিখানা ও তোশখানা। শাহজাহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রাথমিক পর্বায়টা স্মরণ করুন—নিদ্রান্তে তসবিখানায় মালাজপ এবং তোশখানায় গল্পগাছা করা। খোয়াবগাহ পূর্বপ্রান্তে অষ্টভূজাকৃতি টাওয়ার থেকে সন্ধ্যাট প্রতিদিন প্রজ্ঞাবন্দকে 'করোকা-দর্শন' দিতেন (M)। আম-জনতা সান্নিধ্য হত কিল্লার বাহিরে—যমুনাতে, প্রশস্ত ময়দানে। এখানে যে ঝোলা বারান্দাটা দেখছেন ওটা শাহজাহানী আমলে ছিল না। দ্বিতীয় আকবরের (1806-37), পরবর্তী সংযোজন। এই ঝোলা-বারান্দা থেকে ইংল্যান্ডের পঞ্চম জর্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী দিল্লীবাসীদের দর্শন দিয়ে ধন্য করেছিলেন!



চিত্র—11.8 দেওয়ান-ই-খাশ্, লাল-কিল্লা।

দেওয়ান-ই-খাশ্ (K) : আগেই বলেছি, স্থাপত্যের বিচারে আগ্রার খাশ্মহলের সঙ্গে এর কোনও কার্যক নেই (চিত্র—11.8)। উপরে কাঠের সিলিংয়ে যে সোনালী নকশা দেখতে পাচ্ছেন ওটা মুগল-জমানার নয়। 1911-এ ইংল্যান্ডের এখানে আসার সময় ঐ সিলিংটা সোনালী রঙে গিল্টি করা। ফগর্ডসনের মতো পণ্ডিত দিল্লীতে উপস্থিত থাকতে ইংরাজ কেন এতবড় ভুল করেছিল জানি না। যে মুসলমান সম্রাটের কাছ থেকে শাসনদণ্ড ছিনিয়ে নিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের তাঁর পূর্ব-পূর্ব ঠিক এই কক্ষেই উপবেশন করতেন বিশ্ববিখ্যাত সোনার ময়ূর সিংহাসনে। সিলিং-এর সোনালী গিল্টি-করা নকশায়, ভুলনামূলক কিতাবে সেদিন বিদ্যুৎ ভারতবাসীর দৃষ্টিতে ইংল্যান্ডের যে শব্দ

উপহাসাস্পদ হলেন এটা কি কোন ইংরাজ খেয়াল করেনি?

এখান থেকেই নাদিরশাহ মরুর সিংহাসন লুট করে নিয়ে যায় (1739)।

আর এখানেই ইমারতের কোণায় উৎকীর্ণ করা আছে কবি আমীর খসরোর সেই বহুশ্রুত বয়েঃ :

“অগর কিসেসীন্ বার রু—স্নী জমিন অস্ত
হমিন্ অস্ত্ বহ্ হমিন্ অস্ত্
বহ্ হমিন্ অস্ত্।”*

হামাম : দেওয়ান-ই-খাশের উত্তরে হামামের (P) তিনটি অংশ। দ-পাশের দুটি ঘর হচ্ছে শাহ-জাদা-শাহ-জাদীদের স্নানাগার। পূর্বদিকের ঘরটি—যাতে তিনটি ফোয়ারা আছে, সেটি বস্ত-পরিবর্তন-কক্ষ। মাঝের ফোয়ারাটি দিয়ে নাকি গোলাপজল নির্গত হত। পশ্চিমের স্নানঘরে গরমজলের বাস্প শীতের দিনে স্নানের আয়োজন। জল গরম করার যান্ত্রিক ব্যবস্থার ষ্টেটুকু চিহ্ন আছে তা গাইড আপনাকে দেখিয়ে দেবে।

মসজিদ : শাহ-জাহাঁ প্রতি শতাব্দীর কিল্লার বাহিরে জাম-ই-মসজিদে গিয়ে আম-জনতার সঙ্গে একসাথে নামাজ পড়তেন। প্রাত্যহিক উপাসনার আয়োজন ছিল, আগেই বলেছি, খোয়াবগাহ সুলতান তসবিখানায়। ব্যবস্থাটা পছন্দ হল না আলমগীরের। তার মূল হেতু কী, তা বলা কঠিন—জনসাধারণ থেকে দূরে থাকার প্রেরণা, নিরাপত্তার প্রয়োজন অথবা নিছক ধর্মান্ধতা। সে যাই হোক—এই তিন গম্বুজওয়ালা মসজিদ-মসজিদটি আলমগীর জমানায়, লাল-কিল্লায় একমাত্র উল্লেখযোগ্য সংযোজন। গম্বুজ তিনটিকে লক্ষ্য করুন—এক পূর্বদিকেই তাজমহল মনোরম পেয়াজী চক্টি অর্ন্তহিত। সে যেন মিতালী করতে চায় অনাগত যুগের সফদর-জুহু গম্বুজের সঙ্গে। এক পূর্বদিকেই আলমগীর গম্বুজের গলা টিপে ধরেছে!

প্রসঙ্গটা বন্ধন উঠেই পড়ল তখন সংক্ষেপে শেষ ‘প্রান্ত মুগল’ আলমগীরের স্থাপত্যচিন্তার কিছু ইঙ্গিত এখানে রেখে যাই। আলমগীর অত্যন্ত ধর্মান্ধ। গোঁড়া মুসলমানই শত্রু নন, সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন সুন্নি মুসলমান। তাই শত্রু হিন্দু নয়, সিয়া-সম্প্রদায়-ভুক্ত মুসলীম রাজাগুলিকেও তিনি পদানত করতে

বন্দপত্রিকর হয়ে পড়েন। এই ধর্মান্ধতাই তার, তথা মুগল-সাম্রাজ্যের পতনের সর্ববৃহৎ কারণ। হিন্দুদের মন্দির ধ্বংস করে সেখানে মসজিদ বানানোর জন্য আলমগীর পাগল। কাশীতে বিশ্বেশ্বরের মন্দির ধ্বংস করে একটি মসজিদ তৈরী করেন। তার সুউচ্চ মিনারটি যতদিন টিকেছিল ততদিন,—দুর্ভাগ্য আলম-গীরের—পরিচয় বহন করত : ‘বেণীমাধবের ধ্বজা’! তারপর আলমগীর মথুরাতে ‘কেশবদেব’-এর একটি অপূর্ব মন্দির ধ্বংস করেন। জাহাঙ্গীরের আমলে সেটি নির্মাণ করিয়েছিলেন বুদ্ধেন্দ্রারাজ বীর সিং। তেরিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে। বিদেশী পর্যটক তাভার্নিয়ের সেটি দেখেছিলেন 1650 সালে, বার্নার 1663-তে। দুজনেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। নামসায়ুজ্যে সাহস করে বলতে পারছি না, এই বীর সিং-ই আবুল ফজলকে হত্যা করেছিলেন কি না। কারণ ফাইল-কপি যতদূর ছাপা হয়েছে তা পাঠ করে জৈনিক ইতিহাসের পন্ডিত আমাকে জানিয়েছেন যে, সুলতান জালাল-উদ্দীনকে যে স্বহস্তে হত্যা করে তার নাম ‘মালিক কাপুর্’। কিন্তু সে ইতিহাসখ্যাত ‘মালিক কাপুর্’ নয় (পৃঃ 45)। কেশবেশ্বরের মূর্তিটি অবশ্য সংযোগ-স্বত্ব মন্দির ধ্বংস হবার পূর্বেই অপসারিত করতে পেরেছিলেন উদয়পুরের রাণা রাজসিংহ। জীবনের শেষ পঁচিশটা বছর ঔরঙ্গজীবের কেটেছিল দাক্ষিণাত্যে। সেখানেই ঔরঙ্গবাদে তাঁর একমাত্র উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য-কীর্তি : বিবি-কা-মক্কারা। তাজমহলের বার্থ অন-করণ! দাক্ষিণাত্য বিজয়ের বার্থতার স্মারক যেন!

দিল্লীর জাম-ই-মসজিদ : লাল-কিল্লার বাহিরে, প্রায় 500 মিটার পশ্চিমে শাহ-জাহাঁ নির্মিত জাম-ই-মসজিদ ভারতবর্ষের বৃহত্তম মসজিদ। শুরুর হয় 1650 সালে, শেষ হয় ছয় বছর পরে। শাহন-এর মাপ প্রায় 100 বর্গমিটার। পশ্চিমপ্রান্তে প্রার্থনাকক্ষটি দৈর্ঘ্যে 61 মি., প্রস্থে 27.5 মি.। তার সম্মুখভাগে এগারোটি খিলান, কেন্দ্রীয়টি লিয়ানধর্মী, প্রায় ডবল উচ্চতায়। এখানেও সেই শাহ-জাহানী ‘ম্যানারিজম’, অর্থাৎ নয়-পাপড়ি-ওয়ালা খিলান। মূল প্রার্থনাকক্ষের দুই প্রান্তে দুটি মিনারিকা এই ইমারতকে একটি অপূর্ব মাধুর্যে মন্ডিত করেছে। শাহনের তিন দিকে তিনটি প্রবেশ-তোরণ, পূর্বদিকেরটিই মূল প্রবেশদ্বার। এ স্থাপত্যে সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করেছে স্থাননির্বাচনে। পুরাতন দিল্লীর সর্বোচ্চ ভৌগোলিক অবস্থানে অতি উচ্চ কুসির উপরে

* স্বর্ণ নদী মনের জ্বল ধরার বাক্যে স্নেহেট থাকে, এইখানেই, এইখানেই, এইখানেই দেখুন থাকে।

শেহান্-তল পাতা হয়েছে। এজন্য প্রবেশ-তোরণের সম্মুখে বুলন্দ-দরওয়াজার অনুরূপ অসংখ্য সোপান। লক্ষণীয়, প্রবেশ-তোরণের খিলানে কিন্তু নয় পাপড়ির অলঙ্করণ বর্জন করা হয়েছে। চিত্তস্ন পরিকল্পনায় দ-পাশে তিন-তিনটি ছোট ছোট খিলান।

যদুগল মিনারিকা, প্রবেশ-তোরণে খিলান-পাপড়ি বর্জন, অত্যুচ্চ কুর্সি (plinth), গম্বুজে এবং মিনা-

রিকায় উদ্যোগ: অলঙ্করণ-রকম প্রকৃতি বৈচিত্র্য অম-
দান ৭৫৫ বেশ কিছুটা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে।
অসম্ভব নয়, এর ডিজাইন-এ রাজ পরিকল্পনাকারের
কিছুটা হাত আছে। সমগ্র পরিকল্পনাটি বলিষ্ঠ, মহান
ও নয়নাভিরাম। নিঃসন্দেহে জাম-ই-মসজিদ-তাজ-
মহল ব্যতিরেকে, শাহজাহানী-জমানার শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য-
কীর্তি।

৩৭৬৬৬৬৬৬

ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্য-ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ উদা-
হরণ বললে যথেষ্ট বলা হয় না, তাজমহল সম্ভবতঃ এই
পৃথিবীতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্য-কীর্তি।
এ-কথা বলার জন্য বিশেষ পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন নেই।
যদুগ-যদুগ ধরে দেশী-বিদেশী মনীষীরা সে-কথা
সোচ্চারে বলে গেছেন। সকলেই অভিধান ঘেঁটে বাছা
বাছা বিশেষণ খুঁজে পরিপাটি করে সাজিয়েছেন তাঁদের
বক্তব্য। তার মধ্যে বিশেষ করে আজ মনে পড়ছে
মিসেস্ রুজভেল্টের কথা; কারণ তিনি যা বলেছেন
তা নিতান্তই অন্তর-নিঃসৃত তাত্ত্বিক উচ্ছ্বাস।
সাজিয়ে-গড়িয়ে নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট
সম্প্রদায়িক তাজমহল দেখে এলে সাংবাদিকরা মিসেস্ রুজ-
ভেল্টকে প্রশ্ন করেছিলেন, কেমন দেখলেন?

মিসেস্ রুজভেল্টের চট-জলদি জবাব : 'ফ্র্যাঙ্ক
যদি কথা দেয় আমার কবরের উপর অমন একটা স্মৃতি-
সৌধ বানিয়ে দেবে তাহলে আমি আজ রাতেই আত্ম-
হত্যা করতে রাজী।'

এর চেয়ে সহজে বোধহয় কেউ বোঝাতে পারেননি
—তাজমহল দেখার পর মনের অবস্থা কেমন হয়।

একটু অপ্রাসঙ্গিক হচ্ছে, তবু বলি, ঠিক এই
জাতের কথা বলেছিলেন আর একজন শিল্পরসিক, আর
একটি অপূর্ব শিল্পের আবেদনে অভিভূত হয়ে। কবি
সত্যেন দত্ত প্রয়াত হলে একটি শোকসভায় রবীন্দ্রনাথ
'বর্ষার নবীন মেঘ...' কবিতাটি আবৃত্তি করে তাঁর
শ্রদ্ধাজলি জ্ঞাপন করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন
দুই বন্ধু—শিশির ভাদুড়ী আর দিলীপকুমার রায়।
নাট্যাচার্য সঙ্গীতাচার্যের কানে কানে ঠিক ঐ কথাই
বলেছিলেন সেদিন : 'গুরুদেব যদি অমন একখানা
কবিতা মিতীয়বার লিখতে রাজি থাকেন, তাহলে আমি
আজই আত্মহত্যা করতে পারি।'

অবশ্য কবিতাই যে নিয়মের পরিচায়ক তার প্রমাণ-
স্বরূপ দ-একটি বিরুদ্ধমতও আছে; যথা রাইজার
কিপ্লিঙ কিম্বা আলডুস্ হাক্সলে। তা হোক, তবু
ফাগুদাস, হ্যাভেল, কুমারস্বামী থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত
সকলে মিলে তাজমহলের যে ভাবরূপ প্রতিষ্ঠা করে-
ছেন তারপর এর মূল্যায়নের প্রচেষ্টা ধ্বংস মনে হতে
পারে। তবু এটা আমাদের অবশ্য করণীয়—এ-প্রশ্নের
উপসংহার হিসাবে।

স্থাপত্যের ইতিহাসে তাজমহল কোনো যুগান্ত-
কারী মৌলিক আবিষ্কার নয়। অর্থাৎ যে অর্থে
বিজ্ঞানের ইতিহাসে নিউটনের গতিসূত্র, ডারউইনের
বিবর্তনবাদ অথবা আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ এক-
একটি যুগান্তরে-উত্তরণের মৌলিক পদক্ষেপ, সেই
অর্থে তাজমহল স্থাপত্য-ইতিহাসে এক অচিন্ত্যপূর্ব
আবিষ্কার নয়। তবে তা কী-করে বিশ্বস্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ
সম্পদরূপে চিহ্নিত হল? একটিমাত্র শব্দে যদি এ-
প্রশ্নের জবাব দিতে বলেন, তবে আমি কল্ব, তাজ
হচ্ছে : তিলোত্তমা!

প্রাসবর্তী স্থাপত্য-চিন্তা—কী হিন্দু, কী পার-
সিক, কী ইন্দো-ইসলামী—প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে তিল
তিল করে তাদের গগনগলি এখানে সঞ্চারিত, দোষ-
গলি বর্জন করে। আর ভিন্ন দেশ-কালের শ্রেষ্ঠ সম্পদ-
গলি এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, কোথাও জোড়ের
দাগ নেই! এখানেই পরিকল্পনাকারের অসীম কৃতিত্ব।
সেই কৃতিত্বের মূল্যায়নের একটিই রাজপথ : সামগ্রিক
আবেদনে মিসেস্ রুজভেল্ট-এর মত মন্থতার মতাকামী
না হয়ে এ সৌধের প্রতিটি প্রত্যঙ্গকে বিচার করতে
হবে। খণ্ড খণ্ড করে। 'ডিসেক্ট' করে। দেখতে হবে—
কী-ভাবে, কোথা থেকে কোন অনভাবনাটি সামগ্রিক
রূপায়ণে সুবিন্যস্ত। ইংরাজীতে একটা কথা আছে—

'An apt quotation is almost as good as an original work' (সুপ্রসিদ্ধ উদ্ভৃতি মৌলিক রচনার প্রায় সমপর্যায়ের সম্পদ।)

তাজমহল এ প্রবাদবাক্যের প্রকৃষ্টতম উদাহরণ।
কিন্তু! একটা খটকা রয়ে গেল বে!

কতই সুকিনান্ত হ'ক, শব্দমাণ্ডল সুচরনে কোনও ক্লিপকর্ম কি কালজরী হতে পারে? 'বুক অব কোম্পেনসন্স' হতে পারে ক্লাসিকাল সাহিত্য? শিশির জলধী বা অহীন্দ্র চৌধুরীর হৃদয় নকল করে কেউ হতে পারে নরা-নাট্যাচার? না, পারে না। আর সেকোনই প্রবাদবাক্য বৃত্ত হয়েছে এ শব্দটি : almost (প্রায়)। মৌলিকতা প্রেস্ট-শিল্পের এক আবশ্যিক উপাদান! তাজমহলও কালজরী হয়েছে মৌলিকতা ক্ষিপ্রিত হয়ে নয়। দৃষ্টি বিশেষ ক্ষেত্রে তাজমহল পরি-কল্পনাকল্প চূড়ান্ত মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন যা, য'ত্নে ন ভকিস্ততি—ভজের মিনারিকার এবং ভূমি-বক্ষণ সামূহিক কিস্যাসে। সে-কথা বখাষ্যানে।

অসম্ভব, সাময়িক হুজুরনের পূর্বে বিভিন্ন দৃষ্টি-কোণ থেকে এই স্থাপত্য-কীর্তিকে প্রকৃষ্ট খণ্ড খণ্ড-রূপে বিভাজ্য করে দেখি। প্রথমেই ঐতিহাসিক পট-ভূমি। অর্থাৎ সম্ভার দীপাকলীর আগে সকাল বেলা-কল্প সন্ধ্যা পাকসনের ইতিকথা :

আজদ্-বান্দ-বেগমের বিবাহিত জীবন : তাজ-মহলের মূল আবেদন—সম্রাটের শ্রেম। সত্তরার হিসাব মতো প্রথমেই দেখা দরকার, শাহ-জাহাঁ ও মমতাজের বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে ইতিহাস কী কলছে। কোন প্রেক্ষার শাহ-জাহাঁর অন্তরে এমন একটি সৌখ-নির্মিতের কসনা জাপল।

আজদ্-বান্দ হজেন আসক্ অলীর কন্যা, অর্থাৎ ইতিবৃত্ত-বোলা মীর্জা পিন্নাস্ বেগের নাতনি। তার মনে নুরজাহাঁর আপন ভাইকি। তার চোখের প্রথম মিলন 1607 সালে—জর আমচর্কের কথা, পল্লিবশট ঠিক সেই একই, অর্থাৎ ঠিক বেখানে প্রথম চার-চক্রে মিলন হয়েছিল শাহ-জাদা সেলিম ও মেহেরউম-মহল।

সমরট চিহ্নিত করা গেছে : 1607; কিন্তু তার অর্থাৎ একটু সমীক্ষার নিহত দিন। পূর্ববৎসর আকবর প্রয়াত। ঐ বছরেই মাস করেক জাপ কখ-মানের জরখীরকার শেষ আকবর নিহত হয়েছেন। মেহের তখনও নিকর কসেননি : কন্যা, লার্জাল সম্রাট

আছেন জাহাঙ্গীরের হারমে। শাহ-জাদা খুর্রমের বরস ওখন বোলা আর আজদ্-বান্দর পনের। নওরোজ বাজারে ঘুরতে ঘুরতে শাহ-জাদা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েন একটি দোকানের সমুখে। স্তম্ভ বিস্ময়ে দেখতে থাকেন পঞ্চদশী পশারিণীকে। কয়েকটি খণ্ড ম'হুতের পর মেয়েটি বললে, কী দেখছেন? কিছ, কিনবেন?

শাহ-জাদা সম্মিত ফিরে পান। বুকতে পারেন, প্রথম প্রশ্নটির উত্তর বাহুলা। বহু বহু দর্শকের মন্থ দৃষ্টির দর্পণে মেয়েটি জানে প্রথম প্রশ্নের কী জবাব। তাই তাড়াতাড়ি ওর মেজ থেকে একটি কাচখণ্ড হাতে তুলে নিয়ে দ্বিতীয় প্রশ্নটির জবাব দেন, এই নকল হীরেটোর দাম কত?

মেয়েটি মূখ লুকিয়ে হাসল। বলল, ওটা থাক, আপনি আর কিছ, পসন্দ করুন?

—কেন? এটোর কি দোষ হল? এটা তো চমৎকার নকল-হীরে?

আজদ্-বান্দ বলল, ওটা আপনাকে বেচব না।

—বেচবে না, তাহলে সাজিয়ে রেখেছ কেন?

—বেচব না তো বলিনি, বলছি 'আপনাকে' বেচব না।

সওয়াং কিছ, নয়, মীনাবাজারের মূল বেসাতি : রঙ্গরস। খুর্রম মূখ হলেন পশারিণীর বাকপট-তায়। রঙ্গাড়ের কললেন, তোমার নসীবে দৃশ্য অচ্ছে! স্বরং বাদ-শাহ-জাদাকেই যদি না বেচ তো তামাম দূনিয়ার খরিন্দার কোথায় পাবে?

খন্দরের চোখে-চোখ রেখে মেয়েটি বললে, খরি-ন্দার এখনই আসবেন। খোদ শাহ-রেন-শাহ! পাদ-শাহ!

মূখ কালো হল খুর্রমের। মেয়েটি মূখের মতো জবাব দিচ্ছে! মীনাবাজারে সে এক-নম্বর খরিন্দার নয়! তব, বাকবশে নীরবতা মানাই হার স্বীকার। তাই বলে কেমন করে জানলে তিনি এটা কিনবেন?

চট-কলদি মূখে-মূখে জবাব : কেহত আমি জানি, শাহ-রেন-শাহ সাজ্য জহুরি। ইমান-ইনসাফের মালিক এক নকলেরই বুকতে পারেন : কোনটা আসল হীরে, কোনটা নকল।

চমকে ওঠে খুর্রম। আলোর সামনে তলে ধরল কাচখণ্ডটা। মেয়েটি নিঃশব্দে এগিয়ে দিল একটা অপরীস কণ্ড। হল! মাসাত্তক তলে হয়েছে খুর্রমের! এটা আসল হীরে! তব, উপস্থিত দৃশ্য কম নেই শাহ-জাদার : চট করে রপনীতি বদলে নিয়ে বলে, এটা

যে সাক্ষাৎবাদাংশান তা তোমার শাহজাদাও জানে - কিন্তু এত জানো আর এতু জ্ঞানো না যে, সাক্ষাৎ কমল-হাটের পাশাপাশি গ্রামে সব বাদাংশানই হয়ে যায় নকল হাটের? এবার অথবা হবার পালা আজ বান্দুর। বলে, কমলহাটে? সে কোথায়?

খুদরুম এবার ওর মেজ থেকে ভুলে নেয় এক সুবর্ণদণ্ড। মেলে ধরে মেয়েটির মূখের সামনে! দেখে, কমলহাটে চুনিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়!

কথা ঘোরাবার জন্য শাহজাদা বলে, কিন্তু শাহ-রেন-শাহ্ যে একজন সাক্ষাৎ জহুরি এ-কথা শুনলে কার কাছে?

মেয়েটি সামলে নিচ্ছে ততক্ষণে। বলে, আমার ফুফার কাছে।

তৎক্ষণাৎ ওকে সনাক্ত করলেন খুদরুম। এ অসফ আলীর আত্মজা, মেহেরউম্মার প্রাতুপুত্রী; আর তাই ওর এত সাহস! নিঃশব্দে কটিবন্ধ থেকে মোহরের ধলিটা টেনে বার করে বলেন, কত?

: দশ হাজার।

কিনা দরদস্তুরে এক মট্টা স্বর্ণমুদ্রা বিছিয়ে কেন ওর মেজ-এর উপর। অক্ষুটে বোগ করেন, বাপ্ কো বেটা—সিপাহী কো ঘোড়া! জোহুরি হই ন্ন হই, হুরী দেখলে আমিও কিন্তু চিনতে পারি।

আজুবান্দুর গন্ডময় আবার রক্তিম হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে কৌতুহলী পথারিণীর দল ঘনিষে এসেছে শাহজাদাকে দেখতে পেয়ে। তাই আজুবান্দু কোন জুসই জবাব দিতে পারল না। মূখ নিচু করে আদাব জানালো শূন্য।^১

পরদিনই বাদশাহর দরবারে এন্ডেলা দিল খুদরুম। এক নিম্মাসে দাখিল করল আজি : উজীর অসফ আলীর কন্যাকে সে বিবাহ করতে ইচ্ছুক।

ইতিপূর্বেই মীনাবাজারে কলিজা-বিকিকিনির কটনাটা সবিস্তারে শুনোছিলেন মেহেরউম্মা। কয়ে, জাহাঙ্গীরও। রোমাণ্টিক কাহিনীটি সবিস্তারে নিক-দন করে মেহের বলেছিলেন, পুত্রের কাছে কিন্তু হার হয়েছে আপনার!

আকিঙের নেশার বৃদ্ধ শাহ-রেন-শাহ্ শূন্য কল-লেন, এ-কথা কেন?

—বাঃ! তা নয়? মীনাবাজারে গিয়ে আপনি জোড়া কবুতর খুইয়েছিলেন! আর খুদরুম জোড়া-হাটে করে আনতে চাইছে। কার কৃতিত্ব বেশী?

নেশার আক্ষেপে জাহাঙ্গীর ওকে বকে টেনে নিয়ে বলেছিলেন : আমার! জোড়া-কবুতর আমার খোলা

বারান অদৌ।

সুতরাং এমন একটা প্রস্তাব যে শাহজাদার কণ্ঠ থেকে আসছে, সে-কথা অজানো ছিল না উম্মার। এক কথার সম্মত হলেন সন্তুষ্ট। অসফ আলী অবশ্য তার কন্যার মতমত গ্রহণ করার কল কান্ডও করেন এম না। বাদশাহী বাসনার সেদিন থেকে আজুবান্দু হারা সেল খুদরুমের একমুগ্ধ কদু।

তবু ইতিহাস বলে দেখে—ওদের বিবাহ হয়েছে দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে, 1612 খ্রিষ্টাব্দে। কেন? কেহেবু মেহেরউম্মা এ পাঁচ বছর নিজের কসতে রান্না করান। মেহের বরা না দিলে তার তাইব কোনকম হবে না ভরতসম্রাজ্ঞী! পাঁচ বছর জাহাঙ্গীর! খুদু ভাই নয়, এই দীর্ঘ পাঁচ বছরে শাহজাদা খুদরুম একটি দিনের ভরেও তার বাকসজা করুক দেখতে পারনি।

না, ভুল কলনাম। এ পাঁচ বছরে একবার—কতত একবার, আবার চাকচক্য মিলন হয়েছিল। কেবলমি না হলেই শূন্য হত আজুবান্দু। এক শাহজাদা! একটি বিবাহ সময়ে। সেখানে উজীর-উম্মার আজুবান্দু এসেছিল নিমন্ত্রিতরূপে, আর খুদরুম ঘন্থন-রূপে! শাহজাদা খুদরুমের সঙ্গে কাম্বহার রক্ত-কুমারীর সে বিবাহ বাসরে (1608) খুদরুমের সঙ্গে আজুবান্দুর কোনও কথাপকলন হয়েছিল কি ন ইতি-হাসে লেখা নেই। তাই সে সম্মান বে কটনাটা লিপ-বন্ধ করলাম তা নিছক কল্পনার আশ্রয়ে :

বাসরে ইঠাৎ আজুবান্দুর দর্শন পেয়ে মূক হয়ে গিয়েছিল খুদরুম। বাসরের বৃদ্ধবয়সে আসরে সবাই কক্বোশ বাধন-হায়া। আজুবান্দু এঁখরে এসে দাখিল করেছিল এক বছর আজবকর কৌতুক-কথার জবাব : এতদিনে বুকলাম, জহুরি হোন না হোন, শাহ-জাদা হুরী চিন্তে ভুল করেন না।

অর্থগ্রহণ হরনি কক্ববত বৌকিতবশের—জ্বর ভেবেছিল, এ-বৃকি পরম্য রক্তকুমারীর রূপের তীর্ষক প্রসংগ। খুদু কাকপটে খুদরুম মূকৌ আর ভুলতে পারেনি।

পারস্য রক্তকুমারীর সঙ্গে খুদরুমের বিবাহ হবার আরও তিন বছর পরে মেহেরউম্মা কন্যিষ করলেন। বুকলেন, তিনি নিজের কসতে সম্মত না হলে তাঁর ভাইকিকে চিরকুমারী থাকতে হবে। খুদরুমের সঙ্গে জাহাঙ্গীরের বিবাহ হল 1611-১২। পরের বছর খুদরুম ও আজুবান্দুর।

উম্মার বিবাহিত জীবন—হিজাব হবে দেখছি, উনিশ বছর খুই রাস এখরে বিবাহ। উম্মার কাম্বহার

হয়েছিল সাতাশে মার্চ 1612 ; এবং চতুর্দশ সন্তানকে জন্ম দিতে গিয়ে মমতাজের মৃত্যু হল সাতই জুন, 1631 তারিখে। সাতটি সন্তান আঁতুড়ে অথবা আঁত শৈশবে মারা যায়। যে সাতজন শিশু মৃত্যু এঁড়য়ে বেঁচে পেরেছিল তাদের নাম নিচে দেওয়া হল।

অম্বিকর হিসাব কলছে—ঐ উনিশ বছর দুই মাস এগারো দিনের মধ্যে চৌদ্দটি সন্তানকে জন্ম দিতে হলে (যে-হেতু তাঁর কখনও ষমজ-সন্তান হয়নি) গর্ভিণী সময়ের ব্যবধান পায় গড়ে এক বছর চার মাস বাইশ দিনের। হয়তো আরও কম, যদি তাঁর দু-একবার গর্ভপাত ঘটে থাকে।

উল্লেখ্য, আজুবান্দকে বিবাহ করার পূর্বেই প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে পারভেজ বান্দর জন্ম হয় (1611) এবং চতুর্থ জীবিত-সন্তান রোশন-আরার জন্মের পর শাহজাদা তৃতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন (1617) ; এবার নববধূ ছিলেন আবদুর রহিম খান-ই-খানান-এর নাতনী। ফলে, শাহজাহাঁর বহু প্রশংসিত একান্তপ্রেম কালিদাসের ভাষায় ‘সকৃৎকৃতপ্রণয়োহয়ং জনঃ’!

চতুর্দশতম সন্তানকে জন্ম দিতে গিয়ে কী-ভাবে মমতাজের মৃত্যু হল, এবং সম্রাট কী পরিমাণ মর্মান্বিত হয়েছিলেন তার বিস্তারিত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা আছে। শুধু একটি কথা ইতিহাসে বল হয়নি : বর্হানপুর দুর্গের ঐ ঘরটা ছিল অভিশপ্ত। ক্ষুধিত পাষণ!!

1631 সাল। শাহজাহাঁ এসেছেন দাক্ষিণাত্য বিজয়ে। বর্হানপুর মালায়া রাজ্যে, গোলকুন্ডা ও বিজাপুরের সিং-দরওয়াজায়। শাহজাহাঁর উদ্দেশ্য বিদ্রোহী খান জাহান লোদীকে শাস্তাস্তা করা। যথারীতি মমতাজও এসেছেন। সম্রাট যে তাঁকে ছাড়া থাকতে পারেন না! মুরাদ বক্স-এর জন্মের পর তিন-তিনটি সন্তান হয়েছে মমতাজের গত পাঁচ বছরে, 1625 থেকে 1630-এর ভিতর। তিনটিই সর্দিকাগারে

মারা গেছে। মমতাজের ষয়সও তখন প্রায় চল্লিশ। বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছেন তিনি। রক্তাক্ততায়। যদিও শাহজাহাঁর অন্যান্য পত্নীরা তাঁকে ক্রমাগত সন্তান উপহার দিয়ে যাচ্ছিল এবং হারেম-উপপত্নীর সংখ্যাও অপরিমিত, তবু অসুস্থ শরীরে আজুবান্দ বেগমকে আগ্রা থেকে আসতে হল বর্হানপুর।

এবং এসেই তিনি গর্ভিণী হয়ে পড়লেন।

সাতই জুন যুদ্ধশিবিরে সংবাদ এল মমতাজ মহল চতুর্দশ সন্তানের মা হয়েছেন। কন্যারত্ন। শিশু ভালই আছে।

—আর তার মা? —প্রশ্ন করলেন বাদশাহ।

সংবাদবহ নর্তাশিরে জানায়, তিনি অত্যন্ত কাঁহিল। দ্রুতগতি অবস্থাতে শাহজাহাঁ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এলেন বর্হানপুর কিল্লায়। শ্বিতলের একটি কক্ষে প্রসূতি শায়িতা। সম্রাটকে সে কক্ষে প্রবেশ করতে দিলেন না হাকিম-উল-মুলক ওয়াজির আলি খান। বললেন, প্রসূতি নিদ্রাগত, অত্যন্ত দুর্বল। কোন রকম উত্তেজনা তাঁর বরদাস্ত হবে না। জাহাঁ-পনা বরুণ বিশ্রাম নিতে যান। বেগম-সাহেবা একটু সুস্থ বোধ করলেই তাঁকে সংবাদ দেওয়া হবে।

সম্রাট সম্মত হলেন। বর্হানপুর কিল্লার শ্বিতলে দক্ষিণদিকের মেহমানখানায় বিশ্রাম নিতে গেলেন। এই বিলাসকক্ষটি সচরাচর তালাবদ্ধ থাকে। বিশেষ সম্মানীয় কোনো অতিথি এলে কিল্লাদার এই মেহমানখানায় তাকে থাকতে দেয়। সুসজ্জিত সুন্দর কক্ষটি—কিন্তু শাহজাহাঁ আদৌ জানতেন না : কক্ষটি অভিশপ্ত!

রাজরক্তের স্বাক্ষর বৃকে নিয়ে রত্নম্বার মেহমানখানার চার-চারটি পাষণ প্রাচীর ক্ষুধিত প্রতিহিংসায় লোলদপ হয়ে প্রহর গুণছে!

ক্রান্ত শরীরে নরম কামদার পালঙ্কে গভীর নিদ্রায় ঢলে পড়লেন যুদ্ধক্রান্ত সম্রাট। মধ্যরাতে কে যেন এসে করাঘাত করল রত্ন-কপাটে। সম্রাট দ্বার খুলে দিলেন।

নাম	জন্ম স্থান	জন্ম তারিখ
জাহান-আরা	আজমীর	23. 3. 1614
দারাবকো	ঐ	20. 3. 1615
শাহ-সুজা	ঐ	23. 6. 1616
রোশন-আরা	বর্হানপুর	24. 8. 1617
ওরঙ্গজেব	সোহাদ (যোম্বাই)	24. 10. 1618
মুরাদ বক্স	রোহতাস	29. 8. 1624
মৌদান-আরা	বর্হানপুর	7. 6. 1631



କିମ୍ବଦୀ : ଶ୍ରୀମଦ୍ଦେବୀ

(ଶ୍ରୀମଦ୍ଦେବୀଙ୍କ ଶୈଳୀର ଗ୍ରନ୍ଥ)

কে? কী চাই?

সংবাদ গুরুতর। মমতাজ-মহল মরুদ্! সম্রাটের সাক্ষাৎপ্রার্থী।

কক্ষের প্রাচীর চতুষ্টি যেন ঘনিষে এল বাদশাহের বেদন-বিধুর পান্ডুর মূখখানা দেখতে!

শাহজাহাঁ তৎক্ষণাৎ নেমে এলেন প্রসূতি-আগারে। মূহূর্তে নির্জন হয়ে গেল সেই মৃত্যুশীতল কক্ষটি—শুধু দাঁড়িয়ে রইল সাতিউল্লস, সম্রাজ্ঞীর একান্ত-সহচরী; আর রইলেন হাকিম ওয়াজির আলি খান। সম্রাট নীরবে এসে বসলেন মৃত্যুপথযাত্রিণীর শয্যা-পার্শ্বে। তুলে নিলেন তার রোগপান্ডুর শীর্ণ হাতটি। মমতাজের বাকশক্তি রোধ হয়নি। মনে হল, তিনি কী-যেন একটা কথা বলতে চান।

শাহজাহাঁ ঝুঁকে এলেন।

মমতাজ সেই মৃত্যুতীরের সর্বোচ্চ সোপানের উপর দাঁড়িয়ে শাহজাহাঁকে কী বলছিলেন তার ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। লোকগাথা বলে, তিনি বিদায়-মূহূর্তে একটি আখির আর্জি পেশ করেছিলেন: তাঁর মক্কারা যেন সম্রাটের মহশ্বতের উপযুক্ত হয়।

সূর্যোদয়ের পূর্বেই রক্তহীন প্রসূতির সব যন্ত্রণার অবসান হল।

ধীর পদক্ষেপে সম্রাট ফিরে এলেন সেই চিহ্নিত মেহমানখানায়। অর্গল বন্ধ করে দিলেন ভিতর থেকে।

ঐতিহাসিক আব্দুল লাহোরী বলছেন, পুরো আটদিন সেই রুম্মম্বার কক্ষের অর্গল উন্মোচিত হয়নি। মেহমানখানায় সঞ্চিত পানীয় তিনি গ্রহণ করেছিলেন কিনা জানবার উপায় নেই, কোনও খাদ্য-দ্রব্য কেউ নিয়ে যায়নি কামরার ভিতর। সমস্ত ভারত-বর্ষ রুম্ম-নিশ্বাসে প্রহর গুণাছিল সে কয়দিন। অষ্টম দিনে নিজে থেকেই দ্বার খুলে বেরিয়ে এলেন শাহ-য়েন-শাহ।

রুম্মবাক বিস্ময়ে সবাই বজ্রাহত হয়ে গেল!

"A strange physical transformation had also taken place. The Emperor's back was now bent in a peculiar way and his hair, which had been raven black, had turned totally white. Whispers in the Hall of Audience hinted at something even stranger: was it an illusion or had the Emperor grown smaller in size since the queen's death?"¹⁰ (তাঁর দেহাকৃতিতে এক আশ্চর্য

রূপান্তর ঘটেছে: সম্রাট কেমন যেন কুঁজো হয়ে গেছেন। তাঁর বায়সকৃক বেশরাজী কিল্কুল সফেদ। দেওয়ান-ই-আমে সবাই কানাধুবার তার চেয়েও অশুভ একটা কথা কানাকান করত: এ কী তাঁদের দৃষ্টান্ত, নাকি মমতাজের মৃত্যুর পর সম্রাট আকারে সত্য ছোট হয়ে গেছেন?)

যে তথ্যটা আবদুল লাহোরী উল্লেখ করতে ভুলে-ছেন তা এই:

বুহানপুর কিল্লার ঐ মেহমানখানার চার-দেওয়াল পূর্ববর্তী দীর্ঘ নয় বছর ধরে রুম্মম্বার গুমরানিতে ফুঁসছিল।

কথাসাহিত্যের অলিখিত আইন: চরমতম করুণ-রস পরিবেশনের পর সময়ে থামতে জানা চাই। কিন্তু মহাকাল সে আইনের ভোয়াল্লা রাখেন খোড়াই! তাই ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখলে যেখানে আমরা থামতে হত, ইতিহাস লিখতে বসে সেখানে থামতে পারছি না:

ঠিক নয় বছর পূর্বে বুহানপুর কিল্লার ঐ মেহমানখানায় আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন আর এক মাননীয় শাহজাদা—সম্রাট জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠপুত্র! যুবরাজ। দৃষ্টিহীন খস্রো! একইভাবে মথারাত্রে কে-যেন এসে রুম্মম্বারে করাঘাত করেছিল। নিরস্ত্র আতঙ্কগ্রস্ত অশ্ব মানুষ্যটা প্রথমে দ্বারের অর্গল মোচনে স্বীকৃত হয়নি। আগন্তুক তখন জানিরেছিল নিজের পরিচয়: সে শাহজাদা খুর্রমের দূত, এসেছে সম্রাটের আদেশে খস্রোকে মৃত্তি দিতে।

ছোটভাই খুর্রমের প্রতি কৃতজ্ঞতায় শাহজাদা খস্রোর অশ্ব দুটি চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল! হাৎড়ে হাৎড়ে এসে খুলে দিয়েছিল মেহমানখানার দ্বার।

আগন্তুক বাস্তবে ঠাঁতদাস আলি রেজা, দানবাকৃতি এক নিষ্ঠুর পেশাদারী নরঘাতক। এসেছে খুর্রমের গোপন নির্দেশে খস্রোকে খুন করতে।

"পেশীবহুল দুটি হাতে হিংস্র নখর-লাঙ্ঘিত দুটি মৃত্যু থাবা! থাবা নেমে এল খস্রোর মূখের উপর, তাঁর নীল রক্ত বয়ে যাওয়া শূন্য কণ্ঠনালীর উপর চপে বসল। সম্রাট জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠপুত্র খস্রো, বিজ্ঞ, চরিত্রবান খস্রো, সর্বস্বনৈশ্বনা মহান খস্রোর...নাক দিয়ে হয়তো দু'ফোটা রক্ত গড়িয়ে পড়ল, নিশ্চল দুটি হাত পালঙ্ক থেকে দু'পাশে বুলে পড়ল।"¹⁰

সেই পালঙ্ক, সেই অতিথি-শয্যা, সেই প্রায়-মৃদে-যাওয়া দু'ফোটা রক্তচিহ্ন বৃকে নিয়ে মেহমানখানার

জর-দেওয়ান দাঁষ নয় বৎসর প্রতিহিংসা পূর্বে রেখেছে।
বেমমাবরহাভুর শাহ্ জাহার সন্তরজনাবাশা মনস্তদ
কলাপ উপভোগ করছে, নেশা-ঘেরা অত্যাচারে ফেটে
ফেটে পড়েছে! অতুত শাহ-য়েন-শাহ্-র সঙ্গে সম-
বেদনার তামাম হিন্দুস্থান যখন কোঁদেছে তখনই সেই
কৃষ্ণত পাখা দাঁষ নয় বছরের রোজা ভেঙে স্বগতি
খস্রোর সঙ্গে একপাতে ইফতারি করেছে।

সমকালীন ঐতিহাসিক আবদুল হামিদ লাহোরী
জানাচ্ছেন—মমতাজের মৃত্যুর পর পুরো দুই-বছর
মোটো হিন্দুস্থানে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানের আয়োজন
হে-আইনী ছিল। সুদূর দক্ষিণাত্য বা বঙ্গদেশেও
কোন উৎসবে গৃহসজ্জা, শোভাযাত্রা বা আলোকমালা
নিষিদ্ধ ছিল। সম্প্রতি, ক্রীড়া, আমোদ-আহ্লাদ
সব বন্ধ। প্রকৃষ্ট কেউ বর্ণা পরিচ্ছদ পরতে পারত
না, সবরকম প্রসাধন-সজ্জার ব্যবহার বন্ধ!

ছয় মাস পরে বুহানপুর থেকে কফিনটাকে নিয়ে
আসা হল আগ্রায়। ইতিমধ্যে মমতাজ-মক্‌বারার
স্থান-নির্বাচন খতম হয়েছে : দার-উল-খিলাফৎ, আক-
বরবাদে।

আজ্জ-মন্দ্ বান্দ-বেগমের কথা এই পর্বন্তই।
এবার তাজের কথা। কিন্তু এতক্ষণে খেয়াল হচ্ছে
একটা কথা কিংকল করতে ভুলেছি। তা আমার আর
দোষ কি? সমকালীন ঐতিহাসিকও যে সে-কথা বে-
মজদুম করতে ভুলেছেন! আতুত ঘরের সেই সদ্যো-
জ্ঞাতর—কি বেন সেই বাজ্ঞ সেরেটার নাম—তার
কী হল : না, তার শিশু-মৃত্যু হয়নি। যার আগমন-
জনিত কারণে তাজ মাঝা ভুলে দাঁড়িয়ে সেই মেরেটি
তাজ-ইতিহাসের কাছে উপেক্ষিত। তার কী হয়েছিল?
জানি না। সে-কথা লাহোরী-সাব লিখে যাননি।
মরেনি, এটুকুই জানিয়েছেন। আন্দাজ করি, কোন
দৃশ্যবতী ধাত্রী কানকতার মা-হারা সেরেটা আপন
জীকনীশক্তি-কু তার ছোট্ট মৃত্যুর নিয়ে হারেমের
একান্ত কোনরকম টিকে ছিল। বাজ্ঞ বসে, একটু
বক্তা লিখে সে হস্ততা আন্দাজ করেছিল তার প্রতি
এই জনীহর হেতু। মৃত্যুনা কেথার লুকবে ভেবে
পড়নি! তাজমহলের যেদিন অ্যাক্সেসার্টন হল,
সেদিন হিসাব করে দেখছি, মোহান-আরা বেগমের
করস হেইল। সেই একটি দিন কোথাকার সে হারেমের
পাখা-চক্রে গাটির পড়ে তার অসৎ-মায়ের জন্য
প্রাণ-লে কামটে পেরেছিল—করল মোটা হারেম
সেদিন পল্লী রূপে পরিচিত অকস্মিকতায়, আরো-
শব্দনের আনন্দ উৎসবে রোগ দিতে। এ অপরাধ সেরে-

টাকে সঙ্গে নেবার কথা কারও মনে পড়েনি।
মা-খাকী মেয়ে যে।

তাজ-পরিষ্করণকার কে? এ-প্রশ্নের চূড়ান্ত
সমাধান হয়নি। বোধকরি হবেও না কোনদিন। কারণ
সব প্রমাণ, সব নথী কে বা কারা কি-জানি-কেন সময়ে
বিনষ্ট করে গেছে। বিভিন্ন তথ্য, নজীর, প্রমাণ নিয়ে
অনুমান-নির্ভর আলোচনা হতে পারে মাত্র। অনেক-
গুলি 'খিয়োরি' আছে—আমরা নোতি-নোতি পক্ষপাতের
অগ্রসর হব। তবে শেষ ফলাফলটা প্রথমেই জানিয়ে
রাখি : তিনি অর্চিহিত!

প্রথমে দেখা যাক : ইতিহাস কতটুকু বলতে পারে?

মমতাজের মরদেহ আগ্রায় নীত হওয়ার পূর্বেই
সম্রাট 'সাইট-সিলেকশান'-টুকু সমাপ্ত করেছিলেন—
দারউল খিলাফৎ, আকবরাবাদে, ঐ যাকে আপনারা
বলেন 'তাজমহলের সাইট'। যমুনা তীরে ; শহরের
উপকণ্ঠে। এমন স্থানে, যেটা আগ্রা-কিল্লা থেকে
দেখা যাবে। জমিটি রাজা মানসিংহের বংশে, সে-
আমলে তাঁর পৌত্র রাজা জয়সিংহের দখলদারীতে।
সম্রাট এই জমিটি পসন্দ করেছেন শুনে জয়সিংহ
সানন্দে জমিটি দান করতে চাইলেন। কিন্তু পত্নীর
মক্‌বারা প্রসঙ্গে প্রতিগ্রহ নিতে অনিচ্ছুক সম্রাট এজন্য
সম্মেল্যের খাস-জমি জয়সিংহকে লিখে দিলেন। বোধ-
করি সেখানে জয়সিংহের কিছু আউট-হাউস সহ
বাগানবাড়ি ছিল ; সেগুলি ধূলিসাৎ করা হয়।

ঐতিহাসিক মীর মৃগল বেগ বলছেন, অতঃপর
শাহ-য়েন-শাহ্ মমতাজমহলের জন্য এমন একটি
মক্‌বারা বানাতে চাইলেন, যা হবে 'নায়াব' (মৌলিক,
নুতন), 'কামাল' (সার্থক), 'লতিফ' (উৎকৃষ্ট) এবং
'আজীব-ও-মারিব' (বিস্ময়কর ইয়ারৎ)। তারপর মৃগল
বেগ ফাসীতে যা লিখেছেন আজকের দিনে তার সহজ-
বোধ্য ভাষান্তর : এই স্পেসিফিকেশনটুকু বিজ্ঞাপিত
করে সম্রাট একটি 'গোবাল টেন্ডার ফ্লোট' করলেন।
অর্থাৎ এটুকু মনোবাসনা জ্ঞাপন করে দেশ-বিদেশের
প্রখ্যাত স্থপতিবিদদের কাছ থেকে প্রতিযোগিতা-
মূলক নকশা আহ্বান করলেন। অতঃপর : কাবুল-
কান্দাহার-ইরান-তুরান থেকে "কাগজ-নকশায়ে মক্-
বারা হর-এক উস্তাদ মে' আআভদন্দ" (বহু ওস্তাদ
কাগজে নকশা ছকে দাঁখল করলেন)। পরের পংক্তিটি
"চপ-ইক নকশা-পসন্দ আলিজা-হজরৎ" (যেহে
মিলেন একটি পছন্দসই নকশা মহান সম্রাট)। বাদ-
শাহের ইচ্ছামুতাবে নির্বাচিত নকশা এবং আরও দু-

একটি উৎকৃষ্ট নকশা অবলম্বনে কয়েকটি কাঠের মডেল তৈরী করা হল। বাদশাহের চূড়ান্ত অনুমোদন-সাপেক্ষে কয়েকজন উস্তাদ-কি-উস্তাদ স্থপতি-বিদ যৌথভাবে সেগুলির মধ্যে কিছ্ৰ অদল-বদল, পাম্‌টেশন-কম্বিনেশন করে এক 'ভিলোসুমা' পয়দা করলেন। তাকেই বাস্তবরূপ দেওয়া হল।

মীর মৃগল বেগ সরকারী ঐতিহাসিক। সুতরাং এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, অনেকগুলি প্রতিযোগিতামূলক নকশা দাখিল করা হয়েছিল, তার ভিতর একটি পছন্দ করা হল এবং অন্যান্য কয়েকটি উৎকৃষ্ট ডিজাইনের দৃ-একটি অঙ্গ তাতে সংযোজন করা হল। তারপর একটি চূড়ান্ত কাঠের মডেল বানানো হল।¹¹ সবই মানছি, কিন্তু কিছ্ৰতেই যে ভুলতে পারছি না মৃগল বেগ-এর ঐ মর্মবিদারী একটি পংক্তি : "চুগ-ইক নকশা-পসন্দ আলিজা-হজরৎ।" তিন নয়, দুই নয়—এক! কার নকশা? কী তার নাম? পরবর্তীকালে তাতে বতই বদল করা হোক, যে আলিমশিল্পীর ধ্যানের দৃষ্টিতে ঐ মর্মরসোধ প্রথম ধরা দিয়েছিল, তার নামটি কী?

লোকগাথা বলে,¹² "Shah Jahan was overwhelmed with the magnificence of what they had accomplished—so overwhelmed that, to demonstrate his approval he chopped off the hands of the Master Builder, blinded the Calligrapher and cut off the Chief Architect's head so that none of these people could build an edifice to rival the Taj Mahal... That at least, is the legend." (সমাপ্ত তাজমহল দেখে শাহজাহাঁ খুশির বন্যায় ভেসে গেলেন; এতই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন যে, তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন : প্রধান বাস্তুকীদের হাত দুটি কেটে ফেলা হ'ক, লিপিকারদের অন্ধ করে দেওয়া হ'ক এবং মূখ্য-স্থপতিবিদের গর্দানা নেওয়া হ'ক। যাতে ওরা কোনদিন তাজমহলের জুড়ি না বানাতে পারে।...এ সবই অবশ্য নিছক লোকগাথা।)

মানছি। লোকগাথা। কিন্তু লোকগাথার মূল উপাদান কী? আদ্যন্ত কল্পনা? লোকের মনে যা গাঁথা হয়ে যায় তাই তো লোকগাথা? যা রুটে, তার কিছ্ৰও কি 'ঘটে' নয়? এই লোকগাথার উৎসমুখে হঠাৎ আছে মৃগল-বেগ-এর ঐ 'চুগ-ইক নকশা-পসন্দ আলিজা-হজরৎ'-এর পরের না-লেখা পংক্তির অনন্তিত্ব। সেই...নেই তাই খাছ, থাকলে কোথায় পেতে?'-র কালিদাসী হেমালীর হৃদয়!

বেশ অদ্ভুত করা যায়, সম্রাটের লিখিত নির্দেশে

না হলেও, আভাসে-ইঙ্গিতে মৃগল বেগ-এর সরকারী ইতিবৃত্তের মশানে তাজ-পরিচালনাকারকে কুসর্বাঙ্গ করা হয়েছে! তাকে সম্পূর্ণ মূছে ফেলা হয়েছে : টোটাল এ্যান্‌হিলিয়েশন! না হলে যে ঐতিহাসিক কত হাজার কতশ' কতটি প্রবাল-মুন্ডা-পায়দা কোথা থেকে খরিদ করা হল, কে কত মজুরি দিল, কোথা থেকে কত বায়ে কোন প্রবাটি সংগৃহীত হল তার নিখুঁত হিসাব লিপিবদ্ধ করে গেছেন, তিনি কেমন করে ভুলে বান লিখতে—কার ধ্যানের দৃষ্টিতে ঐ 'আজীব-ও-চারিব' প্রথম ধরা দেয়!

তা যদি সত্য হয়, তাহলে—ছেঁবে দেখুন, তার একটিমাত্র সম্ভাব্য হেতু : স্বার্থসর্বস্ব শাহজাহাঁ চেয়েছিলেন, কৃতিত্বের ষোলো-আনা অংশ বেন তাঁতেই বর্তায়। লোকে বেন মধু ফস্কেও কোনদিন না বলে বসে,—'ঈশা আফান্দির তাজমহল! বরং অন্যতকাল শব্দ বলুক : 'তোমার কীর্তির চেয়ে ভূমি যে মহৎ!'

ভুল বুদ্ধি বেন না আমাকে। এ উদ্ভৃতি এ-গ্রন্থে আমি ইতিপূর্বেও ব্যবহার করেছি। এ বক্তোক্তি রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রযুক্ত নয়। তাঁর ভক্তপাঠকের হাত থেকে আত্মরক্ষার্থে নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা দিচ্ছি : গীতিকাব্যের সত্য ঐতিহাসিক অথবা সাংস্কৃতিক উভয় নয়। কাব্যসত্য সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের সম্পদ। সেখানে বামির হাতে নিবে-বাওয়া প্রদীপ বিশ্বপ্রপঞ্চের মহা-অবলুপ্তির দ্যোতক হতে পারে, সেখানে বালিকার কণ্ঠে উচ্চারিত 'ষেতে নাহি দিব' ধ্বনি এই মর-ধ্বনির জীবনের পদ্য হতে পারে, সেখানে কিলার তীরে ক্রৌঞ্চকের পাখার স্পন্দনে 'অপসন্ট অতীত হতে অক্ষুণ্ট সূত্র' মৃগান্তরে মহাকালের ব্যতিহীন পক্ষধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে পারে! 'শাহজাহান' কবিতার শাহজাহান কে? মিছারি দানায় সুতোটি বই-ভেদ নয়? রবীন্দ্রনাথের কাছে ঐ কবিতা-রচনার রোমাঞ্চিক মূহুর্তে শাহজাহাঁ এক শাস্কত বিরহী-আত্মার বিমূর্ত প্রতীক! কবি যদি ইতিহাসের নিরিখে, সাংস্কৃতিক মূল্যায়নে বিশ্বাস করতেন যে, স্মৃতি-শাহজাহাঁ তাজমহলের চেয়ে মহোত্তর, তাহলে তিনি কবিতা লিখতেন না—'চারিত্রপুঞ্জ' আর একটি প্রবন্ধ রচনা করতেন। রাসমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথের পাশাপাশি একই সারিতে বসিয়ে দিতেন সেই তাজোত্তর কতিসত্বকে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অদ্বিতীয় পাঠকের একমুখ ঐ বহুপঠিত কবিতার প্রভাবে এখন আমাকে হরভে ধমকে উঠবেন : স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন শাহজাহান তাজমহলের চেয়ে মহোত্তর; ভূমি কে যে ইতিহাস পাল এবেছ হান্দ-গাইতে : তাজমহলের নির্মাণ-কৃতিত্বের

ষোলো-আনা হিসাবদার সন্ধ্যাট শাহজাহান নন, কে-
এক নাম-না-জানা ইশা আফগি?

তাই এত কথা কলা। পুনরুজ্জ্বলিত দোষ হচ্ছে জেনেও
একই উদ্ভৃতি বারে বারে শোনানো।

হতে পারে—তাজমহলের পরিকল্পনাকার একজন
নন, একটি টীম। কিন্তু মানবসভ্যতার ইতিহাস বলে,
বোধ-প্রচেষ্টার যেখানে যখনই মহৎ কিছু সৃষ্ট হয়েছে,
দেখা গেছে, সেখানে কেন্দ্রবিন্দুতে আছেন অসীম
প্রতিভাধর একটিমাত্র, অস্বভাবীয় মানুষ। রাশিয়ার
বিশ্বব একটি বোধ-প্রচেষ্টা। কিন্তু কেন্দ্রস্থলে এক-
জনমাত্র মানুষ : লেনিন। আর তাঁর পশ্চাদপটে
মার্কস। আর একটি যুগান্তকারী বোধ-প্রচেষ্টার
কথা বিবেচনা করুন—পারমাণবিক শক্তি। মার্কিন যুক্ত-
রাষ্ট্রের আটপ্রান্তে অবস্থিত আটটি গবেষণাগারে
অসংখ্য বৈজ্ঞানিকের নিরলস পরিশ্রমের ফলশ্রুতি।
কিন্তু তার ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্ভবপর হয়েছে একা-
ধিক বিজ্ঞানভিক্তর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার বিবর্তনে—
রাদারফোর্ড-চাডউইক-জোলিও কুরি-এনারিকো ফার্মি-
অটো হান! তাজমহলের ক্ষেত্রেও সেই ধারাবাহিক
ইতিবৃত্তটা ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে : হুমায়ূন ও খান-ই-
খানান মক্কারা-চন্ডীসেবা দেউল-তাণ্ডোর মন্দির—
ইতমদ-উদ্দৌলা-সেকেন্দার প্রবেশ-তোরণ। কিন্তু
লেনিনের পশ্চাদপটে যেমন Das Capital-গ্রন্থ হাতে
একজন, এ্যাটম-বোমার পশ্চাদপটে যেমন $E=mc^2$ -
ফর্মুলা হাতে একজন—এখানে এই আজীব-ও-বারিব-
এর পশ্চাদপটে কে সেই মহামহিম মূল স্রবধর :
তাজমহলের মহাপুরুষ?

যদি বলেন : শাহজাহাঁ, তাহলে কল্ব, সে-ক্ষেত্রে
স্বীকার করুন—‘পারমাণবিক শক্তি’র আবিষ্কারক
প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট। খরচের বাস্তবরাস্তা তো তাঁরই
সই-এর ছোঁয়! না কি?

শাহজাহাঁ নিশ্চয় নয়। তবে কে? মোটামুটি
পাঁচটি ধিঁয়োরি আছে। তিনটি অর্বাচীন উজ্জ্বল, দুটি
বিবেচনাযোগ্য। প্রথমেই অর্বাচীন মতগুণি শোনাই :

এক : ভেরোনিমো ভেরোনিও। ভেনিস-এর এক-
জন জহুরী। শাহজাহাঁর রাজত্বকালে তিনি ভারত-
কর্ষে আসেন, লাহোরে মারা যান। তাঁর এ দাবীর মূলে
জটিল সমকালীন ক্রীষ্ট ধর্মপ্রচারকের দিনলিপি—
ফাদার সিবিস্টিয়ান। সমসাময়িক অন্য কারও দিন-
লিপি বা চিঠিপত্র এ-কথার উল্লেখ নেই।

দুই : অস্টিন দ্য বোর্দো। ফরাসী। পেশায়
স্বর্ণকার এবং চিত্রকর। এঁর হাতের কাজ লাল-
কিলকার আছে, সে-কথা আগেই বলেছি (পৃঃ 171)।
এঁর দাবীর কথা উঠেছে একজন ইংরাজ মেজরের রচনা

থেকে মেজর স্মিথ্যান।

দুটি দাবীই অগ্রাহ্য। প্রথম ক্ষেত্রে ফাদার
সিবিস্টিয়ান এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মেজর স্মিথ্যান ছাড়া
আর কোনো বিদেশী এ-কথা বলেননি। তাজমহল
পরিকল্পনার কৃতিত্বটাকে যদি এশিয়াখন্ড থেকে যুরোপে
নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হত, তাহলে এত-এত বিদেশী
বণিক, পর্যটক, রাজনীতিক কি নীরব থাকতেন?
দ্বিতীয়তঃ তাজমহল-নির্মাণের যে বিস্তারিত খরচের
খতিয়ান আছে তাতে ঐ দুটি বিদেশী নামের কোন
উল্লেখ নেই। শেষ যুক্তি—স্থাপত্য-সম্বন্ধে যার কোনো
প্রাথমিক শিক্ষার বিনিয়াদই নেই, ইন্দো-ইসলামী
স্থাপত্য কী তা যে দেখিনি, জানে না, বোঝে না, তার
পক্ষে আন্দাজে এ-কাজ করা অসম্ভব—তা সে যতবড়
মণিকার, জহুরী অথবা চিত্রকরই হোক না কেন। স্যার
জেমস্ জীনস্—যিনি বলেছেন, অশ্বশাস্ত্রমতে একটি
বানর যদি কোটি কোটি বছর ধরে একটি টাইপ-রাই-
টারের চাবি এলোমেলোভাবে টিপে যায়, তাহলে শেষ-
মেশ সে হয়তো একটি শেক্সপীয়রের সনেট পয়দা করে
ফেলতে পারে, তিনিও বোধহয় মেনে নিতে পারতেন
না যে, একজন ইতালীয় মণিকার এলো-মেলো লাইন
টানতে টানতে আখেরে ঘটনাচক্রে তাজমহলের প্ল্যানটা
ছকে ফেলবে। অশ্বশাস্ত্রমতে পারবে, যদি ‘কোটি-কোটি’
বছর ধরে সে এলোমেলো লাইন টেনে যায়।

প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ছে গোডস্মিট-এর কথা।
মার্কিন নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট। পরাজিত বিধ্বস্ত
জার্মানীতে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল অনুসন্ধান করে
জানতে, জার্মান নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্টরা এ্যাটম-বোমা
তৈরীর পথে কতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। দীর্ঘদিন
অনুসন্ধান করে গোডস্মিট তাঁর রিপোর্ট পাঠালেন
ওয়াশিংটনে—যুদ্ধচলাকালে জার্মান বৈজ্ঞানিকেরা ইউ-
রেনিয়াম অথবা প্লুটোনিয়াম পরমাণুকে ক্রমাগত
বিদীর্ণ করতে কোনও ‘চেইন-রিয়াকশন’ পদ্ধতি বার
করতে পারেননি। বন্দিশালায় অটো হান, ভন লে,
উইজেকার অথবা হেইজেনবের্গ প্রভৃতির সঙ্গে কথা
বলে তিনি এ সিদ্ধান্তে এসেছেন। জবাবে মার্কিন
সমর-পরিষদ টেলিগ্রাফ করে জানালেন...“এমনও তো
হতে পারে ঐ চার-পাঁচজন বিজ্ঞানী ছাড়া কোন অজ্ঞাত
বৈজ্ঞানিক নির্জন সাধনায় জার্মানীতে বসে ঐ আবি-
ষ্কারটা করেছিলেন, যার কথা আপনি কল্পনাও করতে
পারছেন না।”

এ-কথার জবাবে গোডস্মিট একটি মর্মান্তিক
টেলিগ্রাফ করেছিলেন¹⁸—“A paper-hanger may
perhaps imagine that he has turned into a
military genius overnight, and a trader in

champagne may be able to disguise himself as a diplomat. But laymen of that sort could never have acquired sufficient knowledge, in so short a time, to be able to construct an atom bomb" (কোন রঙমিস্ত্রি হয়তো মনে করতে পারে রাতারাতি সে একজন সামরিক ধ্বংসর হয়ে উঠেছে, অথবা কোনও ভাটিখানার শূড়ি রাত-পোহালে বিখ্যাত রাজনীতিকের ছদ্মবেশ হয়তো ধারণ করতে পারে—কিন্তু একজন রাস্তার লোক এত অল্পসময়ে এতটা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কিছতেই লাভ করতে পারে না যাতে সে পরমাণু-বোমার নির্মাতা হয়ে পড়বে!)

তাজমহল ডিজাইন করার প্রসঙ্গে ভেরোনিও এবং বোর্দোর দাবী সম্বন্ধে ঐ একই কথা।

তৃতীয় অর্বাচীন থিয়োরিটা হচ্ছে—এটি রাজা মান-সিংহের একটি প্রাসাদ, যা কিছ্ অদল-বদল করে তাজমহলের রূপ দেওয়া হয়েছে। এ থিয়োরির মূল কোথায় তা আন্দাজ করা কঠিন নয়—মতাবলম্বীদের বিশ্বাস 'ওক'-গাছের মতো সুদৃঢ়। সম্ভবতঃ রাজা মানসিংহের জমিটি যখন শাহজাহাঁ গ্রহণ করেন, তখন সেখানে কোনো আউট-হাউস জাতীয় মোকাম ছিল, অথবা বাগানবাড়ি, যা নিঃসন্দেহে ধূলিসাৎ করা হয়। একদা-উপস্থিত সেই ইমারৎটি হয়তো এ অর্বাচীন উদ্ভির গণ্যগণ্য। এ জাতীয় চিন্তা হিন্দুধর্মের ঋতুর ধ্বজাধারীদের কী-ভাবে প্ররোচিত করে তা কুৎসিত মিনার প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

সম্ভাবনাময় দুটি নাম এবার পেশ করি :

একটি মত : উস্তাদ্ আহমেদ তাজের জনক। তথ্যটা পরিবেশন করেছেন আহমেদের পুত্র। উস্তাদ্ আহমেদ লাল-কিল্লার প্ল্যানিং-এ গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়েছিলেন, তিনি প্রখ্যাত ক্ষমতাবান স্থপতি। কিন্তু তাঁকে তাজমহলের পরিকল্পনাকার বলে মেনে নিতে পারছি না। কারণ লাল-কিল্লার ইমারৎগুলির সঙ্গে তাজ-স্থাপত্যের ফারাকটা আশমান-জমিন। লাল-কিল্লা শূরু হয়েছে তাজমহলের পরে, ফলে এ-কথা কিছতেই মেনে নেওয়া যায় না যে, কোন একজন স্থপতি যার ধ্যানের দৃষ্টিতে তাজমহল ধরা দিয়েছে, তিনি দশ-পনের বছর পরে লাল-কিল্লায় দেওয়ান-ই-খাশে আগ্রা-কিল্লার খাশমহলের হুবহু নকল করবেন।

নেতি-নেতি করে শেষ যে নামটিতে এসে ঠেকলাম সেটি : উস্তাদ্ ঈশা আফান্দ।

তাজমহল প্রসঙ্গে তাঁর নাম নানাভাবে উল্লিখিত হয়েছে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশতি শতাব্দীতে : উস্তাদ্ খান আফান্দ, ঈশা মুহম্মদ আফান্দ, উস্তাদ্ মুহম্মদ

ইসফাহান্দ, ঈশা খান ইত্যাদি। তাঁর আদি নিবাস সম্পর্কে নানা মতের নানা মত : ইসফাহান্দ, শিরাজ, ইসফাহান, সমরকন্দ, কান্দাহার এবং দিল্লী-আগ্রা। পরিচয় দিতেও অনেক অনেক কথা বলেছেন—তিনি খ্রীষ্টান, ইহুদী, আরবী, এমন কি মুসলমান ফকির অথবা হিন্দু সম্রাসী। মোটকথা ইতিহাস হাফড়ে কোনও সিদ্ধান্তে আসা যায় না।

ইতিহাস নয়, ইমারৎ ঘেঁটে ঘেঁটে আমি কিন্তু কয়েকটি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। সেগুলি দাখিল করি। মানা-না-মানা আপনাদের অভিযুক্তি।

আমার ব্যক্তিগত আন্দাজ : তিনি বিদেশী, সম্ভবত ইসফাহানী, ভারতবর্ষে ছিলেন বছর ত্রিশেক ; 1628 থেকে 1658 সালে। এই অনুমানের সপক্ষে বক্তব্য :

তাজের নকশাতে একটি অত্যন্ত পরিণতম্না স্থপতির স্বাক্ষর, অর্থাৎ তাজপরিকল্পনাকারের বয়স 1630-এ অন্তত ত্রিশ। তিনি যদি ভারতীয় হন তাহলে দিল্লী-আগ্রাতে তাঁর যৌবনের হাতের কাজ নেই কেন? জীবনের প্রথম নকশাতেই কি তাজের ডিজাইন সম্ভব? এবং এটা তাঁর প্রথম ডিজাইন হলে তিনি কেমন করে প্রতিযোগিতায় অংশ নিলেন? অখ্যাতনামা স্থানীয় স্থপতি এমন 'প্লেবাল-টেডারে' ডিজাইন দাখিল করার সুযোগ পায় না। ফলে তিনি বিদেশী। ইসফাহান-এর লোক অনুমান করছি তাঁর নাম থেকে—'আফান্দ', যা 'ইসফাহান্দী' থেকে। 'শিরাজ'-এর লোক 'শিরাজী', লাহোরের লোক 'লাহোরী' হয় কেমন। তাজ নির্মাণের পর হয় তিনি মাল্ল খান, নয় ভারতবর্ষ ত্যাগ করে যান। কারণ তাজের পরবর্তী কোনও বড় কাজে তাঁর হস্তের স্পর্শ নেই।

হাজারির খাতায় দেখছি, প্রতি পাতায় তাঁর নাম লেখা হয়েছে সবার প্রথমে ; তাজনির্মাণের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মাসিক এক হাজার তক্ষা বেতনে। মজা হচ্ছে, খাতায় ঈশা আফান্দ ছাড়া আরও তিনজন হাজার তক্ষা মাস-মাহিনায় বেতন নিজেছেন। প্রশ্ন হতে পারে, চীফ আর্কিটেক্ট বা মূল পরিকল্পনাকার হিসাবে তাঁর মাহিনা কিছ্ বেশি হওয়া স্বাভাবিক ছিল না কি? কিন্তু সে ব্যক্তিটাই কি ধোপে ঢেকে? যদি আগেই ধরে নিই—এবং ধরে নেবার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে যে, শাহজাহাঁ মূল পরিকল্পনাকারের নামটা ইতিহাস থেকে মুছে দিতে বন্দ্যপরিষদ, তাহলে তিনি কী করবেন? 'আর্কিটেক্টস'-ফি-টা কালোচকর নগদে ফেঁটবেন। এক-নম্বরী খাতায় তার উল্লেখ থাকবে না, থাকবে দু-নম্বরে। প্রকাশ্য হিসাবের খাতায় শূরু 'সুপারভিশন চার্জ'-টুকু দেখানো হবে—আর পাঁচজনের সঙ্গে সমান অঙ্কে। 'আই. টি. ও.'-কে বড়বক বানাতো।

এখানে শাহজাহান আই. টি. ও.--অনাগতকাল! ইতি-
হাস!

এছাড়া আরও ছাব্বিশ জন মাসিক 675 থেকে
200 তৎকাল নিষ্পত্ত ছিলেন। বাকি কর্মীরা 'ফুরনে'
কাজ করেছে, কিস্তি দৈনিক হারে অস্থায়ীভাবে। প্রতি
পন্থায় প্রথমেই ইশা আফান্দির নাম। কাজের পরি-
চয় হিসাবে মূল ফাসীতে কী-লেখা আছে তা পড়বার
মতো বিদ্যে আমার নেই; ইংরাজী অনুবাদে দেখছি
'Chief Designer' বাঙালার যাকে 'মূল পরিকল্পনা-
কার' বলতে হয়।

সম্ভবতঃ শিল্পীরা বুদ্ধিতে পেরেছিলেন শাহ-
জাহান বড়বন্দটা। তার একটি প্রমাণ রয়ে গেছে তাজের
গম্বুজে--অনেক উঁচুতে। সেখানে তুমরা হরফে খুদে
খুদে অক্ষরে লেখা আছে : 'লিপিকার--অতি অভাজন
আমান খান শিরাজী'।

প্রকাশ্যস্থানে আশ্চর্যঘোষণার সুযোগ পাননি বলেই
অত উঁচুতে তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে নিজের নামটা লিখে
গেছেন; যা অতি সম্প্রতি মেরামতির সময় আবিষ্কৃত
হয়েছে। শিল্পীমায়েই বেটুকু চান--একটু স্বীকৃতি,
একটু দরদ--সেই আকৃতিতেই তিনি রেখে গেছেন
নিজের স্বাক্ষর।

সে সুযোগ কোথাও পাননি মূল পরিকল্পনাকার
ইশা আফান্দি অথবা উস্তাদৌ-কি-উস্তাদ মীর
মহম্মদ গাজী মিন্না অজ্ঞাতনামা!

তা হোক, নাম না থাক, তাঁর ব্যক্তিত্বের স্পষ্ট স্বাক্ষর
তিনি রেখে গেছেন তাজমহলের আপাদমস্তকে :

(ক) এই একটিমাত্র ইমারতে শাহজাহানী 'ম্যানা-
রিজম্' তিলমাত্র প্রতিকলিত হয়নি। আদ্যন্ত মর্মরে
নির্মিত হলেও (সেলিম চিস্তির কবরও তাই এবং
ইতমদউদ্দৌলা-সমাধিসৌধ) এখানে নয়-বাঁক-ওয়াল
খিলান বর্জন করা হয়েছে। শৃঙ্গ উপরের চারটি ছোট
চন্দ্রায় এই ম্যানারিজম্-টি মেনে নিয়ে শাহজাহানের
মর্যাদা রক্ষা করা হয়েছে। দেবরাজ ইন্দু নাকি একবার
ঘাগের মাথার নারায়ণের বাহন গরুড়কে বস্ত্র ছুঁড়ে
মারেন। মহাবিহঙ্গম সে আঘাত অবিলম্বে গ্রহণ
করেন। ইন্দু লজ্জায় অধোবদন হলেন। তখন নারায়ণ
গরুড়কে কলসেন, বস্ত্র সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলে মহামুনি
দণ্ডিচীর অপমান! সে-কথা শুনে গরুড় তাঁর একটি
পালক খুঁজে দিয়েছিলেন। ইন্দুর বস্ত্র সেই পালককে
দখ করে তুপে ফিরে যায়। বোমকারি ইশা আফান্দিও
অনুভব করেছিলেন ঐ বহুকবচন-কিচ্ছিক্ত কিন্তু
মূলতঃ নয়নাভিরাম নয়-বাঁক-ওয়াল খিলানকে একেবারে
অস্বীকার করা হলে শাহজাহানী নয়, সৌন্দর্যবোধের
অপমান। তাই চারটি অতিক্রম চন্দ্রায় তার

স্বীকৃতি দিয়েছেন! তাজমহলে ছতীবর্জিত সমতল
ছাদ কোথাও নেই, প্রসারিত-বাহন ছক্কা নেই, হিন্দু-
শৈলী বর্জনের প্রবণতা নেই। শৃঙ্গ মূল ইমারৎ নয়,
সংলগ্ন কোনও মোকামেও নেই। ফলে এই ইমারতে
শাহজাহানী-স্থাপত্যের তিলমাত্র ছাপ কোথাও পড়েনি।

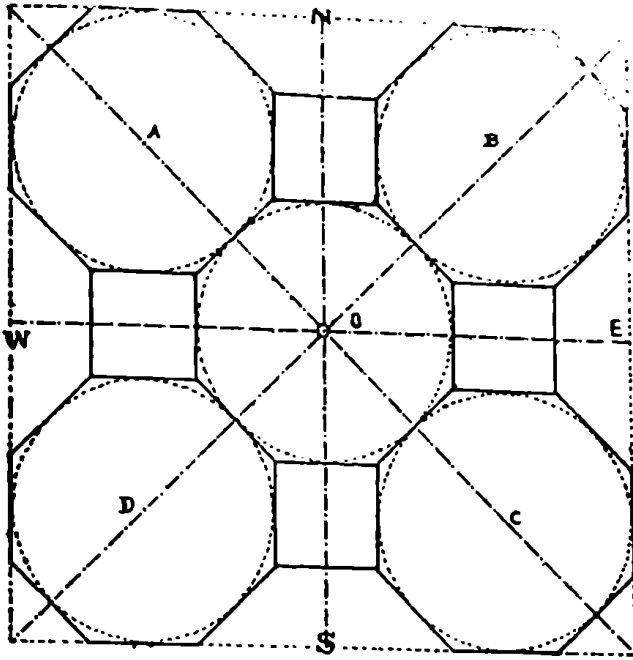
(খ) এই প্রথম এবং এই শেষবার, শাহজাহানী-
স্থাপত্যে হিন্দু-স্থাপত্য স্পষ্টভাবে ছাপ ফেলেছে।
পঞ্চরত্ন-দেউল বাস্তু-নকশায়, তাজোরী গম্বুজে, মহা-
পশ্ম-ঘণ্টা-আমলক-কলস অলঙ্কারের ব্যবহারে। পরি-
কল্পনাকার যেই হোন তিনি হিন্দু ও ইসলামী
স্থাপত্যে আলিম--গভীর জ্ঞানসম্পন্ন। তার চেয়ে
বড় কথা, বাদশাহের প্রবণতা কী, তা জানা সত্ত্বেও
তিনি শিল্পসত্যকে কোথাও খাটো করেননি : তিনি
নির্ভীক। তাঁর এই হিন্দু এবং ইন্দো-ইসলামী জ্ঞানের
পরিধি দেখেই আন্দাজ করেছি, তাজের ডিজাইন ছকার
অন্তত বছর তিনেক আগে তিনি ভারতবর্ষে আসেন,
অর্থাৎ 1628 নাগাদ।

(গ) 'পার্সপেক্টিভ' বা পরিপ্রেক্ষিত-জ্ঞান তাঁর
আকাশচুম্বী, যেটি সমকালীন ভারতীয় কোনও আর্কি-
টেক্টের অধিকারে ছিল বলে নজরে পড়ে না। 'অপটিক্স-
বিজ্ঞান' তাঁর নখাগ্রে। তিনি দর্শককে এমন-এমন স্থানে
দাঁড় করিয়ে দিতে পেরেছেন যেখানে সুবিশাল ইমারৎ
তার আয়তন ও 'ম্যাস'-কে ত্যাগ করে শৃঙ্গ ভাবটুকু
মুঠায় করে উদ্ভাসিত হয়েছে। মৃত্তোর দানার মতো!
কালের কপোলে একবিন্দু নয়নের জলের মতো। তিনি
শৃঙ্গ স্থপতি নন, তিনি কবি। মহাকবি!

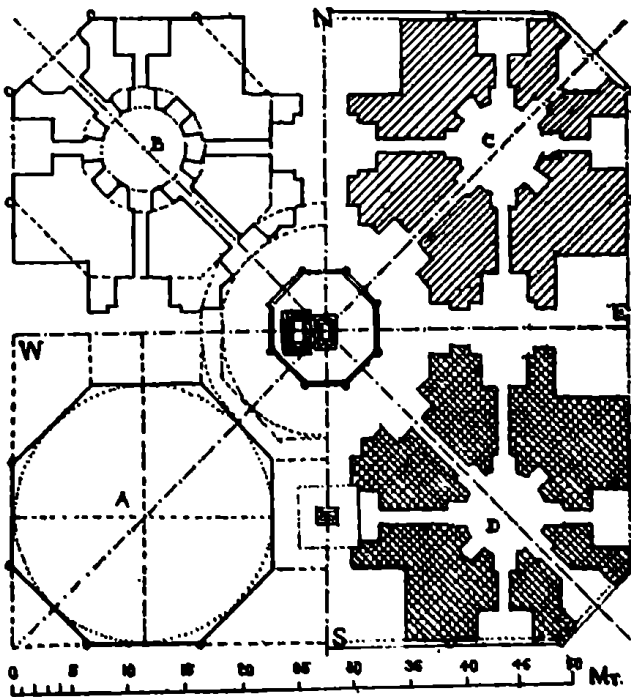
(ঘ) অপটিক্স-বিজ্ঞানের একটি বিশেষ প্রয়োগ-
কৌশল--trompe l'oeil--যার সার্থক প্রয়োগ প্রাক্-
শাহজাহানী ভারতীয় স্থাপত্যে নজর পড়ে না, অথচ
বা ইতালীয় হাই-রেনেসাঁতে বহুল-প্রযুক্ত, তা দেখে
মনে হয়, শিল্পী বিদেশী। ভারত-আগমনের পূর্বে
ইতালীয় রেনেসাঁর সঙ্গে তাঁর অন্তত পরোক্ষ যোগা-
যোগ ঘটেছিল।

তাজমহলের প্ল্যান : ইতিমধ্যেই আমরা দেখেছি
যে, ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যে মক্কার প্ল্যান দু-
জাতের : পারস্যরীতির বৃত্ত-কেন্দ্রিক এবং হিন্দু-
শৈলীর রেখ-কেন্দ্রিক। আকবর বরাবর দ্বিতীয়
পন্থাটিতে বাস্তু-নকশা ছকেছেন, তাও দেখেছি। তাজ-
মহলের প্ল্যান কিন্তু পারস্য-শৈলীর। বৃত্তকেন্দ্রিক।
হুমায়ুন-মক্কার অনুরণে। মীর্জা গিয়াস্ হুমা-
য়ুন-মক্কার ছকেছিলেন নয়টি বৃত্তকে মূলধন করে।
সেখানে কেন্দ্রীয় বৃত্তটি ছিল তার চতুর্ভুজ-বৃত্ত-
চতুর্ভুজকে স্পর্শ করে। কিন্তু চার কোণের আটটি বৃত্ত

পরস্পরকে ছেদ করেছিল। তাজে আছে মাত্র পাঁচটি বস্তু, কিন্তু কেউ কাউকে ছেদ করেনি। বস্তু-সংখ্যার



চিত্র-11.9 তাজ বাস্তু-নকশার পঞ্চবস্তু-মূলক জ্যামিতিক মৌলসূত্র।



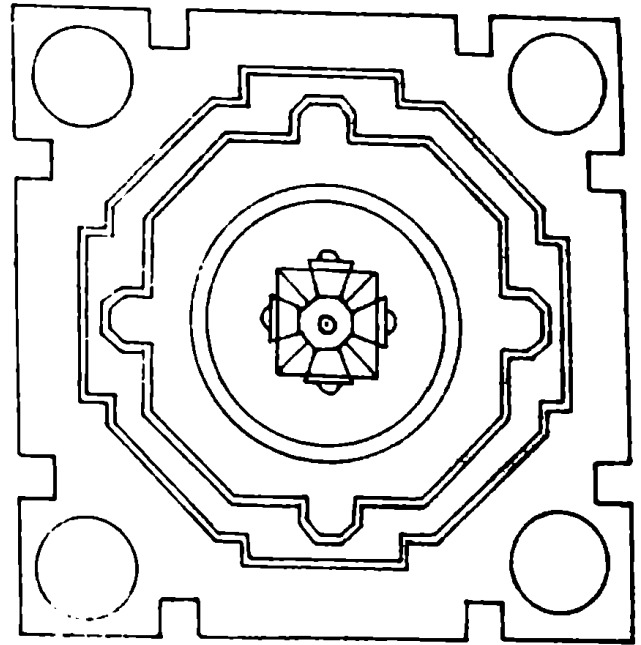
চিত্র-11.10 তাজের বাস্তু-নকশা। কেন্দ্রে মমতাজের ও তার পশ্চিমে শাহ-জাহাঁর সমাধি।

ফারাকেই শূন্য নয়, তাদের জন্মদিনাসেও মৌলিকতার ছাপ। এই পাঁচটি বস্তুকে মূলধন করে কী-ভাবে বাস্তু-

শাহ-জাহাঁ

নকশাটি রূপায়িত তা চিত্র-11.9 এবং 11.10-এ দেখাবার চেষ্টা করেছি। সুতরাং কেউ যদি বলেন, তাজের প্ল্যান হুমায়ুন-মক্‌বরার অনুসরণে পারস্য শৈলীর তা অম্বীকার করি কেনন করে?

আবার স্বীকারও যে করতে পারছি না; কারণ পঞ্চবস্তুকে মূলধন করে মন্দির-রূপায়ণের নির্দেশ আছে হিন্দু বাস্তু-শাস্ত্রেও। তাকে বলে 'পঞ্চরঙ্গ-দেউল'। পার্সি ব্রাউনের মতে অবশ্য পঞ্চরঙ্গ-দেউলের বাস্তু-নকশা বস্তু-নির্ভর নয়, ছাদের ঐ পঞ্চচ্ছত্র জন্মই তার এই নাম। কিন্তু হ্যাডেল-সাহেব যেভাবে দেখিয়েছেন তাতে মনে হয় পঞ্চরঙ্গ দেউলের ঐ ছাদটি এক-বারে ভূমি-নকশা থেকেই উঠে আসে। এই বিষয়ে



চিত্র-11.11 পঞ্চরঙ্গ দেউল; শিবের স্মৃতি-চণ্ডীকো দেউল-1098, বম্বাই।

যদি স্থাপত্য বা পুরাতত্ত্বে কোনো গবেষণা বা 'অনু-গ্রাফ' প্রকাশিত হয়ে থাকে তবে আমার তা নজরে পড়েনি। যাই হোক হ্যাডেল সাহেবের গ্রন্থ থেকে উদাহরণ হিসাবে স্ববম্বীপের একটি পঞ্চরঙ্গ-দেউলের ছাদের প্ল্যান চিত্র-11.11-এ সংযোজন করা গেল। এটি একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত-তখনও ভরতবর্ষে মুসলমান রাজত্ব শুরু হয়নি।

এবার আপনারাই বলুন, তাজমহলের বাস্তু-নকশার মূল প্রেরণা কোথায়? পারস্য-শৈলীর হুমায়ুন-মক্‌বরার অথবা হিন্দুদের পঞ্চরঙ্গ দেউল?

এখানেই সেই অজ্ঞাত তাজ-পরিকল্পনাকারের অসীম কৃতিত্ব। ভিল ভিল করে তিলোত্তমা গড়েছেন,

অথচ কোন ভিল্টি কোথা থেকে তুলে এনেছেন তা ভিলমাত্র বঝতে দেননি। নিঃসন্দেহে তাজ ইন্দো-ইসলামী মিশ্রিত শৈলীর। আর তাই হ্যাডেল সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন^{১৪} : The Taj belongs to India, not to Islam.' (তাজ ভারতবর্ষের সম্পদ, ইসলামের নয়।)

গম্বুজ : তাজমহলে সৌন্দর্যের বৃকোদরভাগ দখল করে আছে তার গম্বুজ। এখানেও পরিকল্পনাকারের কৃতিত্ব অপারিসমী। এই অপূর্ব গম্বুজটি কে ডিজাইন করেন এ বিষয়েও নানা মূর্নির নানা মত। একদল দাবী করেছেন, শাহজাহাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র উস্তাদ-ম্বপতি এবং সম্রাট-নিবৃত্ত দারোগা-ই-ইমারৎ আলি মর্দন খাঁ এটি 'ডিজাইন' করেন। এ মতটা মানতে পারছি না। কারণ ইতিহাসে দেখাছি, আলি মর্দন আগ্রাতে এসে কাজে যোগদান করেন ১৬৩৪ সালে। তাজ গম্বুজের কাজ শুরুর হবার ছয় বছর পরে। আমার ধারণা তাজের গম্বুজ রূপায়ণ করেন : উস্তাদ আহমেদ। কেন? বলছি।

দেখা যাচ্ছে, এই বিশেষ গম্বুজটি সম্বন্ধে ফাগুদ-সন ও হ্যাডেল কিছ্র ভিন্ন মত পোষণ করেন। ফাগুদ-সনের মতে তাজমহলের গম্বুজ পারস্যারীতির সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ ; এটি নিভেজাল 'স্যারাসেনিক' (অর্থাৎ ইসলামী। 'স্যারাসেনিক' শব্দটা ফাগুদ-সনের আমলে স্থাপত্য পরিভাষায় চালু ছিল। একই অর্থবহ। কিন্তু শব্দটা বিভ্রান্তিকর বলে আমরা পার্সি ব্রাউন অনুসরণে সর্বত্র 'ইসলামী' বলছি)। ফাগুদ-সনের মতে ভারতবর্ষে পে'য়াজী-গম্বুজ বানানোর কায়দাটা কারও জানা ছিল না। আর্চ, স্ট্যালেক্টাইট প্রভৃতির মতো 'পে'য়াজী-গম্বুজও ইসলাম ভারতবর্ষে আমদানী করে। কিন্তু পে'য়াজী-গম্বুজ কী?

আমরা চিত্র-11.12-এ অনেকগুলি গম্বুজ পাশা-পাশি সাজিয়ে দিয়েছি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তাজের পূর্ববর্তী প্রতিটি ইসলামী গম্বুজের ক্ষেত্রে তার ব্যাস বৃহত্তম ঠিক যেখানে গম্বুজ-কুর্সি অথবা পাদপীঠ থেকে সেটা উর্ধ্বমুখে যাত্রা শুরুর করেছে। তাজের ক্ষেত্রে তা নয়। প্রস্তর-নির্মিত গম্বুজের এক-তৃতীয়াংশ উচ্চতায় গম্বুজের ব্যাস বৃহত্তম। এই সরু-থেকে-মোটা এবং তারপর মোটা-থেকে সরু হওয়ার চঙটিকেই আমরা 'পে'য়াজী গম্বুজ' বলছি। যেন একটা গোটা পে'য়াজের আকার (bulbous dome)। তাজ নির্মাণের প্রায় সওয়া শ' বছর পরে সফদরজঙ মক্-বারায় দেখাছি, উচ্চতার তুলনায় ব্যাসের বৃদ্ধির হার আরও দ্রুতচলু হয়েছে। লাল-কিল্লার ভিতরে আলমগীর-নির্মিত মতি-মসজিদেও এটা আমরা দেখে এসেছি।

এক্ষেত্রে কিন্তু বলতে পারা যায় না—এই পে'য়াজী-চঙটি তাজ-পরিকল্পনাকারের একটি মৌলিক চিন্তা। পার্সি ব্রাউন-সাহেব তাঁর গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে যে কয়টি ইন্দো-ইসলামী গম্বুজের ছবি দিয়েছেন এবং আলোচনা করেছেন তার বাহিরে একটি ইন্দো-ইসলামী গম্বুজ বর্ণিত হয়েছিল যা তাজের আগে এবং যা পে'য়াজী গম্বুজ কিন্তু পার্সি ব্রাউনে অনালোচিত। মমতাজের পিতা আসফ আলীর সমাধিতে—লাহোরের কাছে সাহাদ্রায়, জাহাঙ্গীর-সমাধির অনতিদূরে। চিত্র-11.12-এ দেখুন উপরের সারিতে আঁকা চারটি ইস-লামী গম্বুজের একটিও পে'য়াজী গম্বুজ নয়। অথচ প্রাক-মুসলিম যুগের হিন্দু-ম্বপতি এই পে'য়াজী-চঙটা জানত। বহু বৌদ্ধ স্তূপের 'অন্ড' এ চঙে তৈরী। তাজোর-দেউল-এর গম্বুজ হুবহু তাজের গম্বুজের চঙে। উত্তর ভারতের ইসলামী যুগে লাহোরে

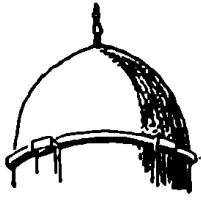
খরচের বন্টন থেকে একটি পুস্তার বণ্ণানুবাদ

নাম	আধিনিবাস	কর্ম-পরিচয়	মাসিক বেতন (তংকা)
মুহম্মদ ইশা আফগিন	..	পারিকল্পনাকার	1000
সত্যর খান	..	রেখাকার	1000
মুহম্মদ সিক	..	নকশা বিদ	1000
অম্মান খান শিগ্গাজী	..	খুদ্রা সেক	1000
জাহির জামান খান	..	শিল্পী	800
শিগ্গাজী লাল	..	মোজাইক মিস্ত্র	800
বসমত দাস	..	পা. তার. স.	690
মাস্তা লাল	..	খোদাই-শিল্পী	680
বমুনা দাস	680

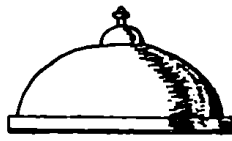
নির্মিত আসফ-আলির মক্‌বারাতে এটি প্রথম প্রবেশ করল ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যে।

এই প্রসঙ্গেই উঠে পড়ছে উস্তাদ্ আহমেদের নাম। উস্তাদ্ আহমেদ লাহোরের অধিবাসী। তিনি একজন প্রখ্যাত স্থপতি ; লাল-কিল্‌দার প্ল্যানিং ও অনেকগুলি ইমারত তিনি ছক্‌কেছিলেন উস্তাদ্ হামিদেদ সঙ্গে যৌথভাবে। আসফ-আলী মক্‌বারার 'ডিজাইন'ও তাঁর। আমার তাই ধারণা : তাজের গম্বুজটা তিনিই ডিজাইন করেন। আর এ-থেকেই আহমেদের পত্র

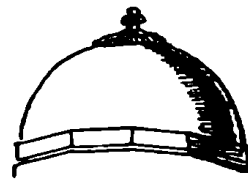
কল্পনাটা পেসেন কোথা থেকে : ফার্গুসন বলেছেন-- পারস্য থেকে। হ্যাভেল দৃঢ় স্বরে বলেন, না। এটা ভুল হয়েছে ফার্গুসনের--"Fergusson made a great mistake in his statement that bulbous domes were not known in India in the fourteenth century."¹⁵ (ফার্গুসন বিরাট একটা ভুল করেছেন, বলেছেন, চতুর্দশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে পেঁয়াজী গম্বুজ বানাবার কারদাটা কেউ জানত না।) স্বমতের সমর্থনে হ্যাভেল তাজের মন্দির-শিখরের



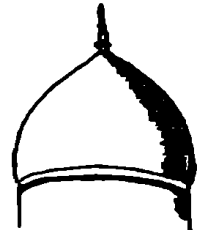
ডোম অব দ্য রক
জেরুসালেম
৭ম শতাব্দী



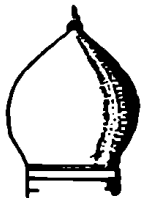
আলাই দরওয়াজা
কুৎব-চত্বর
1310



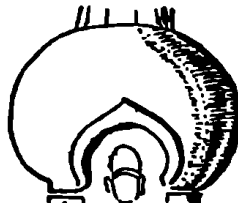
মুহম্মদশাহ সৈয়দ
দিল্লী
1444



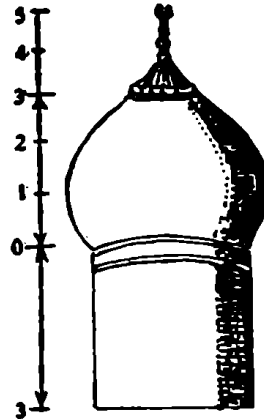
হুমায়ুন মক্‌বারা
দিল্লী
1564



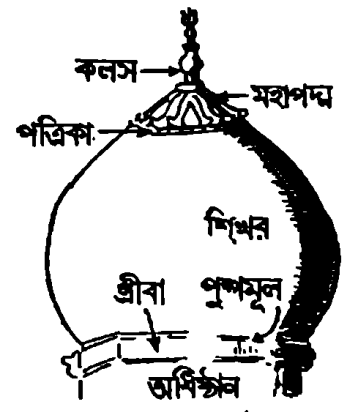
আসফ আলি
লাহোর
প্রাক-তাজমহল



উনবিংশতি চৈত্য
প্রাক-ইসলামী যুগ



তাজমহল
1634



তাজমহল-দেউল
প্রাক-ইসলামী যুগ

চিত্র-11.12 গম্বুজের রূপবিবর্তন।

দাবী করেছেন তাঁর পিতা তাজমহলের পরিকল্পনাকার। কিন্তু উস্তাদ্ আহমেদকে গোটা তাজমহলের পরিকল্পনাকার বলে স্বীকার করতে পারছি না। হেতু একটাই : রচনা শৈলী। তাজমহলে যে বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট চিত্তাধারা—শাহাজানী মানারিজমকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করার দৃঢ় মনোভাব, তার চিহ্নমাণ কোথাও নেই লাল-কিল্‌দায়। তাই তাজের পরিকল্পনার হিসাবে হামিদ, আহমেদ বা আলিমদানের দাবী মানতে পারা যায় না। কিন্তু উস্তাদ্ আহমেদই বা এই অশুভ পরি-

একটি নকশা তাঁর গ্রন্থে যোগ করেছেন। হিন্দু শাস্ত্র-সম্মত তার বিভিন্ন প্রত্যঙ্গের নামোল্লেখও করেছেন। সেই দৃষ্টান্ত গ্রন্থ থেকে আপনাদের সর্বাধার জন্য নকশাটা এখানে একে দিলাম।

এবার এই তাজের-শিখরের সঙ্গে তাজ-গম্বুজের তুলনা করুন। উচ্চতা ও ব্যাস অনেক অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে ; কিন্তু বহিরঙ্গ-রেখা হুবহু এক। তাছাড়া পটিকা, মহাপদ্ম, কলস-এর কোন পরিবর্তন করা হয়নি। শব্দমাণ ধাতব শিখরচড়ায় সর্বোচ্চ স্থানে

শুল্পাধির বিশ্লেষণ পরিকল্পিত এসেছে ইসলামী ঐদের চাঁদ। যাকে বলে Master Artrium (উস্তাদ-কি-উস্তাদ)-এর 'ফিনিশিং টাচ'।

হ্যাভেল এ-প্রসঙ্গে আরও বলেছেন, "Akbar made Moghul Art great not by setting up a new standard of architectural taste, as Babur and Humayun did and as we foolishly do in India today, but by allowing the Hindu builders to weld the Persian and Arabic art tradition on their own." [আকবর যে মূল রীতিকে মহান রূপ দিতে পেরেছিলেন, তার হেতু এ নয় যে, তিনি বাবুর এবং হুমায়ূনের মতো নবাবগণের নতুন স্থাপত্যচিন্তার প্রবর্তন করতে চাইলেন,—যে ভুলটা আমরা (অর্থাৎ ইংরেজেরা পরাধীন) ভারতবর্ষে আজও করে চলেছি। বরং তিনি স্থানীয় হিন্দু কারিগরদের সুযোগ দিয়েছিলেন পারসিক ও আরবীয় শৈলীকে তাদের নিজস্ব চিন্তাভাবনার জারকরূপে জীর্ণ করে নিতে।]

শাহজাহাঁ সে পথে যাননি। যদিও তিনি আলম-গীরের মত চরম ধর্মাত্ম ছিলেন না, তবু বেশ কিছুটা সোঁড়া ছিলেন। সারা জীবনে হিন্দু স্থাপত্য-শৈলীকে তাঁর স্থাপত্যে পরিহার করে গেছেন। একেবারে আদি যুগে, আকবরী প্রভাবমুক্ত হওয়ার প্রারম্ভিক কালে কিছু কিছু বীম-ব্র্যাকেট কর্বেলিঙ ব্যবহার করলেও শেষ দিকে তা সমস্তে পরিহার করেছেন। তাজমহল পারিকল্পনাকার—তা তিনি ঈশা আফান্দি হ'ন, অথবা যেই হ'ন, সম্রাটের এই মনসিকতা বৃদ্ধিতে পেরেছিলেন ঠিকই। অথচ মনে-প্রাণে তিনি আকবরের ঐ নীতিটা, বা প্রতিধ্বনিত হয়েছে হ্যাভেলের কণ্ঠে, সে মতটা বিশ্বাস করতেন। ফলে শিল্পী নিশ্চয়ই মর্মান্তিক কর্মযাত্রা ভোগ করেছিলেন—নিজের আদর্শ এবং বাদশাহী বাসনার সমঝোতা করতে। এ পরীক্ষায় অসামান্য কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন তিনি। প্রতিটি ক্ষেত্রে হিন্দু-শৈলীকে ইসলামী রীতির জারকরূপে এমন সুনিপুণভাবে জীর্ণ করেছেন যে, কোথাও সে তত্ত্বটা বোঝা যায় না। তাঁর প্ল্যানিং পণ্ডরক্ত-ডেউলের অনুসরণে, অথচ দেখলে মনে হয় হুমায়ূন-মক্‌বারার পারস্য-রীতি অনুসারী! তাঁর গম্বুজে তাজমহলের মন্দিরের শব্দ-ধ্বনির অনুরণন—যার 'পাস্তিকা-পদ্ম-কলস' সবই গ্রহণ করেছেন দৃঢ়হাত বাড়িয়ে : কিন্তু ফিনিশিং-টাচ—এ বিশ্লেষণ বদলে ঐদের চাঁদ। সম্রাট শাহজাহাঁ তো ছাড়, আঁত ধরলেন স্থপতি জেমস্ ফাগুসন পর্যন্ত ধরতে পারেননি ঐন্দুজালির এই অপূর্ণ চমৎকারতা! কলস বস-

লেন : তাজ-গম্বুজ হচ্ছে নির্ভেজাল স্যারাসেনিক-রীতির! আরও লক্ষ্য করে দেখুন—কেন্দ্রীয় মূল গম্বুজটি হিন্দু-শৈলীর হলেও চারপ্রান্তের চারটি ছোট ছোট গম্বুজ হচ্ছে নিছক ইসলামী শৈলীর। কেউ সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে না দিলে, বলে না দিলে খেয়ালই হয় না। এমনই বে-দাগ্ মিলাদ-সরীফের অয়োজন করেছেন তিনি ইন্দো ও ইসলামী স্থাপত্যের।

মিনারিকা চতুষ্টয় : স্বীকার্য, মৌলিক চিন্তা নয়। মক্‌বারার সঙ্গে মিনারিকাকে যুক্ত করার রেওয়াজ এতদিন দিল্লী-আগ্রা অঞ্চলে ছিল না। আকবর সেটা প্রথম আমদানী করতে চেয়েছিলেন নিজের মক্‌বারায়, তাই দক্ষিণ-তোরণে তাদের রূপায়িত করেছিলেন। কিন্তু নিজ মক্‌বারার মূল সোঁথে সেগুদিল নির্মাণের পূর্বেই তাঁকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হয়। জাহাঙ্গীর সে তত্ত্বটা বৃদ্ধিতে পারেননি, পেরেছিলেন নূরজাহাঁ ; আর তাই ইতিমধ্যে উদ্‌দৌলয়, নিজ মক্‌বারায় এবং জাহাঙ্গীরের সমাধিতে তিনি মিনারিকা বানিয়েছিলেন। এসব কথা আগেই বলেছি। কিন্তু রাজধানীর সঙ্কটস্থ চোহন্দীর বাহিরে এই অপূর্ণ অবয়বটি মক্‌বারার অঙ্গ হিসাবে বারে বারে রূপায়িত হতে দেখছি। মিনার-মিনারিকার বিবর্তনটা বোঝাতে চিত্র—11.13-এ সাতটি ছবি দেওয়া হয়েছে। তার প্রথম দুটি বিচ্ছিন্ন মিনার, বাকি পাঁচটি ইমারৎ-সংলগ্ন মিনারিকা। তুলনামূলক বিচারে তাজের মিনারিকাই সবচেয়ে সাদামাটা। তার সম্ভাব্য হেতু সম্বন্ধে মূর্খতবা আলী-সাহেবের মন্তব্য আগেই উদ্ধৃত করেছি (পৃঃ 34)।

তাজের মিনারিকা প্রসঙ্গে লিখতে বসে এখন মনে হচ্ছে, পূর্ব-অনুচ্ছেদের ঐ পংক্তিটা কেটে দিই, ঐ 'তাজমহলের সৌন্দর্যের বৃকোদরভাগ দখল করে আছে তার গম্বুজ'। এখন মনে হচ্ছে, গম্বুজ নয়, ঐ মিনারিকা চতুষ্টয়।

মূল ইমারতের আপেক্ষিকে এই চারটি মিনারিকা, তাদের আকার, উচ্চতা, আয়তন, অবস্থান, তলবিভাগ, এবং 'ম্যাস' চূড়ান্ত সফলতার স্বাক্ষরমণ্ডিত। ভূমি-নকশায় কেন্দ্রস্থ ফোয়ারার কাছে দাঁড়িয়ে, অথবা প্রবেশ-তোরণের মধ্যবিন্দুতে দাঁড়িয়ে দর্শক ঐ চারটি মিনারিকাকে ইমারতের আপেক্ষিকে কী-ভাবে দেখবে তা কেমন করে আন্দাজ করলেন স্থপতি? সম্মুখদৃশ্যে (এলিভেশানে) মিনারিকার অবদান নিতান্ত তুচ্ছ। কিন্তু বাস্তবে, পার্সপেক্টিভ-দৃষ্টিতে কেন্দ্রবিন্দু থেকে টানা 'রেডিয়াল-রেখায়' উদয়তানুর রশ্মিচ্ছটার মতো তা মহিমামণ্ডিত। এই অবকাশে হুমায়ূন-মক্‌বারার

ছাঁটটা (চিত্র—9.5) একবার দেখে নিন। এখন যেন মনে হবে,—হ্যাঁ, এটারই অভাব ছিল কটে।

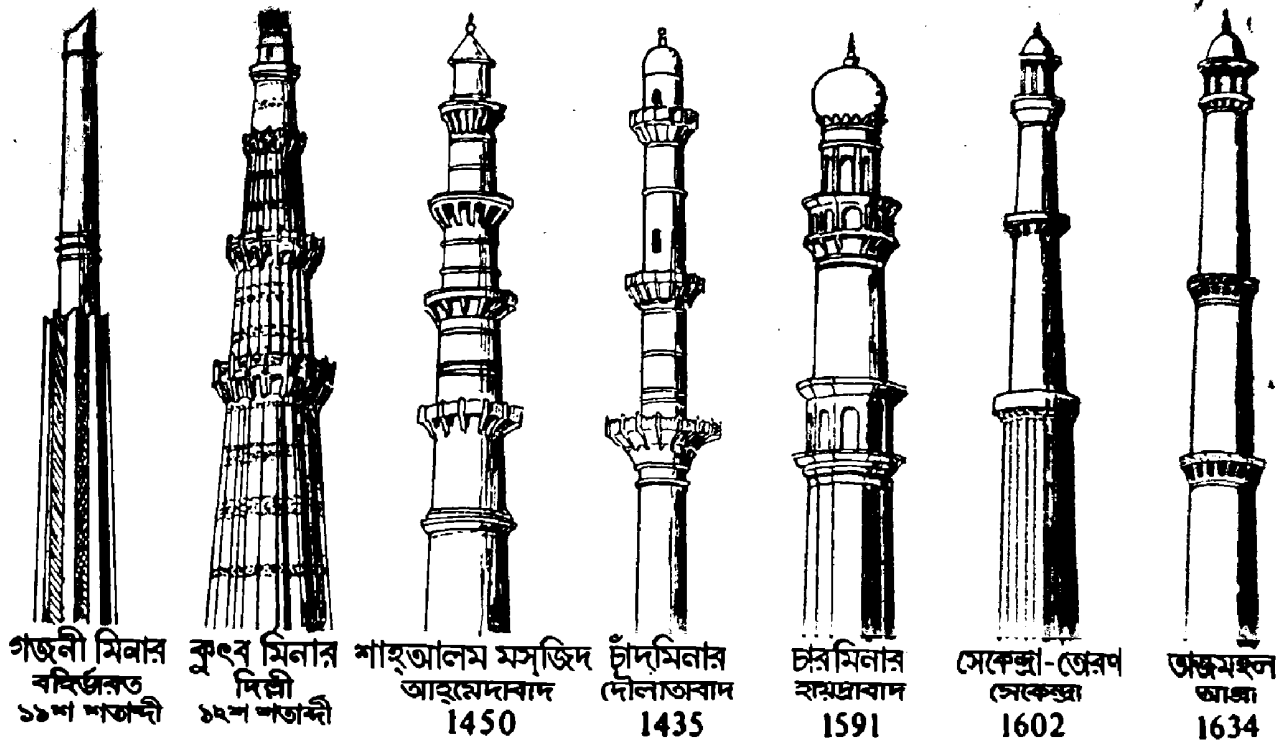
অথচ কী আশ্চর্য—কী অপারিসম আশ্চর্য। আলডুস্ হাক্সলে তাজ দেখে এসে লিখলেন,^{১৬} “Architecturally, the worst features of the Taj are its minarets. These four thin tapering towers, standing at the four corners of the platform on which the Taj is built are among the ugliest structures ever built by human hands.” (স্থাপত্যের নিরিখে তাজমহলের দুর্বলতম অঙ্গ হচ্ছে তার মিনারিকা-চতুষ্টয়। যে প্ল্যাটফর্মের উপর তাজ নির্মিত তার চার-প্রান্তে এই

(খ) জোড়াইশ্বলগুণি পয়েন্টিং করায় সৌন্দর্য-হানী হয়েছে। (ওর মত। আমরা মানতে পারছি না। তবে ভাঙো-জাগা না-জাগা নিয়ে তো তর্ক চল না।)

(গ) ক্যালকনির তলায় ব্র্যাকেটগুণি অহেতুকী। (বটেই তো। স্ট্রাকচারালি! আর্কিটেকচারালি নয়। কোরিথিয়ান-কলমের মাথায় পদুপসম্ভার অথবা আয়নিক কলমের মাথায় আয়নিক ডল্ফটও তো অহেতুকী। হাক্সলের মতে তা কি বর্জ্যনীয়?)

(ঘ) ক্যালকনিগুণি সম-দূরত্বে নির্মিত নয়। (না কি? মাপ নিতে ভুল হয়ে থাকবে!)

একটু অপারিসম হচ্ছে, তবু বলি—যে গ্রন্থের জন্য আলডুস্ হাক্সলে বিখ্যাত তাঁর সেই বইটি ছাপা



চিত্র—11.13 মিনার/মিনারিকার ক্রমবিকর্তন।

চারটি শীর্ণকায় মিনারিকা কোন মরমানুষের হাতে বানানো কুৎসিততম স্থাপত্য-অংগের অন্যতম। কেন? হাক্সলে-সাহেবের আপত্তি চার-জাতের। সেগুণি শ্রেণী-বন্দ্যভাবে সাজিয়ে দিচ্ছি, (আমাদের মন্তব্য সমেত) :

(ক) মিনারিকাগুণি অহেতুক মোটা-থেকে-সরু করা হয়েছে। (আজীব-সওয়াল! সারা পৃথিবীতে যে-কোন যুগে যত মিনার-মিনারিকা-স্তম্ভ নির্মিত হয়েছে তা মোটা-থেকে-সরু। গ্রীস, রোম, মিশর, ভারতবর্ষ সর্বত্র। একমাত্র ব্যতিক্রম ক্রীট শ্বীপ। সরু-থেকে-মোটা স্তম্ভ দেখার বাসনা থাকলে হাক্সলের ক্রীট শ্বীপে যাওয়া উচিত ছিল, রাজা নসস্-এর প্রাসাদ দেখতে।)

হয়েছিল 1931 সালে—‘Brave New World’। ছয়-শত বৎসর পরে পৃথিবীর কী অবস্থা হবে তা তিনি কল্পনার মধ্যে দেখেছেন। গ্রন্থটির বর্তমান বয়স মাত্র পঞ্চাশ বছর। এখনই তা হাস্যকর। লেখক ষড়্ভিংশতি শতাব্দীতে পৃথিবীর জনসংখ্যা কল্পনা করেছেন 200 কোটি।^{১৭} জন্ম-নিয়ন্ত্রণের জন্য মেয়েরা অশ্রুত ব্যায়াম করছে অথবা বেলেট-কম্বছে।^{১৮} পারমাণবিক শক্তির সম্মান পাননি বিজ্ঞান : এবং লন্ডন থেকে নিউ ইয়র্ক উড়ে যেতে অক্ষাংশানের সময় লাগছে ছয় ঘণ্টা। এই যার কল্পনার দৌড়, তাঁর কাছে আর কী-ই বা প্রত্যাশা করা যায়?

মিনারিকাগুণির প্রসঙ্গে আর একটি কথা কলা

বাকি আছে। যা ইতিপূর্বে হয়নি, পরেও কোথাও হয়েছে বলে জানি না। সম্পূর্ণ মৌলিক চিন্তা।

মিনারিকাগুলি আলম্ব (ভার্টিকাল) নয়, অতি সামান্য হেলানো। কিন্তু পীসার মিনার অথবা কুংব মিনারও তো হলে আছে, মৌলিকতা কোথায়? তফাৎ এই : পীসা ও কুংব মিনার হলেছে প্রকৃতির খেলালে, বনিয়াদ বসে যাওয়ায় : যেমন কলকাতা শহরে 12 নং ক্যামাক স্ট্রীটের দশতলা বাড়িটি হলে টিকে আছে! তাজমহলের মিনারিকা চতুষ্টয় হলে আছে পরিকল্পনা-কারের ইচ্ছানুসারে। প্রমাণ? ওরা প্রত্যেকেই হলে আছে বাহির দিকে। দক্ষিণ-পশ্চিমের মিনারিকার শীর্ষদেশ কেন্দ্রবিন্দুর উপর দিয়ে টানা আলম্ব-রেখা থেকে 200 মি. মি. বা আট-ইঞ্চি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে হলে আছে ; বাদ বাকি তিনটি 50 মি. মি. (বা দুই ইঞ্চি) হলে আছে ; কিন্তু সর্বদাই বাহির দিকে! অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব মিনারিকা হলেছে উত্তর-পূর্ব দিকে, উত্তর-পশ্চিম মিনারিকা হলেছে উত্তর-পশ্চিমে, দক্ষিণ-পূর্ব মিনারিকা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে! উদ্দেশ্য, যদি কোনদিন ভূমিকম্প মিনারিকা চারটি ভেঙে পড়ে তবে তা পড়বে বাহির দিকে, মূল সৌধের কোনো ক্ষতি না করে!*

অন্তত এই তথ্যটুকু যদি গাইড জানিয়ে দিতে পারত তাহলে হয়তো পণ্ডিত-প্রবর আলডুস্ হাঙ্গলে সেদিন সগর্বে ঘোষণা করতেন না : 'মোর কী সাহস ভাই/তারকার মধ্যে আমি দিয়া আসি ছাই!'

ক্যালিব্রেশন প্রয়োগ-নৈশূন্য : প্রধান ইবানের দূ-পাশে উপর-থেকে-নিচে কুরান-সরিয়ের যে বাণী তুঘরা-হরফে কালো-রঙে খোদাই করা (চিত্র-11.18) তাতে একটি অম্লভূত প্রয়োগকৌশল লক্ষণীয়। হরফগুলি দেখলে মনে হয় তারা আকারে সব সমান। বাস্তবে তা নয়। বাস্তবে যদি অক্ষরগুলি সমান মাপের হত তাহলে নিচের হরফগুলি আমরা বড় দেখতুম, উপরের-গুলি অপেক্ষাকৃত ছোট। তার হেতু শব্দ এ নয় যে, উপরের অক্ষরগুলি দূরে আছে। তার মূল হেতু দর্শককে ঘাড় উঁচু করে দেখতে হচ্ছে। তন্তুটার বৈজ্ঞানিক বরখা পাওয়া যাবে চিত্র-11.14-তে। প্রতিটি অক্ষর সমান মাপের মনে হবে বখন তারা দর্শকের চোখে সমান কোণিক মাপ উপস্থাপন করবে। বাস্তবে TAJ MAHAL যদি বড় থেকে ছোট মাপে লেখা যায়, তবেই প্রতিটি অক্ষর 'a' মাপের মনে হবে দর্শকের কাছে।

অপটিক্স-বিজ্ঞানের এই প্রয়োগ-কৌশলটি তাজ-মহলে নিখুঁতভাবে রূপায়িত, যদিও প্রাক-তাজ ভারতীয় স্থাপত্য-শাস্ত্রের এটি তেমন নজরে পড়ে না।

অপরপক্ষে য়ুরোপে হাই-রেনেসাঁ যুগে এ-কৌশল বহুলপ্রযুক্ত। যথা, মিকেলান্জেলোর (1475-1564) পীতা, মোজেস মূর্তিতে এবং সিসতিন-চ্যাপেল ম্যুরালে। এর ফরাসী নাম trompe l'oeil, জাহাঙ্গীরকে স্যার টমাস্ রো কিছু য়ুরোপীয় চিত্র উপহার দিয়েছিলেন ; তাতে ভারতীয় চিত্রকরদের 'পরিপ্রেক্ষিত' সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্টতর হতে পারে ; কিন্তু এই trompe l'oeil পদ্ধতি সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ হওয়া অসম্ভব। এটিও অন্যতম কারণ যাতে অনন্দমান করছি, উস্তাদ ঈশা আফান্দি বহিরাগত। পশ্চিম শিল্পজগত সম্বন্ধে তিনি ওয়াকিব্বাহাল ছিলেন। এই প্রয়োগ-কৌশলের কৃতিত্বের ষোলো-আনা হিসাবাদার তুঘরা লেখক শিরাজী নন, কারণ এ প্রয়োগ-কৌশল গোটা ইমারতের স্থাপত্যে প্রতিফলিত।

সম্মুখদৃশ্যের গাণিতিক সূত্র : আগেই বলেছি, সম্মুখদৃশ্যে কোথাও শাহজাহানী ম্যানারিজম নেই, যা দেখে দেখে দর্শক ক্লান্ত বোধ করেন—আগ্না-কিল্লায়, লাল-কিল্লায়, দিল্লী, আজমীর, লাহোরে। ইতিহাস যদি হারিয়ে যেত, যদি শব্দ রচনা-শৈলী দেখে-যেভাবে পণ্ডিতেরা স্বিজ-বড়ু-দীন চণ্ডীদাসের মূর্তি সনাক্ত করেন, যেভাবে কুমারসম্ভবের সপ্তম সর্গের পরের রচনা কালিদাসের কি না তা নির্ণয় হয়, সেভাবে যদি বিচার করতে হত, তাহলে শাহজাহাঁ দাবী আদৌ টিকত না। বামির হাতে নিবে-যাওয়া দীর্ঘশিখাটির মতো বেহেশত-আসীন শাহজাহাঁকে আজ আতর্কণ্ঠে পদকার দিয়ে উঠতে হত 'হারিয়ে গেছি আমি!' কারণ তাজে আর যাই থাক—শাহজাহাঁ নেই!

মোকাম-কুর্সি বা প্লিন্থ হুমায়ুন-মক্‌বারায় ছিল 6.71 মিটার, সেকেন্দ্রায় সেটা বর্ধিত করা হয়েছিল 9.14 মিটারে। তাজে তা আবার কমিয়ে আনা হল 5.97 মিটারে। তিনটি সৌধের সম্মুখদৃশ্যের তুলনা-মূলক বিচার করলে অনুভব করা যায় যে, বিস্তার ও উচ্চতার অনুপাতে তাজ-কুর্সির মাপটাই শ্রেষ্ঠ। গড়-মানুষের উচ্চতা-অনুসারে অপর দুটি ক্ষেত্রে মোকাম-কুর্সি বড় বেশি হয়ে গেছে। সৌন্দর্যহানী হয়েছে। পার্সি ব্রাউনের Indian Architecture, Islamic Period গ্রন্থে LXII প্লেটে দুটি আলোকচিত্র আছে, হুমায়ুন-মক্‌বারার। প্রথমটি মাটিতে দাঁড়িয়ে তোলা, দ্বিতীয়টি আকাশযানের গবাক্ষ থেকে। এই মাত্র যে দুটির কথা বললাম, তা শব্দ প্রথম ক্ষেত্রেই অনুভব করা যায়, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নয়। বেশ বন্ধোতে পারা যায়, মোকামকুর্সি যে বাস্তবীয় উচ্চতা অতিক্রম করেছে এ তথ্য মীর্জা গিয়াস্ প্রাণধান করতে পারেননি। কারণ তিনি

ছোট মাপের কাঠের গডেসটা দেখবার সময় মনশ্চক্ষে নিজেই ঐ মেনেলে ছোট করে দেখতে পাননি দর্শক বাস্তবে কী দেখবে। সেকেন্দ্রা মন্দির সম্পর্কেও ঐ একই কথা। অপরপক্ষে তাজ-পরিবর্ণনাকার এ তথ্যটা বুঝেছিলেন। 'এলিভেশান' আঁকবার সময় ধ্যান-নেত্রে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন তার 'পরিপ্রেক্ষিত দৃশ্য'টা কেমন হবে। ধ্যান-নেত্রে নয়, যেহেতু তিনি ছিলেন অপটিক্স-বিজ্ঞানে প্রগাঢ় পণ্ডিত।

এখানে 'এলিভেশান' ও 'পার্সপেক্টিভ' শব্দ দুটিকে কিছুটা ব্যাখ্যা করা দরকার। 'এলিভেশান' হচ্ছে একজাতের সাংকেতিক চিত্র, যেখানে প্রতিটি অঙ্গের বাস্তব উচ্চতা দেখানো হয়। সে-চাঁবি হুবহু সামনে থেকে আঁকা—অর্থাৎ প্রতিটি বিন্দু আঁকবার সময় মনে রাখতে হবে, ঠিক সামনে থেকে যেমন দেখাবে তেমনিই আঁকব। এটি সাংকেতিক চিত্র, ব্যবহারিক প্রয়োজনে আঁকা হয়—যা দেখে মিস্ত্রী কাজ করে। এ-গ্রন্থে চিত্র—9.18 হচ্ছে 'এলিভেশান'। অপরপক্ষে 'পার্সপেক্টিভ' বা 'পরিপ্রেক্ষিত' চিত্র হচ্ছে বাস্তবে দর্শক যা সামনে থেকে দেখবে। বিশেষ কোনও দৃষ্টি-কোণ থেকে। এ-গ্রন্থে চিত্র—9.18B হচ্ছে 'পার্সপেক্টিভ' চিত্র। ইতিপূর্বে কোথাও 'এলিভেশান', কোথাও 'পার্সপেক্টিভ' এঁকেছি। তাজের ক্ষেত্রে তিনটি চিত্র আঁকতে হল।

চিত্র—11.15 হচ্ছে তাজের এলিভেশান। লক্ষণীয়, এখানে পিছনের মিনারিকা দুটি দেখা যাচ্ছে না; সামনের মিনারিকাম্বয়ে তারা ঢাকা পড়েছে। এখানে প্রতিটি উচ্চতা বাস্তবে যেমন বানাতে হবে। অর্থাৎ চিত্র—11.14-এ যেমন বাস্তবে 'T' অক্ষরটি কড় ও 'L' অক্ষরটি ছোট।

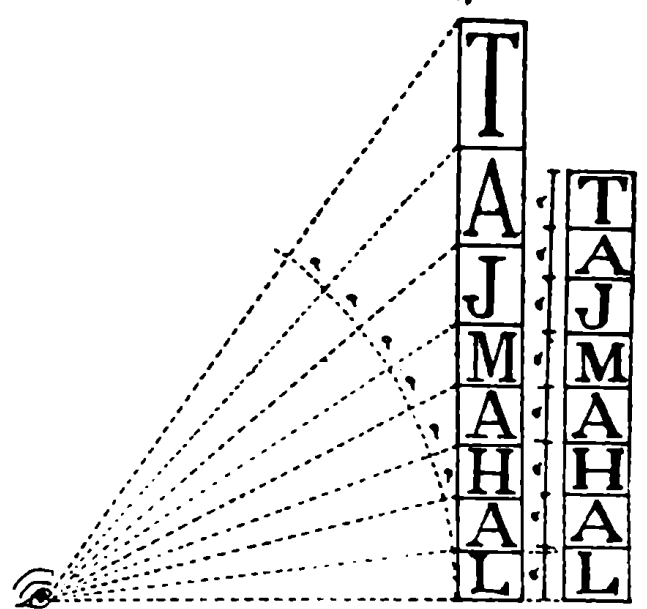
চিত্র—11.16 হচ্ছে পরিপ্রেক্ষিত-দৃশ্য। দর্শক যা দেখবেন। কোথা থেকে? ঠিক সম্মুখ থেকে, কেন্দ্রীয় জলাধারের কাছ থেকে, যখন তাঁর চোখের 'লেভেল' মাটি থেকে 5.97 মিটার উঁচুতে। অর্থাৎ মোকাম-কুর্সির সমতলে।

চিত্র—11.17 হচ্ছে অপর একটি পরিপ্রেক্ষিত। এবার দর্শক আছেন প্রবেশ-তোরণের ম্বিতলে। কিছুটা গরুড়াবলোকনে। তাই এবার মোকাম-কুর্সির শাহন কিছুটা দেখা যাচ্ছে।

পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে পরে আলোচনা করব; আপাতত দেখি 'এলিভেশানে' পরিবর্ণনাকার রাজমিস্ত্রীদের কী নির্দেশ দিচ্ছেন :

মন্দির সৌধের বিস্তার যতটা (EE'), উচ্চতাও ততটা (P.Q)। অর্থাৎ E এবং E' বিন্দুতে জমির সমান্তরাল-রেখার সঙ্গে দুটি 60 ডিগ্রি কোণ রচনা

করা হল। তারা সেখানে মিশল সেই Q-বিন্দুটি মন্দির-সৌধের উচ্চতম বিন্দু ও দাওবদন্ডের পাদদেশ। PQ-রেখাকে বাস কল্পনা করে একটি বৃত্ত রচনা করা গেল, C হচ্ছে যার কেন্দ্রবিন্দু। ঐ C-বিন্দু দিয়ে জমির সমান্তরাল একটি সরলরেখা টানলে তার শেষ-প্রান্তে পাব D ও D' বিন্দুদ্বয়,—তারা সম্মুখস্থ দুটি শেষপ্রান্তের গুলদস্তার শীর্ষবিন্দু। আরও লক্ষণীয়, P-বিন্দু থেকে যদি সম্মুখস্থ মিনারিকা-শীর্ষের (গম্বুজ-বাদে) মধ্যবিন্দুদ্বয়কে যোগ করা যায়, তাহলে সেই রেখাদ্বয় E ও E থেকে টানা আলম্ব রেখাকে A এবং A' বিন্দুতে ছেদ করে। অপিচ, ম্বিতলের উচ্চতা (h₁) একতলার উচ্চতা (h) অপেক্ষা সামান্য বেশি (যদিও আমার অতি ক্ষুদ্র নকশায় তা বোঝা যাচ্ছে না)। কতটা



চিত্র—11.14 তাজে trompe l'oeil প্রয়োগকোমল।

বেশি? ঐ trompe l'oeil নীতিতে কতটা দরকার—যাতে দর্শকের চোখে তারা সমান উচ্চতা নিয়ে প্রতীয়মান হয়। মোকাম-কুর্সির দৈর্ঘ্য উচ্চতার ম্বিগম্।

এবার প্রথমে পরিপ্রেক্ষিত চিত্রটা (চিত্র—11.16) লক্ষ্য করুন :

(ক) সৌধের উচ্চতা সামান্য কম গেছে, কল্পিত-বৃত্তটা এখন খাতব-কলসের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রবিন্দু কিছুটা নেমে এসেছে।

(খ) এতকলা ও দোতলার মাপ সম্মান মনে হচ্ছে।

(গ) পূর্ব ও পশ্চিম ফাসাদের ইবানের দৃ-প্রান্তে দুটি গুলদস্তা (D_১, D_২) বর্তমানে দেখা যাচ্ছে। তারা মন্দির একটি ছন্দ রচনা করেছে। P-বিন্দু থেকে একটি সরলরেখা টানলে তা D_১ D_২-কে ছুঁয়ে যাচ্ছে।

(ঘ) পূর্ব ও পশ্চিম ইবানের উপর যে পাঁচিল তাও দেখা যাচ্ছে। সেই তেড়ছা-পাঁচিলের রেখাটি বর্ধিত করলে তা একদিকে P-বিন্দু, অপরদিকে মিনারিকার শীর্ষবিন্দুদ্বয়কে স্পর্শ করছে।

(ঙ) P-বিন্দু থেকে সম্মুখস্থ মিনারিকার এক-তলা, দোতলা ও তিনতলার প্রান্তদেশকে স্পর্শ করে যদি যদি একাধিক রেখা টানা যায় তবে তারা পিছনে অবস্থিত মিনারিকার ঐ ঐ তলকে ছুঁয়ে যায়।

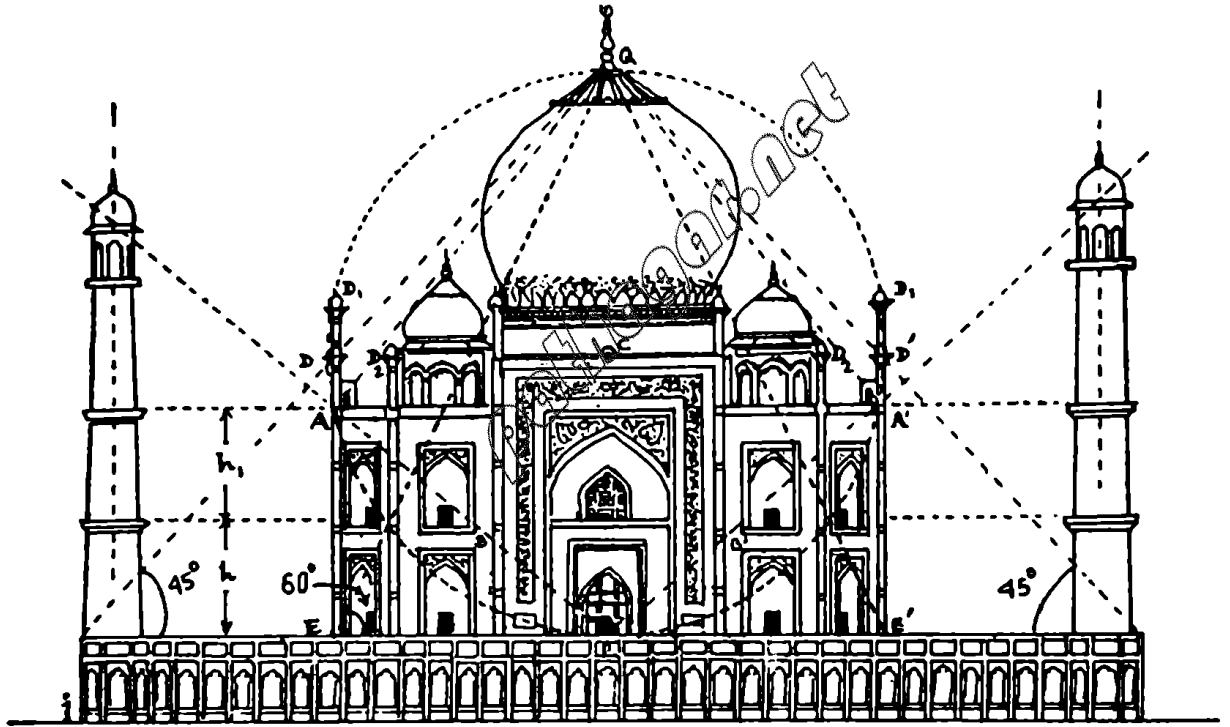
(চ) সামনের দুটি ছোট ছোট গম্বুজ (ইসলামী শৈলীর) দ্বারা এলিভেশান-চিত্রে অনেক দূরে ও অনেক নিচে ছিল, তারা কেন্দ্রীয় গম্বুজের (হিন্দু-শৈলীর) কাছে ঘনিষ্ঠে এসেছে মিডালী করতে, যেন চুম্বন করছে।

(গ) তেড়ছা ইবান প্যারাপেটের রেখাদুটি বর্ধিত করলে তা মিনারিকার তিনতলার শীর্ষবিন্দুদ্বয়কে ছুঁয়ে যাচ্ছে।

(ঘ) বিভিন্ন মিনারিকার তল-নির্দেশক রেখা একই মিলন-বিন্দুর দিকে অভিযাত্রী।

(ঙ) মোকাম-কুর্সির শাহন এখন দৃশ্যমান। তার দূ-প্রান্তের রেখা বর্ধিত করলে ঐ একই বিন্দুতে এসে মেশে।

‘অল রোডস্ লীড টু রোম’-নীতিতে সব ‘ডটেড-লাইন’ যে বিশেষ বিন্দুটিতে মিশতে চাইছে সেটাই বর্তমানে বিলীয়মান-বিন্দু। গরুড়াবলোকনে দেখার জন্য এখন দৃষ্টিতল উপরে উঠে এসেছে, তাই বিলীয়মান-বিন্দুও উন্নত হয়েছে।



চিত্র-11.15 তাজমহলের এলিভেশান বা বাস্তুশাস্ত্রসম্মত সম্মুখদৃশ্য।

পরিপ্রেক্ষিত বিজ্ঞান অনুসারে বর্তমানে P-বিন্দু হচ্ছে বিলীয়মান-বিন্দু বা vanishing point।

এবার দৃষ্টিকোণ বদলে নিন, দাঁড়ান গিয়ে সম্মুখস্থ প্রবেশ-তোরণের স্ফিতলের ক্যালকনির কেন্দ্রস্থলে। কী দেখছেন? (চিত্র-11.17) :

(ক) সৌখের উচ্চতা আরও কমে গেছে। কম্পিত বৃত্তটা এখন ধাতবকলসের শীর্ষস্থান ছুঁয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রবিন্দু আরও নোমে এসেছে।

(খ) একতলা ও দোতলার মাপ এখনও প্রায় সমান মনে হচ্ছে।

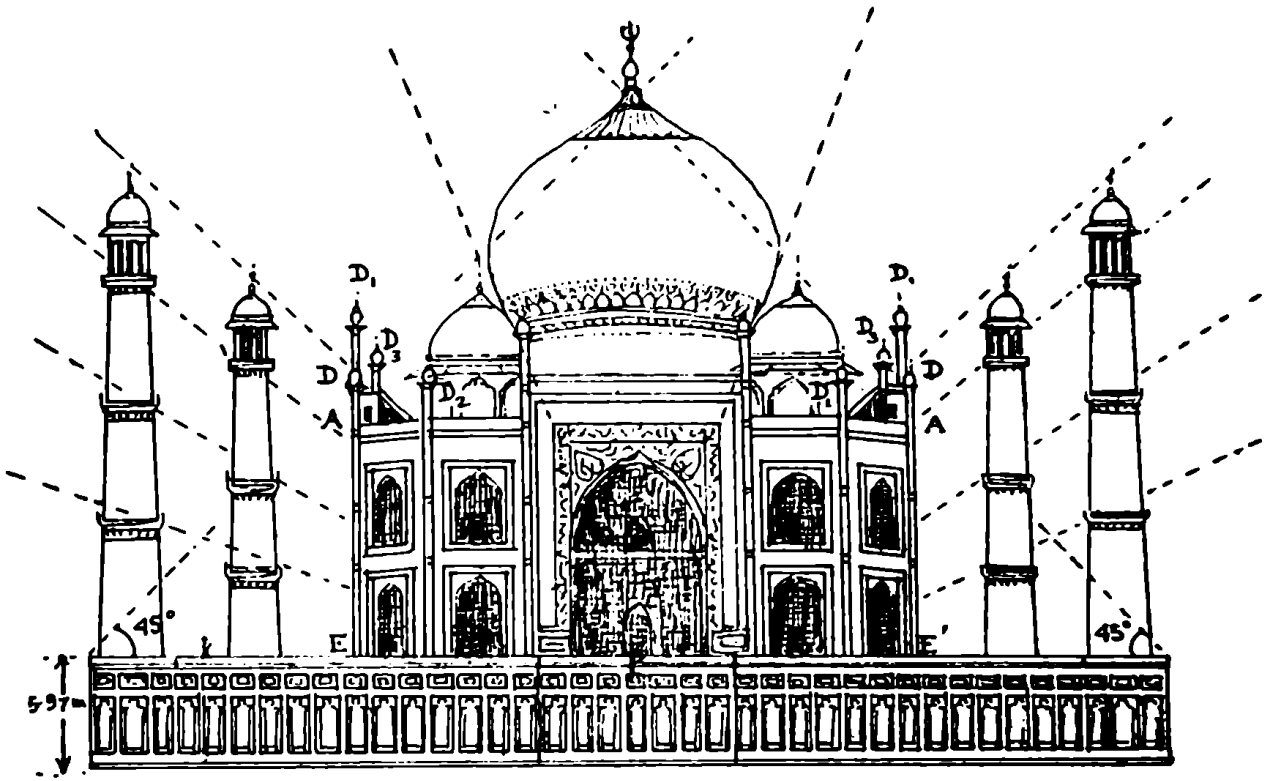
এতক্ষণ যা বলছি তা নিতান্ত জ্যামিতিক কচ্-কচি। আপনারা বলতে পারেন, বেশ তো, সবই মানছি, কিন্তু তাতে কোন চতুর্ভুজ লাভ হল?

জবাবে বলব, তাতেই তাজ মহিমময় হয়ে উঠল!

মানছি, সিমেন্টিকাল ইমারতে মধ্যবিন্দুর সামনে দাঁড়িয়ে দর্শক ইমারতের দূ-পাশের যাবতীয় তেড়ছা সমান্তরাল রেখাকে একটিমাত্র বিন্দুতে মিশতে দেখবে। পার্সপেক্টিভ প্রযুক্তি-বিজ্ঞান বলে, সেই বিশেষ বিন্দুটি হচ্ছে বিলীয়মান-বিন্দু বা vanishing point। দর্শক যদি গরুড়াবলোকনে দেখে তখন বিলীয়মান-বিন্দু

উপরে উঠবে। ফলে, তাজে যা দেখাছি, তা কোনও ভৌতিক নয় ; অন্ধশাস্ত্র মতে এটাই হবার কথা। কিন্তু এ তথ্যটা তো সব জাতের ভারসাম্যমূলক ইমারতের ক্ষেত্রেই সত্য। ইমায়ুন-মক্‌বরায়, ইমদ উদ্‌দৌলায় এবং ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে। কিন্তু অন্য কোথাও তো দর্শক এ ছন্দটা অনুভব করেন না—উদয়ভানুর ঐ রবিরশ্মিরেখার মতো বিচিত্র নকশাটা! এলিভেশান দেখে কি আন্দাজ করা যায় যে, বাস্তবে অমন একটি সুন্দর প্যাটর্ন রচিত হবে? অপটিক্স-বিজ্ঞানে কতখানি অধিকার থাকলে এ সত্যটা অনুভব করা যায়, তা আপনি-আমি বুঝব না, বুঝবেন যারা ঐ প্রযুক্তি-

সম্বন্ধ-মিশ্রের মাপনিক জ্ঞান : ভার্মিতিক হিসাব-নিকাশ দর্শক জ্ঞানসারে লক্ষ্য করে না। করে না আল্পনার নক্সায়, কাম্বীরী গালিচায়, বেনারসী-শাড়ির আঁচলে কিম্বা নবমুদ্র চন্দন-চাঁচিট লগাটে। কিন্তু ঐ সুসম বর্ণিকাভূষণে ছন্দই নান্দনিক অনুভূতির জগতে রসজাহ্নবী-ভগীরথের শশ্বনির্ঘোষ! গম্বুজটা এলিভেশানে আসৌ নরনাভিরায় নয়, সফ-দরজঙ অথবা বিবিদা-মক্‌বারার মতো। অথচ পরিপ্রেক্ষিতে একটু চ্যাপ্টা হয়ে যাবার পর তা তাজের সুপরিচিত সুসমার্মাভিত। ইবান-প্যারাপেটের উচ্চতা



চিত্র—11.16 তাজমহলের পার্সপেক্টিভ, দৃষ্টভল 5.97 মি।

বিদ্যা নিয়ে হাতে-কলমে কাজ করেন—এঞ্জিনিয়ার, আর্কিটেইক, ড্রাফটস্ম্যান এবং যারা শব্দ বিমর্দিত নয়, প্রতীচ্য-শৈলীতে ছবি আঁকেন।

নকশা দেখে অজাত ইমারতের বাস্তব-স্বরূপটা কল্পনা করতে পারা স্থপতির অন্যতম প্রধান গুণ। অপটিক্স-বিজ্ঞান, পরিপ্রেক্ষিত এবং আরও কয়েকটি প্রয়োগবিদ্যার উপর প্রগাঢ় অধিকার থাকলেই ধ্যাননেত্রে সেটা দেখা সম্ভবপর। তাজ-পরিকল্পনাকারের এই জ্ঞানটি ছিল আকাশচুম্বী।

এই মানসচক্ষে প্রাগ্‌দর্শনের ক্ষমতার দিক থেকে তাজমহল—একমাত্র ইলোরার বিশ্বকর্মা-কৈলাস মন্দির ব্যতিরেকে ভারত-ভূখণ্ডে সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

ঠিক কতখানি হলে সেটা এই ছন্দে তালে-তাল দেবে, তা কি পরিপ্রেক্ষিত-চিত্রতে বোঝা যাচ্ছিল? মিনারিকার বিভিন্ন তলের উচ্চতা কেন কম-বোশ করা হয়েছে—বে তত্ত্বটা অনুধাবন করতে পারেননি আলফুস্ হাক্কলে—তা এখন পরিষ্কার বোঝা গেল। তাজের প্রতিটি প্রত্যঙ্গের মাপজোখ একটি বিশেষ ছন্দে গড়া, যাতে তারা ঐ উদয়ভানুর রশ্মিছটার প্যাটর্নটা ফুটিয়ে তুলতে পারে।

কিন্তু কেন ঐ প্যাটর্ন? শুধুই কি একটা নরনাভিরায় আকৃতি দান করতে? বোধকারি নয়। হয়তো তাজের প্রতিটি অঙ্গের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা নির্ধা-

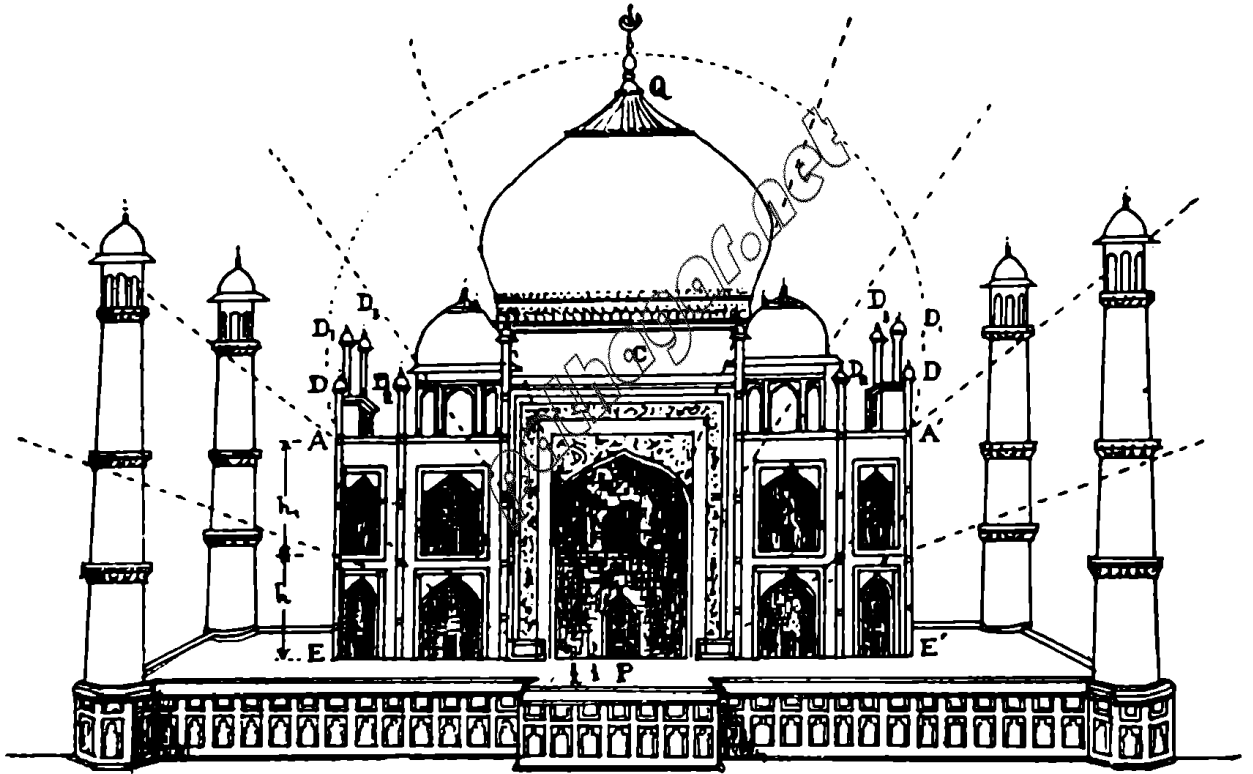
রূপের মধ্যে দিয়ে অমন একটি বিচিত্র প্যাটার্ন গড়ে তোলার পিছনে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। সেটা যেন বিশেষ কিছু একটা কথা বলতে চায়, আভাসে-ইঙ্গিতে, অন্তর্গত বাজানায়! একটা 'সিম্বলিজম', একটা প্রতীকী! কী তা? আমার যা অনুমান তা পরবর্তী অনুচ্ছেদে নিবেদন করেছি।

তাজে হিন্দু শিল্পশাস্ত্রের প্রভাব : আমার মৌল বক্তব্য—অজ্ঞাত পরিকল্পনাকার আকবরী স্থাপত্যাদর্শনে বিশ্বাসী : সম্ভবতঃ শাহজাহার অজ্ঞাতসারে।

হিন্দু ও মুসলমান—এ মহান উপম্বীপের দুই প্রধান প্রতিবেশীর মাক্ষানে একটা সেতু রচনা করতে

ইদের চাঁদের আড়ালে লুকানো মহাপদ্ম-ঘণ্টা-কসসে! সবই গোপনে। কারণ তাকে এবার 'ট্র্যাবিয়েট'-শাহ-জাদার সঙ্গে 'আকুয়েট'-হিন্দুকুমারীর বিবাহ দিতে হয়েছে অত্যন্ত গোপনে ; গোড়া সন্ন্যাস-মুসলমান শাহ-জাহার চক্ষুর অন্তরালে। শিল্পীর এই আন্তর-ম্বন্দ্রটাকে অভ্যুপগম হিসাবে স্বীকার করে নিয়েই আমি বিচার করছি। সেই 'হাইপথেসিস'-টা যদি ভুল হয়, তাহলে আমার এ তাজ-মূল্যায়ন বহুলাংশেই ব্যর্থ হবে।

হিন্দু শিল্পশাস্ত্র মতে শিল্পের ষড়-অঙ্গ! এ নিয়ে আমার পূর্ব-প্রকাশিত গ্রন্থ 'অজ্ঞাত-অপরূপা'-তে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে সংক্ষেপে তত্ত্বটা আবার পেশ করতে হচ্ছে, কারণ তাজ-পরিকল্পনা-



চিত্র-11.17 তাজমহলের পার্সপেক্টিভ, দৃষ্টতল প্রবেশভোরণের মিতল বারান্দা।

চেষ্টেছিলেন জালালউদ্দীন, তাঁর স্থাপত্যের মাধ্যমে। তারপর অর্ধশতাব্দী অতিক্রান্ত। সেই আকবরী চিন্তাটা নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামায়নি। এ পঞ্চাশ বছরে—ইতমদউদ্দৌলা, জাহাঙ্গীরী মক্কারা, আগ্রা-কিল্লার সম্প্রসারণে সেই অনুভাবনাটি তিল তিস করে কিস্মতির অতলে তলিয়ে যেতে কসেছিল। তাজ-পরিকল্পনাকার—তিনি যেই হোন, সেই মহান দার্শনিক-ভক্তের স্থাপত্যপ্রয়োগের চেষ্টা একবার শেষবারের মতো করতে চাইলেন! তাজের প্রতিটি অঙ্গে সেই বে-দাগ মিলনাচিহ্ন। পঞ্চরত্ন-দেউল ছন্দে, তাজোরী গম্বুজে,

কার যদি গোপনে এই 'আজীব-ই-যারিব'-এ হিন্দু শিল্পচিন্তার জাহবীতে অবগাহন করে থাকেন তাহলে ঐ ষড়অঙ্গ নিয়ে তিনি নিশ্চয় বিচার করেছেন! ভাষান্তরে, হ্যাভেল যে-কথা বলেছেন—'The Taj belongs to India, not to Islam', তা কোন সমাপতন নয়, পরিকল্পনাকারের সজ্ঞান প্রয়োগেই তা সম্ভব। সেক্ষেত্রে শিল্পের 'ষড়-অঙ্গ' সম্বন্ধে তাজাশিল্পী সচেতন কিনা যাচাই হওয়া প্রয়োজন।

বাৎসায়ন-প্রণীত 'কামসূত্রের' টীকায় যশোধর একটি শ্লোক (পৃঃ 136) উদ্ধার করে বলেছিলেন, শিল্পের

ছয়টি আবশ্যিক অঙ্গ : রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, আবগ্য-
যোজনা, সাদৃশ্য ও বর্ণিকাভঙ্গ।

তাজের ক্ষেত্রে 'রূপভেদ' ও 'প্রমাণ' সম্বন্ধে সন্দেহের
কোন অবকাশ নেই। দর্শক সহজেই বুঝতে পারেন
তাজ একটি মক্কারা, মেপে দেখতে পারেন তাতে
'প্রমাণ', বা মাপজোখের হিসাবে কোথাও কোন গল্টি
নেই।

তৃতীয় অঙ্গটি : ভাব। নয়নেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য শিল্পের
মধ্যে চিত্র ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেই এ অঙ্গটি প্রত্যাশিত,
স্থাপত্যে নয়। কোনো একটি ইট-পাথরে গড়া ইमारতে
'ভাব' পরিস্ফুট হবার অবকাশ কোথায়? ধ্বনি সাজিয়ে
সাজিয়ে বিটোফেন থেকে রবিশঙ্কর 'ভাব' সৃজন করতে
পারেন, কথা সাজিয়ে সাজিয়ে তা করেছেন কালিদাস
থেকে রবীন্দ্রনাথ, তুলির টানে ভাবরূপ মূর্ত করেছেন
অজন্তা-শিল্পী থেকে অবনঠাকুর। এমনকি পাথর
খোদাই করে ভাবের দোলায় দর্শককে দুলিয়েছেন
মহাবলীপুত্রের ভাস্কর থেকে মিকেলাঞ্জেলো। কিন্তু
স্থাপত্য? ওলন-পাটা-কর্ণিক-বাঁশুলী দিয়ে চুন-সুর-
কির গাঁথনিতে 'ভাবরূপ' মূর্ত করার কথা কে কবে
শুনেছে? ওটা যে হবার নয়। কেন নয়? কারণ ভাব
হচ্ছে শিল্পের অন্তরঙ্গের সম্পদ, বহিরঙ্গের নয়।
ইমারৎ যে বহিরঙ্গ-সর্বস্ব।

তাজ-পরিকল্পনাকার একমাত্র ব্যতিক্রম! অপরি-
সীম দার্ঢ্য তিনি ঘোষণা করলেন, না! সেতারের তার,
কবির কলম, শিল্পীর তুলি যদি ভাবরাজ্যের মনোজগতে
দর্শককে উধাও হওয়ার পাথেয় যোগাতে পারে, তবে
মাকরানা মার্বেলও তা পারবে!

দিনের এক-এক সময়ে তাজের এক-এক ভাবরূপ,
বছরের এক-এক ঋতুতে তার এক-এক আবেদন। উষার
প্রথম আলোকস্পর্শে-জ্যেগে-ওঠা বালার্করাগরঞ্জিত তাজ
কিশোরী কুমারীর অবাকস্বপ্নের মত অপারিবিম্ব ;
নিদাঘ-মধ্যাহ্নে তার হীরকদ্যুতির জ্বলদ্বিষে চোখ ধাঁধিয়ে
যায় ; আবার বিষণ্ণ প্রদোষে যখন বিদায়ী-সূর্যের শেষ
সিন্দূরবিপ্লব সীমন্ত থেকে মূছে ফেলে শূন্যবসনা
বিধবার মতো দিগন্তে দৃষ্টি মেলে সে উদাসীন বসে
থাকে, তখন হৃদয় বেদনায় আন্দৃত হয়ে যায়।
পূর্ণিমা রাতে তাজকে দেখেছ? যেন অতীন্দ্রিয় অনু-
ভূতি-দিয়ে-গড়া স্বপ্নচারিণী এক অবগুণ্ঠনবতী। যেন
কান পাতিলে শোনা যায় কোন বিদেহী আত্মার আতি :
'হাজারো সালসে নাগিস আপনা বেনুরী-পর রোতি
হয়।' শুনোছি ঘোর অমাবস্যা রাতে বিশ-ত্রিশ বছর
আগেও তাজের আর এক ভাবমূর্তি ফুটে উঠে।
তাজের সে গোপনরূপ দেখতে হলে রীতিমতো সাধ-

নার প্রয়োজন - অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর ধনকৃষ্ণ
আকাশপটে তারার আলোয় ধীরে ধীরে ফুটে উঠে
ওর বহিরঙ্গরোমা। অমৃত-নিমিত্ত আলোকবর্ষের ওপার
থেকে অতি ক্ষীণ আলোকরশ্মির চুম্বনে রক্তকন্যা জেপে
ওঠে! পুরোপরি নয়। আধাখাদি! যেন মাটির
দুয়ার আধেক খুলিয়া আপন গোপন ঘর দেখায়
বসুন্ধরা। তার স্বরূপ তখন অতাসে-হীপাতে,
অভাবে-ভাবে। সে তাজের আবেদন নাকি—যারা দেখে-
ছেন তাঁরা বলেছেন : অনির্বচনীয়! অধুনা আগ্রা
শহরের বিজলীর রোশনাইয়ে সে তাজ চিরতরে অব-
লুপ্ত।

শীতের কুয়াশায়-ঢাকা আধো-প্রস্ফুটিত তাজ,
যমুনার পরপারে পূজীভূত বর্ষার জলদসম্ভারের ঘন-
কৃষ্ণ-পশ্চাৎপটে 'খিরাবজাল'র মতো তাজ—এদের ভাব-
রূপ সম্পূর্ণ পৃথক। কখনও বেহাগ, কখনও ইমন,
কখনও পূর্বী!

আবার একই ঋতুতে, একই সময়ে শব্দমাত্র বিভিন্ন
দৃষ্টিকোণ থেকে তাজের ভিন্ন ভিন্ন আবেদন।

ভেবে দেখ, 'ভাব'-এর রাজ্যে ঐ প্রবেশ-তোরণ থেকে
মোকাম-কুর্সি পর্যন্ত এগিয়ে আসতে আসতে তুমি মনে
মনে তোমার গোটা জীবনটা অতিক্রম করে এসেছ! হ্যাঁ,
তোমার আদ্যন্ত দাম্পত্যজীবনটা!

মনে করে দেখ, প্রবেশ-তোরণের খিলান-ঘোমটার
ভিতর দিয়ে প্রথম তাজ-দর্শনের সেই রোমাঞ্চশিহরণ!
যেন ছাঁদনা-তলায় প্রথম শব্দদৃষ্টি! তখন মনে হয়ে-
ছিল—ও কলটুকুন! বন্ধি ওকে কোলপাজা করে তুলে
নেওয়া যায়! ঐ চন্দনচর্চিত আনন্দমুখটি আলতো
করে তুলে ধরে ওর মুখচুম্বন করা যায়। তারপর দুই
সারি পাদপের আদাবকে স্বেচ্ছাবিনত করে সংসারী
মানুষ তুমি পায়ে পায়ে কখন আনমনে এগিয়ে এসেছ
কেন্দ্রীয় জলাধারে। বোবনপ্রান্তে কর্মহীন কণিক-
অবকাশে একদিন ওর দিকে চোখ তুলে তুমি স্তম্ভিত
হয়ে গেলে! কী আশ্চর্য! এই কি শব্দদৃষ্টির ছাঁদনা-
তলায়-দেখা সেই তরুণী মেরেটি? ভরা বোবনের ভায়ে
সে আজ স্তোকনম্রা, শ্রোণীভারাদলসগমনা। সন্তান-
বতী ঘরণী মহিমময় রূপ নিয়ে তোমার সম্মুখে হাসি-
মুখে দাঁড়িয়েছে!

তারও পরে ক্রান্ত চরণে প্রৌঢ়-তুমি এগিয়ে
এলে, কাছে, কাছে, আরও কাছে। অবসরপ্রাপ্ত জীবনে
মোকাম-কুর্সির চরণতলে এসে শ্রান্তপথিক তুমি আবার
মুখ তুলে পতঙ্গদৃষ্টিতে দেখতে গেলে সেই অতি
পরিচিত জীবনসঙ্গিনীকে। বজ্রাহত হয়ে গেলে এবার!
চিনতে পারলে না ওকে! গম্বুজ নেই। মিনারিকা নেই,

ছয় নেই! সেই হরিণ নয়ন, অপাঙ্গদৃষ্টি, যৌবনের
বৃক্ষজন্মস্তম্ভ সবই হারিয়ে গেছে। আছে শুধু
আকাশজোড়া ইবানের, পরিণত প্রেমের একটি আন্তরিক
আহ্বান—একটা নিশ্চিন্ত আশ্বাসের শান্ত প্রতিশ্রুতি।
পাকাচুলে-সিন্দূরপরা এই গৃহমুচ্যেতে-কে দেখে
তোমার বিশ্বাস হতে চাইবে না—এক দিন একেই
পাঁজাকোলা করে নতুন-নীড়ের দেহলী অতিক্রম করার
স্বপ্ন দেখেছিলে!

একই সেতারে, একই লেখনীতে, একই তুলিতে
যদি হাজারো 'ভাব' মূর্ত হতে পারে, তবে একই ইমা-
'রতেও তা হওয়া সম্ভব! তবু হাজারো ভাবের হরেক
আবেদনের মধ্যে ওর গানের মূল ধরো একটাই :
'একবিন্দু' নয়নের জল/কালের কপোলতলে শুধু
সমুদ্রদল/এ তাজমহল।'

শিল্পী শতকরা শতভাগ সার্থক : সিলিঙ-এ, সন্দোখ-
ঘেরা মর্মর প্রাচীরে, ডাডো-তে, সর্বত্র।

কিন্তু ষড়-অঙ্গের পঞ্চম-অঙ্গ? সাদৃশ্য?

এটি বিতর্কমূলক প্রশ্ন। কারণ এ অঙ্গটি শুধু-
মাত্র চিত্র-শিল্পেই প্রত্যাশিত। স্থাপত্য-ভাস্কর্যে নয়।
তবু বুলন্দ-দরওয়াজা সমালোচনা-কালে আমরা
দেখেছি—আকবর কী বিচিত্র কায়দায় এই 'সাদৃশ্য'
অনুভাবনাটি ব্যবহার করেছেন। তাহলে কি তা করা
হয়নি?

এই প্রশ্নেই উঠছে ঐ উদয়ভানুর বিচিত্র প্যাটার্ন-
টার যথার্থ্যের কথা।

শিল্পী কি ইমারতের মৌল-বস্ত্যটি একটি
সাদৃশ্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন?

মৌল বস্ত্যটা কী?



চিত্র—11.18 "আছে শুধু আকাশজোড়া ইবানের আন্তরিক আহ্বান"।

লাক্যাবোজনা'র অঙ্গটিও কানার কানার টলমল।
'লাক্য' প্রসঙ্গে শিল্পাচার্য অকনীন্দ্রনাথ বলেছেন, নিটোল
একটি মস্তার দানার সর্বাপেক্ষে যে চলচল তরলিত আভা,
সেটি যদি শিল্পী রূপায়িত করিতে পারেন, তবেই
তাহার মস্তা-আঁকা সার্থক। ইহাই লাক্যাবোজনা।'

গোটে পৃথিবীর স্থাপত্য-ইতিহাসে সত্তার আদি-
যুগ থেকে আজ পর্যন্ত যদি কোনও একটিমাত্র ইমারত
ঐ মস্তাদানার চলচল তরলিত আভাকে মস্তার মধ্যে
ধরতে পেরে থাকে তবে তা : তাজমহল!

ষড়অঙ্গের শেষ অঙ্গ—বর্ণিকাভঙ্গ। এখানেও

এই সৌধের নিচে মৃগল-রাজবংশের পদ্রুপ-সিংহ
শায়িত।

কিন্তু মৃগল-রাজবংশের 'প্রতীক' কী হতে পারে?
মনে করে দেখুন—মৃগল নিশান-এর প্রতীকটি কী
ছিল? যাকে বলে, herald, standard?

: উদয়সূর্যের সম্মুখে নতজানু সিংহ।

গোটা ইমারতও তাই বলতে চাইছে!

তাহার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উচ্চতা ও অন্যান্য
মাপজোখ এমনভাবে নির্ণীত হয়েছে, যাতে পরি-
প্রেক্ষিতে দৃষ্টিকোণ যেখানেই হোক—দেখতে পাওয়া

যাবে উদয়ভানুর ঐ রবিরশিখাছটা। অবশ্য নতজান্দ, সিংহকে দেখতে হবে মনশ্চক্ষে : মৃত্যুর মহিমায় কৃষ্ণ-তাজের কবরে শায়িত আল্লাতালার সম্মুখে নতজান্দ, পূরুষ-সিংহ : শাহজাহাঁকে।

এখানে একটি সঙ্গত প্রতিপ্রশ্ন হতে পারে। যদি স্বীকারও করে নেওয়া যায় যে, এই বিচিত্র নকশার ছন্দে তাজ-শিল্পী মৃগলনিশানের প্রতীকটি ব্যবহার করে এ সৌধের মৌল আবেদনটা মূর্ত করেছেন, তবু সেটা যে ‘সাদৃশ্য’, এটা কেমন করে মেনে নেব? ‘প্রতীকী’ অলঙ্কার তো সব জাতের শিল্পেরই উপাদান, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের। এমন কি আধুনিক চলচ্চিত্রেও। আদি কবির আদিম শৈলাকে রাবণের প্রতীক ব্যাধ, রামসীতার প্রতীক ক্রৌঞ্চ-মিথুন। কালিদাস শকুন্ত-লার প্রথম দিকেই যখন লিখলেন : ‘ভো ভো রাজন্ আশ্রমমৃগোহং ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ’ তখন মৃগ কে? শকুন্তলার প্রতীক নয় কি? এগুনি কি ‘সাদৃশ্য’? অথবা আরও দূর দেশে যাওয়া যাক। মিকেলাঞ্জেলো তাঁর জীবনে প্রথম ভাস্কর্য গড়েছিলেন ‘সিঁড়ির তলায় শিশুযীশু ক্রোড়ে মেরী ও পাশে পীতর।’ সেখানে যখন দেখি শিশু-পীতরের হাত এবং সিঁড়ির ব্যালাস্ট্রেড মিলে-মিশে একটি ক্রুশ-চিহ্ন রচনা করেছে, তখন বেশ বড়তে পারি—যীসাস্-এর অন্তিম পরিণামটা কিশোর শিল্পী একটা তির্যক ‘প্রতীকী’র মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। এ প্রতীক শতকরা শতভাগ অবনীন্দ্রনাথবর্ণিত ‘সাদৃশ্য’। কিন্তু মিকেলাঞ্জেলো নিশ্চয় হিন্দু শাস্ত্রসঙ্গত ‘সাদৃশ্য’ রূপায়িত করেননি। সেভাবে গ্রহণ করলে তাজের ঐ নান্দনিক ছন্দটি—‘উদয়ভানুর সম্মুখে নতজান্দ, সিংহ’ একটা প্রতীকী, symbolism ; ‘সাদৃশ্য’ নয়!

সমাধিকক্ষ : কক্ষটি অষ্টভুজাকৃতি। মমতাজের কবর কেন্দ্রীয়-রেখায়। শাহজাহাঁর কবর একটু পশ্চিম ঘেঁষে; তাতে ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে। (চিত্র-11.21) সন্দোখ ঘিরে একটি অষ্টভুজাকৃতি শ্বেতপাথরের জালিকাজ-করা প্রাচীর। তার দুই-প্রান্তে দুটি প্রবেশদ্বার। ফাগুর্সনের²⁰ মতে এটি পরবর্তী সংযোজন। সম্ভবতঃ তাঁর অনুমান ঠিক; কাবণ বার্নিয়ার ঐ অপূর্ব কাজ-করা প্রাচীরের উল্লেখ করেননি তাঁর পুস্তকানুপুস্তক-বর্ণনা দেওয়া ভ্রমণবৃত্তান্তে।²¹ ফাগুর্সন আরও বলেছেন, এই মর্মর আবেষ্টনীতে দুটি রৌপ্যনির্মিত স্মার ছিল; যা তাঁর করতে সে আমলে খরচ পড়েছিল সওয়া লক্ষ তুকা। সে দুটি জ্ঞাঠ সৈন্যরা লুণ্ঠ করে নিয়ে যায় (1761)। এ-কক্ষে আলো

আসার ব্যবস্থা সুউচ্চে স্থাপিত দুটি জালিকাজ-করা গলাক্ষ দিয়ে। সিলিংও অপূর্ব নকশা (চিত্র-11.20)। কবরের উপর একটি ‘শ্যাডোলেয়ার’, বা দাতব কোলানো বার্তির কাড়। সেটি মৃগল-জমানার নয়, লর্ড কার্জনের শ্রদ্ধার্থী। মৃগল-শৈলীতে বানানো।

সমাধিকক্ষের প্রাচীরে ‘ডাডো’ পর্বত অলটো-রিলিভো (অর্ধোৎকীর্ণ) মার্বেলের নকশা। সাদার উপর সাদা। ফুল-লতা-পাতা। অনেক পরিচিত পুষ্প-সম্ভার। এখানে যে সংঘর্ষ দেখানো হয়েছে তা জাত-শিল্পীর। দয়ালবাগে গেলে দেখতে পাবেন বাস্তবতার



চিত্র-11.19 সন্দোখ-কক্ষের ভিতর। (ক্যামেরাবারী পূর্ব-প্রান্তে, সেজনা সিমোটি অব্যাহত। সামনে কেন্দ্রস্থলে মমতাজ ও তার পিছনে শাহজাহাঁর সন্দোখ। সুলত শ্যাডোলেয়ারটি লর্ড কার্জনের শ্রদ্ধাঞ্জলি।)

হৃদমৃদু করার প্রচেষ্টায় আগুদরলতা ঠিক আগুদর-লতার মতো হয়েছে; আম-আতা-আনারস হুবহু আম-আতা-আনারসই হয়েছে, কিন্তু শিল্প হয়নি। এখানে শিল্পী বাস্তবকে অস্বীকার করেননি; কিন্তু বাস্তবতার পারে দাসখণ্ড লিখে দেননি। নকশার যে সুন্দর সংযমী বাস্তববর্ণনাটি গড়ে উঠেছে তা অপূর্ব। এর চেয়ে বর্ণিকাজলের কেরামতি হয়তো ইতমব্-

উপকোলের বেশ : কিন্তু সৌন্দর্য্যস্বপ্নটির প্রতি-
বোধিতার তাড়নাই জেতেছে।

তৃতীয়তঃ, pietra dura-র কাজ অর্থাৎ মর্ম্মর
খোদাই করে বিভিন্ন মণিমন্ডা যিসে প্যাটার্ন তৈরী
করা। এ-কাজ লহরির। মূল্যবান পাথরগুলি ক্রমা-
গত চুরি হওয়ার এই জাতের কাজের মূল্যায়ন আজ
আর সম্ভবপর নয়। চতুর্থতঃ, স্লেজ ড্-টালির
স্টোক-কো-কাজ। আলোক-প্রতিফলনের প্রয়োজনে অতি-
মসৃণ এই জাতের টালি আকবরী-যুগেই চরম ঔৎকর্ষ-
লাভ করেছিল। তাহে সেই ঐতিহ্য নিরবচ্ছিন্ন ধারায়
প্রবাহিত। পঞ্চমতঃ, শ্বেত পাথর খোদাই করে ভিন্ন
রঙের পাথর-বসানোর কাজ। ছোট-ছোট দামী পাথর
বসিয়ে pietra dura-র কাজ নয়, নকশা-মোতাবেক
সংরক্ষণী ভিন্ন রঙের মর্ম্মর। যাকে বলে, opus sectile।

এই কাজের একটি বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি
আকর্ষণ করব : রঙ নির্বাচন। বহিঃরঙ্গে শিল্পী এ-
কাজে মাত্র তিনটি রঙ ব্যবহার করেছেন—সাদা, কালো,
গেরুরা। সাদা মার্বেল তো base, জমিন্ ; তার মানে
দুটি রঙ—কালো ও গেরুরা। এই বর্ণ-নির্বাচনেও
শিল্পীর কবিত্বের পরিচয়। সাদা রঙটা হচ্ছে বেগম
মমতাজের প্রতীক, গজদস্তদ্বন্দ্ব মহিষীর নিষ্পাপ প্রতি-
চ্ছবি : যার 'জবাব', শাহজাহাঁকে লাভ করার কথা
অসম্পূর্ণ 'কুস-তাজে।' কালো রঙ ব্যবহারের দুটি
উদ্দেশ্য। কমলো হচ্ছে সাদা রঙের শ্রেষ্ঠ 'জবাব'—
contrast ; এটি ব্যবহারিক দিক থেকে। কাবোর দিক
থেকে কালো রঙ শোকের চিহ্ন। শূন্য, শ্রীচাঁচন নয়,
মুসলমানেরও। স্বামীর মৃত্যুতে মুসলমান বিধবা
কমলো রঙের বোরখা পরে। কিন্তু গেরুরা ? ওটা
সম্ভবতঃ হিন্দু-রীতি থেকে এসেছে : গেরুরা বৈরাগ্যের
চিহ্ন। সংসারে বীতরাগের প্রতীকী। পরিকল্পনাকার
তাই মিনারিকা-চতুষ্টয়কে রঙিয়েছেন কালো ও
গেরুরা রঙে সাদা জমিনে। অথচ গেরুরা রঙটা এত
গাঢ় নয় যে, চোখকে পীড়া দেবে।

প্রশ্ন হবে—সবুজ রঙ নেই কেন ? সবুজ রঙটাকে
তো ইসলামের প্রতীকী বলে আমরা ভাবি। তিনটি
বর্ণিত : এ ধারণাটা পরবর্তীকালের। তাছাড়া সবুজ
রঙ তারুণ্যের প্রতীক—এ মক্কারাতে সে-সবটা আম-
দানী করতে চাননি শিল্পী : ঠিক যে-কারণে সুলতান-
বারি মক্কাগত নেই মিনারিকা, গজদস্ত বা ছটী।
তৃতীয়তঃ, প্রায়শ্চিত্তবিদ্যার ব্যবহারিক জ্ঞান বলে—সবুজ
রঙ বহিঃরঙ্গে ব্যবহার না করাই ভালো, সেটা সূর্য্য-
লোকে ক্রমশঃ জ্বলন্ত যায়।

বনিয়াদ : প্রযুক্তিবিদ্যার এই বিশেষ শাখায় স্থপতি
কতটা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা মেপে দেখতে পারিনি
—ফলেন পরিচয় পেয়েছি শূন্য। সাড়ে তিনশ
বছরে বনিয়াদ কোথায় একটুও বসেনি। হ্যাডেস-
সাহেব বলেছেন, ভূগর্ভে কবরটি নির্মাণের পূর্বে
কয়েকটি কূপ বনিয়াদ (well foundation) তৈরী করা
হয় ; যার গভীরতা তদানীন্তন যমুনা 'বেড'-এর নিচে।
ঠিক যেভাবে রেল-স্ট্রীজের খাম্বা বানানো হয়, সেভাবে
গোলাকার কূপ-প্রতিম বনিয়াদের উপর 'স্ল্যাব' পেতে
কবর দুটিকে বসানো হয়েছে। মূল ইমারতে বনিয়াদের
গভীরতা তদানীন্তন যমুনা-বেড'-এর নিচে পর্যন্ত
নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

গত তিন-সাড়ে তিনশ বছরে বনিয়াদ কোনও দিকে
তিলম্বিত বসেনি। প্রসঙ্গতঃ বর্তমান শতাব্দীতে
নির্মিত ভিক্টোরিয়া-মেমোরিয়ালে বনিয়াদ বেশ-কিছুটা
বসেছে ; কিন্তু সব দিকে সমানভাবে বসায় কোনও
ফাট দেখা দেয়নি। তাহের বনিয়াদের দৃঢ়তা দেখে
কলা যায়—এ সৌধ হাজার বছর টিকবে, যদি না ভূমি-
কম্প, বা কোনও বৈমানিকের অনবধানতায়, কিম্বা অন্য
কোনও অপ্রাকৃতিক কারণে তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ভূমিকম্পের বিরুদ্ধে স্থপতি কিছু ব্যবস্থা নিয়ে-
ছেন, সে-কথা আগেই বলেছি। এয়োরোস্পেন বা
প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের অন্য কোনও অভিশাপের কথা তিনি
কল্পনাই করতে পারেননি। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করি,
গত দশকে জনৈক বৈমানিকের অনবধানতায় তাজ
মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে বসেছিল। প্রচন্ড কুয়া-
শায় বিমানচালক সামনে কিছু আছে কি না দেখতে
পাচ্ছিল না, সহসা তাহের গম্বুজটা তার নজরে পড়ে।
শেষ মুহূর্তে সে পাশ কাটিয়ে নিজেকে এবং তাজকে
রক্ষা করে। ঘটনাটা রিডার্স ডাইজেস্টে পড়েছিলাম।
সঠিক সংখ্যাটা এখন খুঁজে বার করতে পারছি না।

তিন নম্বর আতঙ্ক : প্রযুক্তি-বিদ্যার অভিশাপ !
মথুরায় নাকি নূতন কংস সম্প্রতি জন্মগ্রহণ করেছেন !

সে বিষয়ে একটি পৃথক অনুচ্ছেদে আলোচনা করা
গেল।

তাজ ও মথুরা রিফাইনারি :^{২২} গত দশকে তাজ
থেকে মাত্র ৪০ কিলোমিটার দূরে নির্মিত হয়েছে
মথুরা রিফাইনারি। তার চিম্নি দিয়ে প্রতি ঘণ্টায়
এক টন পরিমাণ 'সালফার-ডায়োক্সাইড' বাতাসে ছেড়ে
দেওয়া হচ্ছে। একদল বিশেষজ্ঞের মতে এতে তাজ
প্রচন্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ সম্বন্ধে কাগজে ও
সাময়িক পত্রিকায় নানা আলোচনা হয়েছে। এখানে

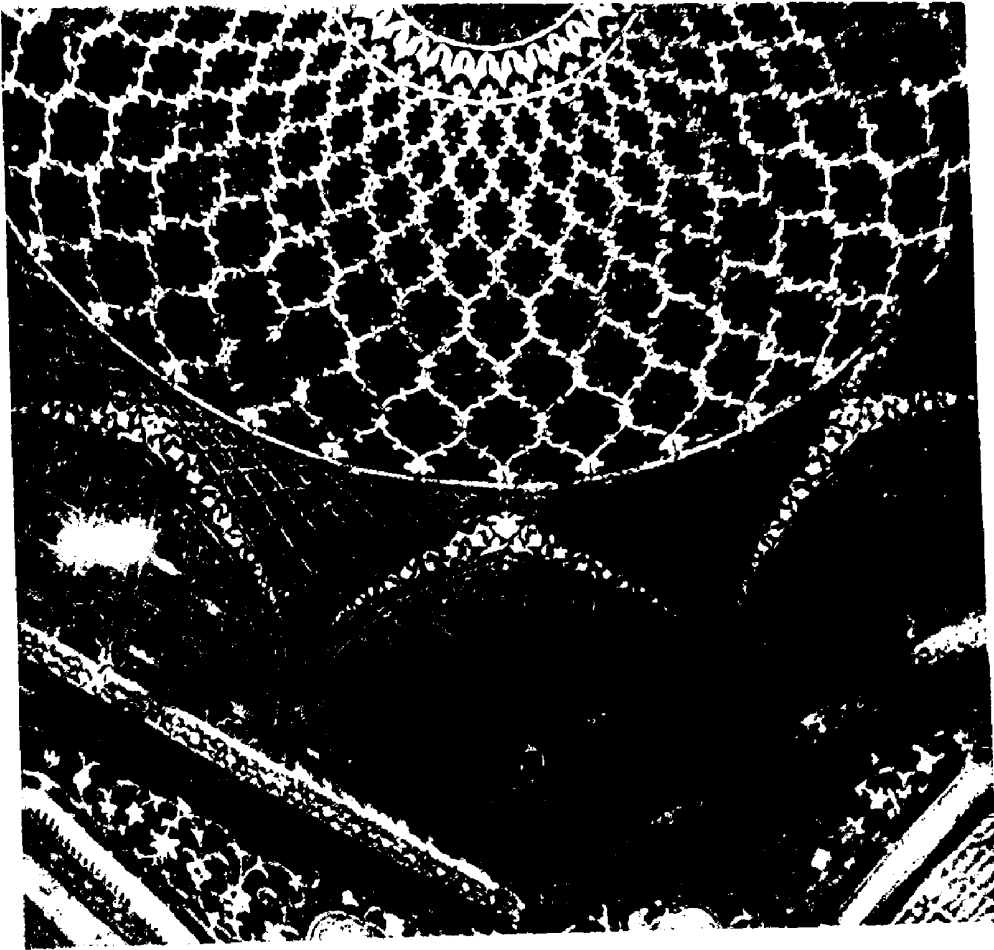
তার সংশ্লিষ্টতার সংকলিত করা গেল :

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও সংবাদ-পত্রের প্রতিবাদে পেট্রোলিয়াম ও রাসায়নিক মন্ত্রক 1974 সালে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিযুক্ত করে জানতে চাইলেন, মথুরা রিফাইনারির জন্য তাজমহলের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা কতটা আছে। কমিটি দুটি প্রতিষ্ঠানকে গবেষণা করবার জন্য নিযুক্ত করলেন। একটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান : 'ইন্ডিয়ান মেরিটোরিয়োলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট' : দ্বিতীয়টি একটি ইতালিয়ান বিশেষজ্ঞ-প্রতিষ্ঠান TECNECO।

গবেষণায় জানা গেল, আগ্রার বায়ুমণ্ডল দূষিত হওয়ার একাধিক হেতু : দুটি পুরাতন কয়লা-চালিত

মাইক্রোগ্রাম। দুটি প্রতিষ্ঠানই পৃথক পৃথক রিপোর্টে কললেন, চম্পিশ কি. মি. দূরে মথুরা রিফাইনারির জন্য তাজের কাছে ঐ বিখ্যাত সালফার ডায়োক্সাইডের পরিমাণ দুই-তিন মাইক্রোগ্রাম বর্ষিক পেরে পড়ে যত।

তবু আমরা জানি না, এজনা তাজ-মহলের কোনও ক্ষতি হবার আশঙ্কা আছে কি না। আমাদের জীকিত-কালেই আমাদের অনেকের মনে হয়েছে চিশ-চম্পিশ বছর পূর্বের দেরা তাজ কিছু বেশী সাদা ছিল। তাজের উপর কি সত্যই কোনও প্রদূষণ (কোটিং) পড়ছে? এজনা তাজের এলাকা থেকে সংগৃহীত একটু ময়লা-হয়ে-যাওয়া একটুকরো মার্বেল পাঠিয়ে দেওয়া



চিত্র-11.20 তাজ-সিলিক-এ বর্ণিকান্তাপ। কোণায় গম্বুজ পেঁথে পুইক-সমস্যার সমাধান করা হয়েছে, বাঁম পেতে নয়, চিত্র-3.12 তুলনীয়।)

কান্নখানা, রেলগাড়ির ধোঁওয়া, প্রায় আড়াই শ'টি ছোট-ছোট লোহার ফাউন্ড্রি। ওদের হিসাবমতো এজনা আগ্রার আবহাওয়ায় বর্তমানে প্রতি ঘনমিটার বাতাসে গড়ে বছরে 20 মাইক্রোগ্রাম সালফার-ডায়োক্সাইড থাকে। সেটা এমন কিছু বেশী নয়, যেমন তুলনামূলকভাবে বলা যায় পারী-নগরীর বাতাসে তার পরিমাণ 114

হল রোম-নগরীর IRC প্রতিষ্ঠানে। তারা এজাতীয় কাজে বিশেষজ্ঞ। পরীক্ষা করে জানলেন—ঐ ময়লার দাগ আগ্রা-এলাকার বাতাসে সালফার ডায়োক্সাইড থাকার জন্য নয়, একজাতের 'গ্যালি' বা 'ফাংগী'-র আক্রমণে। শ্যাওলা জাতীয় কোন কিছু।

সুতরাং আশা করা যায়, মথুরার যে নয়া-কল-

রাজকে পরদা করা হয়, সে তাজমহলকে নিশ্চিহ্ন করতে পারবে না।

আশা করি সেই আনন্দে সরকার তাজমহলের কাছে-পিঠে সারি-সারি কংস পরদা করে আগ্রার বাতাসকে আরও বিবাক্ত করে তুলবেন না।

আনুষ্ঠানিক : তাজমহলে এ-ছাড়া যা দৃষ্টব্য তার বিস্তারিত বর্ণনা থেকে বিবৃত থাকিছে। আপনাদের অভির চিন্তা সেগুনি ঝঞ্জে নেবার জন্য কিছ্ ইঞ্জিত-মাত্র রেখে যাওয়া কেতে পারে।

তাজের জলসরবরাহ ব্যবস্থাটি প্রয়োগবিদ্যার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। আপনি যদি 'ওয়াটার-সাপ্লাই' ব্যাপারে উৎসাহী হন, তাহলে অভিজ্ঞ গাইডকে জিজ্ঞাসা করবেন, সে দেখিয়ে দেবে, কী-ভাবে যমুনা থেকে জল তোলা হত বলিবর্দ-নিয়োজিত 'পার্শিয়ান হুইল' বা 'পার্নিচার' সাহায্যে। সঞ্চিত হত জলাধারে ; এবং ভূমভূমি পরঃপ্রণালীর মাধ্যমে নীত হত চাহর বাগ-এর বিভিন্ন প্রান্তে, কেন্দ্রীয় জলাধারে ; ছাড়িয়ে পড়ত ফেরারার আকরে। পশ্চিমদিকের ভূগর্ভ থেকে সম্প্রতি একটি পোড়ামাটির জলবাহী পাইপ খুঁড়ে বার করা হয়েছে। 1980 সালেও সেটি ঐ তাজ এলাকাতে ছিল। 230 মিলিমিটার বাস, সেটি মাটির গভীরে 152 মিটার নিচে থেকে পাওয়া যায়।

আপনার ঝোঁক যদি 'আরবোরিকালচারের' দিকে হয়, তাহলে ঝোঁক নিয়ে দেখতে পারেন বাগিচার কোথায় কোন জাতের গাছ রোপিত হয়েছিল। এদিক থেকে পরিকল্পনাকার প্রকৃতিপ্রমিত আব্দুর-বাদশাহ-র উত্তরসূরী। সম্বৎসর পরঃপ্রণালীর দূ-পাশে সার দিয়ে যে 'সাইপ্রাস' গাছ লাগিয়েছেন তা স্থাপত্যের সঙ্গে একসঙ্গে বঁধা। সেগুলিকেও মাপমতো ছোট্ট দেওয়া হত যাতে উদ্যানের রশ্মিচ্ছটার প্যাটার্নে সুরাও সুরে সুর মেলাতে পারে। অর্থাৎ বিলীয়মান কিম্বদন্তি তারও অভিযাত্রী। সপ্তদশ শতাব্দীতে আঁকা একটি চিত্রে ঐ কাউগাছগুলিকে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান দেবা যাচ্ছে—অর্থাৎ পাদপসম্ভার পরি-কল্পনাটি লর্ড কার্জন সংস্কারের সময় আনয়ন করতেন।

অপরপক্ষে আপনার ঝোঁকটা যদি চিত্রশিল্পের দিকে হয়, তাহলে মসজিদ এবং তার জবাব, মেহমানখানায় ঝোঁক নিয়ে দেখতে পারেন। টেম্পার-পার্শ্বভিতে দুটি মাঠ রঙের ব্যবহারে প্রাচীন চিত্রগুলি রূপায়িত। ইমতদউলদৌলার রঙ-বরঙ নয়, তাই সমাধিসৌম্যের পান্ডিত্য ঝিলমাট ব্যাহত হয়নি। পার্শ্বভিটি বৈশিষ্ট্য

দাবী করতে পারে। দেওয়ালের 'জমিন' বা base গাঢ় লাল রঙের। তার উপর অতি সূক্ষ্ম প্রায় হাঁসের ডিমের খোলার মতো বেদ-এ একটি আস্তর করা। লাইমপাটি বা পণ্থের কাজ। সেটি শূন্যে ওঠার পর হালকা-পেন্সিলে ছবির বহিরঙ্গণা আঁকা হয়েছে। শেষ কাজ—স্থানে স্থানে ঐ সাদা আস্তরটা নিপুণ-ভাবে চেঁছে তুলে ফেলা হয়েছে। ফলে 'বাতিক'-এর কাজে যেমন ঋণাত্মক প্রতিফলনে নকশাটা ফুটে ওঠে, এখানেও তেমনি লাল-জমিতে সাদা নকশার আলিঙ্গন। আপনারা যদি না মনে করেন যে, আমি ওক-গাছের মতো 'হিন্দু-অবসেশনে' ভুগছি, তাহলে 'আর্কিওলজিকাল সাউন্ড' অব ইন্ডিয়া' প্রকাশিত 'অজন্তা ম্যুরালস্' গ্রন্থের XXXIX-প্লেটটা এই প্রসঙ্গে দেখতে বলব। একই রকম লাল-জমিতে সাদা ছবি ; ঋণাত্মক-পার্শ্বভিতে আঁকা (Cave I, Ajanta)।

আর গুরুত্বপূর্ণ—'আদিরস রসনায়'-মন্টে আপনার ঝোঁকটা যদি হয় তাজ-চত্বরে বাতানুকূল করা আধুনিক রেস্টোরাশ্য মোগলাই-খানা খাওয়ার দিকে, তাহলে আপনাকে একটা পরামর্শ দিতে পারি। তাজমহলে পৌঁছে সহযাত্রীদের সঙ্গে একটা বাজী ধরে বসুন : প্রশ্ন করুন : মূল গম্বুজের উপর ঐ ধাতবদণ্ডটা কিস্তিবে কত বড়? বলতে পারেন—যাঁর উত্তর নির্ভুল মাপের দশ-শতাংশের ভিতর হবে তাকে আপনি ঐ রেস্টোরাশ্য মর্গ-মশল্লম খাওয়াবেন ; আর কারও উত্তর যদি দশ-শতাংশের ভিতর না আসে তাহলে ওরা সবাই মিলে আপনাকে তাই খাওয়াবে। এতে আপনার লাভ বই লোকশান হবে না। ঔদের জবাব পাঁচ-সাত-দশ-পনের ফিট-এর মধ্যেই সীমিত হবে। বাস্তবে তা ত্রিশ ফুট (9.14 মি)-এর কাছাকাছি, অর্থাৎ তিন-তলা বাড়ির সমান। সহযাত্রীরা যখন প্রমাণ চাইবে তখন ঐ পূর্বদিকস্থ মেহমানখানার বাহিরে চাতালটায় ওদের নিয়ে যাবেন। দেখিয়ে দেবেন, লাল-পাথরের শাহনে কালো কণ্ঠ পাথরে 'ফুলস্কেল'-এ নক্সটা সাড়ে তিনশ বছর আগে খোদাই করা হয়েছে। মর্গ-মশল্লম খাওয়ার সময় অখমের কথা স্মরণ করবেন। ট্রিপ্ল-টোটেট টিপসটা তো সেই দিয়েছে, না কি বলেন?

নির্মাণ-ব্যয় ও যথার্থ্য : মার্কিন-মূল্যকে বাস্তব-কারের একটা সংজ্ঞা প্রচলিত আছে : 'An engineer is one who can do a thing for a dollar, which any fool can do for two.' (এঞ্জিনিয়ার তাকেই বলবে যে, এক ডলারে এমন একটা কিছ্ পরদা করতে পারে, যা যে-কোনো মূর্খ পারে দুই ডলারে)।

শুধু শাহজাহাঁ নয়, বিগতযুগের ভাবগুরুজনগণের মানব-বাসী ঐ সংস্কারটি মানতেন না। মানেননি মিশরের ফারাও, পারস্যের শাহ, চীন-সম্রাট, রাশিয়ার জার অথবা চতুর্দশ লুই। সুতরাং এজন্য শাহজাহাঁকে দোষারোপ করা অন্যায্য। তবে বলতে পারেন, দোষী বা নির্দোষ কিনা নাই বা বিচার করলাম, আজকের দিনের বিচারে ফলাফলটা কি হচ্ছে জানতে দোষ কি?

তা যদি বলেন, তবে বলব : অহৈতুকী ব্যয়বৃদ্ধির অপরাধে তাজমহল নির্মাতা অপরাধী।

খরচ হয়েছিল সাড়ে আঠারো কোটি শাহজাহানী-তঙ্কা।

কিন্তু তার অর্থ কী? অর্থনীতির মূল্যায়নে 'শাহজাহানী-তঙ্কা'র ক্রয়-ক্ষমতা কত? এক তঙ্কায় তখন কত মণ চাউল খরিদ করা যেত? একটি মেহনতী মানুষ কতদিন কৌদাল চালিয়ে এক তঙ্কা উপার্জন করতে পারত? তা জানি না। তবে একটি তুলনামূলক বিচারে 'তঙ্কা'র বাজারদরটা আন্দাজ করা সম্ভব। বক্তৃওয়ার খাঁ ছিলেন আলমগীরের আমলে একজন ঐতিহাসিক। তিনি পূর্ব-জমানায় সমাপ্ত লাল-কিল্লার খরচের একটা খতিয়ান রেখে গেছেন। সেটাই আমাদের দিগদর্শক হতে পারে :

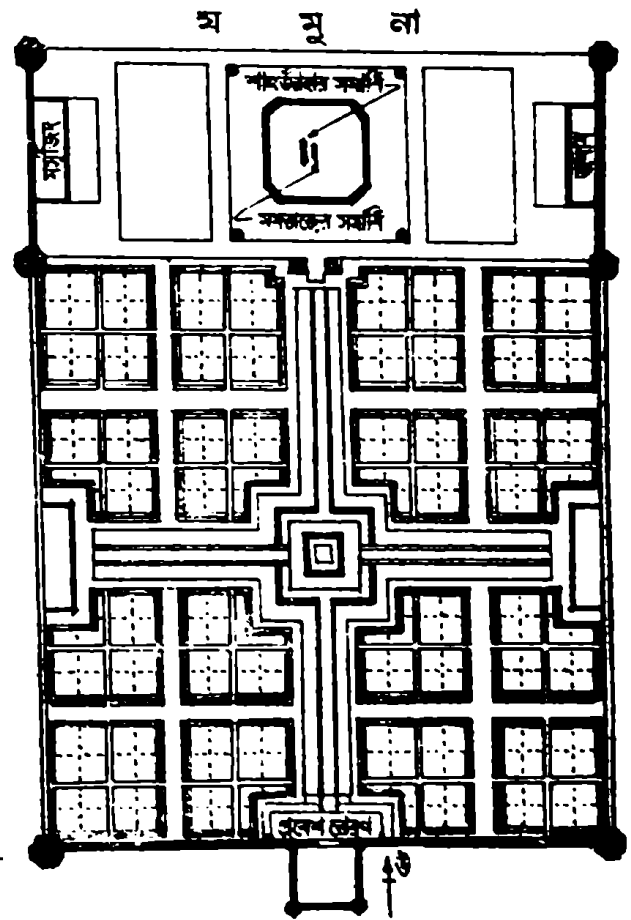
লাল-কিল্লার বিভিন্ন অঙ্গের নির্মাণ ব্যয়	লক্ষ তঙ্কার হিসাবে
প্রাচীর, গড়-খাই, শাহবুর্জ ইত্যাদি	21
মীনাবাজার, কারখানা ও বহিঃস্থ মোকামগুদী	4
দেওয়ান-ই-খাশ্ (রৌপ্যমণ্ডিত সিলিঙ ও অলঙ্কার সহ)	14
রঙমহল, খোয়াবগাহ (আসবাবসহ)	5½
দেওয়ান-ই-আম (ময়ূর সিংহাসন বাদে)	2
সম্রাটের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ইমারৎ ও আসবাব	28
হায়াৎবস্ত্র বাগিচা ও হামাম (জল সরবরাহ ব্যবস্থাসহ)	2
বেগম মহল ও সংলগ্ন বিলাসোপকরণ	7
	83½
অন্যান্য বিকিস্ত ইমারৎ ইত্যাদি	16½
	100

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যেখানে যাকতীয় বাদশাহী অলঙ্করণ, আসবাব ইত্যাদি সমেত গোটা লাল-কিল্লা নির্মাণে খরচ হল দশ কোটি তঙ্কা, সেখানে তাজমহলের খরচ প্রায় তার দ্বিগুণ—18.5 কোটি!

শুধু তাই নয়, হিসাবের মধ্যে যেটা সবচেয়ে চমকপ্রদ সংবাদ তাই এখনও বলা হয়নি—জমির মূল্য, জল-সরবরাহ ব্যবস্থা ইত্যাদিসহ মূল তাজমহল, মসজিদ ও জবাবে সিবিলা এঞ্জিনিয়ারিং কাজে খরচ হয়েছিল মাত্র 50 লক্ষ তঙ্কা! আজকে হ্যাঁ, মূল্যাকর

প্রমাদ হয়নি এখানে, আমি বলছি 'পঞ্চাশ লক্ষ' তঙ্কা! বাকি আঠারো কোটি খরচ হয়েছে দামী পাথরের অঙ্গ সজ্জায়! তথ্যটা আপাতদৃষ্টিতে অবিশ্বাস্য মনে হয়; অথচ তাই লেখা আছে ঐতিহাসিকের খতিয়ানে! তার মানে দাঁড়াচ্ছে : সম্রাট যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তার মাত্র 2.7 শতাংশ বর্তমানে পরিদৃশ্যমান; বাকি 97.3 শতাংশ নিশ্চিহ্ন! লুট হয়ে গেছে ইতিমধ্যে নাদিরশাহ, জাঠ সৈন্য ও ইংরাজের হাতে।

বে-সরমকি বাতে!—এই সহজ সরল সত্যটা কেন প্রণিধান করতে পারলেন না অতি বিচক্ষণ শাহ-ব্রেন-



চিত্র-11.21 পরিদৃশ্যমান ভাঙের ভূমি-নকশা।

শাহ শাহজাহাঁ? যে মালমশলা দিয়ে, যে দৃঢ় বিনিয়োগের উপর তিনি এই 'কামাল-লতিক-নানাব-আজীব-ও ঝারিব' নির্মাণ করিয়েছিলেন তাতে তিনি সম্পদ কার্যেই আশা করেছিলেন এ ইমারৎ সহস্রাব্দিকাল অটুট থাকবে। কিন্তু তিনি কেমন করে আশা করলেন—তাজমহলের নিরাপত্তা-স্বক্সা সেই দীর্ঘ-সময় ধরে অব্যাহত থাকবে? মূল্য-মোহরবর্ষি সাময়িক-অর্থও যে পশ্চিমে চলতে শুরু করেছে তার ইঙ্গিত

মহাকাল দিয়েছেন—কল্ক, বাদ্যকশান্, সমরকন্দ-
কিঙ্করের জন্য বিরাট বাহিনী নিয়ে শাহজাহাঁ অগ্রসর
হয়েছিলেন এবং পরাজয়ের বেদনা বন্ধে নিয়ে ফিরে
এসেছিলেন ; শ্বিতীয়বার সে ভুল তিনি করেননি
জীবদ্দশায়। কিন্তু ইতিহাসের সে ইঙ্গিত সমকালে
দাঁড়িয়ে যদি শাহজাহাঁ না বুঝে থাকেন তবু এটুকু
কেন বুঝেন না—অনাগতকাল তাঁর প্রয়াত বেগমের
প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ ঐ মহার্ঘ হীরা-মুক্তা-জহরৎ ওখানে
থাকতে দেবে না? মৃগল-জমানা তাঁর দেহান্তে টিকে
থাকলেও? তিনি নিজেই কি আগ্রা-কিল্লায় তাঁর
শিতামহের ইয়ারগুর্দাি ধবংস করে হাল-ফাসানের
মোকাম বানাননি? সফদরজঙ্ঘ যেভাবে আবদুর রহিম
খান-ই-খানান-এর মক্‌বারা থেকে মার্বেল খুলে এনে
নিজের সমাধিসৌধ বানিয়েছেন, সেভাবে কেউ তাজ-
মহলের পাথর খুলে ফেলবে এ আশঙ্কা হয়তো তিনি
সঙ্গত কারণেই করেননি ; কিন্তু তাই বলে অরক্ষিত
সোনার পাত, হীরা-মুক্তা ওরা ওখানে থাকতে দেবে?
টুটেনখামেন-এর নামটা জানা না থাকলেও, সোমনাথ
মন্দিরের নামটোও কি তিনি শোনেননি?

তবু সেই বিচক্ষণ সম্রাট ভূ-ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত
থেকে অত্যন্ত মূল্যবান নানান পাথর এনে তাজমহলকে
অলঙ্কৃত করলেন। বাগদাদ থেকে এনেছিলেন 540টি
কর্নেলিন, তিব্বত থেকে 670টি ফিরোজা, সিংহল-
স্বীপ থেকে 242টি লাজবস্ত (লাপিস্ লাজুলি),
এ ছাড়া বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মৃগ (প্রবাল), তিলাই
(সোনাপাথর), মস্‌সা (কৃষ্ণ-মর্মর), গুলাবী, নীলা,
মরকব (পাশা), আভী (রক্তমুখী নীলা), পোকরাজ,
সাকু (চর্নি), শম্‌ব, মৃত্তা, রুশম্‌, মায় সাঁচা-বাদখ-
শান (আসল হীরা!)।

যেন মহার্ঘ মানেই মহার্ঘ!

এই নিবৃত্ত হিসাব দাঁখিল করতে পারছি সেই
মীর মৃগল-বঙ্গ-এর সরকারী নথী থেকে—সেই যে
ঐতিহাসিক ‘চুন-ইক নক্‌শা-পসন্দ আলিজা-হজরৎ’
লিখে পরের পংক্তিটি লিখতে কি-জানি-কেন ভুলে
গেছিলেন!

তাছাড়া কয়বান্ধ মানেই উন্নততর কাজ এটা কোন
কোয়কুব স্নেনে দেবে? বনিয়াদের তলায় একমুঠো হীরে
পড়তে রাখলে ইমারতের ‘কস্ট’ বাড়ে, ‘ভ্যালু’ বাড়ে না।
একটা উদাহরণ দিই : যে সিঁড়ি বেয়ে তাজের মোকাম-
কুর্সিতে উঠে এসে, লক্ষ্য করে দেখুন, তার ধাপগুলি
নিরুপেক্ষ মার্বেল দিয়ে বানানো। বালি-পাথরের উপর
মার্বেলের পাত নয়। অথচ প্রযুক্তি-বিদ্যার প্রচলিত
পদ্ধতি—সাধারণ বালি-পাথরের উপর দেড়-দুই ইঞ্চি

বেদ-এর মার্বেল-স্ল্যাব বিছিয়ে দেওয়া। দুনিয়ার তাৎ-
মার্বেল-মোকামে এ নীতি মানা হয়েছে ; তাজের বাস্তব-
কারেরা যে পদ্ধতিটা জানেন না, তাও নয় ; কারণ মূল
সৌধটি ঐ পদ্ধতিতেই নির্মিত। তাহলে? কিছতেই
ভুলতে পারি না—ঐ প্রতিটি ধাপের নিরেট নিখুঁত
মার্বেলগুলি মিকেলান্জেলোর হাতে পড়লে ‘ডেভিড-
পীতা’ না হলেও এক-একখানা ‘ব্যাঙ্কাস্’ হতে পারত।

আপনি কলবেন, শাহ-য়েন-শাহ-র কাছে ঐ
মাপের খান-পঞ্চাশ মার্বেল খণ্ডের কীই বা দাম? তা তো
বটেই—‘কত ধন যায় রাজমহিষীর এক প্রহরের প্রমোদে।’
কিন্তু কেমন করে ভুলি : পাজাবের সেই খালকাটার
কাজটার নক্‌শা তৈরী হয়ে পড়ে ছিল, অর্থাভাবে তাতে
হাত দেওয়া যায়নি। আর সত্যি কথা বলতে তাজের
নির্মাণ-ব্যয় শাহজাহাঁর তোষাখানা থেকে মেটানো
হয়নি আদৌ। সম্রাট এজন্য ত্রিশটি মৌজা চিহ্নিত
করে দেন। ঐ ত্রিশটি মৌজা থেকে রাজ কর্মচারীরা
খাজনা আদায় করে আনত, তা সরাসরি জমা পড়ত
তাজের তহবিলে।

সেই সময় হারিয়ে-যাওয়া গ্রামের নিরন্ন প্রজার দল
কী-ভাবে খাজনা দিত তা কি আন্দাজ করতে পারছেন
না? বেগম প্রয়াত, কিন্তু ‘কর্তার ভৃত’ মরে না। ওরা
বাইশ বছর ধরে তাজের তহবিলে খাজনা জমা দিয়ে
গেছে : ‘আরু দিয়ে, ইজ্জত দিয়ে, ইমান্ দিয়ে, বৃকের
রক্ত দিয়ে!’²³

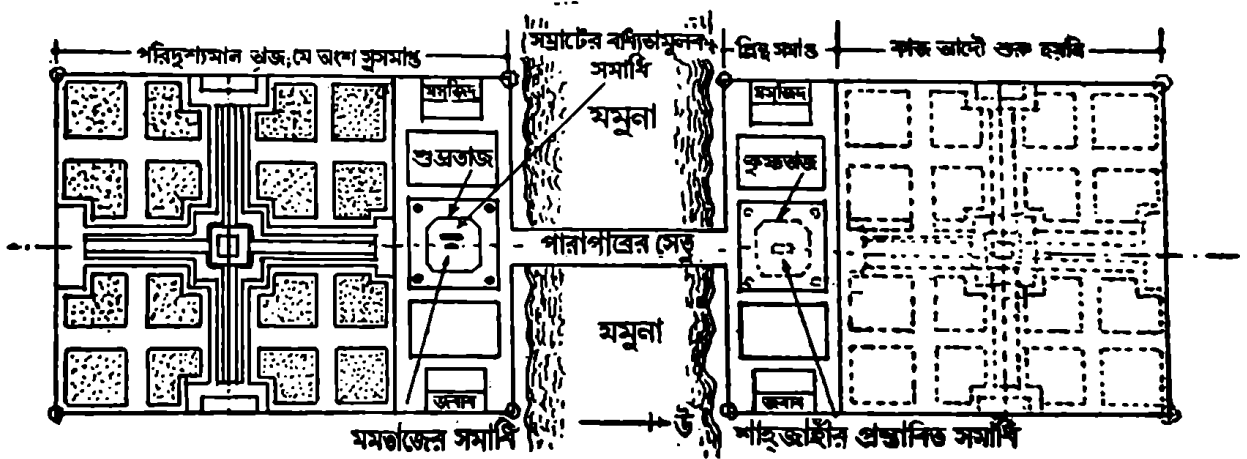
তাজের সামূহিক ভূমি-নক্‌শা : ভুল, ভুল, আদ্যন্ত
ভুল বকে চলোঁছ এতক্ষণ! গম্বুজ নয়, মিনারিকা নয়,
প্রয়োগ-বিজ্ঞানের হন্দমন্দ নয়—অজ্ঞাত পরিকল্পনাকার
তাঁর চরমতম মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন তাজের
সামূহিক বিন্যাসছন্দে!

‘আর্কিটেক্টনিক এ্যাপীল’ এবং ‘ইস্‌থিটিক্’
ডিলাইট-এর মহাসঙ্গম সেই সামূহিক ভূমি-নক্‌শার
মূল সূত্রটি পাওয়া যাবে : বাবুর-বাদশাহ-র ‘চাহার
বাগী’ ছন্দে, যা মৃগল-বিন্যাসের কেন্দ্রীয় ভাবনা। কিন্তু
এ পর্যন্ত কোথাও—কী ভারতবর্ষে, কী বহির্ভারতে,
সেই চাহ-র বাগ্‌ এমন অপূর্ব মহিমময় হয়ে ওঠেনি।

‘চার’ সংখ্যাটি ‘চাহ-র বাগ্’ পরিকল্পনার মূল কথা
—ইসলামী ঐতিহ্যও নানা কারণে ঐ ‘চার’ সংখ্যাটি
গুরুত্বপূর্ণ। এখানেও ভূমি-নক্‌শায় (চিত্র—11.21)
উদ্যানকে প্রথমে চার খণ্ডে এবং পরে আবার চার খণ্ডে
এবং তারপর আবার চার খণ্ডে ভাগ করা হয়েছে।
কিন্তু তাজমহল ঐ চারমাত্রার বোলে সময় মাথায় নেই।
তা কেন্দ্রাতিগ বেগে সরে গেছে একপাশে। কেন?

ইতিপূর্বে যাবতীয় মৃগল-ইমারতে বাগিচার কেন্দ্র-বিন্দুতে চিরকাল মূল ইমারতকে গড়ে উঠতে দেখেছি : বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর এবং ইতমদ-উদ্দৌলার মক্‌বারায়। এই প্রথম সেই 'ট্র্যাডিশন'কে অস্বীকার করা হল। প্রধান সৌধটিকে তার দুই সখী-সমেত সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল বাগিচার এক প্রান্তে, উত্তরসীমান্তে। সম্মুখস্থ বর্গক্ষেত্র-আকারের কেন্দ্রবিন্দুতে রইল একটি কৃত্রিম মর্মর জলাধার। তার আকার, আয়তন ও সংস্থাপনচাতুর্যে সে তাজমহলকে প্রতিফলিত করার অধিকার পেয়েছে।

শিল্পী কি কোনও দার্শনিক তত্ত্বের ইঙ্গিত দিতে তাজকে এমন অন্তর্বাসী করেছেন? তিনি কি বলতে চান : এই মরণশীল দুনিয়ায় মক্‌বারাও জলবিশ্বের মতো অলীক? তিনি কি বলতে চান : পাথরে খুঁজতে যেও না সেই অমর প্রেমকে, হয়তো পেলেও পেতে পার তার অলীক প্রতিবিশ্ব! বাস্তবে তা মায়ী, কল্পনায় শাস্বত?



চিত্র-11.22 তাজের মৌলিক ভূমি-নকশা।

অজ্ঞাত পরিকল্পনাকার বিস্মৃতির অমর্ত্যলোক থেকে স্নান হেসে বলেন, তাই যদি হবে, তাহলে এই মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের প্রতীককে কি আমি বাঁধতে চাইতুম বন্ধ জলাশয়ে? —যা অপ্রাকৃত, অ-বহমান, যা চিরকাল থম্কে থেমে আছে?

—তাহলে?

—জী নেহি বাবুজী! মায়নে গল্‌তি নেহি কী! ইয়ে স্নেফ তকদিরকি খেল!

বুঝিয়ে বলেন, আমার চিন্তাধারা বন্ধ জলাশয়ে আবদ্ধ হবার নয়! প্রকৃতিপ্রেমিক আবদুর-বাদশাহ্ যে ব্যবস্থায় সবচেয়ে খুশি হতেন তাই করতে চেয়েছিলেন আমি। পরিকল্পনার মধ্যবিন্দুতে আমি তাকেই রাখতে

চেয়েছিলেন যাকে পরদা করার হিম্মৎ শাহ-য়েন-শাহ্-শাহ্-জাহাঁ তো তুচ্ছ, নেই 'তামান্' ইনসানিয়্যাতের! মানুষ যা পারে না, যা আত্মাতার অসীম করুণাধারা!

—কী তা?

—আপনাদের বাধা আর কুকের মাঝে বা চিরকাল প্রবাহিত! সেই বিরহের নীল যমুনা!

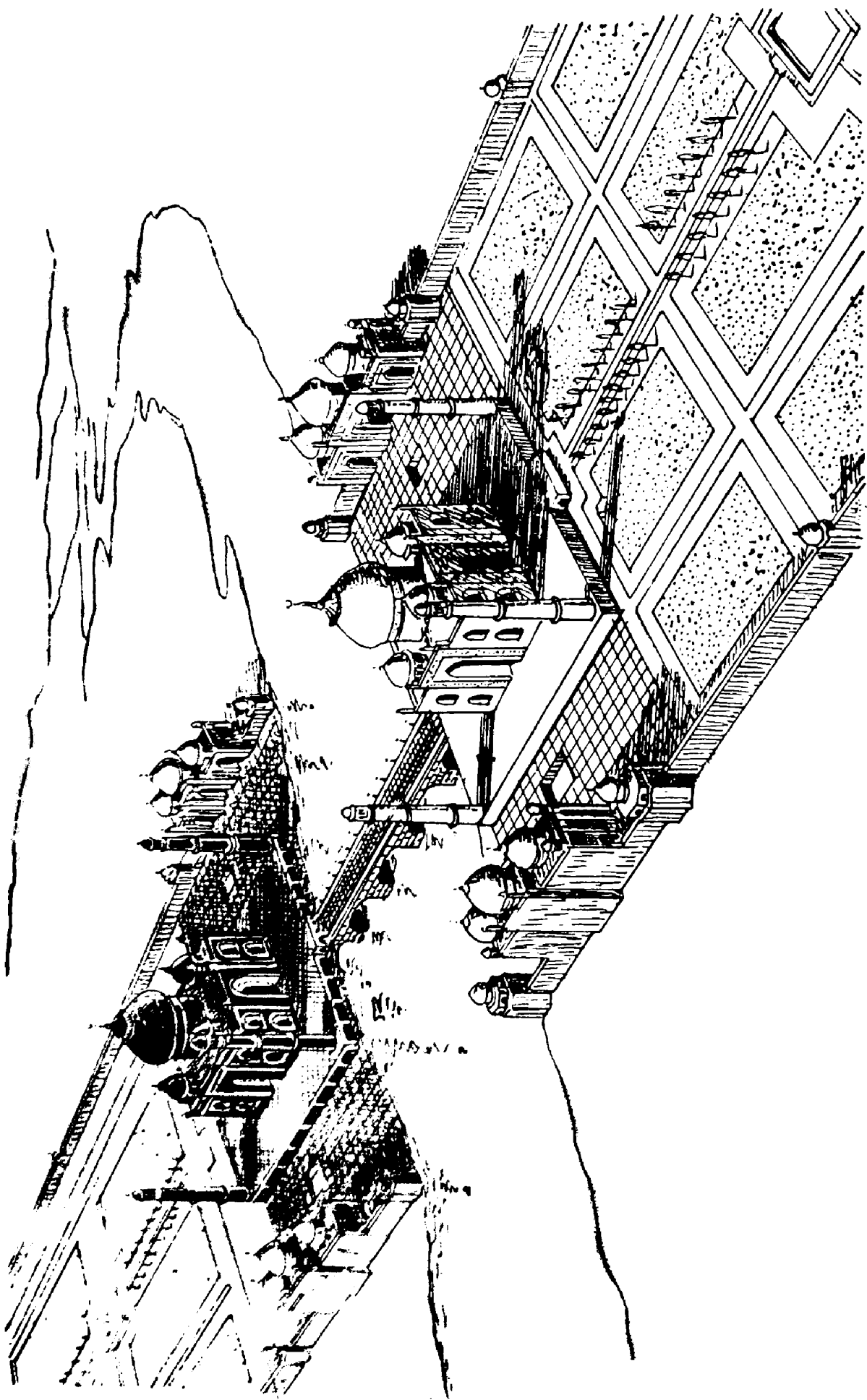
আমাদের অবাক হবার ইচ্ছা আছে! যমুনা? সে তো গোটা পরিকল্পনার বাহিরে! উত্তরসীমানার ওপারে!

তা হোক! বে-ইক্ বাৎ বলেননি বে-হাদিশ্ কাস্তু-কার! সামূহিক পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে যমুনা-ই!

তাজ-পরিকল্পনার শব্দ আধখানাই বাস্তবায়িত। প্রস্তাব ছিল, যমুনার পরপারে নির্মিত হবে আদান্ত নিকষকালো কষ্টিপাথরে : কৃষ্ণতাজ। শব্দ-তাজের প্রতিবিশ্ব—'লিঙ্‌চুডিনাল এ্যান্ড্রিসে' তাজের : জবাব। বেগমের সমাধি থাকবে ওপারে, শব্দতাজে : বাদশাহ্-র

সমাধি থাকবে ওপারে, কৃষ্ণতাজে। দুইটিই কেন্দ্রীয় অক্ষরেখায়। আর লায়লা-মজনু-র মাঝখান দিয়ে অনন্তকাল ধরে প্রবাহিত হবে বিরহের নীল-যমুনা। সেই চিরবিরহের বাধা অতিক্রমণের একটা স্বার্থপ্রয়াসের প্রতীক হিসাবে নির্মিত হবে একটি মর্মর সীকো। তার আধখানা সাদা, আধখানা কালো। যেন দু'দিক থেকে দু'টি হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ওরা। বুঝাই (চিত্র-11.22)।

শাহ-জাহাঁ বন্দী হওয়ার পূর্বে যমুনার পরপারে কৃষ্ণতাজের মোকাম-কুর্সি পর্যন্ত গাধা শেষ হয়েছিল। আমি 1965 সালে সেটি স্বেচ্ছা দেখে এসেছিলাম। এ বছর (1980) তার চিহ্নমাত্র দেখতে পেলাম না। শুনলাম, যমুনার সাম্প্রতিক বন্যায় পলিমাটি ও বাজির



চিত্র-11.23 ইশা-আফগিন্দর খানে তাজের সামূহিক রূপ।
(গরুড়াবলোকনে কাল্পনিক চিত্র।)

তলায় তা চাপা পড়েছে। একান্তভাবে আশা করব, পুরাতত্ত্ববিভাগ সেই ভিতটুকু খুঁড়ে বার করবেন। ওটাই যে তাজ পারিকম্পনাকারের 'ল্যাস্ট-ল্যাক্স'!

—অনুবাদে : আর্থেরি আস্‌!

ঔরঙ্গজীবের হাতে শাহজাহাঁ বন্দী হবার পর দিল্লী থেকে এল বাদশাহী হুকুমৎ : 'বন্দ করে দাও কৃষ্ণতাজের নির্মাণকার্য'।

মর্মাহত হলেন সেই পরিচয়হীন উস্তাদো-কি-উস্তাদ ; বন্ধলেন বাইশ বছর ধরে যে নিখুঁত ভার-সাম্যমূলক অনবদ্য ইমারৎটি বানাচ্ছেন এবার তা ভার-সাম্যচ্যুত হল। কেন্দ্রীয় অক্ষের দ-পাশে—পূবে আর পশ্চিমে আদ্যন্ত 'সিমেন্টিক্যাল ডিজাইন'-এ ঐ একটিই ছন্দপতন, যার নিয়ামক স্থপতি নয়, বাস্তবকার নয়—ইতিহাস ! কেন্দ্রীয় অক্ষরেখায় মমতাজ-মহলের সন্দোখ্ ; কারণ কথা ছিল, তাঁর স্বামীর মরদেহ শায়িত হবে একই অক্ষরেখায় যমুনার পরপারে কৃষ্ণতাজে (চিত্র—11.22)। যে-হেতু কৃষ্ণতাজ পরিত্যক্ত তাই শাহজাহাঁর মরদেহ এখন শুইয়ে দেওয়া হল মমতাজের পাশটিতে। নিয়তির কী নিষ্ঠুর পরিহাস ! তামাম জিন্দগি যিনি ছিলেন বেগমের দিকে ফিরে, এবার শাস্বতকালের জন্য তাঁকে শুতে হল তাঁর দিকে পিছন ফিরে ! মক্কার দিকে ফিরে ! মমতাজের কবর-সন্দোখ্ যে হাত-দুই পূবে সারিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখবেন তারও উপায় নেই—সাহী শরিয়তী তাঁরকে কবরে ঘুমন্ত মানুষকে সরানো-নড়ানো বারণ !

ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে তাজ-পারিকম্পনাকারের নামের শেষচিহ্নটুকু বে-হাদিশ্ মূছে ফেলে জাহাঁপনা বোধকারি নির্জন খোয়াবগাহে অটুহাস্যে ফেটে পড়েছিলেন : নেই, নেই, কোথাও নেই সেই বেতনভুক নফরটার নাম-ধাম-পরিচয় ! টোটাল এ্যান্‌হিলিয়েশান !

তামাম হিন্দুস্থানের মালিক শাহ-য়েন-শাহ্ বাদশাহ্‌র যেমন ছিল সীমাহীন রাজশক্তি, তেমনি তাঁর মখসূর প্রতিদ্বন্দ্বীর ছিল অপারিসীম প্রতিভা ! শ্বৈরখ-সমরে তিনি মাথা নিচু করেননি। অসীম শক্তিশালী

মালিকের ইব্‌তিজাজের বিরুদ্ধে নীরব জেহাদ ঘোষণা করলেন। লড়াই ফতে করলেন তাঁর একটিমাত্র একাধারী দিয়ে—সে অস্ত তাঁর শিল্পপ্রতিভা ! একইভাবে তাজ-মহল-স্থাপত্য থেকে শাহজাহাঁকে বে-হাদিশ্ মূছে ফেলে ! টোটাল এ্যান্‌হিলিয়েশান !

শেষ-হাসি হাসবার সন্ধ্যোগ শাহজাহাঁ পাননি ! আর পাননি যে, তা জানতেও পারেননি ! সেদিন সে-কথা কেউই বোঝেনি ! শাহজাহাঁ তো ছাড়, ফাগুদুসনের মতো বিদগ্ধ স্থাপত্য-পাণ্ডিত পর্যন্ত সেটা বুঝতে পারেননি। কিন্তু তাতে কি ? শিল্পী জানেন : কাল নিরবধি, পৃথবী বিপদলা ! জানেন : 'বড়ি মদুর্শকিল-সে হোতি হয় চানন্‌মে দিদাবর পরদা' ! কিন্তু নাগি-সের হাজার বছরের প্রতীক্ষা তো বিফলে যাবার নয় ! তাই দিদাবর হ্যাভেলকে একদিন বলতে হয়েছে—তাজ শাহজাহাঁর নয়, ইসলামের নয় : The Taj belongs to India !

: 'আর্থেরি-হাস্'-এর হক্‌দার কে ?

আর্থেরি-হাস্‌ হাসে জমিন্, যখন বে-অকুফ্ পস্ত-নিদার বলে : এ জমি আমার ! আর্থেরি-হাস্‌ হাসে অসতী ঔরৎ, যখন বে-অকুফ্ মরদ বিবিকে বশিত করে তার বাচ্চাকে ওয়ারিশ্ বানিয়ে যায় ! আর আর্থেরি-হাস্‌ হাসে উস্তাদো-কি-উস্তাদ আলিম শিল্পী, যখন বে-অকুফ্ মালিক ইনাম দিয়ে ইমানকে খরিদ করতে চায় ! —একমুঠো আসরুফির বিনিময়ে শিল্পের ষোলো-আনা হিসাদার বনতে চায় !

মালিক-শ্রমিকের সেই শ্বৈরখ সমরে কিজরী হয়েও এক্ষেত্রে নাম-গোত্র-হীন উস্তাদো-কি-উস্তাদ মীর মুহম্মদ গাজী মিঞা 'এ্যানন্‌' সেই 'আর্থেরি-হাস্‌' হাসতে পারেননি !

অসমাস্ত 'কৃষ্ণতাজে'র পরিত্যক্ত মোকাম-কুর্সি'র দিকে তাকিয়ে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলেছিলেন !

আর্থেরি আস্‌ !

শাহজাহাঁর মৃত্যুতে নয় ! তাজের ভরসাম্য-চ্যুতিতে ! □

॥ তামাম্‌ শূদদ্‌ ॥

॥ ইতি শ্রী 'লা-জবাব-দেহলী-অপরূপা আগ্রা' গ্রন্থং সমাপ্তম্ ॥

॥ টীকা ও উৎস-নির্দেশিকা ॥

[প্রথম সংখ্যাটি ত্রৈমাসিক, দ্বিতীয়টি পত্রায়, তৃতীয়টি সপ্তাহিক এবং চতুর্থটি পত্রিকায়।]

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্য

- 1.3.1.19 চতুঃপা, মজ্জতবা আলী, প্রকাশ ভবন, চতুর্থ বর্ষণ, পৃঃ 90.
2.5.1.8 দক্ষিণপাত, যাবাবর, পৃঃ 42.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ বাহ্যিকভাবে ইসলামী স্থাপত্যের বিবর্তন

- 1.13.2.4 Ibn Khaldun & Timurlane. by W. J. Fishoel. P. 40.
2.13.2.9 An Outline of Islamic Architecture. by R. A. Jairazbhoy, Asia Publishing House 1972, P. 41.
3.13.2.13 Ibid, P. 41.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥ দাস-বংশ

- 1.23.2.33 "The Arab settlers lived side by side with their Hindu fellow-citizens for many years on terms of amity and peace",—An Advanced History of India, by R. C. Mazumdar, Macmillan & Co., 1946, P. 275.
2.25.2.17 "Never has a sovereign, so vigorous, kind-hearted and reverent towards the learned and divines, sat upon the throne".—Minhaj Uddin.
3.26.2.22 Raverty, Vol. I, P. 642.
4.26.2.24 Ibid, P. 642.
5.29.1.18 "Gen. Cunningham found an inscription on the walls recording that twenty seven temples of the Hindus have been pulled down to provide materials for the mosque". Arch. Report, Cunningham, Vol. I, P. 176.
6.29.2.23 'ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্য', বিশ্বকোষ, ত্রৈমাসিক রজন দাস, ৮ম বর্ষণ, পৃঃ 109.
7.30.2.42 'Taju-L-Ma-asir', by Hasan Nizami, History of India, Elliot, Vol. II.
8.31.1.29 'The World's Last Mysteries', Reader's Digest, 1st Edn. 1977, P. 304.
9.31.1.31 History of Indian & Eastern Architecture, by J. Fergusson. Vol. I, P. 208.
10.32.1.4 'China Pictorial', II, 1979, P. 35.
11.32.1.5 চতুঃপা, মজ্জতবা আলী, পৃঃ 96.
12.32.1.41 'The Qutb Minar : Was there Afgan Influence?' by Dr. R. Sengupta, The Times of India, Sunday, July 30, 1978.
13.32.2.28 Quotation from Juzjani, Ibid.
14.32.2.30 History of Ind. & Eas. Architecture, by Fergusson, Vol. I.
15.33.1.34 চতুঃপা, মজ্জতবা আলী, পৃঃ 98.
16.34.1.2 চতুঃপা, মজ্জতবা আলী, পৃঃ 99.
17.36.1.34 D. O. letter no. 13(8)79C dated 26.5.80, from Dr. R. Sengupta, Director of Conservation, Archaeological Dept., Govt. of India, N. Delhi, to the author.
18.37.2.18 শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরটি আমি দেখিনি। তথ্যটি নিম্নলিখিত সূত্র থেকে সংকলিত : 'How Qutb Minar Was Designed', by Dr. R. Sengupta, The Hindusthan Times, Aug. 13, 1978.
19.37.2.20 Indian Architecture, Hindu Period, Percy Brown, 6th reprint 75, P. 14.
20.38.2.1 চতুঃপা, মজ্জতবা আলী, পৃঃ 97.
21.38.2.19 দক্ষিণপাত, যাবাবর, পৃঃ 112.
22.42.1.2 Palestine Pilgrims Tex Society, IV, 1897, P. 17 & An Outline of Islamic Architecture by Jairazbhoy, Asia Publishing House, 1972, P. 291.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥ খিলজী-বংশ

- 1.44.1.43 'Tarik-i-Firuzshah', Zia-ud-din Barani, (Trans Elliot).
2.45.1.24 'An Advanced History of India', by R. C. Mazumdar, Macmillan & Co., 1946, P. 300.
3.48.1.17 'Tarik-i-Alaishahi', by Amir Khasrau.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ■ তুঘলক-বংশ

- 1.51.1.43 হুসিউদ, বাবাবর, পৃ. 37.
 2.52.2.27 "Tarik-i-Firuzshah" Biblioth. Indica P. 452.
 3.52.2.33 'History of Medieval India from 637 A.D. to Mughal Conquest', by Iswari Prasad, Allahabad, 1933, P. 293.
 4.52.2.33 'Translation of Barauni', by Elliot, Vol. III, P. 235.
 5.52.2.40 'An Advanced History of India' by R. C. Mazumdar, P. 315.
 6.52.1.5 'Ibn Batuta', Paris Edn. III, P.p. 212-13.
 7.52.1.20 Ibid, P. 214.
 8.52.2.21 Iswari Prasad, Allahabad, 1933, P. 294, Bib. Ind. P. 214.
 9.52.1.7 'Indian Architecture, Islamic Period', Percy Brown, (1956) Sixth reprint. '75, P. 21.
 10.57.2.9 'Fatuhat-i-Firozshah', tr. Elliot, Vol. III, P. 382.
 11.59.1.36 'Sham-i-Siraj', Elliot, History of India, Vol. III, P. 350.
 12.62.2.36 'History of Medieval India.', by Iswari Prasad, 1933, P. 355.
 13.63.1.5 'Sham-i-Siraj', Alif; 'Tarik-i-Firozshah' P. 361.
 14.63.2.28 'Narrative of the Embassy of Clavijo to the Court of Timurlane', by Markham (Haklyal Soc. 1859).

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ■ সৈয়দ ও লোদী

- 1.69.1.29 পার্সি ব্রাউন তাঁর কালজরী গ্রন্থে (Ind. Arch. Islamic Period) সৈয়দ ও লোদীযুগের মক্কারাগুলিকে শিখারায় বিভক্ত করেছেন। তৃতীয় জাতের সন্তোষণধর্মী মক্কারায় উল্লেখ করেননি। গ্রন্থকারের মতে এ যুগের সমাধিসৌধ দ্বিধারায় বিচার করা উচিত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ■ বাবুর ও হুমায়ুন

- 1.74.2.1 'তৈয়্যুদ ফুল', শামলী, রবীন্দ্রনাথ।
 2.75.2.11 "History of India", Dr. Kalikinkar Dutta.
 3.76.1.31 'The Story of Babur's Death', Calcutta Review, Sept., 1936, by Ram Sharma.
 4.76.2.15 'Memoirs of Babur', by Leyden & Erskine, 1826.
 5.76.2.17 'Memoirs of Babur', by Mrs. A. S. Beveridge.
 6.76.2.29 'Life & Memoirs of Gulbadan Begam', Tr. by Beveridge.
 7.76.2.39 'Tawarik of Sayyid Maghbar Ali' (a minister of Babur).
 8.79.2.14 'An Advanced History of India', by R. C. Mazumdar, P. 601.
 9.80.1.2 Ibid. P. 600.
 10.80.1.31 যুগে যুগে ভারতশিল্প, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, 1961, পৃ. 148.
 11.81.1.7 যুগে যুগে ভারতশিল্প, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, পৃ. 151.
 12.81.2.4 যুগে যুগে ভারতশিল্প, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, পৃ. 152.

অষ্টম পরিচ্ছেদ ■ শেরশাহ হুয়

- 1.83.1.25 শেরশাহ-এর প্রামাণিক জীবনীকর ডঃ কানুনগোর মতে ফরিদের জন্ম 1486; কিন্তু গ্রীষ্মকাল সীরণ এ মত অব্যাহত করে প্রমাণ করেছেন [The Date & Place of Sher Shah's Birth. J. B. O. R. S., 1934, P. 108.] যে, ফরিদের জন্ম 1472 খ্রীষ্টাব্দে। রমেশচন্দ্র পরবর্তীকালে এ মত মেনে নেন।
 2.83.2.20 'Advanced History of India', by R. C. Mazumdar, P. 435.
 3.83.2.23 Ibid. P. 426.
 4.87.1.38 'History of India', Elliot Vol. III, P.p. 375-76.

নবম পরিচ্ছেদ ■ আকবর

- 1.97.1.15 আকবরনামা, ইং অনূবাদ, Vol. I. P. 375.
 2.99.1.11 আইন-ই-আকবরী, ইং অনূবাদ, Vol. I. P.p. 253-288.
 3.99.1.21 আইন-ই-আকবরী, ইং অনূবাদ, Vol. I. P.p. 484-485.
 4.99.2.36 'Akbar the Great', by Dr. Srivastava, 1st Edn. Vol. I. P. 41.
 5.100.2.30 'Muntakhab-ut-Tawarikh', by Abdul Quadir, Badayuni. (Tr.) Vol. III, P.p. 47-48.
 6.102.1.28 "When the expecting Khan removed the veil from her face he found her dead", Firista. (Tr.) Vol. II, P. 274.
 7.102.2.36 আইন-ই-আকবরী, ইং অনূবাদ, Vol. II, P.p. 159-60.
 8.104.2.28 'Delhi & Its Neighbourhood', by Y. D. Sharma, Archaeological Survey of India Publication, New Delhi, P. 119.

- 0.105.1.3 'Akbarname', Freer Gallery of Art, Smithsonian Institute, Washington, D. C., Exhibit No. 3957.
- 10.107.1.0 আকবরনামা, ইং অনুবাদ, Vol. II, P. 243.
- 11.108.2.2 'Akbar the Great', by Dr. Srivastava, Vol. I, P. 98.
- 12.109.1.5 'Indian Architecture, Islamic Pd', Percy Brown, P. 92.
- 13.110.1.29 'Agra & Its Monumental Glory', by R. Ratha, Taraporevala, Bombay, 1977, P. 24.
- 14.110.1.35 Indian Arch., Islamic Pd., Percy Brown, P. 92.
- 15.117.1.6 অজস্র অপরাধ, নারায়ণ সান্যাল, মার্চ, 1980 সংস্করণ, পৃঃ 66.
- 16.121.1.40 'Fatehpur Sikri', Sd. A. A. Rizvi, Arch. Soc. of India, 1922, P. 37.
- 17.121.2.7 Ibid, P.p. 34-35.
- 18.126.1.34 'Akbar the Great', by Dr. Srivastava, P. 316.
- 19.128.2.38 বাদশাহী আমল, বিনয় ঘোষ, পৃঃ 148.
- 20.129.2.12 আকবরনামা, ইং অনুবাদ, Vol. III, P. 81.
- 21.131.2.2 'Fatehpur Sikri', Salyad A. A. Rizvi, Arch. Survey of India, P. 61.
- 22.135.2.22 'ভারতশিল্পে ষড়ঙ্গ', অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্ববিদ্যালয়গ্রন্থ, পৃঃ 40.
- 24.140.2.7 আকবরনামা, ইং অনুবাদ, Vol. III, P. 576.

দশম পরিচ্ছেদ II জাহাঙ্গীর

- 1.149.1.35 History of Indian & Eastern Architecture, Fergusson.
- 2.150.1.1 Indian Architecture, Islamic Period, Percy Brown, P. 90.

একাদশ পরিচ্ছেদ II শাহজাহান

- 1.158.1.16 "The Emperor Jahangir, in an hour of drunkenness, handed over to Khurram the Prisoner (Khusrav) with the intention of transferring him from the ditch of prison to the plains of non-existence."—Salil, Amal, Vol. I, P. 137.
- 2.158.2.11 'History of Shahjahan', D. P. Saxena, P. 63.
- 3.158.2.29 Ibid P. 9.
- 4.158.2.36 'The Tazuk-i-Jahangir', Rogers & Beveridge, Vol. I, P. 115.
- 5 (Fig. 11.1) Copied from a Mughal Miniature now in British Museum, London.
- 6.166.2.6 'Agra & Its Monumental Glory', by R. Rath, Taraporevala, 1977.
- 7.167.1.33 History of Eastern Architecture, J. Fergusson, Vol. I, P. 308.
- 8.175.1.27 'The Taj Mahal', by David Carrol, Newsweek, New York, 1972, P.p. 16-17.
- 9.177.1.42 Ibid P. 14.
- 10.177.2.40 'নুরজাহান', সুকন্যা, করুণা প্রকাশনী, পৃঃ 148.
- 11.179.1.13 'Anecdotes of Aurangzeb & Historical Essays', Sri J. N. Sarkar, 1912, P. 148.
- 12.179.1.20 'The Taj Mahal', D. Carrol, P. 56.
- 13.180.12.42 'বিশ্বাসঘাতক', নারায়ণ সান্যাল, দে'জ, প্রথম সংস্করণ, পৃঃ 105.
- 14.184.1.4 'Indian Architecture. E. B. Havel, 1913, P. 71.
- 15.185.2.6 Ibid. P. 15.
- 16.187.1.4 'Jesting Pilate', Aldous Huxley, 1926.
- [Vide 'The Taj Mahal', by David Carrol, P. 159.]
- 17.187.2.18 'Brave New World', Aldous Huxley, Penguin Edn., 1972, P. 39.
- 18.187.2.19 Ibid, P. 50.
- 19.188.1.21 'The Taj Mahal', David Carrol. P. 98.
- 20.195.1.35 'History of Eastern Architecture', J. Fergusson, Vol. II, P. 313.
- 21.195.1.38 'Travels of Bernier', Constable's Edn. P. 298.
- 22.196.2.36 এ অনুচ্ছেদের তথ্যসমূহ 'Reader's Digest', Oct. 13/79, পৃঃ 68-71 থেকে সংগৃহীত।
- 23.200.2.24 'কর্তার ভূত'—রবীন্দ্রনাথ।

॥ নিবন্ধ ॥

অগলান, আজেম—২৩, ২৪
 অগলান, ইশক—২৩
 অজন্তা—১, ২, ৩, ৪০, ১০৫, ১৯৮
 অটোমান তুর্ক—১১, ১৭
 অনুপতলাও—১১৬-১১৮, ১২২
 অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—১১২, ১৩৫, ১৬৫, ১৯৩, ১৯৪
 অমরসিং গোট—১০৯, ১১০
 অরুপরতন—(ভট্টাচার্য দ্রঃ)
 অল্ ওয়ালিদ—১০, ১৩
 অষ্টভুজ মকবারা—৬৫, ৮৫, ১০৪
 অশোক স্তম্ভ—২১, ৫৯, ৬০, ৬৩

আইন-ই-আকবরী—৭৯, ১১১
 আইনস্টাইন—৫৬, ১৭০, ১৮০
 আইবক কুৎবউদ্দীন—৬, ৭, ১৮, ২২, ২৪, ২৮, ২৯, ৩১, ৫৯, ৬৪, ৭৭
 আইয়ুব, আবু সৈয়দ—৪০
 আউলিয়া—(নিজামুদ্দীন দ্রঃ)
 আকবর, সম্রাট—৭, ১০, ১৭, ৬৬, ৬৮, ৭১, ৮৩, ৯৪, ৯৬-১৪৮, ১৫০, ১৬২
 আকবরনামা—৭৯, ৮০
 আকবরী মহল—১১৩, ১১৪
 আগ্রা—৩, ৪, ৭, ৫৯, ১১৫, ১৪০, ১৯৭
 আগ্রা কিল্লা—১, ৭, ১৮, ৯৬, ১০৮, ১১৩, ১১৪, ১২৯, ১০৫, ১৪২, ১৪৩, ১৬৪, ১৬৭
 আজেম, অগলান—(অগলান দ্রঃ)
 আড়াই-দিন-কা ষোপড়া—২২
 আংকা খান—১৯, ৯৮, ১০৪, ১০৫
 আদিলাবাদ—২১, ৫৬
 আধম খান—২১, ৬৬, ৬৮, ৯৬, ৯৮, ১০০-১০২, ১৩০
 আনন্দবাজার—৩৫
 আনারকলি—১৪২, ১৪৬
 আফকন শের—(শের আফকন দ্রঃ)
 আবদল মালেক—১০, ১৩
 আবদারখান—১১৭, ১২২
 আবদু মশার—২৩
 আবদুল ফজল—৭১, ৭৬, ৭৯, ৯৬, ১০৪, ১০৮, ১২৭, ১৪১, ১৭২
 আবদুস সামাদ—৭৯
 আবদুর রহিম খান-ই-খানান—১২৭, ১৩৯, ২০০
 আবদুল লাহোরী—(লাহোরী দ্রঃ)
 আবদাসীদ বংশ—১৪, ১৫, ১৬
 আমীর-ই-আখর—২৫
 আমীর খসরৌ—(খসরৌ দ্রঃ)
 আমল/বী—৫, ৮, ১০, ১৩, ১৫, ২৩

আরিস্তওল—৪৫
 আকুয়েট—২৯, ৩৪, ৪৭, ১১১
 আর্কেমিডিস—১৫
 আজীবানু বেগম—(মমতাজ দ্রঃ)
 আলতুনিয়া—২৬, ২৭
 আলমগীর—১৭, ৭৩, ৮১, ১৭২, ১৯৯
 আলাই দরওয়াজা—১৯, ২৭, ৪৬, ১৮৫
 আলাই মিনার—২৭, ৪৬, ৬৪
 আলাউদ্দীন—(খিলজী দ্রঃ)
 আলিওয়াল—৮২-৯৫
 আল্লাহ—১১-১৪, ৫৭, ১২৪, ১৪২, ১৪৫, ১৯৫
 আসফ খাঁ—১৪৬, ১৬০, ১৮৫
 আহমেদ, স্থপতি—১৬৮, ১৬৯, ১৮৫
 আহিওল—৬, ৩৬, ৩৭

ইউক্লিড—১৫
 ইতমউদ্দৌলা—২, ৫, ১৫, ৩৭, ১০১, ১৪৬, ১৫১-৬, ১৬২, ১৮২
 ইবন কতুতা—৫২-৫৫
 ইবান—৬, ১১, ৩০, ৪১, ১০৪, ১০৫, ১৫০
 ইবাদখানা—১৬, ১১৭-২৪
 ইমারৎ—৪, ১৩
 ইরাক—১১, ১৪, ৬৭
 ইরান—১১, ৬৭
 ইলতুংমিস্—৩, ১৫, ২২, ২৫, ২৯, ৪১
 .. সমাধি—৩৯, ৪০-৪২, ৪৭
 ইলিয়ট—৫২
 ইশক অগলান—(অগলান ইশক দ্রঃ)
 ইশার তোরণ—১০৩
 ইস্তাম্বুল—৮, ১৭, ১০৩

ঈশা আফান্দ—১৬৪, ১৭৮-৮২, ২০১-০৩
 ঈশা খাঁ—৬৬, ৬৮
 ঈশোপনিষদ্—১৪৫
 ঈশ্বরীপ্রসাদ—৫২

উমর ইবন আবু রাবেয়া—১৩
 উল্লেখ খান—৪৪

ওক, পি. এন.—৩৫, ৩৬
 ওমর খৈরাম—১২৯
 ওমর মসজিদ—(ডোম অফ দ্য রক দ্রঃ)
 ওয়ামিরদ বংশ—১২, ১৪-১৬, ২০, ৬৬
 ওল্ড টেমটামেন্ট—১২৯

উল্লেখজীব—২, ১৫৯, ১৬০, ১৭২, ২০০
 (এবং আলমগীর দ্রঃ)

ফজর—৫৭
 কমলাদেবী—৪৫, ৪৮
 কলিঙ্গ—১০, ৩৬-৭
 কাইরোয়া—১০, ১৪
 কাফুর, মালিক—৪৮-৯
 কাবা—৬, ৯, ১১, ৪০
 কার্জন, লর্ড—৩৮, ১০৭, ১১৫, ১১৮
 কার্দ্ভা—৮, ১০, ১৪
 কালান মসজিদ—৬০
 কাসেম, মহম্মদ বিন—২২-৩
 কিস্—১৫
 কিপলিঙ, রাইডার—১৮, ১৭০
 কিল্লা—৬, ১১, ১৩, ১৬৬
 কিল্লা-ই-খুনাহ—৯২
 কুণ্ডতুল মসজিদ—২১, ২২, ২৪-৩০, ৩৯-৪১, ৪৬, ৫৯, ৯২
 কুৎবউদ্দীন আইবক—(আইবক দ্রঃ)
 কুৎব মিনার—৪, ৭, ২১, ২২, ২৪, ৩২-৩৬, ৭৭, ১০৩
 কুৎব, মেয়াদ—৪৮
 কুফি লিপি—৪০
 কুমারস্বামী, আনন্দ—১৭০
 কুরান—১১, ৩০, ৩৪
 কুর্সি—৫৫, ১৯৩
 কুর্সি-গম্বুজ—(গম্বুজ-কুর্সি দ্রঃ)
 কোর্নিক কোণ—৩৭, ৩৮, ১০৬
 কার্নিহোয়া—৩১
 কালিগ্রাফি—১৪৬

খলিফা, অল ওয়ালিদ—১৩
 .. আকল মালিক—১২
 .. মনসুর—১৪
 .. মোরায়ীয়া—১০
 খসরৌ (জাহাঙ্গীর পুত্র)—৭১, ১০৯, ১৪৬, ১৪৭, ১৭৭-৭৯
 খসরৌ নাসিরুদ্দীন—৫০
 খাজুরাহো—৬, ১০, ১৬, ৩৬, ৩৭
 খান-ই-জাহান ডিলাঙ্গানী—২৯, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৬
 খানমহল—৫৯, ১৬৫, ১৭১
 খিলজী, আলাউদ্দীন—৭, ১৬, ২৯, ৪৩-৪৬, ৫০
 খিলজী জালাউদ্দীন—৪৩-৪৬
 খিলান—৩, ৬, ৩০, ৪৭, ৬৮, ১০৪, ১৬৩, ১৬৬
 খিলান মসজিদ—৬০
 খুররম—৭১, ১৩৯, ১৪৬, ১৪৭, ১৫৮ (এবং শাহজাহা দ্রঃ)
 খোয়াবগাহ—১২২, ১৩৫, ১৫০, ১৬০, ১৬৭-৭০, ২০৩

খজনী মিনার—৩৩, ৩৭

গজনারি মন্দির-৬
গজমুতা, হুস্তী-১০৭-৩৮
গম্বুজ-০, ৬, ১৫, ১৫, ৪০, ৪১,
৪৭, ৬১, ৬৭, ১০৬, ১১০,
১৪২, ১১০
গম্বুজ-কুসি (বা মোকানকুসি)-৬৬,
৬৭, ৬৮, ১০৫, ১৪৫, ২০১
গাজী মালিক-(তুগলক পিরাস্ প্রঃ)
গাজী শাহনা-(শাহনা প্রঃ)
গালিব-৪০, ৬২
পিরাস্ তুগলক-(তুগলক প্রঃ)
পিরাস্ ফলবন-(ফলবন প্রঃ)
গুদামহল-১২১, ১২২, ১৪৪
গুদবন্দ-৫, ৫১
গুদবন্দা-০, ৬, ৬৮, ১০৫, ১১৫
গুদবন্দ বেগম-৭৮, ৭৯, ১৭, ১৬১
গ্যালেন-১৫
গ্যালিলেও-০৪, ৫৬
গ্যান্ড ট্রান্স রোড-১২, ১৫
গ্যান্ডিওটোর-২০

ঘাত্রী, সুলতান-২১, ২২, ৪০-৪২, ১১৬
ঘাত্রী মহম্মদ-২৪

ছবতী পুর্নচন্দ্র-৮১, ৮২
চুখতাই তুর্কি-৭৬, ৭৭
চুপিঙ্গ খান-১৫, ১৬, ৭৪, ৭৫

ছফা-৪৭, ৬২, ১২৪, ১২৫, ১৫১,
১৫০, ১৬৬

ছত্রী-০, ৬, ৫১-৬১, ৬৭, ১০৫,
১৪১, ১৫০, ১৫১, ১৫০, ১৬৬,
১১৬

ছোটো খান-কা-গম্বুজ-৬১

জবাব-৬, ১১৬, ২০১
জাম-ই-মসজিদ-২৪, ৬০, ১১৭, ১০০-
০০

.. দিল্লী-২১, ১৫৭, ১৬০, ১৭২
জালালুদ্দীন-(বিজ্জী প্রঃ)
জাহাঙ্গীর-৭, ১৭, ১৮, ৭৯, ৮০,
১৪৬-৫৬, ১৫৮

.. মকসস-১৫৪-১৫৬
জাহাঙ্গীরী মহল-৪৭, ১১০-১৪,
১৫১

জাহান-আরা-৭৯, ৮০, ১৬১

জাহান পনাই-৫৬, ৬০

জাহান, মালিকা-৪০-৪৫

জিগুদুয়া-১৫

জিজিয়া কর-১৬

জিয়া বারনি-(বারনি জিয়া প্রঃ)

জুড়িয়া-১০

জেনিসারি-২০

জেবউল্লাহ-৭১, ৮০

জের-সালেম-৮, ১০, ১৬, ৬৬

টোপারা-১৫
টোডরমল-১৬, ১৪০
টোবিয়েট লম্বাতি-২১, ৬১, ১০২-১১,
১১৪, ১২৭, ১০৬

ডেকাটে-১২০
ডোম অব দা রক-১২, ১০, ৬৬, ১৮৫

ডাকমহল-১, ০, ৬, ০০, ০৭, ৬১, ১২,
১৪, ১২২, ১০১, ১০২, ১৪১,
১৫১, ১৬৫, ১৬৬, ১৭২-২০০

.. ক্যালিগ্রাফি-১৮৮-৮১

.. গম্বুজ-১৮৪-৮৬

.. জল সরবরাহ ব্যবস্থা-১১৮

.. নির্মাণ ব্যয়-১১৮-২০০

.. পরিকল্পনাকার-১৭৮-৮২ (এবং

.. প্রশা আফানি প্রঃ)

.. স্যানের বৈশিষ্ট্য-১৮২-৮৪,

২০১-২০০

.. মথুরা রিফাইনারির প্রভাব-

১১৬-১১৮

.. মিনারিকা-১৮৬-৮৮

.. সম্মুখ দৃশ্য-১৮৮-১২

.. হিসাবের খাতা-১৮৪

.. হিন্দু স্থাপত্যের প্রভাব-১১২

তানসেন-১১৫, ১২২, ১২৭, ১৪০,

১৪০, ১৫০

তুগলক বংশ-৫০, ১০৬

.. গিয়াসউদ্দীন-৭, ২১, ৪৭, ৫০-
৫৬

.. মহম্মদ বিন-৭, ৫১-৫৬

তুরস্ক-৫, ১০, ১৪

তুর্কি সুলতানা কুটির-১২৫

তৈমুরলঙ-৬০-৬৬, ৭০, ৭৪

দরওয়াজা, আগ্রা-(আগ্রা দরওয়াজা প্রঃ)

দাদী-কা-গম্বুজ-৬১

দারাদুকা-১৪৬

দামাস্কাস-১০-১৫

দাসপ্রথা-২২-২৪

দাস বংশ-৭, ২৪, ৪০

দিল্লী-১, ৪, ২০, ২৪, ০৫, ৫৯,

৬০-৬৮, ৭৬, ১০৫, ১০৯, ১৭০

দিল্লী দরওয়াজা-২১, ১১০, ১১০,

১৬৭-৬৯

দীন ইলাহী-১৮, ৯৬, ১১৯, ১০১,

১৪৫

দীনাপনাই-১০৭

'দৃষ্টিপাট'-৫, ৫১-৫০

সেওয়ান-ই-আম-৬, ৫৯, ১১৭, ১১৮,

১০৪, ১৬০, ১৬৬-৭১

সেওয়ান-ই-খাশ-৬, ৫৯, ১১৭, ১২০,

১৬০, ১৬৫, ১৬৭-৭১

সেক্সাসেবী-৪৮, ৪৯

সৌলখানা-১১৭, ১২০

প্রাদিক স্থাপত্য-০৭

নজরোজ বাজার-১২৮

নজরখানা-১৬৭-৭০

নবরঙ্গ মন্দির-৫৯, ৬০

নাই-কা-কোট-২১, ৫৬

নাগর স্থাপত্য-০৭, ১৬০

নাগিনা মসজিদ-১৬৬-৭০

নাথ, শ্রী আর-১৬৬

নালন্দা-১০, ৫৭

নাশখ লিপি-৪০

নাসিরউদ্দীন-২৫, ৪০

নিজামউদ্দীন আউলিয়া-২১, ৪৯, ৫৫,

১০৪

.. হজরৎ শেখ-৫১-৫০

নুরজাহা-১৭, ৭৯, ৮০, ১২১, ১৪৬,

১৪৯, ১৫১, ১৫২, ১৬১

নেবুকাডনেজার-১০০

পার্শ্বী কোর্ট-১২২

পণ্ডর দেউল-১৮০

পন্নগবর-(হজরৎ মহম্মদ প্রঃ)

পাকিস্তান-১৮

পাচমহল-১২৪

পানিপথ-৭০, ৭৭, ৯৬

পার্সি টাউন-(টাউন প্রঃ)

পাল, সুনীল-২

পাড় দেউল-১৬০-৬৪

পীর গালিব-৬০

পীসা, হেলানো-মিনার-০৫

পুখরাই চৌহান-২৪, ০৪, ০৯

পুখরাই গম্বুজ-১৪৯, ১৮৪-৮৬

'পুখরাই'-০, ১১০

প্লেটো-১৫

ফতেপুর-সিদ্ধি-৪, ৭, ১৫, ১৭, ৯৭,

১০৬, ১১৪, ১১৫-৪৫, ১৫০,

১৬২

ফরিদ-৮২

ফাগুসন-০১, ০২, ৪০, ৪১, ১৪৯,

১৬৭, ১৭০, ১৮৫, ২০০

ফারুখ বেগ-৭৯

ফিরোজ শাহ কোটলা-২১, ৫৬, ৫৮,

১৬৮

ফিরোজ শাহ-(তুগলক প্রঃ)

ফিরোজাবাদ-৭

ফেরেস্টা-২৬

ফেজি-৭৯, ৯৬

ফেস্কা-১৫

বড়াখান-কি-গম্বুজ-২১, ৬৯, ৭৮

বগবন, গিয়াসউদ্দীন-২১, ২৮, ৪৭

বাগদাদ-৮, ১০, ১৪, ১৬

বাজবাহাদুর-১০০-১০২

বাদগীর-১২৪

বাদাউন-২৫

বাদামি-৫, ০৬

বাদুর-৭, ৬৮, ৭০, ৭০-৮১, ১৪৮

.. , শিল্পযোগ-৭৬-৭৯

.. , চাহারবাগ-৬৬, ১৬৮, ২০০

বার্গিন, জিয়া-৪৪, ৫২, ৫০, ৭৯

বার্গিনার-১৬১

বাহারাম-২৭

টমাস রো, স্যার-৮১

টরেন্স-২২, ৭০

টেলি-১৫

মাহমুদ-৬৬

বীরবল-১৬, ১১৭, ১১৮, ১২৫-২৮, ১৬০

বল্লভ, দরওয়াজা-৪, ১৪, ১১১, ১১৭, ১০০-০৬, ১৫০, ১৬৪

.., বীরবল-১০৪

.., ভয়ানক রস-১০৪

.., শান্ত রস-১০৬

বেগমপুরী মসজিদ-৬০

বেগা বেগম-১৭, ১০৮

বেসর স্থাপত্য-০৭

বোদোঁ, অস্টিন-১৭১, ১৮০-৮১

বার্টিয়ান-৫৪, ৬১, ১৪২, ১৫০, ১৫৩

ব্রাউন, পার্সি-৪১, ৪৭, ৫৫, ৬০, ৬৫, ১০৯, ১১০, ১৪২, ১৮০, ১৮৪

কটোচার্জ, অরুণরতন-০৫-০৬

ভলভেয়ার-৫৬, ১২০

ভসৌর-৩০, ৪৭

ভাদুড়ী শিশির-১৭০

‘ভাব’-১১০

ভারমোর-২০

ভার্সাই প্রাসাদ-১৫৯

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-২, ৩৩, ১১৬

ভুবনেশ্বর-৫

ভুলি-ভাটিয়ারী-২১, ৬২

ভেলাস্কেথ-৮০

ভ্যান গথ-৫৬

মকবারা-৬, ৫৫, ৬১, ৬৫-৬৯, ১০৭, ১৪৯

.. অষ্টভুজ-৬৫, ৬৯, ৭০

.. চতুষ্কোণ-৬৮-৭০

.. সংক্রামণ ধর্মী-৬৫, ৬৯

মক্কা-৮-১২, ৪২, ৯৯

মদিনা-৮, ১১, ১২

মতি-মসজিদ-১৬৬, ১৭২

মজুমদার, রমেশচন্দ্র-৪৫, ৫২, ১১৫

মমতাজমহল-১৭, ৭৭, ৮০, ১৬১, ১৬২, ১৭৪-৭৮, ১৯৬

ময়ূর সিংহাসন-১৬১

মরিয়ম জমাদানী-১৭, ১৬১

মরিয়ম মকানী-১০৫, ১৪০

মসজিদ-৫, ৬, ১২, ১৩, ১৫, ৬৭

মহম্মদ কাসেম-(কাসেম প্রঃ)

মহম্মদ বিন-(ভুগলক প্রঃ)

মহম্মদ হজরৎ-১০-১৩, ১৭, ১৪৫

মহাবলীপুরম-১০

মাখ্‌সুদ-২১, ৬৭

মাদ্রাসা-১৬, ১৭, ৬১

মানবাঈ-১৪৬

মানমতী-১৪৬

মানসিংহ-১৩০, ১৩৭-৮, ১৮১

মার্কস-১৮০

মালচা মহল-৬২

মালিক কাফুর-(কাফুর প্রঃ)

মাহমুদ, সুলতান-২৪

মিকেসাজেলো-২, ১৫২, ১৫৭, ১৬৪, ১৯০, ২০০

মিনার/মিনারিকা-৪, ৬, ১০, ১৫, ১৬, ৩২, ৩০, ৪২, ৬০, ১১০, ১৩০, ১৫০, ১৫০, ১৯০

মিজা গিয়াস-১০৭, ১০৮, ১৪৭

মিশর-১০, ১১, ১৭, ২০, ১৯৯

মিহরাব-৬, ১১, ১৫, ৫৪, ১১৬

মীর সৈয়দ আলি-৭৯, ৮০

মুগল-এ-আজম-৭, ৬৮

মুজতবা আলী-০, ০২-০৪, ০৮, ৬৯, ৭৬, ১৬৪, ১৮৬

মুবারক শাহ সৈয়দ-(সৈয়দ প্রঃ)

মুয়াফ্ফিন মিনার-৬১

মুসমান বর্জ-১৬৫

মুহম্মদাবাদ-৫৬

মেট্রোপোলিটান মিউজিয়াম-৭১

মেসোপটেমিয়া-১০, ১৪, ২০

মেহেরউদ্দিনসা-১২৯, ১৪৬, ১৪৭

মেহেরুলী-২০, ২১, ৪০, ৪৭

মৌর্য-৫

ম্যানারিজম-১৫৯

মাদ্রাস-১১

‘মাদাবর’-৫, ৩৮, ৫১-৫০

মাদ্রাস-১১, ১০, ৫৬, ১৪৬

মাকু-২৬, ২৭

রকম-ই-হিন্দু-২০

রক্তমহল-১৬৮-৭১

রথ, ডঃ-১১০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-৬১, ১৫৭, ১৭০, ১৭৯, ১৯৪

রমেশচন্দ্র-(মজুমদার প্রঃ)

রঃমেনিস্-০৫

রায় পিথোরা-৫৬

রায়ী-১৫

রাহজেস্-১৫

রিজভী-১২৮

রুথো বেগম-১৭, ১২৮

রুজভেট, মিসেস্-১৭০

রূপভেদ-০, ১৯০

রূপমতী-৯৬, ৯৯-১০২

রেথ দেউল-১৬৩-৬৪

রোজিয়া সুলতানা-২২, ২৬-২৮

রোদা-১৩০

লাডলী বেগম-১৫৫-৫৬

লালকিল্লা-৭, ২০, ২১, ৫৯, ১১২, ১২৯, ১৫৭, ১৬৭-৭০

লাবণ্যবোজনা-১৯০, ১৯৪

লাহোর-৭, ৮, ২৪, ১৪০, ১৫৪-৫৬

লাহোরী, আবদুল-১৭৭

লিয়ান-৩০, ৪১, ১০৫, ১০৯

লেনিন-১৮০

লোদী-৭, ৭০, ৭৫, ১০৬

.. বংশ-৬৫-৭০

.. সিকান্দার-৩৪, ৬৫-৬৮

লৌচস্তুত, কুৎস-০১

লক্ষগ্রাম-৬, ১৪৫

লক্ষগ্রাম, শেখ মজিদ-৫১-৫০

লক্ষগ্রাম, সেনরায়-(সেনরায় প্রঃ)

লক্ষগ্রাম-১১

লাহজাহী-৭, ১৭, ৪৭, ৭৯, ৮১, ৯৪, ১১২-১৪, ১২৮, ১৪৬, ১৫২, ১৫৭

.. সৈন্যদল জীবন-১৬০-৬০

.. স্থাপত্য স্থলরূপ-১৬০-৬৪

লাহজাহী-৭

লাহানা, মালিক গাজী (মালিক)-৬০

লাহানা-১৬৪

শেখ, সেলিম চিস্তি-২, ১১৫, ১০০-

০২, ১৮২

শেখ শাহ শেখ-২, ১৭, ৬৬, ৬৮, ৭০, ৭৭, ৭৯, ৮২-৮৫, ৯৯, ১৫২

.. স্থাপত্য স্থলরূপ-৭৪, ৮৭, ৮৯, ৯৪, ৯৫

শেখ আমিন-১৪৬-৪৭

শেহান-৬, ১১, ১০০, ১০৩

শ্রীকান্ত-১২৪-৮

সন্দো-৬, ৫৫, ১৫৫, ১৯৫, ২০০

সকলকর্ত-২, ২১, ৪২, ২০০

সবুজপানি-২২, ২৪

সমগ্রকর্ম-১৬, ৬০, ৮৮, ২০০

সলোমন-১০

‘সাদা’-১০৫, ১৫১, ১৯০-৯৬

সাদা-৮, ১৫, ১৬

সালিমা বেগম-১৭, ১৬১

সালিমা সুলতানা-১৭

সিকান্দার লোদী-(লোদী প্রঃ)

সিরি-২১, ৪৬

সিরিয়া-৫, ১১, ১৩

সিস্টিন চ্যাপেল-২, ১৫২, ১৬৮

সুনাহারা ফকান-১২৪, ১২৭

সুনাহারা পাল-(পাল প্রঃ)

সুলতান হারী-(হারী প্রঃ)

সুলতানা বেগম-১৮

সুলতানা রোজিয়া-(রোজিয়া প্রঃ)

সেকুয়ার-৬

সেকেন্দার শাহ-৪৫

সেকেন্দার মক্কা-৭, ৪২, ১০৫, ১৪২, ১৪৭-৫১

সেনরায়, লক্ষগ্রাম-২

সেনোটাক-৬

সেলজুক ডুক-১৬, ১৭

সেলিম-১১৪, ১১৫, ১২৮, ১০৪, ১৪০, ১৪২, ১৪৪, ১৪৬

(জাহাঙ্গীর প্রঃ)

সৈয়দ বেগ-৭, ৬৫-৭০, ৭০, ১০৬

সৈয়দ মুবারক শাহ-৬৫-৬৮

.. মুহম্মদ শাহ-৫৫-৬৮, ১৮৫

শ্বইক-১৫, ৪০, ৪৭, ১০১, ১২৭

শ্চায়েকটাইট-০৪, ৩৮, ১১১, ১৮৪

শ্বইসোনিরান ইসা-১০৫

হক, আবদুল (স্বপ্নাতি)—৬০
 হুজাত—২০
 হুলাবিয়াট/ঘাটী—১০৭-৩৮
 হুলাবেন—৮০
 হুলালে, আলফুস—১৭৩, ১৮০-৮৪
 হুজা বৈগম—৯৬, ৯৭, ১০৭, ১০৮
 হুমজানামা—৮০
 হুমাম—৬, ১৪, ১১৬, ১২২, ১৬৫-৭২

হামিন, (স্বপ্নাতি)—১৬৮
 হামিদা বান, বৈগম—৯৬-৯৮, ১০৮,
 ১৪০-৪৪
 হারাম-সারা—১২৪
 হারেম—১৬১-২
 হাসান শাহ, শূর—৬১, ৮২-৯৫
 হিজিরা—১১
 হিরণ মিনার—১১৬, ১০৬-৩৯, ১৬৪

হুনাইন, ইবন ইশাখ—(ইশাখ পঃ)
 হুমামুন—৭, ৬৮, ৭৩-৮২, ৯৬, ৯৯
 " " স্থাপত্য—৭৮
 " " মক্কারা—২, ৩, ৫, ২০, ২১,
 ৩৩, ৪২, ১০৫, ১১০, ১৩৯,
 ১৪৯, ১৫০, ১৮৩, ১৮৫
 হোস-ই-খাশ—২০, ২১, ৬১
 হ্যাভেল—৪১, ১৪৯, ১৭৩, ১৮৩,
 ১৮৫, ২০৩

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

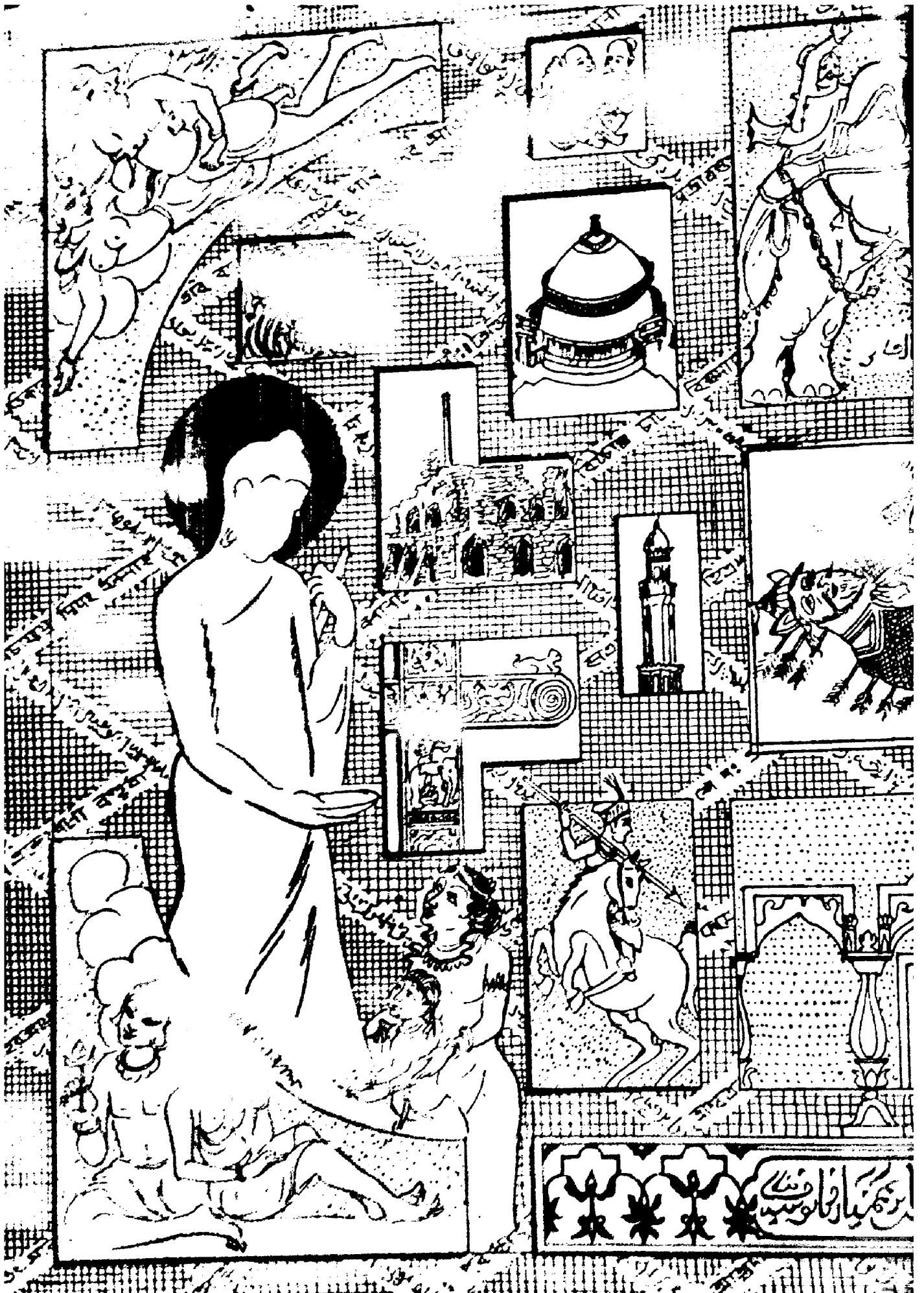
[লেখকের উপাধির ক্রমানুসারে সজ্জিত]

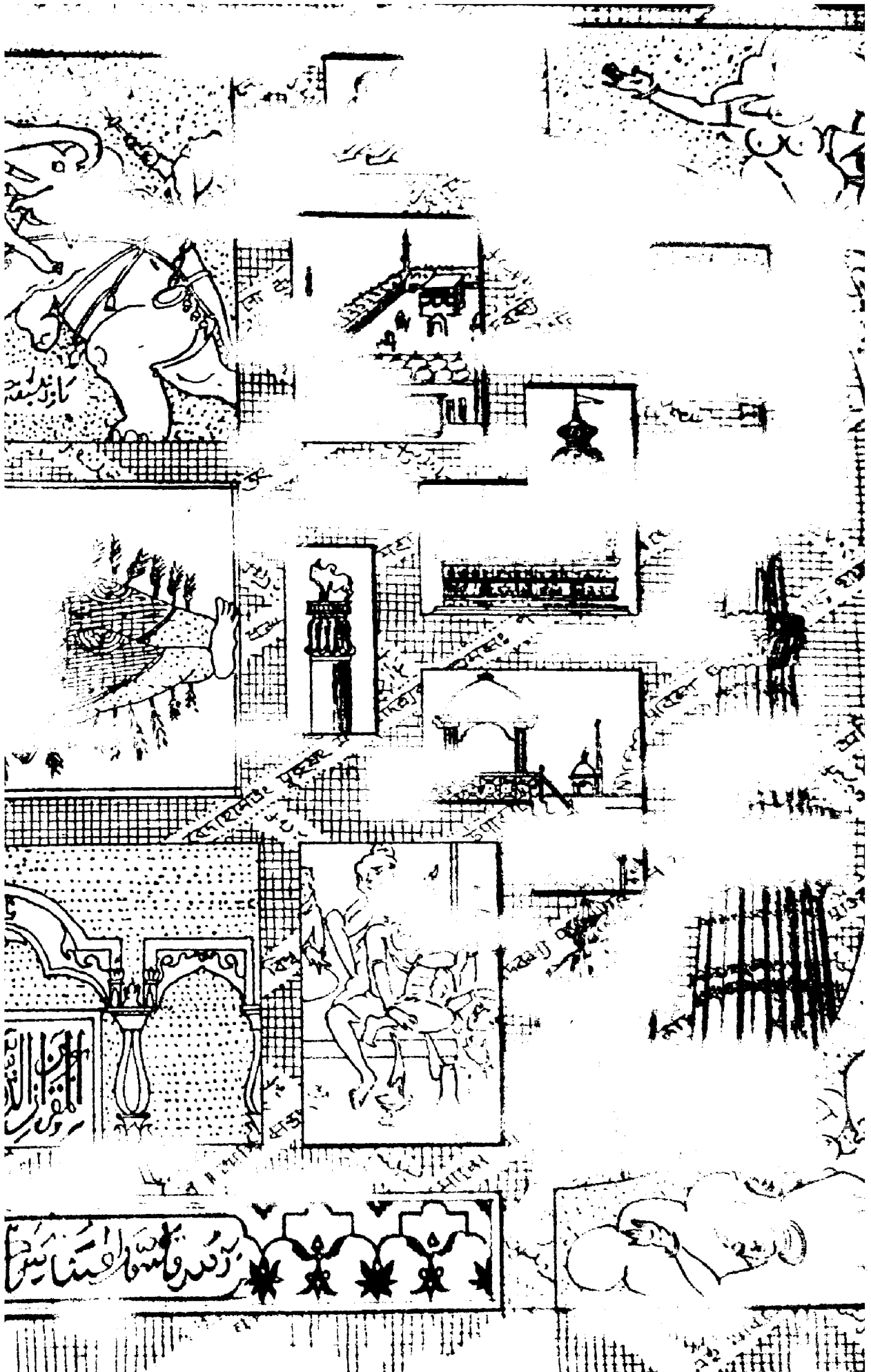
আব, লক্কন : 'আইন-ই-আকবরী'—
 ১০০ এ; 'আকবরনামা'—১৮,
 ১০৬, ১০৮, ১০০, ১৪১
 আলি, মুজ্জতবা : 'চতুর্ঙ্গ'—০, ১১,
 ১৫, ১৬, ২০
 কান্দনগো, ডঃ : 'শেরশাহ'—৮৪
 ঘোষ, বিনয় : 'বাল্মীকী আমল'—১০০
 চক্রবর্তী, পূর্ণচন্দ্র : 'যুগে যুগে ভারত
 শিল্প'—৮১, ৮২
 ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ : 'ভারত শিল্প
 যত্ন'—১০৮
 ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : 'রচনাবলী'—৭৫,
 ১৬, ২০২
 দাস, দীপকরঞ্জন : 'বিশ্বকোষ'—৩০
 যাকার : 'দৃষ্টিপাত'—৫, ২৯, ৫১
 সান্যাল, নারায়ণ : 'অজ্ঞতা অপরাধ'—
 ১১৬
 ঐ : 'বিশ্বাসঘাতক'—১৮২
 সীতল, পদ্মস্বা : 'J.B.O.R.S.'—
 ৮৪
 স্কেনা : 'নরজাহান'—১৭১

Ali, Maghbar ; 'Tawarik of
 Sayyid M. Ali'—৭১
 Badayuni (tr. Abdul
 Quadir)—১০১
 Barani, Zia-uddin ; 'Tarik-
 i-Firuzshah'—৪৪, ৫২
 Beveridge, Mrs. A. S. ;
 'Memoirs of Babar'—
 ৭৭, ১৬০
 Bernier ; 'Travels of'—১১৬
 Brown, Percy ; 'Indian
 Architecture'—৩৬, ৫৫,
 ১১০, ১১১, ১৫১

China Pictorial, ১৯৭৯—১৭
 Cunningham ; 'Architectu-
 ral Reports'—২৯
 Digest, Reader's ; 'The
 World's Last Mysteries'
 —৩১
 Dutta, Kalikinkar ; 'His-
 tory of India'—৭৬
 Elliot ; 'Historical Works'—
 ৫২, ৫৭, ৫৯, ৮৮
 Erskine, 'Memoirs of
 Babur'—৭৭
 Fergusson, J ; 'History of
 Indian & Eastern Archi-
 tecture'—৩১, ৩৩, ১৫১,
 ১৬৮, ১৯৬
 Fishoel ; 'Ibn Khaldun &
 Timurlane'—১০
 Havell, E. B ; 'Indian
 Architecture'—১৮৫, ১৮৭
 Huxley, Aldus ; 'Jestine
 Pilate'—১৮৮
 Do ; 'Brave New World'
 —১৮৯
 Ibn Batuta ; 'Travels of'—
 ৫০
 Iswariprasad ; 'History of
 Medieval India'—৫২,
 ৫০, ৬০
 Khasrau, Amir ; 'Tarik-i-
 Alai-Shahi'—৪৮
 Markham ; 'Narratives of
 the Embassy of Clavijo
 to the Court of Timur-
 lane'—৬৪

Mazumdar, R. C. ; 'An
 Advanced History of
 India'—২৩, ৪৫, ৫২, ৮০,
 ৮১, ৮৪
 Minhaz Uddin ; 'History of
 India'—২৫
 Nizanni, Hasan ; 'Taju-el-
 Ma-asir'—৩১
 Ratha, R ; 'Agra & It's
 Monumental Glory'—
 ১১১, ১৬৮
 Rizvi, Sd. A. A. ; 'Fatehpur
 Sikri'—১২২, ১৩০
 Salil, A ; 'History of the
 Mughals'—১৬০
 Sarkar, Jadunath ; 'Anec-
 dotes of Aurangzeb &
 Historical Essays'—১৮০
 Saxena, B. P. ; 'History of
 Shahjahan'—১৬০
 Sengupta, R. ; 'The Qutb
 Minar', The Times of
 India, (৩০-৭-৭৮)—৩২
 Do ; 'How Qutb Minar was
 Designed', Hindusthan
 Times (৩-৮-৭৮)—৩৭
 Sharma, Ram ; 'Story of
 Babur's Death, 'Cal.
 Review (Sept. '36)—৭৭
 Sharma, Y. D. ; 'Delhi &
 It's Neighbourhood'—
 ১০৫
 Srivastava, Dr. ; 'Akbar
 the Great'—১০০, ১০৯,
 ১২৭





“শিল্পকার পেশার ব্যক্তিকার, নেশায় শিল্পপরিসিক। উপরন্তু অন্ধনাশিল্পী। সুতরাং তাঁর রচনায় শব্দ, আলোচ্য শিল্পকীর্তির বাহিরপের পরিচয়ই পাওয়া বাবে না, সেখানে অন্তর্নিহিত শিল্প-রচনার সঙ্গেও তিনি পাঠকের কাছে পৌঁছাননি—এটা প্রত্যাশিত। এই প্রত্যাশা পূরণ করেছেন লেখক।...নরায়ণ সান্যালের সব চাইতে অধিক গাঢ় কৃতিত্ব এই যে, বাংলাভাষার পাঠক-প্রতিক্রিয়ার কাছে তিনি পরিবেশন করেছেন হুন্দা-মুসলিম স্থাপত্যকীর্তি সম্পর্কে এমন একটি তথ্যসমৃদ্ধ-গ্রন্থ যা ইতিপূর্বে শব্দে রচিত নয়, বোধহয় ইংরেজীতেও হয়নি। যা এতদিন শব্দে ব্রহ্মবিলাসীদের কাছে দুঃশব্দের আগ্রহের বিষয় ছিল তা ইতিহাস এবং শিল্প-কলা সম্পর্কে অনুমানী মানুষের কাছে অপরিহার্য, সুখপাঠ্য এবং নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসাবে গণ্য হবে।”

অধ্যাপক শ্রীনিশীথরঞ্জন রায়

দেশ, 18.12.82

“আমাদের ভাষায় এ হেন গভীর তথ্য ও ভাবনা-সমৃদ্ধ বই আছে বলে আমার জানা ছিল না। আপনার বইয়ের নকশা ও বিশ্লেষণ, অন্ত্যন্ত মূল্যবান। ইংরাজীতেও এই বইয়ের বিষয় ও লিখন-শৈলীর সমতুল্য সূচনায়ক বই আমি পড়িনি—not even Havell and Percy Brown. আমি দীর্ঘ পনের বৎসরকাল আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগের কর্তা ছিলাম, এ অঞ্চলের Islamic Architecture সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ নই।...উচ্ছ্বাসের বশে হঠাৎ একথা লিখছি না।”

অধ্যাপক শ্রীঅমলেন্দু বসু

10.10.82

“কইখানি অতি সুন্দর হয়েছে। পড়ে যেমন আনন্দ পেলাম, তেমনি অনেক কিছুর নতুন করে জানলামও। পড়া শেষ হতেই প্রবল বাসনা জাগল তোমাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাতে—আই এই চিঠি। একদিন এস, বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছা আছে।”

শ্রীউমাপ্রসাদ মুনোপাধ্যায়

20.9.82

“কইটি পড়ে বিশেষ আনন্দলাভ করেছি। আপনার বইয়ে ইতিহাস, শিল্পবিদ্যা ও সাহিত্য-রচনার সুন্দর মিলন ঘটেছে। প্রত্যেক অঙ্গসম্প্রদায় আপনার সুক্ষ্ম শিল্পীমনের পরিচয়। আপনি অজস্র নতুন আগ্রহের বিকাশ ঘটান গিয়ে বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন রীতির প্রবর্তন করেছেন। এতে যেমন সুন্দর স্বপ্নের ইতিহাসিক, শিল্পী ও লেখকের সমন্বয় ছাড়া সম্ভব নয়

শ্রীচিন্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজয়া দশমী, ১০৮৯

“নরায়ণ সান্যাল নিজে একজন স্থাপত্যবিদ। এই বোধহয় তিনি একটি বিশেষ দৃষ্টি নিয়ে এই-সব স্থাপত্যকে দেখেছেন এবং সেই অপরূপ দর্শনের আনন্দ অনুভূতিকে অকুণপ হৃদয়ে বিচলিত করেছেন পাঠকের কাছে।”

গ্রন্থবর্তী বিভাগ II যুগান্তর

24.2.83